উদ্বোধন

" উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত "

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬৩ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ॥

মাঘ, ১৩৬৭

বার্ষিক মূল্য ৫·০০

প্রতি সংখ্যা ০·৫০
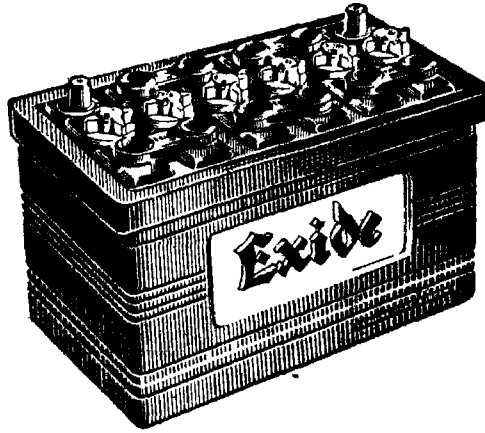
শ্রীশ্রীবিবেকানন্দাষ্টকম্

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দধদ্ দিব্যজ্যোতিঃ পরমরমণীয়ং নয়নয়োঃ
প্রসন্নাস্যঃ সৌম্যো মণিকনকশোভাধরবপুঃ।
সুধীঃ সত্যদ্রষ্টা ভুবনবরণীয়ঃ শ্রুতিধরো
বিবেকানন্দোঽয়ং মনুজতনুধারী স্মরহরঃ ॥ ১ ॥

কিশোরো ধ্যানস্থো ভুজগভয়শূন্যো হ্যবিচলো
যুবা দণ্ডী বৈশ্বানরসদৃশদীপ্তির্ভুবি চরন্।
স্বধর্মভ্রষ্টানাং কলুষিতধিয়াং ত্রাণনিরতো
বিবেকানন্দোঽয়ং গহনতিমিরে ভাস্বররবিঃ ॥ ২ ॥

গুরোরন্তেবাসী **পরমপুরুষস্য** প্রিয়তমো
নরেন্দ্রঃ সর্বেষামবনতজনানামভয়দঃ।
প্রতিজ্ঞায়াং ভীষ্মো বিপদি চ মহীধ্রোন্নতশিরা
বিবেকানন্দোঽয়ং কুসুমললিতো বজ্রকঠিনঃ ॥ ৩ ॥

গৃহে বিত্তাভাবাদ্‌বিচলিতমনাঃ শান্তিরহিতো
গতো বারং বারং গুরুবচনতো মাতৃসদনম্।
'ধনং মাতর্দেহী'ত্যনুনয়বচস্তু প্রতিহতং
বিবেকানন্দঃ কিং ভবতি ধনতৃষ্ণাবশগতঃ ? ॥ ৪ ॥

গুরোঃ পাদং ধ্যাত্বা কিমপি নবতেজো হৃদি বহন্
মহাসিন্ধুং তীর্ত্বা নিখিলজগতো ধর্মসদসি।
নবীনঃ সন্ন্যাসী বিজিতজয়মাল্যো বহুমতো
বিবেকানন্দোঽয়ং ভুবনবিজয়ী ভারতনিধিঃ ॥ ৫ ॥

অবিদ্যায়া বৈরী শ্রুতিবিহিতবিদ্যামধুকরঃ
সুখে চানাসক্তঃ পরমপদচিন্তাস্থিরমতিঃ।
জগৎসেবামন্ত্রৈর্জগদধিপতেঃ পূজনপরো
বিবেকানন্দোঽয়ং ভুবি সুবিরলো মানবগুরুঃ॥ ৬॥
দরিদ্রাণাং বন্ধুর্নিখিলমনুজানাং প্রিয়করঃ
সমো জ্ঞানে কর্মণ্যবিচলিতভক্ত্যাং গুরুপদে।
সমঃ শত্রৌ মিত্রেঽপ্রতিম-মহিমোদ্দীপ্ততপনো
বিবেকানন্দো মে হৃদয়গগনে ভাতু সততম্॥ ৭॥
অভয়-বরদ-মূর্তিঃ কালিকা বিশ্বধাত্রী চরণকমলসংস্থৌ সারদা-রামকৃষ্ণৌ
শরণগত-বিবেকানন্দ-সানন্দমূর্তির্ভবভয়হরদৃশ্যং পশ্য রে মুগ্ধ নেত্র॥ ৮॥

(*বঙ্গানুবাদ*)

নয়নদ্বয়ে পরমরমণীয় দিব্যজ্যোতির্ধারী, প্রসন্নবদন, সৌম্য, মণিকাঞ্চনতুল্যশোভাময় দেহ-বিশিষ্ট সুধী, সত্যদর্শী, জগতের পূজনীয় এবং শ্রুতিধর এই বিবেকানন্দ মানবদেহধারী মহাদেব। ১

কৈশোরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সর্পভয়শূন্য ও অবিচল, যৌবনে অগ্নিসদৃশদীপ্তিমণ্ডিত সন্ন্যাসী-রূপে জগতে ভ্রমণকারী এবং স্বধর্মভ্রষ্ট ও কলুষিতমতি মানবগণের ত্রাণকর্তা এই বিবেকানন্দ নিবিড় অন্ধকারে জ্যোতির্ময় সূর্যস্বরূপ। ২

পরমপুরুষ গুরুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) প্রিয়তম শিষ্য, নরেন্দ্র (তন্নামধারী পুরুষ, তথা নরশ্রেষ্ঠ) অধঃপতিত জনগণের অভয়দাতা, প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম এবং বিপদে পর্বতের ন্যায় উন্নতমস্তক এই বিবেকানন্দ কুসুমের ন্যায় কোমল ও বজ্রের ন্যায় কঠিন। ৩

গৃহে অর্থাভাবে বিচলিতহৃদয় এবং শান্তিশূন্য অবস্থায় গুরুর আদেশে পুনঃ পুনঃ মাতৃ-মন্দিরে গমন করিলেও 'মা, আমাকে ধন দাও'—এই বাক্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি ইহা বলিতে পারেন নাই। 'বিবেকানন্দ' কি ধনাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইতে পারেন? ৪

গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া হৃদয়ে কি এক নবশক্তি লাভ করিয়া যিনি মহাসিন্ধু অতিক্রম করিয়া বিশ্বধর্মসভায় জয়মাল্য এবং প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন, সেই নবীন সন্ন্যাসী এই বিবেকানন্দ ভুবনবিজয়ী ভারত-রত্ন। ৫

অবিদ্যার অরি, বেদবিহিত বিদ্যার মধুকর, সুখে অনাসক্ত পরমপদ-চিন্তায় স্থিরমতি এবং জগৎসেবা-মন্ত্রে জগৎপতির পূজাপরায়ণ এই বিবেকানন্দ জগদ্দুর্লভ মানবগুরু। ৬

দরিদ্রের বন্ধু, সকল মানবের প্রিয়কারী, জ্ঞানে ও কর্মে অবিচলিত, গুরুভক্তিতেও সমান নিষ্ঠাশীল, এবং শত্রু-মিত্রে সমদর্শী ও অতুলনীয় মহিমায় উদ্দীপ্ত সূর্যস্বরূপ বিবেকানন্দ আমার হৃদয়গগনে সর্বদা বিরাজ করুন। ৭

রে মুগ্ধ নয়ন! বরাভয়-মূর্তিতে বিরাজমানা বিশ্বজননী কালিকা, তাঁহার চরণপদ্মাশ্রিত সারদা ও রামকৃষ্ণ, এবং শরণাগত বিবেকানন্দের আনন্দময় মূর্তি,—এই ভবভয়হর দৃশ্য দর্শন কর। ৮

কথাপ্রসঙ্গে

নূতনের উদ্বোধন

এই সংখ্যায় উদ্বোধনের ৬৩তম বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। শ্রীভগবানের আশীর্বাদ সম্বল করিয়া, পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় সুধী লেখক-লেখিকার, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের প্রীতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা নববর্ষে উদ্বোধনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিতেছি। আশা করি উদ্বোধনের আদর্শ—শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও সাধনা, স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা—সমাজ-শরীরে সর্বস্তরে সঞ্চারিত হইয়া দেশবাসীর মনপ্রাণ সুস্থ ও সবল করিবে।

* * *

বৎসরের পর বৎসর আসে যায়, কিন্তু প্রতিটি বৎসর সমান ভাবে আসে না, সমান ভাবে যায়ও না। এ বৎসরের শেষ প্রেস কনফারেন্স্-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, 'This is a bad year for the world, but good year for India.' পৃথিবীর দিক দিয়া যে এটি দুর্বৎসর, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বৎসরের প্রথম দিকে স্থায়ী বিশ্ব-শান্তির আশায় বিশ্ববাসী উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু সহসা সে আশার আলো ঘন মেঘে ঢাকিয়া গেল; আজ কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও বা ঝঞ্ঝা বহিতেছে।

বিশ্বের বিশাল আঙিনা হইতে ভারতের দিকে চাহিয়াও আমরা আশান্বিত হইতে পারি না। হয়তো আন্তর্জাতিক বা আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বর্তমান বৎসর ভারতের পক্ষে ভাল কাটিয়াছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাহা অনুভব করিতে পারে না। তাহারা দেখিতেছে, এ বৎসর ভারতের প্রদেশে প্রদেশে প্রীতি নষ্ট হইয়াছে; সংবিধান লইয়াও টানাটানি চলিয়াছে। ভারতের অবহেলিত প্রান্ত বাংলার গৃহকোণে তাকাইলে অবশ্যই বলিতে হইবে—বড়ই দুঃখে সারাটি বৎসর কাটিয়াছে।

বর্তমানের দুঃখই বড় কথা নয়, ভবিষ্যতের আশঙ্কাই মানুষকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করে। ভাবী কল্যাণের আশায় মানুষ চিরকাল অনেক দুঃখই হাসিমুখে বরণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যেখানে আশা অপেক্ষা আশঙ্কাই অধিক, সেখানে মানুষ কল্যাণের কর্মে উদ্বুদ্ধ হইবে কিরূপে? আজ যে ধ্বংসের পূর্বাভাষ চিন্তাশীল মানুষের মনে ধরা পড়িয়াছে—তাহা এই শতাব্দীর চরম অভিশাপে পর্যবসিত হইতে পারে। বিজ্ঞানের শতাব্দী বলিয়া বিংশ শতাব্দীর যে গৌরব, তাহা চিরতরে কালিমা-লিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞান দ্বিমুখী অস্ত্রের মতো; মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ—দুই করিবার শক্তিই ইহার আছে; ফলাফল নির্ভর করে—কে উহাকে কি ভাবে ব্যবহার করিতেছে তাহার উপর।

হিরোশিমার পর হইতে প্রকাশ্যভাবে বরাবরই বিজ্ঞানশক্তিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু লৌহ এবং স্বর্ণ—উভয় যবনিকার অন্তরালেই ধ্বংসাত্মক বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরাম নাই। মুখে শান্তির প্রস্তাব, আর কার্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি—এই দ্বিমুখী ভাবই আজ মানুষের সঙ্কট টানিয়া আনিতেছে।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, এ যুগের সঙ্কটের প্রধান কারণ—যাঁহাদের

কথা ও কাজের উপর কোটি কোটি মানুষের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের মন মুখ এক নয়; অথচ তাঁহারা বিধাতার আসনে বসিয়া বিভিন্ন ধাঁচের গণতন্ত্রের নামে জনগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দাবি করিতেছেন। কোথাও দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল, কোথাও গণতন্ত্রের স্বর্ণশৃঙ্খল! মানুষের মুক্তমহিমার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন-পদ্ধতিই আজিকার সমস্যার সমাধান।

* * *

যাঁহারা রাজনীতিক দ্বন্দ্বে মত্ত তাঁহাদের চোখে সঙ্কটের প্রকৃত কারণ ধরা পড়িতে পারে না, বহু ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেরাই সঙ্কটের কারণ; সাধারণ মানুষের স্বার্থ, সুখ-দুঃখ তাঁহাদের কাছে বড় কথা নয়; দলীয় স্বার্থ ও নিজ নিজ মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহা হইলে দল বা নেতৃত্ব তাঁহারা বজায় রাখিতে পারেন না।

সেই জন্য দেখা যায়, কি দেশে কি বিদেশে, বহু নেতাই প্রকৃত সঙ্কট অস্বীকার করিয়া সর্বদা জাতিকে ভবিষ্যতের এক রঙীন আশার নেশায় মাতাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। অস্বীকার করিয়া কখনও সঙ্কট এড়ানো যায় না! জাতীয় জীবনে সঙ্কট আসিবেই। অভিজ্ঞ মাঝি দূর আকাশে মেঘ দেখিযাই সাবধান হয়, শেষে ঝড়-তুফান আসিয়া পড়িলে তাহার সহিত প্রাণপণ সংগ্রাম করে; সেইরূপ বিশ্বস্ত নেতার নির্দেশে সংগ্রাম করিয়া পুরুষকার সহায়ে একটি জাতি সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়! নতুবা দুর্বল ক্ষীণদৃষ্টি মাঝির নৌকা যাত্রীসহ ভরাডুবি হইবে!

* * *

বর্তমান যুগে উচ্চতম ভাবরাশির অভাব নাই, সেগুলির প্রচারও যথেষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানের অপব্যবহারের মতো সেই উচ্চভাবগুলিরও অপব্যবহার হইতেছে। 'বিশ্বশান্তি', 'সত্য-অহিংসা', 'জনগণ', 'সকলের কল্যাণ' 'সমাজ-সেবা' প্রভৃতি কথাগুলি যদি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পৃথিবী আজ অনুরূপ ধারণ করিত। সাধারণ মানুষকে আজ মৃত্যুভয়ে কণ্টকিত হইয়া, জীবিকা সংস্থান-চেষ্টায় ও জীবিকাচ্যুতির ভয়ে সর্বদা সচকিত ভাবে জীবন্মৃতবৎ জীবনধারণ করিতে হইত না।

এক শ্রেণীর মানুষের চিন্তা ও কর্মই আজ মানবজাতিকে এই ভৃগুপতনের ভয়াল অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর এ অগ্রগতি তাহার দুর্গতিরই কারণ হইয়াছে। পৃথিবীতে কোথাও সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা আজ নাই বলিলেই চলে। নিজ হাতে যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া মানুষ আজ সেই যন্ত্রেরই চক্রতলে পিষ্ট হইতেছে। যন্ত্র শুধু শিল্পসৃষ্টিরই সহায়ক নয়, গণতন্ত্রের যন্ত্র আইন প্রণয়নও করে। জনগণেরই মতাধিক্যে এমন আইন প্রণীত হইতে পারে, যাহার সাহায্যে জনগণেরই জীবন নিপীড়িত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনে করা হইত গণতন্ত্রই পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবে, আজ আর কেহ তাহা মনে করে না। তবে চিন্তাশীল রাজনীতিকগণ বলিতে শুরু করিয়াছেন: আমরা বুঝিয়াছি গণতন্ত্রের যথেষ্ট ত্রুটি আছে; কিন্তু এতদপেক্ষা ভাল কোন শাসন-পদ্ধতিও আমরা পাইতেছি না। দিকে দিকে গণতন্ত্র বিফল হইতেছে, সেই বিপুল বিফলতার স্তূপ হইতে নব নব বিশেষণে বিশেষিত হইয়া নব নব গণতন্ত্র নিত্য নূতন নামে দেখা দিতে চাহিতেছে। ঐ সকল শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্র বলা চলে কি না, তাহাও আজ বিবেচ্য।

বিংশ শতাব্দীর এ এক বিশেষ সঙ্কট—গণতন্ত্রের পরীক্ষা ও ইহার ব্যাপক বিফলতা। পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী নূতনতর এক বিশ্বশাসনপদ্ধতির জন্মযন্ত্রণাই বর্তমান অশান্তির কারণ। এ সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে গেলে প্রথমত জানিতে হইবে—গণতন্ত্র কেন বিফল হইতেছে; দ্বিতীয়ত বুঝিতে হইবে, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন কি।

দুইটি প্রশ্নের একটি উত্তর: মানুষ! আদর্শ-গণতন্ত্রের খসড়া যাহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন—মানুষ-মাত্রেই সৎ ও সচেতন, সকল মানুষ শিক্ষিত ও চিন্তাশীল; তাহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন—নির্বাচিত প্রতিনিধিগণও সকল সদ্গুণে বিভূষিত! কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—নির্বাচকমণ্ডলী যেমন অজ্ঞ ও অচেতন, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণও তেমন চিন্তাহীন ও স্বার্থপর, দায়িত্বজ্ঞানশূন্য, দলীয় নেতার ইঙ্গিতে চালিত ভৃত্যমাত্র।

এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে গেলে প্রয়োজন প্রকৃত মানুষের—শিক্ষিত, সচেতন মানুষের। যে মানুষ প্রয়োজন মত চিন্তা করিবে, প্রয়োজন মত কাজও করিবে! সমাজে প্রকৃত মানুষের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সে জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা—যাহা পশু-মানবকে যথার্থ পূর্ণ-মানবে পরিণত করিবে, তাহাকে শুধু কেরানি বা কারিগরে পরিণত করিবে না। উনবিংশ শতাব্দীর কেরানিগিরির শিক্ষাকে আজ বিংশ শতাব্দীর কারিগরি শিক্ষায় পরিবর্তিত করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। মানুষকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হইবে মনুষ্যত্বের; তারপর সে নিজেই স্থির করিবে তাহার জীবিকা। প্রয়োজন-বোধে মানুষই কেরানি হইবে, প্রয়োজন-বোধে সেই মানুষই স্বেচ্ছায় সসম্মানে কারিগর হইবে। মনুষ্যত্বের শিক্ষা না থাকিলে শুধু উপদেশ শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া কেহ কখনও যে-কোন বৃত্তিকে সসম্মানে গ্রহণ করিতে পারে না, গ্রহণ করিলেও মর্যাদা বজায় রাখিয়া সে-কাজ সে করিয়া যাইতে পারে না। সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা, প্রশাসনিক পদমর্যাদা যেখানে কারণে অকারণে অধিকতর সম্মানিত, সেখানে সকলেই চায় সমাজের উপর-তলায় উঠিতে।

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে গেলে প্রয়োজন মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধ-বৃদ্ধি। আগামী যুগের শিক্ষায় তাই মনুষ্যত্বের দীক্ষার প্রয়োজনীয়তাই বড় করিয়া দেখা দিয়াছে! জন-সংখ্যার কম-বেশীর উপরে দেশের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে না, করে 'মানুষের' সংখ্যার উপর! অতএব সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা উচিত যাহাতে দেশে মানুষের সংখ্যা বাড়ে। আত্ম-বিশ্বাসসম্পন্ন, আত্মসম্মানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা যদি ক্রমেই বাড়িয়া চলে—তবেই পৃথিবীতে 'স্বর্গরাজ্য' স্থাপিত হইবে। মানুষের অন্তরে সত্য ও প্রেমের, শক্তি ও পবিত্রতার, শান্তি ও সন্তোষের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বাহিরেও সমাজে তাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠিবে।

মানুষের অন্তরে স্বর্গরাজ্য-স্থাপন, পশু-মানবকে পূর্ণমানবে রূপান্তরিত-করণ, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব বা পূর্ণত্বকে বিকশিত করিয়া তোলা—একই কথা। ইহা পার্লামেণ্টে আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তন করিয়া সম্ভব নয়। মানুষের এই আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন আর্থিক মানোন্নতি বা বৈজ্ঞানিক শিল্পপ্রসারের উপরও নির্ভর করে না। আর্থনীতিক সাম্য মানুষের স্বার্থদ্বন্দ্বকে সাময়িক ভাবে চাপা দিতে পারে, কিন্তু নির্মূল করিতে পারে না; অথচ সমষ্টিগত ভাবে

মানুষের সুখশান্তি নির্ভর করে সমাজে ও সংসারে স্বার্থদ্বন্দ্বজনিত পারস্পরিক সংঘর্ষ কতটা কমিয়াছে—তাহারই উপর।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানই দেহকেন্দ্রিক সচেতনতা হইতে মানুষকে অন্তর উচ্চতর বিরাট এক সত্তা সম্বন্ধে সচেতন করে। তাহারই ফলে জাগ্রত মানুষ দেশে কালে সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া, 'সকলে আমি, আমাতে সকল' এই মহানুভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলের সুখের জন্য সকলের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। আধ্যাত্মিক সাম্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সর্বকল্যাণ-প্রচেষ্টাই আজিকার রুগ্ণ পৃথিবীকে তাহার স্বাস্থ্যসম্পদ্ ফিরাইয়া দিতে পারে।

সমাসন্ন বিবেকানন্দ-শতবর্ষজয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়া স্বামীজীর এই মহান্ ভাবরাশি দেশে দেশে আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে সঞ্চারিত হউক; তবেই শক্তির সহিত শান্তি, বুদ্ধির সহিত সরলতা, জ্ঞানের সহিত প্রেম, কর্মের সহিত ধ্যান—ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মানব-উন্নয়নের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী

১৯৬১ রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বৎসর; বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রতি শহরে শহরে, বাংলার প্রতি গ্রামে গ্রামে, বহুস্থানে প্রতি ঘরে ঘরে—সারা বৎসর ধরিয়া উৎসবের আয়োজন চলিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও মানস নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন, 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে'—কে কোথায় কি ভাবে তাঁহার কাব্য পড়িতেছে এবং পড়িয়া জীবনরস সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের অন্তরে কবি অনুভব করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবী নেহাতই 'ছোট তরী'—কবির 'ছোট ক্ষেতে'র ফসলেই তরী ভরিয়া যায়। এ তরীতে কাব্য-ফসলের স্থান আছে, কবির স্থান নাই। কবি যে কাব্যের চেয়ে অনেক বড়: 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'।

শতবার্ষিক উৎসব কবির জন্য নয়—কবিকে যাহারা ভালবাসে, তাহাদেরই হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হইবে নানা ভাবে; এ সকলের মাধ্যমে আমরা যেন কবির অন্তরবীণার অন্তরতম গভীর রাগিণীটি ধরিতে পারি। যেন বিশাল কাব্য-সমুদ্রের গম্ভীর কল্লোলের শ্রুতি-মাধুর্যে আত্মহারা হইয়া, বেলাভূমিতে বসিয়া শুধু তরঙ্গ দর্শন করিয়া, শুধুমাত্র ঝিনুক কুড়াইয়া আমরা যেন সময় ক্ষেপণ না করি। আমরা যেন রত্নাকরের রত্ন-সংগ্রহেও মনোনিবেশ করি, অমৃতভাণ্ডার সমুদ্রের জীবনপ্রদ স্পর্শে আমরা যেন আমাদের ম্রিয়মাণ জীবন সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি। নৈরাশ্য যেন আশার আলোকে ঝলিয়া উঠে, বিফলতা যেন সফলতার সম্ভারে ভরিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। তাঁহার শতবার্ষিকীতে কাব্য-নাটক প্রভৃতির অনুষ্ঠান অবশ্যই হইবে। কিন্তু শুধুমাত্র নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে শিল্প-চর্চার চরম অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া আমরা যেন না মনে করি, রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন যথেষ্ট হইল।

আমরা যেন ভুলিয়া না যাই—রবীন্দ্রনাথ সাধক কবি, তাঁহার মর্মবীণার গভীরতর গম্ভীর সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে আধ্যাত্মিক সংবেদনে, তাহারই জন্য তিনি বিশ্বকবি! বিশ্বমানবতার গোপন রহস্যটি তাঁহার জীবন-সাধনায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল বলিয়াই বিশ্বের সর্বত্র অগণিত হৃদয়ে তাঁহার বাণীর অনুরণন।

রবীন্দ্রনাথ অলস কল্পনার কবি নন; সংসারের কাঁটাগুলি বাদ দিয়া শুধু ফুলের মধুলোভী প্রজাপতিধর্মী কবি তিনি ছিলেন না। জাতীয় জাগরণে তাঁহার দান, তাঁহার ত্যাগ-স্বীকার যেন আমাদের চিরদিন উৎসাহিত করে।

শান্তিনিকেতনে কোমল শিল্পসাধনার সহিত তাঁহার কঠোর শিক্ষার সাধনা, সেবার সাধনা—যেন আমাদের অনুপ্রাণিত করে অনুরূপ কর্মে কর্মযোগী কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমর যেন প্রার্থনা করিতে পারি:

> যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে
> মুক্ত কর হে বন্ধ।
> সঞ্চার কর সকল কর্মে—
> শান্ত তোমার ছন্দ।

চলার পথে

'যাত্রী'

জাগো, বন্দী, জাগো। কতদিন আর বদ্ধ থাকবে তুমি তোমার তমিস্রার কারাগারে, তোমার স্বার্থের তন্দ্রাপ্রদ ক্লান্তিময় অন্ধকারের আরাম-গুহায়? দেখছ না, শীতের কুহেলী ভেদ ক'রে সূর্য উঠেছে। আপন চেষ্টায়, নিজস্ব দীপ্তিতে, স্বকীয় উজ্জ্বলতায় নিজেরই সৃষ্ট কুহেলীর কঠিন কারাগার ভেঙে সূর্য উঠল, আর আত্মবান তুমি, থাকবে নিশ্চেষ্ট দীপ্তিহীন হ'য়ে—তোমার নিজস্ব স্বার্থের কুহেলিকার মধ্যে জড়িয়ে? তা কি হয়? আত্মার সর্বময় স্বাধীনতার বাণী যে তোমার দিকে দিকে আজ বিঘোষিত! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তুমি, তোমার কি সাজে এই পরাজয়, এই ক্লীবতার জড়িমায় পঙ্গু হ'যে পড়ে থাকা? তাই বলি, জাগো বন্দী, জাগো, আপনার আত্মোপলব্ধির মহান প্রচেষ্টায় একান্তভাবে লাগো।

তুমি তো নিজেরই স্বার্থের অন্ধকার গুহায় বন্দী! তোমার স্বার্থ, অর্থাৎ স্ব-অর্থ, নিজেকে কেন্দ্র ক'রে জগতের যে অর্থ, নিজের ভুলবোধ দিয়ে জগতের যে ব্যাখ্যা তুমি করেছ সেইতো স্ব-অর্থ, স্বার্থ! তাই বলি, তোমার মতো ক'রে জগতের যে অর্থ তুমি করেছ সেই অর্থে, সেই মায়ায় তুমি আটকে গেছ। গুটিপোকা যেমন আপন গুটির জালে জড়িয়ে মনে করে অন্য কেউ আমায় জড়িয়ে দিল তেমনি তুমি তোমার নিজের রচিত স্বার্থে জড়িয়ে মনে করছ অন্য কেউ বন্দী করেছে তোমায়।

আবার বলি, তোমার মনের নিজস্ব গতিতে যে জগৎ গতিময়, তোমার স্বকীয় প্রাণ-স্পন্দনের মাধ্যমে জগতের যে প্রাণসত্তা দেখছ—এইটেই ঠিকঠিক স্বার্থ। বিশদ ক'রে বললে যার মানে দাঁড়ায়—নিজের পরিপ্রেক্ষিতে তোমার চারিদিকে যা সব রয়েছে তার তুমি যা অর্থ ক'রছ। তাই যখনই এই নিজের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ 'অর্থ' করা থামবে, অর্থাৎ স্বার্থ থাকবে না, তখনই জগতের রূপ যাবে বদলে। তখন সমুদ্রের সামান্য জলবিন্দু তুমি, সমুদ্রের পরিমাপ করতে গিয়ে দেখবে তাতেই একাকার হ'যে গেছ। সমুদ্র থেকে উঠে এসে আর সমুদ্রের বর্ণনা দিতে পারবে না। তাই বলি, তুমি যাকে ধরে স্পন্দিত, চেতনময়, তাকেই দূরে ঠেলে, তাকেই তোমার জ্ঞানের বিষয় ক'রে, তাকে আবার জানবে কি ক'রে? সূর্যের আলোতেই দেখছ, সেই আলোককে সরিয়ে সূর্যকেই আবার দেখবে কি ক'রে!

এই রকম কেন ঘটে? এর উত্তর দেওয়া যায় না। ঘটে, ঘটছে এবং ঘটবে—এইটুকুই বুঝি, এবং ঐ 'বোঝার' পারে গিয়ে এর কারণ ও কার্য নির্দেশ করা সম্ভব নয়—এটুকুও ঐ বুদ্ধি দিয়েই অনুভব করি। কবির ভাষায় তাই বলা চলে—'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে'। সত্যই তো, যে জিনিষ চোখে দেখছি না, কানে শুনছি না, স্পর্শশক্তি দিয়ে ছুঁতে পারছি না, অথচ তা 'আছে', প্রকটভাবে সত্যকারেই আছে—তাকে তাই আর বুঝবার চেষ্টা না ক'রে, কেবল বিশ্বাস ক'রে নিয়ে এগোনই ভাল। তাকে তাই কানে না

শুনলেও প্রাণে শুনবার চেষ্টা করাই মঙ্গল। দেখ না কেন, বিন্দুর সংজ্ঞা—'যাহার অবস্থান আছে কিন্তু পরিমাপ নাই' সত্যই দুর্বোধ্য; তবুও সেই দুর্বোধ্যকে বিশ্বাস করেই তো আমরা অঙ্ক-শাস্ত্রের অত বড় সৌধটা দাঁড় করাতে পেরেছি। সেই রকম এই আত্মবস্তুকেও গোড়াতেই বুঝে নেবার চেষ্টা না ক'রে বিশ্বাসের অনুবর্তী হ'য়ে এগিয়ে গেলেই আশ্বাসের নিবিড়তা জাগবে, সত্যকার 'বস্তুলাভ' হবে। আর এই লাভ হ'লে যে অনুভূতি হবে, তাকে আর তখন 'উচ্ছিষ্ট' করা চলবে না, অর্থাৎ তা আর মুখে ব'লে অন্যকে বোঝানো যাবে না। কেবল ঠারেঠোরে তার সঙ্কেত মাত্র দেওয়া চলবে। নিজের দিক থেকে তখন কিন্তু ঐ পরম আনন্দানুভূতি অন্তরকে এক চিরন্তন চেতনাময় ব্যঞ্জনার ক্রোড়ে মায়ের মতো উষ্ণ স্নেহে আঁকড়ে ধরে রাখবে। অবশ্য, বোঝাবার জন্যই ঐ 'মা' ও 'ক্রোড়ের' উল্লেখ—তা না হ'লে সে যে কি, তা মুখে বলা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—পাঁচিলের ও-পারের না-দেখা দৃশ্য দেখতে একজন পাঁচিলের ওপরে উঠে হাসতে হাসতে ওপারেই পড়ে গেল, কোন খবর আর এদিকের লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে না। অবশ্য অবতার এপারের লোকদের কাউকে কাউকে হাত ধরে পাঁচিলে তুলে নিতেও পারেন।

তাই বলি, সর্বজীবের ঐতিহ্যবাহী তুমি মানব, তোমার ঐ আনন্দময় মুক্তির জন্য সর্বস্ব পণ করা উচিত। জাগানো উচিত তোমার স্বভাব বা স্বধর্মবোধকে, সেই সঙ্গে তোমার আত্মস্ফূর্তিকেও। মনে রেখো, বাইরের এই বহু বিচিত্রের পিপাসার তৃপ্তিতে তোমার পৌরুষের উৎকর্ষ হবে না। তাই ওদিকে না এগিয়ে, তোমার অন্তর-সরোবরের শতদলকে ফোটাও। সেই প্রস্ফুটিত শতদলের উন্মাদকর সৌরভে জাগবে এক অপূর্ব রসপিপাসা। এই রসপিপাসাই বুঝিয়ে দেবে মহাজীবনের অর্থ কি ও কেন! তখন অমিতবীর্য তুমি, আলোর নিশান তুলে এগিয়ে যেতে পারবে জয়ের পথে। তাই বলি, বন্দী, জাগো। তোমার জীবন-মধ্যাহ্নের অলস দিনগুলোকে আর দীর্ঘায়ত হ'তে দিও না। কারাগারের বন্ধ্যা ব্যথা বুকে নিয়ে মনকে আর অভ্যস্ত সুখ দিয়ে ঝিমিয়ে রেখো না—তাকে তার দুঃসহ মুহূর্তগুলির পেষণ থেকে মুক্তি দিয়ে প্রাণের ঘোষণা শোনাও। বিপুল-ব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবীর মাথা-মালঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বল, নিজেকে আজ নূতন ক'রে আবিষ্কার করলাম আমি; এতবড় পাওয়া যে কোথায় আছে, বহুদিন সেটাই ভুলে ছিলাম, আজ কিন্তু সেই চরম-পাওয়ার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জ্বলে উঠল। তাই আজ আর কণ্ঠস্বরে ভিখারীর আকূতি নেই—আছে বজ্রনির্ঘোষ। চৈতন্যের স্নায়ুস্রোতে আজ তাই উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে: আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি—ব্রহ্ম আনন্দময়। আনন্দেই জীবগণের জন্ম, আনন্দেই তাদের জীবনযাপন, আনন্দের মাঝেই তাদের প্রয়াণ। সেই সর্বগত আনন্দের অমৃতসমুদ্রে আবার কান্নার ঢেউ গোনা কেন পথিক?

তাই বলি, চল পথিক, এই মহান আনন্দরাজ্যের বোধ জাগাবে চল। চল, সেই মধুময় আনন্দলোকে—যার আস্বাদন পেলে বলতে হবে—'মধুর মধু কিবা, মধুর মধু সব'। সেই সর্বমধুময়ের মধ্যে তুমি মধু হবে চল। চল, চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

‘ডুব দে রে মন কালী ব’লে’*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

রামপ্রসাদ গেয়েছেন,

ডুব দে রে মন কালী ব’লে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ॥

ঠাকুর সেটা দেখালেন জীবন দিয়ে। একবার ঠাকুর ‘ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন’ গানটি অশ্বিনীবাবুকে শোনাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে, একেবারে শান্ত স্থির। আর কে গান গাইবে! তিনি তো একেবারে ডুবে গেছেন। ঠাকুরের কাছে এসে এইটি শিখতে হয়—ডুবতে হয়, ভাসলে হবে না। ডুবতে দেয় না কে? কাম-কাঞ্চনের সোলা। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন: গেরস্তর বাড়ীতে বেজী থাকে। ল্যাজে ইঁট বেঁধে দেয়। উঠানেই ঘুরছে ফিরছে! সময় সময় দেওয়ালের গর্তে উঠে বসে, মনে করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে। কিন্তু ল্যাজের ইঁট টেনে নামিয়ে দেয়।

অশ্বিনীবাবুকে ঠাকুর বলছেন, ‘তোমার ইচ্ছা হয়—তাঁর একটু নাম করি, জপ করি, কিন্তু পিছনে ওই যে দড়ি দিয়ে ইঁট বাঁধা আছে, তাই হয় না।’ আসক্তির দড়ি—এই আসক্তি মানুষকে টেনে রেখে দেয় সংসারে। তাঁর জীবন দেখে ভক্তেরা কি শিখতেন? ডুব দিতে হয়, আর এগিয়ে পড়তে হয়।

‘মধুসূদন’-স্তোত্রে আছে:

গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘসংসার-বর্ত্মসু।
পুনর্নাগন্তুমিচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥

—বড় শ্রান্ত হ’য়ে পড়েছি। জন্মমৃত্যু, গর্ভবাস; যাতায়াতের মানেই তাই। তখন বলি, ‘ত্রাহি মাং মধুসূদন!’ সেটা কখন হয়? ধাক্কার ভেতর দিয়ে বেশী হয়। আঘাতের ভেতর দিয়ে হয়। বাইরের দিকে এত এগিয়ে গেছি। এখন ভেতরে ফিরতে হবে তো! ঠাকুর একটি গান গাইতেন:

আপনাতে আপনি থেকো মন,
যেও নাক’ কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥

কোথাও যেতে হবে না। সব ভেতরে আছে। তবে এর জন্য একটা তৃষ্ণা থাকা চাই, পিপাসা চাই। সে পিপাসা কোথায়? এদিকে এগোবার সে ক্ষুধা কোথায়? ভজনে তৃপ্তি আর ভোজনে তৃপ্তি। ভোজনে তৃপ্তি কখন? যখন ঠিক ঠিক ক্ষুধা আছে। এদিকে লিভার খারাপ হ’য়ে গেছে, খেলে শরীর আরও খারাপ করবে। তখন আমরা কি করি? ডাক্তারের কাছে যাই, একটা ঔষধের জন্য। লিভার ঠিক হ’য়ে গেলে আবার ক্ষুধা হয়। তেমনি ভজনের ক্ষুধার জন্য সাধুর কাছে যেতে হয়। সাধুর কাছে গেলে ভগবানে বিশ্বাস হয়, শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা আসে, যেমন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নিষ্ঠা। নিষ্ঠা থেকে’ ভক্তি আসে; ভক্তি থেকে ভাব, ভাব থেকে মহাভাব। এ সব সাধনের ব্যাপার আরম্ভ হয় বাইরের ঘোরা শেষ হ’লে। তাই রামপ্রসাদ একটা সার কথা বলেছেন, ‘ডুব দে রে মন কালী ব’লে।’ আমরা বাইরে খুঁজছি। ঠাকুর বলেছেন, ‘আপনাতে আপনি থেকো মন।’ যখন বাহির থেকে ফিরে আসবে, তখন ঠিক ঠিক ধর্ম-জীবন আরম্ভ

* লখনৌ সেবাশ্রম, ২১.৯.৫৬—পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ; শ্রীজয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রুত-লিখিত।

হবে। যখন দেখবে বাইরে শান্তি নেই, তখন দরজায় এসে বসবে; দরজায় ধাক্কা দেবে, বলবে, 'ওগো ভেতরে কে আছ, দরজা খোল।' ধাক্কা দাও, তবে দরজা খুলবে।

ঈশ্বরকে চাই, আবার বিষয় চাই; এ কেমন ক'রে হবে? ক্রাইষ্ট বলেছেন, 'God and Mammon-এর সেবা একসঙ্গে হয় না।' তুলসীদাস বলেছেন, 'রাম আর কাম এক সঙ্গে মিলতে পারে না।'

ডুবি কি ক'রে? রামপ্রসাদ কি বলেছেন?

'কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার-লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হল্‌দি গায়ে মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।'

তিনি নিজে করেছেন কিনা! তাই বলছেন, তুমি বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহলে ডুবতে পারবে। প্রবাদ আছে, গায়ে হলুদ মাখা থাকলে কুমীর ছোঁবে না। বিবেক থাকলে কামাদি কিছু করতে পারে না। বিবেকের মানে কি? সদসদ্ বিচার, নিত্যানিত্য বিচার, কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ এই বিচার। ঠাকুর ছোট্ট কথায় বলতেন, দুধে জলে মিশে আছে—রাজহংস জলটা ফেলে দুধটা খেয়ে নেয়। যারা বিবেকী, তারা বিষয়-রস ফেলে চিদানন্দ-রস পান করে। বালিতে চিনিতে মিশে আছে। পিঁপড়ে বালিটা ফেলে চিনিটুকু নেয়।

তাঁরই তো মায়া। গীতায় ভগবান্ বলেছেন, 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।' তিনিই তো বেঁধেছেন, ঠুলি পরিয়েছেন। তাঁর কৃপা না হ'লে হবে না, জীবের মুক্তির চাবিকাঠি তাঁর হাতে। তিনিই তো অবতার। যারা ভক্ত, তাদের ভয় কি? ভক্ত হ'তে হবে। যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, তারা সব দিয়ে ফেলে, কিছু রাখে না, খোঁজে আর কি দেবার আছে। তখন ভগবান ভরিয়ে দেন তাদের হৃদয় অনন্ত আনন্দ দিয়ে। যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, তাদের ভাবনা কি? তাদের তিনিই সহায়, সম্বল, জ্ঞান, বুদ্ধি, বল—সব কিছু। তাই তিনি বলেছেন:

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—আমার মায়ার পারে যাওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু যাঁরা আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁরাই কেবল এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। রামপ্রসাদও বলেছেন, মা চোখে ঠুলি পরিয়ে রেখেছেন। আমরা সংসারের কত হিসাব-নিকাশ করছি: কিসে কত লাভ, কত লোক-সান। এতেই বুদ্ধি খরচ করছি। কিন্তু যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা কি করছেন? কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা অনিত্য—এই বিচার করছেন।

ভগবান বলেছেন, আমার শরণাগত হ'লে আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত ক'রব। দেখ জাঁতায় 'কীল' থাকে। জাঁতায় ডাল পিষে যাচ্ছে, কিন্তু গোটাকতক ডাল—যেগুলো কীলের কাছে থাকে, একেবারে গোটা থেকে যায়। তারা কীলটার আশ্রয় নিয়েছে। 'চলতি চাক্কী সব কোঈ দেখে, কীল না দেখে কোঈ।'

তাঁকে লাভ করতে হ'লে ফিরে আসতে হবে। ফিরে আসার নাম হচ্ছে 'নিবৃত্তি'। রামপ্রসাদ বলেছেন, নিবৃত্তি-জায়া সঙ্গে নিতে হবে, প্রবৃত্তি-জায়া নিলে হবে না।

বেঁধেছেন তিনি, আবার খুলবেনও তিনি। এইটি ঠিক ঠিক জানতে পারলে তবেই হবে। পুরুষকার চাই, তারপর দৈব। গীতায় অর্জুনকে বলেছেন, 'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্'। এই প্রীতি-মাখানো ভজন যারা করে, তাদের আমি বুদ্ধিযোগ দিই,

যে বুদ্ধি দিয়ে ভক্ত আমাকে লাভ করবে। তিনি চাইছেন কি? একটু প্রীতি। আমরা প্রীতি সংসারে ছড়িয়ে দিচ্ছি। কাজেই প্রীতি-পূর্বক ভজন কেমন ক'রে হবে? তুমি একটু প্রীতি-মাখানো ভজন কর দেখি। প্রীতি যে সংসারই সবটুকু নিয়ে রেখেছে! উপনিষদ্ বলেছেন: তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। ...... আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

এই যে ভেতরে যিনি বসে আছেন—তোমার আমার ভেতরে, তিনি সকলের চেয়ে প্রিয়। তিনি অন্তরাত্মা। তাই তাঁকে প্রিয়ভাবে ভালবাসতে হবে। সেইজন্য অর্জুনকে বলেছেন,'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্'। ঠাকুর বলতেন, খোল-মাখানো জাব গরু যেমন আনন্দের সঙ্গে খায়, তেমনি প্রীতির সঙ্গে ভজন করলে ভগবানের আনন্দ হয়। স্নেহ-প্রীতি—তাঁরই তো দান। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙো। তাহলে সংসারে আসক্তি আসবে না।

স্বামীজী বলতেন: Attachment and detachment (আসক্তি ও অনাসক্তি)। আমরা attached (আসক্ত) হ'তে শিখে রেখেছি, এখন detached (অনাসক্ত) হ'তে হবে। স্বামীর প্রতি, ছেলের প্রতি কত প্রীতি! —তাঁর বেলাই যত প্রীতির অভাব।

বিবেকের সাহায্য নিতে হবে। নিত্যানিত্য বিচার করতে হবে। মানব-প্রকৃতি দু-রকম—কুলো-প্রকৃতি আর চালুনি-প্রকৃতি। দেখ, ঠাকুরের কেমন সব কথা। কুলো কি করে? ভালো জিনিসটা রেখে খারাপটা ফেলে দেয়। আর চালুনি কি করে? ঠিক উল্টো – খারাপটা রেখে ভালোটা ফেলে দেয়। যারা বিষয়ী তাদের চালুনি-প্রকৃতি। যারা বিবেকী তাদের কুলো-প্রকৃতি। ভুসি ফেলে সার বস্তু নেয়।

ভগবান চাইছেন শুধু প্রীতি। মীরা বলেছেন, 'ভজন করনা চাহিয়ে মনুয়া, প্রীত করনা চাহিয়ে'। দেখ না, ভগবান বিদুরের ঘরে গেলেন। বিদুর-পত্নী সব ভুলে গেলেন। কি খাওয়াবেন, গরীব তো। তাই একটা কলা ছাড়িয়ে ভুলে খোলাটাই খেতে দিচ্ছেন। ভগবান আনন্দের সঙ্গে তাই খাচ্ছেন। কেননা প্রীতি মাখানো আছে। বাল্যবন্ধু সুদামা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, কাপড়ের তলায় চিঁড়ে লুকিয়ে নিয়ে গেছেন। সিংহাসনে বসা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তিনি লজ্জায় আর চিঁড়ে বার করলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছেন। তিনি সুদামাকে বললেন, 'ভাই কি এনেছ—শীঘ্র দাও, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।' শ্রীকৃষ্ণ যত চাইছেন, সুদামা তত কাপড়ের তলায় লুকাচ্ছেন। শেষে ভগবান কেড়ে খেলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন দেখ। আমজাদ ডাকাত দু-বার জেল খেটে বেরিয়েছে; সকলেই ভয় করে। কিন্তু মা তাকে এটা দেন, সেটা দেন, সে মায়ের কাজ ক'রে দেয়। এই নিয়ে মায়ের ওপর সকলেই বিরক্ত; সবাই ভাবে আবার হয়তো কোন্ দিন ডাকাতি করবে। মা আবার তাকে একদিন বাড়ীতে খেতে বললেন। Orthodox (গোঁড়া) ব্রাহ্মণের বাড়ী, তায় আবার মুসলমান। মা কি একটা কাজে ব্যস্ত আছেন, ভাইঝি খেতে দিয়েছে। সে আর কি করে—পিসীমার আদেশ। অগত্যা দু হাত দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলো। মা দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছেন। ভীষণ বিরক্ত হলেন। আমজাদের কাছে এসে মা বললেন, বাবা, আর কি দেবো? এটা খাও, সেটা খাও, যত্ন ক'রে খাওয়াচ্ছেন। তাই আমি বলি 'গণ্ডি-

ভাঙা মা'। আমরা কাউকে খাইয়ে কি করি? Return visit দিই—প্রতিদান চাই। একটা দিই আর একটা চাই। আমজাদ তখন আর খাবে কি, তার চোখ দিয়ে দর্ দর্ ক'রে জল পড়ছে! মা প্রীতি মাখিয়ে ডাল-তরকারি দিচ্ছিলেন। ডাকাতকে ওই ভাবে শুধরে দিলেন।

গিরিশবাবুর কাছে যখন যাই, তখন আমরা যুবক, তিনি হাঁপানিতে ভুগছেন। বিছানায় শুয়ে আমাদের বলতেন—দেখ, দেখ আমি কি ছিলাম, আমাকে তিনি দেবতা ক'রে দিয়েছেন ভালবেসে। এই হ'ল ভালবাসা। এই ভালবাসা তাঁকে দিতে হবে। তাই ভগবান বলছেন প্রীতিপূর্বক ভজন কর। খোল মাখিয়ে জাব দাও। প্রীতিপূর্বক ভজন করলে তাঁকে আসতে হবেই।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, আমি শুধু বুদ্ধিযোগ দিয়ে ক্ষান্ত হই না। তাদের প্রতি করুণায় আমি অন্তর্যামী-রূপে হৃদয়ে থেকে জ্ঞানদীপের দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার সরিয়ে দিই। ঠাকুর বলতেন, হাজার বছরের অন্ধকার —দেশলাই জ্বাললে এক ক্ষণে চলে যায়।

তাঁর কৃপাই হ'ল আসল জিনিস। এক পা এগোলে তিনি একশো পা এগিয়ে আসেন। যাঁরা ভগবান লাভ করেছেন, তাঁরা একবাক্যে এই কথাই ব'লে গেছেন; পুরুষকারের অহঙ্কার করেননি, কৃপার দ্বারাই পেয়েছেন। আর এই কৃপা করার জন্য তিনি দরজায় দরজায় বেড়িয়েছেন। মহাপ্রভু দ্বারে দ্বারে বেড়িয়েছিলেন। ঠাকুর মায়ের কাছে বলতেন, মা আমার শরীরটা এমন করলি যে আমায় গাড়ী ক'রে যেতে হয়। ছুটলেন কেশব সেনের বাড়ী, বিদ্যাসাগরের বাড়ী—অহেতুক কৃপাসিন্ধু। কোন দরকার নেই, অপ্রয়োজনে যাচ্ছেন। গিরিশবাবুর ঘটনা বলি। দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর খেতে বসেছেন। ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। ঠাকুর তাঁকে তুলে কাছে বসিয়ে বলছেন, গিরিশ এসেছ, খাও। হাতে ক'রে খাইয়ে দিচ্ছেন। বোঝো, অপ্রত্যাশিত ভালবাসা। উনি তো একেবারে নীরব। ভাবছেন—এই ওষ্ঠ কি না স্পর্শ করেছে! আর উনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, এই ওষ্ঠ স্পর্শ করছেন! চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল পড়ছে! কথা বলতে পারছেন না। ঠাকুর স্নেহের সঙ্গে বলছেন, খাও গিরিশ। গিরিশবাবু বলতেন, ভেতরটায় কত আবর্জনার গন্ধ ভ্যাট্ ভ্যাট্ ক'রত, আর উনি সব দূর ক'রে দিলেন। এই হ'ল অবতার-পুরুষের ভালবাসা।

শ্রীশ্রীমা-ও সব দিয়ে দিতেন। এতটুকু নিজের সত্তা রাখতেন না। সংসারের মা ৪।৫টি ছেলেমেয়ের মধ্যেই নিজেকে বিস্তার ক'রে রাখেন, পাশের বাড়ীর ছেলেদের খবর রাখেন না। তাই বলি 'গণ্ডির মা'। কিন্তু শ্রীশ্রীমা নিজেকে সকলের মধ্যে বিস্তার ক'রে রেখেছিলেন, তাই বলি 'গণ্ডিভাঙা মা'।

বেশী শাস্ত্রপাঠের কি দরকার? ঠাকুরের জীবন দেখ। চোখের সামনে দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি। তিনি এসে পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি হলেন জগদ্গুরু, কোন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে আসেননি। তাঁর যে পথ, সেই পথ আমাদের অবলম্বন করতে হবে। কিসের জন্য? শান্তি পাবার জন্য। তাঁকে পেতে হ'লে প্রেম চাই, পুরুষকার চাই। শিশু মায়ের কাছে যেতে পারছে না, তবু হামা দিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, তারপর নিজেই এসে কোলে তুলে নিলেন। তোমার দিক দিয়ে চাই পুরুষকার, তাঁর দিক থেকে আসবে দৈব। এই দুয়ের মিল হলেই হ'য়ে গেল।

আত্মবিশ্বাসের সন্ধানে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

স্বামীজীর 'পত্রাবলী' পড়া এখন আমার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। যত পড়ছি, ততই তাঁর বাণীর মধ্যে নতুন নতুন মানে খুঁজে পাচ্ছি। গুরুদেব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য-গুলি কী গুরুত্বপূর্ণ! রামকৃষ্ণ-অবতারের ঐতিহাসিক তাৎপর্যে তাঁর কী গভীর বিশ্বাস! ১৮৯৪ খৃঃ ৩০শে নভেম্বর তারিখের পত্রে লিখছেন :

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ—চারিদিকে প্রচার করতে হবে, যেন সমাজের সর্বাংশে—প্রতি অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোত-ভাবে ব্যাপ্ত হ'য়ে যায়।

আর একখানি পত্রে রয়েছে : *তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন ; এই সাধন, এই সিদ্ধি।*

আবার বলছেন : *যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেই দিন থেকেই Modern India - সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্য-যুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।*

ঠাকুর সম্পর্কে এমন পর্যন্ত বলেছেন : *যাঁর পবিত্রতা, প্রেম আর ঐশ্বর্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণামাত্র প্রকাশ।*

আশ্চর্যের কথা, ঠাকুর সম্পর্কে যিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে এই ধরনের নানা মন্তব্য করেছেন, তিনি কিন্তু প্রথম পরিচয়ের দিনে ভাবী গুরুদেবের প্রতি তেমন একটা গভীর আকর্ষণ অনুভব করতে পারেননি। ঠাকুরের হাব-ভাব দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই প্রকৃতিস্থ নয়। সংশয়ের পর সংশয়ের অন্ধকার পার হ'য়ে তবে স্বামীজী বিশ্বাস করেছিলেন, 'তিনি আবার তাঁর সন্তানগণের পরিত্রাণের জন্যে এসেছেন, পতিত ভারতকে আবার জাগরিত হবার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।'

নিবেদিতার The Master as I saw him গ্রন্থে দেখতে পাই, স্বামীজী তাঁর এই সংশয় সম্পর্কে একদা বলেছিলেন : I fought my Master for six long years, with the result that I know every inch of the way!—Every inch of the way!

—ছ-টি বছর তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, ফলে এ পথের প্রতিটি পদক্ষেপ আমি জেনেছি।

কেন তিনি ঠাকুরের জীবন এবং উপদেশ চারিদিকে ছড়াবার উপরে এত জোর দিয়ে-ছিলেন? কারণ সমস্ত উচ্চস্তরের ধর্মেরই লক্ষ্য হচ্ছে : তাদের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলি রয়েছে, সেগুলি পৌঁছে দেওয়া যথাসম্ভব বেশী নরনারীর কাছে, যাতে তারা মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে জীবনে সার্থক করতে পারে। আর মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল—ঈশ্বরের মহিমা-কীর্তন করা ও তাঁর অনির্বচনীয় আনন্দে ডুবে থাকা। ঐতিহাসিক টয়েন্‌বীর An Historian's Approach to Religion-এ পড়ছিলাম :

The true purpose of a higher religion is to radiate the spiritual counsels and truths that are its essence into

as many souls as it can reach, in order that each of these souls may be enabled thereby to fulfil the true end of Man. Man's true end is to glorify God and to enjoy Him for ever....

[ভাবার্থ পূর্বের অনুচ্ছেদেই অনূদিত]

ঠাকুর বলতেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর-লাভ।' কেন? কারণ ঠাকুরেরই ভাষায়ঃ ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। কর্মকে ঠাকুর কখনও জীবনের উদ্দেশ্য বলেননি। হাসপাতাল-ডিস্পেন্সারি করার উপরেও জোর দেননি।

স্বামীজীর কণ্ঠেও গুরুদেবের বাণীরই প্রতিধ্বনি; ১৮৯৪ খৃঃ ২৬শে জুন স্বামীজী কয়েকজন মহিলাকে সম্বোধন ক'রে যে পত্র লিখছেন, তার মধ্যে আছেঃ

এই জীবনটা একটা মস্ত সুযোগ—কি, তোমরা এই সুযোগ অবহেলা ক'রে সংসারের সুখ অন্বেষণে যাবে? যিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ, সেই পরমবস্তুর অনুসন্ধান কর; সেই পরমবস্তুই তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক্, তাহলে নিশ্চিত সেই পরমবস্তু লাভ করবে।

নিবেদিতা নিজের গুরুদেব সম্পর্কে ঠিকই লিখেছেনঃ His work in the world, as he saw it, was the sowing broadcast of the message of his own Master. —স্বীয় আচার্যদেবের বাণীকে সর্বত্র ছড়ানোই ছিল স্বামীজীর জীবনব্রত। আর ঠাকুরের সমস্ত উপদেশের সার মর্ম ছিল 'এগিয়ে পড়ো।' অর্থাৎ 'আরও এগিয়ে গেলে ঈশ্বরলাভ হবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে।' মানুষের চরম দুর্গতির প্রকাশ হচ্ছেঃ 'বৃক্ষ সম হৈনু।'—কাম-কাঞ্চন-খ্যাতির মিছা মায়ায় এমন বদ্ধ হ'য়ে রইলাম যে ভুলে গেলাম, জীবনের পরম সত্য, 'কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।' ঈশ্বরের মধ্যে জীবনের যে অনির্বচনীয় শান্তি রয়েছে, সেই শাশ্বত শান্তির মতো চরম সত্য আর কি আছে? অবতার-পুরুষেরা পৃথিবীতে আসেন এই পরম সত্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে দিতে। আমরা যখন গাছের মতো একই জায়গায় আবদ্ধ হ'যে থাকি, চলতে চাইনে সেই চিরন্তন আনন্দলোকের দিকে, তাঁরা এসে তখন কানে মন্ত্র দেনঃ 'এগিয়ে পড।' আমরা যখন বই প'ড়ে প'ড়ে হদ্দ হ'যে যাই, চোখের সামনে থেকে মুছে যায় সব আলো, তাঁরা এসে বলেন, 'এগিয়ে পড।' বলেনঃ বই প'ড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স সব খড়কুটো বোধ হয়।

বিবেকানন্দকে ঠাকুরের প্রয়োজন ছিল—তাঁর উপদেশকে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দেবার জন্যে। নরেন্দ্রনাথ যখন অখ্যাতনামা কিশোর, তখন ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'জীবনে কি চাস্ তুই?' সঙ্গে সঙ্গে নরেন জবাব দিয়েছিল, 'সমাধির মধ্যে ডুবে থাকতে পারলে আর কিছুই চাই না।' জবাব শুনে ঠাকুর শুধু বলেছিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম আরও বৃহত্তর কাজের জন্যে তুই পৃথিবীতে এসেছিস।' নরেন্দ্রনাথের ভুল ভেঙে গেল ঠাকুরের ঐ একটি কথায়। নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ We may take it, I think, that the moment marked an epoch in the disciple's career.—ঠাকুরের ঐ কথা শুনে শিষ্যের জীবনধারা বইতে শুরু ক'রল সম্পূর্ণ নূতন খাতে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে অন্ধ হ'য়ে আমরা যখন ধর্মের সিংহাসনে টেকনলজিকে বসাবার জন্যে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে

ছিলাম, স্বামীজী তখন কুড়িয়ে আনলেন আমাদের ছড়িয়ে-পড়া মনকে ধর্মের কেন্দ্রে, শোনালেন: 'প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ভারতের মূল-স্রোত ধর্ম; উহাকে প্রবল করা হউক—তবেই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্রোতগুলি উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।' আরও শোনালেন: 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?'

ইওরোপ ভেবেছিল, তার ভাববন্যায় এশিয়া তলিয়ে যাবে, সে যা বলবে এশিয়া তার প্রতিধ্বনি করবে, স্টীমারের পেছনে গাধাবোটের মতো সে চলবে তার পেছনে পেছনে। এশিয়া অস্বীকার ক'রল ইওরোপের তল্পীবাহক হ'তে। ভারতবর্ষ তার কবির কণ্ঠে ঘোষণা ক'রল:

আজি নিশার আকাশ
যে আদর্শে রচিয়াছে আলোকের মালা,
সাজায়েছে আপনার অন্ধকার-থালা,
ধরিয়াছে ধরিত্রীর মাথার উপর
সে আদর্শ প্রভাতের নহে, মহেশ্বর!
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে।

এশিয়ার এই নব প্রভাতের সূচনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের মধ্যে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রেরণায় এশিয়া মেরুদণ্ড সোজা ক'রে প্রথম দাঁড়ালো ইওরোপের মুখোমুখী হ'য়ে। পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করবার মোহ সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছে—এমন কথা জোর ক'রে বলতে পারিনে। খৃষ্টান পাদ্রীরা এখনও আমাদের দেশে জোর গলায় প্রচার করছেন: **পরিত্রাণ শুধু খৃষ্টান ধর্মের মধ্য দিয়েই।**

কিন্তু সত্যি কি তাই? আর একবার ঐতিহাসিক টয়েন্‌বীর মাপকাঠি দিয়ে খৃষ্টান ধর্মের বিচার করা যাক। দেখা যাক পাদ্রীদের অহঙ্কার ধোপে টিঁকে কি না।

ধর্মের বিচার করতে গিয়ে ঐতিহাসিক লিখছেন:

The touchstone of a religion is its comparative success or failure, not merely in divining the truths and interpreting the counsels but also in helping human souls to take these truths to heart and to put these counsels into action. So the last word has not been said about a religion when we have accepted or rejected its definitions of the nature of Reality and of the true end of Man. We have also to look into the daily lives of its adherents and to see how far, in practice, their religion is helping them to overcome Man's Original Sin of self-centredness.

এর সারমর্ম: কোন নির্দিষ্ট ধর্মের ভালো-মন্দ বিচার করবার কষ্টিপাথর শুধু ঐ ধর্ম সত্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাতে নয়, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করাতেও নয়; আমাদের এও দেখতে হবে; কোন নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসরণ-কারীরা স্বার্থ-কেন্দ্রিকতার আদিম পাপ থেকে কী পরিমাণে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে। কারণ, কোন প্রাণীরই অধিকার নেই তার প্রতিবেশীর, বিশ্বের অথবা ভগবানের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবার, যাতে মনে হ'তে পারে—বিশ্বের কেন্দ্রে তারই আসন এবং আর যারা আছে, তাদের কাজ হচ্ছে তার দাবি মেটানো।

ধর্মের এই যে কষ্টিপাথর টয়েন্‌বী আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন; এতে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রচলিত ধর্ম হিসাবে খৃষ্টধর্ম যে-গৌরবের দাবি ক'রে আসছে, সে-গৌরবে তার কোন অধিকার নেই। লিখছেন টয়েন্‌বী:

But, if the Infidels were to agree to submit to a competitive examination in which the

marks were to be awarded for intelligence, for learning, and for military virtues—we ought to take them at their word ; for in these terms, they would inevitably be beaten at the present day. On all these three points they are far inferior to us Christians. We enjoy the fine advantage of being far better versed than they are in the art of killing, bombarding, and exterminating the Human Race.

এর ভাবার্থ : বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য এবং সামরিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে বিচার করলে (খৃষ্টধর্মে অবিশ্বাসী) অন্যধর্মীরা খৃষ্টানদের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। তাদের তুলনায় আমরা অনেক বেশী ওস্তাদ নরহত্যার কাজে, গোলাগুলি ছোঁড়ায় এবং মানব-জাতিকে নির্মূল করার ব্যাপারে।

খৃষ্টানধর্ম সম্পর্কে সারা বিশ্বের একজন প্রথিতযশা খৃষ্টান ঐতিহাসিকের এই হ'ল সুচিন্তিত এবং সুস্পষ্ট অভিমত।

পৃথিবী অপেক্ষা ক'রে আছে এমন এক ধর্মের জন্যে, যার বাণীর মধ্যে মানুষের আদিম পাপ স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারের কোন স্থান নেই ; আছে আত্মবিশ্বাসের, আত্মপ্রতিষ্ঠার। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সমান অধিকার সকল ধর্মেরই আছে এবং প্রতিবেশীর ধর্মকে সম্মান করা প্রত্যেকেরই উচিত—একথা হিন্দুধর্ম যত জোরের সঙ্গে প্রচার করেছে, এমন আর কোন ধর্ম করেছে কি ? আর শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' কি হিন্দু ঋষিদের চিন্তাধারার নির্যাস নয় ?

স্বামীজীর উদ্দেশে

শ্রীপঞ্চানন মল্লিক

সারা পৃথিবীতে একি তাণ্ডব মিথ্যা-বেসাতি-ভারে,
ধর্ম নিয়েছে বিদায় আজিকে নিষ্ঠুর পাপাচারে।
ক্ষমার আজিকে নেই কোন দাম, আত্মার নেই মূল্য,
মানুষ মানুষে পদাঘাত করে, জীবন তৃণের তুল্য।
কোথা ভারতের জ্ঞানের গরিমা বিশ্বের দরবারে ?
কোথা প্রাচ্যের ত্যাগের মহিমা সংসার-পারাবারে ?
পরম ধর্ম অহিংসারই বা কোথায় আজিকে স্থান ?
কেন হ'ল আজ মানব-প্রেমের প্রোজ্জ্বল শিখা ম্লান ?
বস্তুবাদের নাস্তিকতায় আছে মৌখিক সাম্য,
বিজ্ঞান-জাত ভোগ্য পণ্য শুধু বিলাসের কাম্য।
স্বার্থের লোভে বাধে সংঘাত, নেতারা ক্ষমতালুব্ধ,
সম্মেলনেতে শান্তির নামে বাধিছে কথার যুদ্ধ।
মরণবিজয়ী হে মহামানব, এসো ফিরে আর বার,
রোধ কর এই দম্ভনিনাদ,—প্রলয়ের হুঙ্কার।
চারিদিকে আজ ঘোর অনাচার, আত্ম-সুখের দ্বন্দ্ব,
জ্ঞান দাও তুমি বিবেক-অন্ধে, স্বামীজী বিবেকানন্দ।

বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধারা

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোন প্রকার দর্শন-মত কোন অর্থে বিশ্বজনীন হইতে পারে কিনা, এবং যদি তাহা হয়, তবে তাহার ভাবধারা বা মূল প্রত্যয় ও সিদ্ধান্তগুলি কিরূপ হইবে, ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হইতেছে, বিশ্বজনীন দর্শন কাহাকে বলে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, কোন্ অর্থে উহা সম্ভব নয় ও কোন্ অর্থে উহা সম্ভব? তার পর প্রশ্ন—উহার মূল ভাবধারা ও প্রধান সিদ্ধান্তই বা কিরূপ হইবে। এই কয়টি প্রশ্নের যথাযোগ্য আলোচনা করিতেছি।

বিশ্বজনীন দর্শন (World Philosophy) বলিতে এমন কোন দার্শনিক মত বুঝি না, যাহা সর্বদেশে ও সর্বকালে সব লোকই সঙ্গত ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিবে বা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিবে। এ অর্থে দর্শন কেন, কোন বিজ্ঞানও বিশ্বজনীন অর্থাৎ সার্বকালিক, সার্বদেশিক ও সার্বলৌকিক নয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে সচরাচর আমরা বলি, যে কোন বিজ্ঞান সর্বজনীন (universal), উহা দেশ কাল বা জাতি বিশেষের জন্য নহে; উহা সকলের নিকট সত্য এবং সব কালে ও সব দেশে সত্য। কাজেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশ-কাল-জাতিভেদে আমরা ভেদ করি না, বলি না—ইহা প্রাচ্য বিজ্ঞান, উহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান; ইহা ভারতীয় বিজ্ঞান, উহা ফরাসী বা ইংলণ্ডীয় বিজ্ঞান। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে এরূপ ভেদ করা হয় এবং প্রাচ্য দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরূপ ভিন্ন ধারণা ও ব্যবহারের মূল কারণ এই নয় যে, বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি সব দেশে ও সব কালেই সত্য ও স্বীকৃত, আর দার্শনিক মতগুলি কোথাও সত্য, কোথাও মিথ্যা; কোথাও স্বীকৃত, কোথাও অস্বীকৃত। ঐ সব দিক দিয়া দর্শন ও বিজ্ঞানের ভেদ করা যায় বলিয়া মনে হয় না। সব বৈজ্ঞানিক সত্যই যে সর্বত্র সত্য ও স্বীকৃত, এ কথা বলা যায় না। এক বৈজ্ঞানিকের মত আর এক বৈজ্ঞানিক খণ্ডন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। টোলেমির ভূকেন্দ্রবাদের উচ্ছেদ করিয়া কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, প্রাচীন পদার্থবিদ্যার জড়তত্ত্ব আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে অস্বীকৃত হইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ হয়, আবার এমন স্থান আছে যেখানে উহার কোন ক্রিয়া নাই এবং পৃথিবীতে যে সব দ্রব্য ভারী, সে সব স্থানে তাহাদের কোন ভারই নাই। যোগবলে এই পৃথিবীতেই যে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, তাহা যোগশাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব উপরে লিখিত অর্থে বিজ্ঞানকে সর্বজনীন এবং দর্শনকে অসর্বজনীন বা কাদাচিৎক বলা যায় না। দর্শনের ক্ষেত্রে যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভেদ করা হয়, তাহার প্রকৃত কারণ বোধ হয় এই যে, এক এক দর্শন-মতের এক এক বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার জন্য দেশ ও কালের আশ্রয় লওয়া হয় এবং এজন্যই এদেশের দর্শন বা ওদেশের দর্শন—এরূপ কথা বলা হয়। বিজ্ঞান ও চারুকলার ক্ষেত্রেও আমরা এরূপ শব্দ-ব্যবহার করি,—যেমন প্রাচীন পদার্থবিদ্যা,

আধুনিক পদার্থবিদ্যা ; গ্রীক কলা, ভারতীয় কলা ইত্যাদি।

আমরা দেখিলাম যে, বিশ্বজনীন দর্শন বলিতে সব দেশে কালে ও লোকে সত্য এবং স্বীকৃত কোন বিশেষ দর্শন মত বুঝায় না, এবং এই অর্থে কোন বিজ্ঞানও বিশ্বজনীন নহে। এই অর্থে দর্শন বা বিজ্ঞানের সর্বজনীন হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এখন দেখা যাক্ কি অর্থে উহাদিগকে সর্বজনীন বলা যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে বিজ্ঞানের কতকগুলি মূল তত্ত্ব বা মুখ্য সূত্র আছে, যাহা সার্বত্রিক বা সর্বত্রব্যাপী, আর কতকগুলি গৌণতত্ত্ব বা অপ্রধান সত্য আছে, যাহা দেশে ও কালে অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ। যে বিজ্ঞানে যত বেশী মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় এবং মূলতত্ত্বগুলির সাহায্যে অপ্রধান তত্ত্ব বা সত্যগুলি এবং তাহাদের দেশ-কালে ব্যতিক্রম যতটা বুঝা যায়, তাহা ততটা সর্বজনীন বলিয়া বিবেচিত হয়। এই হিসাবে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদকে (Theory of relativity) নিউটনের নিরপেক্ষিক (absolute) বৈজ্ঞানিক মত অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক সর্বজনীন ও সমাদরযোগ্য বলা হয়। গ্রীক্ দার্শনিক আরিস্টটল দর্শনের সর্বজনীনতা বা বিশ্বজনীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই দর্শনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, 'দর্শন মূল তত্ত্বগুলির বিজ্ঞান (Science of first principles)।' অতএব আমরা বলিতে পারি যে, যে দর্শনে পরতত্ত্ব বা পরম সত্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহাদের সাহায্যে অপর তত্ত্বগুলির এমন কি বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিরও ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাই বিশ্বজনীন দর্শন হইবে। এই অর্থে আমরা বিশ্বজনীন দর্শনের কথা বলিতে পারি।

যদি এই অর্থে বিশ্বজনীন দর্শন বা দার্শনিক মত সম্ভব হয়, তবে তাহার ভাবধারা অর্থাৎ মূল প্রত্যয় ও সিদ্ধান্তগুলি কিরূপ হইবে, তাহাই আলোচনা করিব। মনে রাখিতে হইবে যে বিশ্বজনীন দর্শনে পরম তত্ত্বের এরূপ নির্দেশ থাকিবে যে, তদ্দ্বারা অন্য ও অপর তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করা যায়, উহা এমন এক দর্শন-মত হইবে যে, তাহাতে অন্যান্য দর্শনমতের সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় এবং তাহাদের সমন্বয় সাধন করা যায়; বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিতও উহার একান্ত বিরোধ হইবে না।

পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ মতবাদ দেখা যায়। কেহ বলেন, অচেতন জড় পদার্থ পরমতত্ত্ব; কেহ বলেন, উহা জড়-বিরোধী চেতন সত্তা; কেহ বলেন, উহা এক ও অদ্বৈত; কেহ বলেন, উহা দ্বৈত বা অনেক ও বহু; কেহ বলেন, উহা সগুণ, সক্রিয় ও সবিশেষ; কেহ বলেন, উহা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্বিশেষ। আবার কেহ বলেন, উহা পরিণামশীল বিজ্ঞানধারা মাত্র এবং উহাতে বাহ্য বা জড় বস্তুর স্থান নাই। অপর পক্ষে কেহ কেহ বলেন, উহা ইন্দ্রিয়-গোচর অথচ জ্ঞানাতিরিক্ত ও জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুনিচয়ের সঙ্ঘাত-মাত্র। আবার কেহ বলেন, উহা চিরপরিণামী শক্তি; কেহ বলেন, অপরিণামী শাশ্বত সত্তা; আবার কেহ বলেন, উহা জড় প্রকৃতি ও চেতন আত্মার যুক্ত সত্তা; কেহ বলেন উহা চিদচিদ্বিশিষ্ট পরমাত্মা বা তত্ত্বত্রয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক মতের অন্ত নাই এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ও মত-বিরোধেরও শেষ নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে এত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মত দেখা যায় কেন?

এবং কিভাবেই বা তাহাদের সমন্বয় সাধন করা যায়? যদি এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়, তবে তাহা এক বিশ্বজনীন দর্শনের স্থচনা করিবে। আমরা এখন তাহারই চেষ্টা করিব।

সকল দর্শন-মতের মূলে কোন না কোন প্রকার অনুভূতি (experience) নিহিত আছে। কেবল দর্শন কেন, সকল জ্ঞানের মূলেই কোন এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বা অনুভূতি আছে। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সকল মতবাদ দেখা যায় তাহাদের মূলেও কোন না কোন প্রকার অনুভূতি বিদ্যমান। এ হিসাবে সকল দর্শন-মতকেই কোন না কোন ভাবে সত্য বলা যায়। উহারা পরমতত্ত্বের এক বা একাধিক গুণ ধর্ম বা রূপের পরিচয় দেয় বলিয়াই উহাদিগকে আংশিকভাবে সত্য বা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায়। কিন্তু যদি কোন মত একভাবে সত্য হয়, তবে উহাকে সর্বভাবে সত্য বলা ঠিক হয় না; উহা আংশিকভাবে সত্য হইলে উহাকে সম্পূর্ণভাবে সত্য বলা ঠিক নয়। দার্শনিকগণ যখন নিজ নিজ মতকেই সর্বভাবে ও সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া ভিন্ন মতগুলিকে একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধের সূত্রপাত হয়। যদি কেহ তাঁহাদের বুঝাইয়া দেন যে তাঁহাদের সকলের মতই একভাবে না হয় আর একভাবে সত্য, কিন্তু কোন মতই সর্বভাবে বা সম্পূর্ণরূপে সত্য নয়, তবে তাঁহাদের মতবিরোধ দূর হইবে এবং বিবাদের অবসান ঘটিবে। এ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ স্মরণ করা উচিত। চার অন্ধ ব্যক্তি এক হস্তী-দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া হস্তী সম্বন্ধে চারটি বিভিন্ন ধারণা পোষণ করে এবং প্রত্যেকে নিজ মতটি সত্য ও অপর মতগুলি মিথ্যা বলিয়া কলহ করে। দার্শনিকেরাও এই অন্ধ ব্যক্তিদের মত নিজ নিজ মতটিকেই সত্য এবং অপর সকল মতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বহুরূপীর দৃষ্টান্ত দিয়াও এই কথাই বুঝাইয়াছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে এক বহুরূপীকে বিভিন্ন বর্ণ-যুক্ত দেখিয়া প্রত্যেকে নিজদৃষ্ট বর্ণটিই উহার প্রকৃত বর্ণ বলিয়া ঝগড়া করিতে থাকে। তার পর বহুরূপী যে বৃক্ষে থাকিত, তাহার তলদেশে যে ব্যক্তি সর্বদা বাস করিত, তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিলে তিনি বুঝাইয়া দেন, তাহাদের প্রত্যেকের কথিত বর্ণ বহুরূপীতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখা যায়, আবার কখন উহার কোন বর্ণই দেখা যায় না। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা নিজ নিজ ভুল বুঝিয়া কলহ হইতে নিবৃত্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বহুরূপীর দৃষ্টান্তে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য। পরমতত্ত্ব (Reality বা Absolute) এমন এক সার্বভৌম তত্ত্ব যে, তাহাতে সব জীব-জগৎ, সব গুণ-ধর্ম-রূপ আছে, আবার উহা এ-সকলের অতীত; উহা সর্বগুণের আশ্রয় আবার সর্বগুণাতীত, সর্বগুণাভাস ও সর্বগুণ-বিবর্জিত। ঋগ্বেদ উপদেশ করিয়াছেন: একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ (১.১৬৪.৪৬)। এ শ্রুতিবাক্যের অর্থ হইতেছে যে, সব দেবদেবী এক পরমতত্ত্বের বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ। ইহাতে আরও বুঝা যায় যে, পরমতত্ত্ব এক বা অদ্বিতীয় হইলেও উহা অনন্তরূপে, অনন্তধর্মে, অনন্ত আকারে ও অনন্ত প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে তত্ত্ব অনেকান্ত ও অনন্তধর্মক। শুধু পরমতত্ত্ব কেন, বিশ্বের যে কোন বস্তুতেই অনেক ও অনন্ত ধর্ম দেখা যায়। একটি মনুষ্যে

যে সব ধর্ম বিদ্যমান এবং যে সব ধর্ম অবিদ্যমান অর্থাৎ অস্তিবাচক ও নাস্তিবাচক (positive, negative) ধর্ম, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এজন্য আমাদিগকে আর একটি কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্ত্ব যেমন অনেকান্ত, তেমনি সত্যও অনেকান্ত, অনেকরূপ ও অনেকপ্রকার। বিভিন্ন বিজ্ঞান দর্শন বা ধর্মমত একতত্ত্বের বিভিন্ন দিকের বা রূপের প্রকাশ, উহারা এক পরম সত্যের বিভিন্ন অংশের বা কলার পরিচয় দেয়।

এখন জিজ্ঞাস্য, তত্ত্বজ্ঞান-লাভের উপায় কি? তত্ত্বানুভূতি বা তত্ত্বসাক্ষাৎকারই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু মানুষের মনের এমনই গঠন এবং তাহার অনুভূতির এমনই গতি ও রীতি যে, সে এককালে মাত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গী বা একটি জ্ঞান-স্তর হইতে যে কোন তত্ত্বের অনুভূতি করিতে পারে। একথা পর বা অপর—উভয় তত্ত্ব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। একটি প্রাসাদ আমরা মাত্র একদেশ হইতে ও এককালে দেখিতে পাই। উহাকে সব দেশ হইতে এবং সব কালে যুগপৎ দেখিতে পাই না। আবার এক দেশ ও কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন আমাদের ঐ প্রাসাদের জ্ঞানও এক বিশেষ প্রকারের হয়, এবং ভিন্ন দেশ ও কালে লব্ধ জ্ঞান হইতে কতকটা ভিন্ন হয়। এ জন্য বলিতে হয়, কোন তত্ত্বের অনুভূতি বা জ্ঞান আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানের স্তর-সাপেক্ষ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানের স্তর-ভেদে তত্ত্বের অনুভূতিরও প্রকারভেদ ঘটিবে। সকলেরই এক প্রকার তত্ত্বানুভূতি হয় না। যিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বা জ্ঞানের যে স্তর হইতে তত্ত্বের অনুভূতি করেন, তাঁহার তত্ত্বানুভূতিও তদুপযোগী হয়। আর একথা সত্য যে, তত্ত্বানুভূতিতেই তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। অতএব বলিতে হয় যে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞান-স্তর-ভেদে তত্ত্বের অনুভূতি ও প্রকাশ ভিন্ন হইবে এবং তদনুসারে বিভিন্ন লোকের তত্ত্বজ্ঞানও কতকটা বিভিন্ন হইবে। এজন্যই আমরা দর্শনের ইতিহাসে তত্ত্ব সম্বন্ধে এত বিভিন্ন মত দেখিতে পাই।

এখন কিভাবে আপাতবিরোধী বিভিন্ন দর্শনমতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং কিভাবে তাহাদের একটা সমন্বয় সাধন করা যায়, তাহা আলোচনা করিব। পূর্বে বলিয়াছি জ্ঞানের স্তরভেদে তত্ত্বের প্রকাশ-ভেদ ঘটে এবং তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞানেরও কতকটা প্রকার-ভেদ ঘটিবে। বাহ্য-ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সর্ব-সাধারণ এবং সম্ভবতঃ সর্বনিম্ন স্তর। এই স্তর হইতে মানুষ তত্ত্বের যে অনুভূতি পায়, তাহাতে তত্ত্ব রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময় বলিয়া প্রকাশিত হয় এবং এজন্য সে তত্ত্বকে রূপ-রস-গন্ধাদি গুণবিশিষ্ট ও দেশকালান্তর্গত জড় পদার্থ বলিয়া বুঝে ও নির্ণয় করে। ভারতীয় চার্বাক দর্শন এবং পাশ্চাত্য জড়বাদ, মার্কস্‌বাদ, দৃষ্টবাদ, (positivism), স্বভাববাদ (naturalism), যদৃচ্ছাবাদ (mechanism), নাস্তিক্যবাদ (atheism) মানুষের এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই ব্যাখ্যা ও আলোচনায় নিবদ্ধ। পক্ষান্তরে মানুষ যখন তাহার মনোবুদ্ধির স্তর হইতে তত্ত্বকে অনুভব করে এবং প্রজ্ঞার (reason) সাহায্যে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে, তখন তাহার নিকট তত্ত্ব মনোময় বা বিজ্ঞানময় অর্থাৎ চেতন বলিয়া প্রকাশিত হয়। এখন যদি সে তাহার বাহেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে, তবে তাহার দর্শন বিজ্ঞান-বাদে (subjective idealism) পর্যবসিত হইবে। যোগাচার বৌদ্ধদের এবং বিশপ বার্কলের

'বিজ্ঞানবাদ' জ্ঞানের এই স্তর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, মনে হয়। আবার যদি সে প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সততা ও উপযোগিতা স্বীকার করে, তবে তাহার নিকট তত্ত্বের দুইটি রূপ প্রকাশিত হয়, একটি চেতনরূপ, অপরটি অচেতন বা জড়রূপ। এই দুইটি রূপকেই স্বীকার করিলে তত্ত্বকে দ্বৈত বলিয়া বুঝিতে হয়, যদিচ মনোবুদ্ধিলব্ধ চেতন-রূপকেই প্রাধান্য দিতে হয়। এইভাবে তত্ত্বকে এক পরম চেতন সত্তার এবং বহু চিদচিৎ সত্তার মিলন বা সংযোগ বলিয়া বুঝিতে হয়। যে সব ধর্মে বা দর্শনমতে দুই বা বহু তত্ত্ব (dualism ও pluralism) স্বীকার করিয়া তাহাদের মধ্যে চেতনকে প্রধান ও স্বতন্ত্র এবং অচেতনকে অপ্রধান ও অস্বতন্ত্র, অথবা উভয়কেই স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে জ্ঞানের এই স্তরে অধিষ্ঠিত বলা যায়। ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মধ্বাচার্যের দ্বৈত বেদান্ত প্রভৃতি এবং পাশ্চাত্য দর্শনের অন্তর্গত ডেকার্ট, লক, কাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকের মতবাদ এই স্তরের জ্ঞানভূমিতে অবস্থিত মনে হয়।

ধ্যানযোগে ও সবিকল্প সমাধির স্তরে তত্ত্বের যে অনুভূতি হয়, তাহাতে তত্ত্ব চৈতন্যগুণ-বিশিষ্ট আত্মা বা পুরুষ বলিয়া প্রতিভাত হয়। জ্ঞানের এই স্তরে আত্মা ও চৈতন্য বা জ্ঞান ভিন্ন বস্তু বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য—এরূপ প্রত্যয়ও হয়। আত্মা ও জ্ঞানের মধ্যে ভেদ অনুভূতির সঙ্গে তাহাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধও অনুভূত হয়। এরূপ অনুভূতির ভিত্তিতে তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদিগকে দ্রব্য ও গুণ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, অংশী ও অংশ—এসব সম্বন্ধ-প্রত্যয়ের (categories of relation) প্রয়োগ করিতে হয়। এতদ্‌বিধায় তত্ত্ব আমাদের নিকট অনন্তগুণবিশিষ্ট দ্রব্য, চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ঈশ্বর ইত্যাদিরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রুতি বা উপনিষদের সগুণ- ও সবিশেষ-বাচক বাক্যগুলির এবং রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূলে জ্ঞানের এই স্তর নিহিত আছে। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে স্পিনোজার অখণ্ড ও অদ্বিতীয় দ্রব্যবাদ (philosophy of substance as absolute) এবং হেগেলের পরম চেতন-বাদকেও (absolute idealism) জ্ঞানের এই স্তরে উদ্ভূত ও অবস্থিত বলা যায়।

জ্ঞানের শেষ স্তর হইতেছে নির্বিকল্প সমাধি। ইহাকে তুরীয় বা ব্রহ্ম বলা হয়। এটি শুদ্ধ-জ্ঞানের অবস্থা। ইহাতে সব চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া মনের এক-কালীন লয় হয়। এই জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বিষয় ও বিষয়ী, আত্মা ও চৈতন্য দুইটি ভিন্ন অথচ নিত্যসম্বন্ধযুক্ত বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হয় না। পক্ষান্তরে উহারা এক ও অভিন্ন বলিয়া অনুভূত হয়, আত্মাই জ্ঞান এবং জ্ঞানই আত্মা—এরূপ অনুভূতি হয়। প্রকৃত-পক্ষে এ অবস্থায় আত্মা, জ্ঞান ও এতদুভয়ের অভেদ জ্ঞান—এরূপ অনুভূতি থাকে না, বরং এক জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-ভেদ-বিনির্মুক্ত শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র থাকে। উহা সাধারণ বিষয়জ্ঞানের মত জ্ঞান নহে। এজন্য কেহ কেহ উহাকে অজ্ঞানের অথবা একটি কাল্পনিক বা অসত্য জ্ঞানের অবস্থা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা তাহা নহে; উহা বিষয়জ্ঞান নহে বটে, কিন্তু অজ্ঞানও নহে, উহা পর-জ্ঞান বা জ্ঞানাতীত জ্ঞান। এই জ্ঞানে তত্ত্বের যে প্রকাশ ঘটে, তাহা অন্য সব জ্ঞানস্তরলব্ধ প্রকাশ হইতে ভিন্ন হইবে। এ জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদিগকে অন্য সব জ্ঞান-প্রত্যয় (categories of experience) ছাড়িয়া

কেবল 'অদ্বৈত' এই প্রত্যয় (category of non-dual) প্রয়োগ করিতে হয়। এতদ্‌বিধায় আমরা তত্ত্বকে অদ্বৈত, নির্গুণ, নির্বিশেষ সন্মাত্র বা চিন্মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করি ; এবং কখন কখন উহাতে জীবজগৎ ও ঈশ্বর পর্যন্ত ত্রিকাল-নিষিদ্ধ বলিয়া ধারণা করি। শ্রুতির নির্গুণ ও নির্বিশেষ-বাচক বাক্যগুলির এবং সগুণ-সবিশেষ-বাচক বাক্যের নিন্দাসূচক বাক্যগুলির মূলে এই অদ্বৈতানুভূতি নিহিত আছে। গৌড়পাদাচার্য ও শঙ্করাচার্য প্রমুখ বেদান্তীদের অদ্বৈতবাদ এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এই অদ্বৈতানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে পারমিনাইডিস, প্লেটো, প্লোটিনাস প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে এবং আধুনিক কালে এফ. এচ. ব্রাডলির দর্শন-মতেও অদ্বৈতানুভূতির কিছু আভাস পাওয়া যায়।

কোন কোন দার্শনিক ও ধর্মগুরু দ্বৈত এবং অদ্বৈত মতের মিলন-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যেন সবিকল্প ও নির্বিকল্প উভয় স্তরের জ্ঞানকেই স্বীকার করিয়া তত্ত্বের একটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এইভাবে বৈষ্ণব বেদান্তী নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত, ভাস্করাচার্যের ভেদাভেদ, শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদ, বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈত এবং অভিনবগুপ্ত-বর্ণিত শৈবদর্শনের কোন কোন শাখা, বিশেষতঃ কাশ্মীর শৈবদর্শন, ভগবদ্‌গীতার পুরুষোত্তমবাদ এবং তন্ত্রের শিবশক্তিবাদের উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রসার ঘটিয়াছে, মনে হয়। ইঁহারা পরম তত্ত্বকে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রকারই বলিয়াছেন এবং উহাতে একত্বের সহিত বহুত্বের মিলন সাধন করিয়া পরব্রহ্মকে জীবজগদ্রূপে প্রকাশমান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক কালে শ্রীঅরবিন্দও দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের, চেতন আত্মা ও অচেতন জড়ের, অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এজন্য তাঁহার দার্শনিক মতবাদকে সামগ্রিক চেতন-বাদ (Integral Idealism) আখ্যা দেওয়া হয়।

পূর্বে বলিয়াছি অনুভূতি তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় এবং সব অকৃত্রিম ও অকপট অনুভূতিতেই তত্ত্ব এক না এক ভাবে প্রকাশিত হয়। মনের বিভিন্ন ভূমিতে ও জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে তত্ত্ব কিরূপ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়—তাহাও বলিয়াছি। নির্বিকল্প জ্ঞান বা সমাধিতে তত্ত্ব নির্গুণ ও নির্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হয়। সবিকল্প জ্ঞান বা সমাধিতে তত্ত্ব সগুণ বা সবিশেষ পুরুষ বা ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হয়। নির্বিকল্প ভূমির শুদ্ধ অধ্যাত্ম-জ্ঞানে (pure spiritual consciousness) তত্ত্ব নিত্য অপরিণামী ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া প্রতিভাত হয়। আবার প্রাণচেতনার সাক্ষাৎ অনুভূতিতে (intuition of life process বা vital consciousness) এবং প্রযত্নচেতনায় (intuition of volitional process বা conative consciousness) উহা চিরপরিণামশীল ও চঞ্চল শক্তিরূপে অনুভূত হয়। এরূপ অনুভূতি হইতেই বৌদ্ধ দর্শন, হার্টম্যান ও শোপেনহাওয়ারের দর্শন এবং বার্গসোঁর দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায়। এভাবে অন্যান্য জ্ঞানের স্তরে তত্ত্ব অন্যরূপে অনুভূত হয় এবং আমরা উহাকে অন্যরূপে বুঝি ও ব্যাখ্যা করি।

সর্বনিম্নে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের স্তরে তত্ত্ব আমাদিগের নিকট রূপ-রস-গন্ধাদিময় জড়জগদ্রূপে প্রকশিত হয় এবং আমরা জড় জগৎকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া বুঝি। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কোন এক জ্ঞানস্তর হইতে আমরা তত্ত্বের যে রূপ পাই, তাহাই উহার

একমাত্র বা সম্পূর্ণ রূপ নহে। এক একটি জ্ঞানস্তর হইতে আমরা তত্ত্বের এক একটি মাত্র রূপের পরিচয় পাই। তত্ত্বের কোন একটি রূপ যেমন উহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, তেমনি উহার অনুভূত কোন রূপই মিথ্যা বা অলীক নয়। যেমন এক জলতত্ত্ব বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় এবং তাহার কোন একটি রূপই জল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যা নয়, তেমনি পরম তত্ত্বের বিভিন্ন অনুভূতিলব্ধ রূপ তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যাও নয়। যেমন আমরা একই জলে রাসন-ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়লব্ধ স্বাদ-গন্ধাদি গুণ স্বীকার করি, তেমনি পরম তত্ত্বের বিভিন্ন অনুভূতিলব্ধ রূপকে তাহার বিভিন্ন-ভাবের প্রকাশ ও সত্য রূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। জলে নীল বা সাদা বর্ণ আছে, কোন স্বাদ বা গন্ধ নাই বলা চলে না, আবার স্বাদ আছে, গন্ধ বা স্পর্শগুণ নাই, তাহাও বলা যায় না। একই জলে বর্ণ, স্বাদ ও স্পর্শগুণ আছে এবং উহারা তাহার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করে। ঠিক এই ভাবেই তত্ত্ব নির্গুণ, সগুণ নহে; নিরাকার, সাকার নহে; জড়মাত্র, চিদ্রূপ নহে; গতিশীল, স্থিতিশীল নহে—এরূপ বলা যায় না। যদি অনুভূতি-সামান্যই তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় হয় এবং বিভিন্ন জ্ঞানস্তরের অনুভূতি একই তত্ত্বকে প্রকাশ করে, তবে বলিতে হইবে যে তত্ত্ব সাকারও বটে, নিরাকারও বটে; সগুণ ও সবিশেষও বটে, নির্গুণ ও নির্বিশেষও বটে; নিত্য অপরিণামীও বটে, লীলায়িত পরিণামীও বটে।

এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন: এক তত্ত্ব সগুণ ও নির্গুণ প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণযুক্ত হইবে এবং একই তত্ত্ব যে বিভিন্ন জ্ঞানস্তরের অনুভূতিতে পাওয়া যায়, তাহা কিরূপে বুঝিব? ইহার উত্তরে প্রথমে বলিব, একই জল কিভাবে রস- ও স্পর্শ-গুণযুক্ত হইতে পারে এবং তরল দ্রব্য বাষ্প ও কঠিন পদার্থ হইতে পারে। তাহা বুঝিলে একথা বুঝা যাইবে, জলে আমরা রস ও স্পর্শ অথবা স্বাদ ও শৈত্যগুণ স্বীকার করি। কিন্তু এগুণ-দুইটি একেবারে ভিন্ন; রস স্পর্শ নহে, স্বাদ শৈত্য নহে, ইহাদের পরস্পরাভাবকে অন্যোন্যাভাব বলে। রস স্পর্শ হইতে ভিন্ন, স্পর্শ রস হইতে ভিন্ন, সেইরূপ স্বাদ ও শৈত্য; তথাপি উহারা এক জলেরই দুইটি গুণ। তারপর একই জল কখন তরল পানীয়, আবার কখন বাষ্প, কখন কঠিন বরফ হইয়া যায়, কিন্তু মূলে ও স্বরূপে সে জলই থাকে। জলে স্বাদ ও শৈত্যরূপ অত্যন্ত ভিন্ন গুণের সমাবেশ অথবা পরস্পরবিরুদ্ধ তরল বাষ্পীয় ও কঠিন রূপের সম্ভাব্যতা আমরা সহজে এবং নিঃসন্দেহে স্বীকার করি। তাহার কারণ জলে এ-সব ভিন্ন গুণের ও বিরুদ্ধ অবস্থার অনুভূতি আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম যে সগুণ ও নির্গুণ দুইই হইতে পারেন, তাহা আমরা সহজে স্বীকার করিতে পারি না, কারণ সেইরূপ অনুভূতি আমাদের সচরাচর ও সকলের হয় না। যদি কেহ বলেন জল তো দেশ-কাল-অবস্থা ভেদে তরলাদি রূপ ধারণ করে, একই দেশ কাল ও অবস্থায় তো সেরূপ হয় না, তাহার উত্তরে বলিব তত্ত্ব বা ব্রহ্মও অবস্থাভেদে সগুণ ও নির্গুণ হন। তিনি যখন জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ম করেন, তখন তাঁহাকে সগুণ বলি; আবার যখন সে সব কর্ম হইতে বিরত হন ও স্বরূপে অবস্থিত হন, তখন তাঁহাকে নির্গুণ বলি। অথবা যেমন জলের অবস্থান্তরের সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'জল তরল না কঠিন?'—এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গেলে বলিতে হয় 'জল তরলও বটে, কঠিনও বটে,' তেমনি তত্ত্ব বা ব্রহ্মে জগদ্ব্যাপারের

ভাবাভাবের সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে হয় 'ব্রহ্ম সগুণও বটে, নির্গুণও বটে'। কিন্তু জল ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জলকে একই অবস্থায়, একই দেশ-কালে তরল ও কঠিন বলা যায় না, ব্রহ্মকে একই কালে ও অবস্থায় সগুণ ও নির্গুণ বলা যায়। আত্মাই ব্রহ্ম এবং আত্মাকে একই কালে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, সগুণ ও নির্গুণ বলা যায়। আমি যখন কোন কর্ম করি, তখন কর্ম-নিষ্পাদক হিসাবে আমি সক্রিয় ও সগুণ, কিন্তু ঐ কর্মের নিশ্চল দ্রষ্টা বা সাক্ষী হিসাবে আমার আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ।

আর এক তত্ত্বই যে বিভিন্ন জ্ঞানস্তরের অনুভূতিতে পাওয়া যায়, তাহা আমরা স্মৃতির সাহায্যে বুঝিতে পারি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে যে একই ব্যক্তি একই জগতের বিভিন্ন রূপ দর্শন করে, তাহা স্মৃতি-সহায়ে বুঝা যায়। তেমনি নির্বিকল্প সমাধি হইতে সবিকল্প জ্ঞানে নামিয়া আসিলে অথবা সবিকল্প হইতে নির্বিকল্প জ্ঞানে উঠিলে পূর্বানুভূতির কিছু স্মৃতি বা বোধ থাকিয়া যায় এবং তাহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে উভয় জ্ঞানস্তরেই এক তত্ত্ব বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিন্ন রূপে অনুভূত হয়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ এক তত্ত্বেরই বিভিন্ন দিক বা রূপের পরিচয় দেয় এবং তাহাদের প্রত্যেকটিই একভাবে সত্য, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নয়। এই সত্যটিই তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য হইবে। এই ভাবে আমরা বিভিন্ন ও আপাত-বিরুদ্ধ দর্শনমতের একটা সঙ্গত সমন্বয় সাধন করিতে পারি এবং যে ভাবধারা দ্বারা তাহা সাধিত হইবে, তাহাকেই বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধারা বলা যাইবে।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মূলে এই ভাবধারা নিহিত আছে এবং তাহা পরিস্ফুট ও প্রতিপন্ন করিতে পারিলে এক বিশ্বজনীন দর্শনের প্রতিষ্ঠা হইবে। এখানে তাহার আভাস-মাত্র দেওয়া হইল।

Open your eyes and see Him. This is what Vedanta teaches. Give up the world which you have conjectured, because your conjecture was based upon a very partial experience, upon very poor reasoning, and upon your own weaknesses.

Swami Vivekananda in Jnana Yoga.

চিরকালের আশ্রয়

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

কোন নিরাপদ আশ্রয়ের অন্বেষণ মানুষের একটি সহজাত এবং প্রবল সংস্কার। ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটানো অপেক্ষা আমরা অনেক সময়ে এই চেষ্টাটিকেই অধিকতর জরুরী বলিয়া মনে করি। তীর্থ-দর্শনে বা কোন নূতন স্থানে বেড়াইতে গিয়া সর্বাগ্রে আমরা একটা 'ঠাঁই' খুঁজি। বলি, রোসো একটা থাকার জায়গা ঠিক করি আগে, তারপরে খাওয়া-দাওয়া, ঘোরাঘুরি, দেখাশুনা।

রামবাবুর মনে বড় অশান্তি, যদিও মেয়েদের বিবাহ হইয়া গেছে, ছেলেরা চাকরি করিতেছে, নিজেও এক বৎসর পেন্সন লইয়া দিনের পর দিন দশটা-পাঁচটা আফিসে কলম পিষিবার একঘেঁয়েমি ও কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। অশান্তির কারণ, রামবাবু এখনও একটি স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করিতে পারেন নাই। "ভাড়াটে বাসায় থেকে কি সুখ আছে?"—রামবাবু নাক সিঁটকাইয়া বলেন। ভাড়াটে বাসা অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আলোবাতাস, জল, বিদ্যুতের সর্বপ্রকার সুবিধাসংযুক্ত হইলেও রামবাবুর চোখে উহা একদিক দিয়া দুঃখকর। উহা 'নিজের' বাসা নয়। উহাতে রামবাবু তাঁহার 'মমত্ব'কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না।

যে আশ্রয়ে নিজের পুরাপুরি অধিকার নাই, সে আশ্রয় তো নিরাপদ আশ্রয় নয়। যখন শিশু ছিলাম তখন হইতেই প্রাণে প্রাণে এই বোধ সঞ্চারিত হইয়াছে। তখন দুগ্ধপান অপেক্ষা মায়ের কোলে সংলগ্ন হওয়াটাই ছিল বেশী কাম্য। এক ঝুড়ি খেলনা, বড় রকমের খাওয়ার প্রলোভন, কাকীমা-জেঠিমা-দাদু-দিদিমার অজস্র আদর—কিছুই আমার ক্রন্দন থামাইতে পারিত না, যদি বুঝিতাম মাতৃক্রোড় হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার শিশু-জগতের অসংখ্য সামগ্রী থাকিত একদিকে, আর আমার জননীর—হাত বাড়াইয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লওয়া, লইয়া বুকে ধরিয়া রাখা থাকিত আর একদিকে। শেষেরটি ছিল আমার স্বতঃ-কাম্য, সর্বতোবরণীয় আকর্ষণ।

যখন মাটিতে পা ফেলিয়া আমরা চলি, তখন আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস থাকে যে, মাটি আমাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই মাটি যদি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদের অন্তরাত্মাও কাঁপিয়া উঠিতে বাধ্য। কী সর্বনাশ, যে মাটিতে দাঁড়াইয়া আছি, সেই মাটিই পায়ের নীচে হইতে সরিয়া যাইতেছে! 'খাইব কি?', 'করিব কি?' প্রভৃতি প্রশ্নে যত না সঙ্কট ও বিপর্যয় ফুটিয়া উঠে, তদপেক্ষা বোধ করি অনেক বেশী বিপদ প্রকাশ পায় 'দাঁড়াইব কোথায়?' এই জিজ্ঞাসায়। দাঁড়ানো, আশ্রয়-লাভ, স্থায়ী হইয়া বসা—ইহা মানুষের জীবনের একটি অতি প্রধান আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

লৌকিক জীবন হইতে ধর্মজীবনেও এই সমস্যাটি সংক্রামিত হয়। বস্তুত: এক দিক দিয়া দেখিলে আমাদের যত কিছু ধর্মচর্যা, উহাদের অন্যতম লক্ষ্য একটি ভাল নিরাপদ আশ্রয় লাভ —যে আশ্রয় নড়ে না, বদলায় না, ক্ষয় পায় না, —যে আশ্রয়ে আমরা কায়েমী হইয়া বসিতে পারি—যে আশ্রয়কে আমরা বরাবর আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারি। এই পৃথিবীতে খুঁজিয়া

খুঁজিয়া ঐরূপ স্থায়ী নিবাস পাই না বলিয়াই তো আমরা স্বর্গের দিকে চাই, ভগবান হরির বৈকুণ্ঠলোকে যাইবার প্রত্যাশা রাখি। এই প্রকার বৃহৎ নিরাপদ আশ্রয়লাভের জন্যই আমরা পুণ্য কাজ করি, কত প্রলোভন, কত অধর্ম-আচরণ হইতে নিজেকে সংযত করি, কত কৃচ্ছ্রতা, ব্রত, নিয়ম, উপবাস ও পূজার্চনা করি।

কোন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার জন্য আমাদের কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি স্বর্গে গতি লাভ করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া আমরা আশ্বস্তও হই। আশ্রয়লাভের একটি মহত্তর এবং বিপুলতর রূপ যেন এখন তাঁহার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা মৃতের জন্য তাই প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার স্বর্গে গতি হয়। এই গতি বা স্বষ্ঠুতর আশ্রয়লাভ যেন মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ। মানুষের অপর যাহা কিছু অন্বেষ্টব্য, তাহা যেন এই আশ্রয়-প্রাপ্তির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রে স্বর্গে আশ্রয়লাভ ও ভগবানের সান্নিধ্য-লাভ এই দুইটির মধ্যে বৃহৎ পার্থক্য দেখানো হইয়াছে। স্বর্গের আশ্রয় চিরন্তন নয়। পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গে গতি হয়, কিন্তু ঐ সঞ্চিত পুণ্যের ক্ষয় হইলে জীবাত্মাকে আবার মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। স্বর্গ পৃথিবীরই মতো একটি স্থান বিশেষ, অবশ্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক নিরাপদ, অনেক বাধাবিপত্তি-ঝঞ্ঝাট-শোক-দুঃখহীন। স্বর্গে দেবতারা থাকেন। নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ভোগ ওখানে করিতে পারা যায়। কিন্তু বিষয়ভোগ—তাহা যত স্বচ্ছ এবং সূক্ষ্মই হউক—কখনও মানুষের চরম কাম্য হইতে পারে না। উহা আত্মাকে বাঁধে, উহা এক প্রকারের দাসত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব স্বর্গের দিকে তাকাইয়া স্বর্গের আশ্রয় লাভ করিয়াই আমাদের অন্বেষণ যেন ক্ষান্ত না হয়। স্বর্গের অপেক্ষাও ঊর্ধ্বতর আশ্রয় আমাদিগকে খুঁজিতে হইবে। সেই আশ্রয় শ্রীভগবানের সামীপ্য। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, এই পৃথিবীতে থাকিতে যদি শ্রীভগবানে মন স্থির করিতে পার, তাঁহাতে বুদ্ধি স্থাপন করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চিত জানিও যে, মৃত্যুর পরেও তাঁহা হইতে তুমি বিযুক্ত হইবে না, অকূলে ভাসিবে না, সেই শ্রীভগবান-রূপ পরম আশ্রয়েই তুমি বাস করিবে। (গীতা—১২।৮)

বস্তুতঃ বিশ্বাসী ভক্তের নিকট আশ্রয়লাভের সমস্যা চিরকালের জন্য মিটিয়া যায়। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন যে, এই জীবনে যে ভগবানের শরণ লইয়াছি, তাঁহার স্মরণ মনন আরাধনা করিতেছি, তাঁহাকে ভালবাসিবার চেষ্টা করিতেছি, ইহা তো ছেলেখেলা নয়। ভগবান নিশ্চিতই সব দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, মৃত্যুর পরও এমনই ভাবে তাঁহার সহিত সংযোগ বজায় থাকিবে, তাঁহাকে ডাকিয়া চলিব, তাঁহাকে ভালবাসিয়া যাইব। এই জীবনে শ্রীভগবানই যেমন পরম আশ্রয়, এই জীবনের পরেও তিনিই পরম অবলম্বন থাকিবেন। তিনি যদি কাছে থাকেন, তাহা হইলে ভাবনা কিসের, দুঃখ কিসের?

এইরূপ ভক্তকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 'মরিতে ভয় হয় কি?' তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন, 'না, মরিতে ভয় পাইব কেন? মৃত্যু অর্থে এই দেহটাই ছাড়িয়া যাওয়া, এই সংসারের খেলাঘর এবং কতকগুলি খেলনাই ফেলিয়া যাওয়া; কিন্তু জীবনের যিনি পরম প্রিয়, পরম অভয় তাঁহার সহিত তো ছাড়াছাড়ি হইবে না। তবে আর ভয় পাইবার কি আছে?'

আবার যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়,

'আপনার স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা ভগিনী আরও কত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সকলকে তো ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই পৃথিবীতে আপনার কত রকমের কাজ ছিল, কর্তব্য ছিল, গান-বাজনা ভালবাসিতেন, দেশভ্রমণের সখ ছিল, দর্শন বিজ্ঞান আলোচনা করিতেন—এ সবও তো মরিয়া গেলে আর করিতে পাইবেন না, তাহাতে কষ্ট হইবে না কি?' তাহা হইলে ভক্তটি নিশ্চিতই হাসিয়া বলিবেন, 'না, আমার কষ্ট হইবে না।' একের পিঠে শূন্য দিলে দশ হয়, দুটি শূন্য বসাইলে একশত হয়, তিনটি শূন্যে হাজার, আরও শূন্য বাড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কও বাড়ে। কিন্তু শূন্যের আগেকার এককে যদি মুছিয়া ফেলি, তাহা হইলে শুধু শূন্য দিয়া কি অঙ্ক হয়? ভগবানই অঙ্কের এক। আর যাহা কিছু সব শূন্যের পর্যায়ের। ভগবান আছেন বলিয়াই অপর সব কিছুর মূল্য। ভগবানের মধ্যেই সব কিছু মূল্য ওতপ্রোত। তাঁহাকে যদি না হারাই, তাহা হইলে কিছুই হারাইবে না। তাঁহারই মধ্যে সব ভালবাসা, সব আকর্ষণ সব তৃপ্তি, সব সার্থকতা মিশিয়া আছে।

ভক্ত যখন বলেন, ভগবান আমার পরম আশ্রয়, তখন 'আশ্রয়' শব্দটির অর্থ তাঁহার নিকট আমরা যাহা বুঝি, তাহা হইতে কিছু স্বতন্ত্র রকমে প্রতিভাত হয়। আশ্রয়-অর্থে শুধু বাসস্থান নয়, সকল প্রাপ্তব্য বিষয়ের, সকল অন্বেষণের পরাকাষ্ঠাও। ভগবান চিরকালের আশ্রয়, ইহার তাৎপর্য এই যে, ভগবানকে লাভ করিলে অনন্তকালের জন্য ছুটাছুটি, দাপাদাপি, অসহায় ক্রন্দন থামিয়া যায়। ক্ষয়হীন, হ্রাস-বৃদ্ধিহীন অস্তিত্ব শুধু নয়, অনন্ত আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তিও লাভ করা যায়। শিশুকাল হইতে আশ্রয় লাভ করিবার যে দুর্নিবার প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে জাগিয়া থাকে, ঐ প্রবৃত্তির চরম পরিপূর্তি ঘটে তখনই, যখন আমরা ভগবানকে ধরিতে পারি। ভগবানকে আশ্রয় জানিয়া আমরা হৃদয়ঙ্গম করি, এইবার গৃহের মতো গৃহ পাওয়া গিয়াছে, যথার্থ নিজের গৃহ—যে গৃহ হইতে কখনো বিচ্যুতি ঘটিবে না। যে গৃহের মধ্যে আমার যাহা কিছু দরকার, সব সুসজ্জিত আছে।

* * *

এই পৃথিবীর চাওয়া-পাওয়া লেনদেনের বাহিরে যাঁহার দৃষ্টি যায় না, তাঁহার নিকট চিরকালের আশ্রয় বলিয়া কিছু নাই। তিনি এই পৃথিবীতেই যতটা পারা যায়, নিরাপদ একটি আশ্রয়ের চেষ্টা করেন—নিজস্ব একটি উদ্যানবেষ্টিত, সুন্দর বড়, সব রকমের সুবিধা-সমেত সুরক্ষিত সুপরিকল্পিত সুনির্মিত পাকা বাড়ি; বিশ্বাসী আত্মীয় এবং বন্ধুগণের সংস্পর্শ; ব্যাঙ্কের খাতায় মোটা জমা অঙ্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। যিনি এই পৃথিবীর আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে দুইটি পন্থার বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। তাঁহাকে হয় পরকালের দিকে তাকাইয়া পুণ্যকর্ম করিতে হয়, যাহাতে উহার ফলে মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইতে পারেন, অথবা ইহলোক-পরলোকের মালিক, জন্ম-মৃত্যু সুখদুঃখের বিধাতা, বিশ্বমূল, বিশ্বসার, করুণা-নিধান শ্রীভগবানকে বিশ্বাস করিয়া, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহাকেই চিরকালের আশ্রয় বলিয়া জানিতে হয়।

তাঁহার পক্ষে আর একটি তৃতীয় পন্থাও সম্ভবপর—আত্মজ্ঞানের পথ। বেদে যেমন স্বর্গের কথা আছে, ভগবানের কথা আছে, তেমনি আত্মবিজ্ঞানেরও কথা আছে। স্বর্গ-রূপ আশ্রয় যদি চাও তো তাহার উপায় পুণ্যকর্ম। ভগবান-রূপ পরম আশ্রয় যদি অন্বেষণ কর তো সেই

আশ্রয়লাভের উপায় বিশ্বাস ও ভক্তি। আর নিজের নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, জন্মহীন, মৃত্যুহীন আত্মাকে আবিষ্কার করিয়া উহাতেই যদি দাঁড়াইতে চাও তো তাহার উপায় হইল বেদান্ত-বিচার। শঙ্করাচার্য বলিতেছেন :

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।
তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশো ভবত্যনু॥

(বিবেকচূড়ামণি, ৪৫)

—বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদে উক্ত সত্যসমূহের পর্যালোচনা ও গভীর অনুধ্যান দ্বারা আত্ম-স্বরূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়। ঐ জ্ঞান হইলে সংসারের যাবতীয় দুঃখ চিরকালের জন্য মিটিয়া যায়।

ভক্ত যেমন ভগবানের মধ্যে সমুদয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার পর্যবসান দেখিতে পান, জ্ঞানী সেইরূপ তাঁহার নিজের চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ভিতর সকল অন্বেষণের পরিসমাপ্তি খুঁজিয়া পান। তিনি দেখেন, আত্মৈবাধস্তাদাত্মো-পরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বম্।

(ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭।২৫।২)

—আত্মাই নীচে, আত্মা উপরে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, আত্মাই যাহা কিছু সব।

জ্ঞানীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বিশ্ব-সংসারের আশ্রয় কি? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবেন, 'আমি'—দেহমনবদ্ধ ক্ষুদ্র 'আমি' নয়, চৈতন্যস্বরূপ সর্বব্যাপী ভূমা 'আমি'। যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি কি মরিতে ভয় পান? —তিনি অবিলম্বে বলেন, না, ভয় কিসের? আমার প্রকৃত স্বরূপের তো আবির্ভাব-তিরোভাব নাই। আমি তো চিরকাল থাকিব—যাহা কিছু বরণীয়, যাহা কিছু মঙ্গল, সুন্দর উহাদের সহিত এক হইয়া থাকিব। আমিই যে আমার চিরকালের আশ্রয়।

ভক্তের নিকট ভগবান যেমন কথার কথা নয়, তাঁহার বিশ্বাস ও ভালবাসার অপ্রত্যাখ্যেয় সম্পদ্, তাঁহার প্রাণের প্রাণ, আকাঙ্ক্ষার আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানীর নিকটও তাঁহার আত্মস্বরূপ সেইরূপ সুস্পষ্ট নিঃসন্দিগ্ধ সতত-প্রত্যক্ষ সত্য। ভক্ত ও জ্ঞানী দুই বিভিন্ন পথ দিয়া একই সত্যে পৌঁছিয়াছেন—যেখানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ভয় নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, সন্তাপ নাই ক্ষুদ্রতা নাই, বন্ধন নাই। তথায় আলো, কেবলই আলো আনন্দ, কেবলই আনন্দ। ঐ সত্যই আমাদের চিরকালের আশ্রয়—ভক্তি-দৃষ্টিতে ভগবান, জ্ঞান-দৃষ্টিতে আমাদের আত্ম-স্বরূপ।

আমরা যেন এই আশ্রয়ের মূল্য বুঝিতে পারি, এই আশ্রয়কে এই জীবনেই লাভ করিতে পারি। এই পরম আশ্রয়—প্রেমময় ভগবান —আমাদের আপন ভাস্বর চৈতন্যস্বরূপ— যিনি সর্বদা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের তো হুঁশ নাই। আমরা বালুকার উপর ঘর বাঁধিতে ব্যস্ত, ভিখারীর মতো দ্বারে দ্বারে কানা কড়ি ভিক্ষা করিতে তৎপর। আমাদের মূর্খতা দূর হউক, শুভবুদ্ধি জাগ্রত হউক, চিরকালের আশ্রয়ের প্রতি হৃদয় উন্মুখ হউক।

স্বাধীন ভারতে সত্য-শিক্ষা

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

স্বাধীন ভারতে আজ শিক্ষা-সমস্যাই আমাদের নিকট অন্যতম প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। জাতীয় সরকারের নিকট আমরা যেরূপ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান আশা করি দৈহিক দিক্ থেকে, সেরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থাও আশা করি মানসিক দিক্ থেকে সমভাবে। সেজন্য আজ স্বাধীন ভারতে, নূতন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে, দেশনায়ক সমাজ-সেবক ও শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌গণ সকলেই জনশিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সকলেরই দৃষ্টি সর্বপ্রথম পতিত হয়েছে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রতি। স্বাধীন দেশের নূতন নাগরিক গঠনের দিক্ থেকে যে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী পূর্ণাঙ্গ নয়—সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু কি উপায়ে সেই পরিবর্তন সাধিত হ'লে সত্যই তা প্রকৃত পূর্ণতা ও অভ্যুন্নতির জনক হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা ও মতভেদের উদ্ভব হয়েছে। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে একটি সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হ'তে পারিনি ব'লে স্বাধীন ভারতে সত্য-শিক্ষার ভিত্তি-স্থাপনের পুণ্য কার্য আজও সমাপ্ত হ'তে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের স্থির ক'রে নিতে হবে যে, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি ; তার পরে শিক্ষার প্রণালী আপনিই স্থির হ'য়ে যাবে। আজ পর্যন্ত সাধারণতঃ শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি কেবলই পুঁথিগত বিদ্যা, কেবলই পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া ; এবং শিক্ষার লক্ষ্য বলতেও বুঝি কেবলই চাকরি-লাভ ; কেবলই অর্থনৈতিক উন্নতি। এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আমাদের শিক্ষানীতি আজও পরিচালিত হচ্ছে ব'লে শিক্ষা যেন হ'য়ে রয়েছে একটি বাইরের জিনিস, একটি চাকচিক্যময় আভরণ অথবা আবরণই মাত্র ; অন্তরের অন্তঃস্থলে তার সঞ্জীবনী স্পর্শ আজও আমরা অনুভব ক'রে ধন্য হ'তে পারছি না ; তার স্বর্ণ আলোকচ্ছটা আজও আমাদের তমসাচ্ছন্ন মনোমন্দিরকে উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলতে পারছে না। এর অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হ'তে পারে ? আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-তত্ত্ববিদ্ রবীন্দ্রনাথও একবার দুঃখ ক'রে বলেছিলেন :

"আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোন একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি, সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোন ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী-গুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।"

শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে এরূপ শোচনীয় সম্পর্কহীনতা দূর করবার জন্য, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, সর্বপ্রথম আমাদের শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থির ক'রে নিতে হবে ; তারপর শিক্ষার উপায় বা পদ্ধতি আপনিই নির্দিষ্ট হ'য়ে যাবে। এই বিষয়ে অবশ্য আমাদের নূতন তত্ত্ব কিছুই আবিষ্কা

করতে হবে না, পরের দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র-হস্তে উপস্থিতও হ'তে হবে না—কেবল একবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ও বরণ ক'রে নিতে হবে আমাদেরই অতি নিজস্ব শাশ্বত আদর্শকে, আমাদের বদ্ধ জীবনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে সাদরে আহ্বান ক'রে নিতে হবে প্রকৃত প্রজ্ঞার সেই আলোককে, যার দ্যুতিতে একদিন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ উদ্‌ভাসিত হয়েছিল। সেজন্যই সেই যুগের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা শিক্ষার তথা মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে ঘোষণা করেছিলেন 'ভূমা' লাভকে :

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি,
ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।

—যা ভূমা, যা বিরাট ও মহান্, কেবল তাই সুখ ; যা অল্প, যা ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ, তাতে সুখ নেই ; একমাত্র ভূমাই সুখ, একমাত্র ভূমাকেই জানতে ইচ্ছা করবে।

এর অর্থ হ'ল কেবল এই যে, মনুষ্যত্বের মহিমা, সমগ্র সত্তার পূর্ণতম বিকাশই হ'ল মানবজীবনের, তথা শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এরূপে ভারতীয় মতে, বিদ্যা বা শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে চাকরি-লাভ বা ধনার্জন-মাত্রই নয় ; এর একমাত্র লক্ষ্য হ'ল আত্মোপলব্ধি, আত্মোন্নতি, আত্মবিকাশ। এরূপ আত্মবিকাশের অর্থ হ'ল : মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্বের, তার সমগ্র সত্তার সর্বতোমুখী বিকাশ। শিক্ষার মাধ্যমে এরূপ মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধিত হচ্ছে না বলেই আজকাল তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও মানুষের মতো মানুষের দর্শনলাভ অতি বিরল। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই পুনরায় বলি :

"অতএব চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকার বিনাশপ্রাপ্ত হইব—অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়।"

এরূপে যদি আমরা মনুষ্যত্ব-লাভকেই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ব'লে গ্রহণ করি, তাহলে শিক্ষা-পদ্ধতিও হওয়া কর্তব্য কেবল পুঁথিগত-বিদ্যা-শিক্ষা-পদ্ধতির স্থলে নীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-পদ্ধতি। বর্তমান অত্যুগ্র রকম বিজ্ঞানের যুগে, জড়বাদের যুগে, বস্তুতন্ত্রবাদের যুগে নীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আমরা যেন অপাংক্তেয় ক'রে রেখেছি শিক্ষার পবিত্র ক্ষেত্র থেকে। কিন্তু যদি অচিরে এরূপ জড়বাদের স্থলে অধ্যাত্মবাদকে, বস্তুতন্ত্রবাদের স্থলে আদর্শ-বাদকে, অর্থনৈতিক উন্নতির স্থলে নৈতিক অভ্যুন্নতিকে আমরা স্থাপিত করতে না পারি, তবে কোন শিক্ষা-প্রণালীই যে ফলপ্রসূ হবে না, তা সুনিশ্চিত।

প্রথমতঃ নীতিমূলক শিক্ষাপ্রণালী বর্তমানে বিশেষভাবে প্রয়োজন এইজন্য যে, ইংরেজীতে যাকে বলে 'Intellect' ও 'Morality' বা বিদ্যাবুদ্ধি ও নীতিবোধের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, তা প্রায় বিলুপ্তই হ'তে চলেছে বর্তমান জগতে। সেই জন্যই দেখা যাচ্ছে, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিখরদেশে আরোহণ করেও, 'জ্ঞানিগুণিগণ'—সজ্জনরূপে পরিচিত হ'তে পারছেন না। তার কারণ হ'ল এই যে, যে তত্ত্বজ্ঞান-লাভে তাঁরা আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন, সেই জ্ঞানকে পুণ্য ও নিষ্কাম কর্মে পরিণত ও প্রকাশ করা তাঁদের সাধ্যায়ত্ত যেন নয়। এরূপে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে ক্রমশঃ

দেখা দিচ্ছে এক প্রকাণ্ড ব্যবধান। কিন্তু সত্য যদি সত্তার অন্তঃস্থলে প্রবেশ ক'রে তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আচরণকেও উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলতে না পারে স্বীয় আলোকচ্ছটায়, তাহলে তার আর সার্থকতা কি? সেজন্যই প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ও নীতি, জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ ছিল অবিচ্ছেদ্য। দ্বাদশবর্ষব্যাপী উচ্চতম ও অশেষ প্রকারের জ্ঞান লাভ ক'রে ছাত্র যখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশেচ্ছু হতেন, তখন সমাবর্তন-কালে গুরু তাঁকে সরলতম নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দান ক'রে বলতেন:

"সত্যং বদ, ধর্মং চর।......
মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব।......
শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্।।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ যে জ্ঞানলাভে তুমি ধন্য হয়েছ, সেই জ্ঞান যেন নিষ্ফলে না যায়। যেমন বৃক্ষের সার্থকতা সুমিষ্ট ফলে, তেমনি জ্ঞানেরও সার্থকতা সুমিষ্ট কর্মে। সেজন্যই সত্যকথন, ধর্মাচরণ, মাতাপিতৃভক্তি, শ্রদ্ধার সঙ্গে দান প্রভৃতি সাধারণ কর্মেই তো হবে প্রাপ্ত ও আহৃত জ্ঞানের পরীক্ষা; এবং এরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে না পারলে, জ্ঞান থাকবে চিরকাল প্রাত্যহিক জীবনের বাইরে, আমাদের একটি আপাতদৃষ্টিতে চাকচিক্যময় আভরণস্বরূপই মাত্র হ'য়ে।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মমূলক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনের প্রস্তাবে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের হয়তো অনেকেই বিস্মিত হবেন। কিন্তু ধর্ম ও সম্প্রদায়, তত্ত্ব ও গোঁড়ামি নিশ্চয়ই এক নয়। সেজন্য প্রকৃত ধর্মতত্ত্বশিক্ষা কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির জনক নয়। ধর্মের অতি সুন্দর সংজ্ঞাদান ক'রে মহাভারত বলছেন:

ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহু র্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যদ্ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়॥

অর্থাৎ যা আমাদের ধারণ করে, তাই হ'ল ধর্ম।

এরূপে মহত্ত্বের দিকে, পূর্ণতার দিকে, প্রবৃদ্ধির দিকে, পরিব্যাপ্তির দিকে যুগে যুগে মানবজীবনের যে অভিযান, তাই হ'ল ধর্মের মূল কথা। এই মূল কথাকেই আজ পুনরায় নির্ভয়ে স্থাপনা করতে হবে আমাদের জীবনের অন্তঃস্থলে।

তৃতীয়তঃ সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য হ'ল আত্মার সংস্কার করা,—যে মলিনতা, ক্লেদ, অন্ধকার আমার অমৃত, আলোক-স্বরূপ আত্মাকে বর্তমানে আবৃত ক'রে রেখেছে, তারই সংস্কার সাধন করা। জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, সেবাপ্রমুখ সদ্‌গুণ ও সৎকর্মসমূহ আমাদেরই অন্তরের অন্তঃস্থলে নিহিত হ'য়ে রয়েছে—তাদেরই পুনরায় ভাস্বর ক'রে তুলতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। স্বামী বিবেকানন্দ সুন্দর উপমার সাহায্যে একবার বলেছিলেন:

আমাদের অন্তঃস্থ দিব্যালোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবৃত হ'যে থাকে। লৌহ-পেটিকার মধ্যস্থিত প্রদীপের রশ্মি যেমন বাইরে থেকে দেখা যায় না, মানবের সত্তাগত জ্ঞানালোকও ঠিক তাই। পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতার সাহায্যে আমরা ক্রমশঃ সেই অস্বচ্ছ আবরণকে স্বচ্ছ ক'রে তুলতে পারি।

এরূপে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা হবে বাইরে থেকে চাপানো বা অধ্যস্ত শিক্ষা নয়, অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা; নূতন গুণের সৃষ্টি নয়, পূর্ব-নিহিত গুণেরই প্রকাশ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় পুনরায় বলি:

কেহ কোনদিনই অন্যের দ্বারা শিক্ষিত হয়নি। প্রত্যেকে নিজেই নিজেকে শিক্ষাদান করেছে। বাহিরের শিক্ষক অন্তরের প্রকৃত

শিক্ষককে জাগ্রত করবার উপায়-স্বরূপই মাত্র—অন্তরের এই শিক্ষকই প্রকৃতকল্পে জ্ঞানদাতা।

এইভাবে স্বাধীন ভারতের সত্য-শিক্ষার তিনটি মূল স্তম্ভ হ'ল—নীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি। সত্য তো হ'ল এই তিনটির সমন্বয়ই মাত্র—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির, —নীতিরূপ কর্ম, ধর্মরূপ ভক্তি, সংস্কৃতিরূপ জ্ঞানের—একটি অপূর্ব মিলনই মাত্র। যে পুণ্যভূমি ভারতের মূল মন্ত্র হ'ল 'সত্যমেব জয়তে'—সেই ভারতে এই সত্যকেই আশ্রয় ক'রে আমরাও যেন আজ সেই বৈদিক প্রার্থনা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারণ করতে পারি :

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

—অসত্য থেকে আমাদের সত্য নিয়ে যাও ; অন্ধকার থেকে আমাদের আলোকে নিয়ে যাও ; মৃত্যু থেকে আমাদের অমৃতে নিয়ে যাও !

জিজ্ঞাসা

শ্রীমতী যমুনা দেবী

আদিম বাসনা কবে
রচেছিল মানবের ঘর ;
পার্থিব চেতনা মাঝে
এনেছিল নব রূপান্তর ?
জ্যোতির অলকানন্দা
নেমেছিল কার হৃদিপুরে ;
চৈতন্যের দিব্যদ্যুতি
ছুঁয়েছিল সঙ্গীতের সুরে ?
ঊষার প্রথম ছন্দে
গেয়েছিল কোন্ কবি গান ;
শাশ্বতের বাণী তার
অন্তরেতে পেয়েছিল স্থান ?

ধরণী কি ভুলে গেছে
মানুষের জন্ম-ইতিহাস ;
কাহার উদার বীর্যে
জেগেছিল প্রথম নিঃশ্বাস ?
অতীতের সেই স্মৃতি
কোথা আজ বিস্মৃতির তলে ;
কার মনে কোন্ বনে
বসন্তের কোন্ পুষ্পদলে ?
ধ্যানের প্রশান্তি মাঝে
সমাধি-বিলীন কোন্ জন,
এ সৃষ্টির সাক্ষী রূপে
নিত্য জাগি আছে চিরন্তন ?

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র কর

বীরপূজা মানুষের সহজাত ধর্ম। যাহা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, সুন্দর ও শক্তিমান্, তাহা সেই সুন্দরতম সর্বশক্তিমান্ ভগবানেরই বিশেষ প্রকাশ। গীতার বিভূতিযোগে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন:

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

—তাই মানবমনে তাহার আবেদন নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকে। এই বীরপূজার নামই আদর্শনিষ্ঠা, যাহা যোগায় তদনুযায়ী আত্মোন্নতির প্রেরণা। আদর্শনিষ্ঠারূপ ভিত্তির উপরই তুলিতে হয় সার্থক জীবনের সৌধ; আদর্শ-বিহীন অপরিকল্পিত জীবন বৈশিষ্ট্যহীন কতকগুলি দিন-মাস-বৎসরের সমষ্টিমাত্র। আজ আমরা যে বীরের আলোচনা করিতেছি, তিনি যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ, সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত সংস্কারমুক্ত ভাবধারার জন্য সর্বজনীন আদর্শরূপে যিনি জগদ্বরেণ্য।

যুগপ্রয়োজনে সমকালীন সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য উপযুক্ত শক্তিধর পুরুষের আবির্ভাব ঘটে—একথা একটি ঐতিহাসিক সত্য। প্রাণহীন বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রাদুর্ভাবে যাগ-যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে বদ্ধ কোটি কোটি প্রাণীর করুণ আর্তনাদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন করুণাবতার ভগবান্ তথাগত। বৌদ্ধধর্মের পতনে কাপালিকতা ও আভিচারিক ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে তাহার কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন জ্ঞানাবতার আচার্য শঙ্কর। শুষ্ক পাণ্ডিত্যের নিগড়ে ও বিধর্মীর অত্যাচারে কণ্ঠাগতপ্রাণ ধর্মের রক্ষার জন্য বঙ্গ-মনের আকুতি শ্রীঅদ্বৈতের হুঙ্কারে মূর্ত হইয়া উঠিলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য। ঊনবিংশ শতকের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ে যখন পাশ্চাত্যের বর্ণাঢ্য ভাবধারার প্লাবনে দেশ প্লাবিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তখন আসিয়া দাঁড়াইলেন মহামনীষী রামমোহন। উপনিষদের একেশ্বরবাদ ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সমবায়ে জন্ম লইল ব্রাহ্ম সমাজ, বিপর্যয়ের মুখ হইতে দেশের রক্ষায় যাহার দান অপরিসীম। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের আবেদন শুধু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় তাহা শহর ছাড়িয়া পল্লীভারতে পৌঁছিতে পারিল না; মিটিল না তাহার দ্বারা দেশের সামগ্রিক প্রয়োজন। ফলে প্রাথমিক স্রোতোবেগ প্রতিহত হইলেও সমস্যার সমাধান হইল না, প্রয়োজন হইল সমন্বয়-পন্থী বলিষ্ঠতর নেতৃত্বের। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্ঘাতজাত এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের পটভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—প্রাচ্যের সাধনার সহিত পাশ্চাত্যের মনীষার অপূর্ব সমন্বয়ের প্রতীকরূপে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অভেদ-আত্মা, দুই বিচ্ছিন্ন শক্তির সমাবেশ নহেন। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে স্থৈতিক শক্তি বা Potential energy ও গতিশক্তি বা Kinetic energy উভয়ে যেরূপ স্বরূপতঃ এক, শুধু প্রয়োজনানুরোধে প্রকাশ-ভঙ্গির বৈচিত্র্য; রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ঠিক সেইরূপ। আরও সরলভাবে বলা যায়,

রামকৃষ্ণ যেন ভাব, আর বিবেকানন্দ তার ব্যাখ্যা—সম্প্রসারণ।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ কিন্তু সহজে এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণের পাদমূলে নিজের ব্যক্তিত্ব বিলাইয়া দেন নাই। যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক যুগের প্রতীকরূপে নানারূপ পরীক্ষা-সমীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথের সমস্ত যুক্তি যখন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, তখনই তাঁহার জীবনস্রোত সেই করুণাগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া লোক-কল্যাণ সাধনের জন্য প্রবাহিত হইতে থাকে। কাশীপুর উদ্যান-বাটিকায় রোগশয্যাশায়ী শ্রীরামকৃষ্ণকে শেষ পরীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথের আত্মনিবেদন মনে করাইয়া দেয় গীতায় শ্রীভগবানের কাছে অর্জুনের আত্মসমর্পণের কথা :

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

এই বিশেষ তাৎপর্য- ও সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনা-প্রসঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দ 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন : যখন কলিকাতার শিক্ষিত যুবকদের মুকুটমণি বিবেকানন্দ একজন নিরক্ষর হিন্দু তাপসের, বিদেশী ভাব বা শিক্ষার লেশ-মাত্রের সহিত সম্পর্কহীন সমাধিমান্ অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানসম্পন্ন মহাযোগীর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন, তখনই সংগ্রামে জয়লাভ হইল।

তারপর? তারপর গঙ্গাযমুনার মিলনে যে প্রবল স্রোতস্বতীর সৃষ্টি হইল, তাহাকে রোধ করে কাহার সাধ্য? ভূমানন্দের আস্বাদ যে পাইয়াছে, ক্ষুদ্রানন্দের সাধ্য কি তাহাকে ধরিয়া রাখে? সংসার-সুখের প্রলোভন, পরিবার-পরিজনের চিন্তা, জননীর অশ্রুজল—কিছুই তো আর তাহাকে ঠেকাইতে পারে না। ফলে—'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'; নরেন্দ্রনাথের উদ্বর্তন ঘটিল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দে—'আত্মনো মোক্ষার্থম্' নয়, 'জগদ্ধিতায়'।

স্বামীজীর বিচিত্র জীবনকে ইংরেজ কবি শেলীর ভাষায় বলা যায় : A dome of many-coloured light—অর্থাৎ আলোর বিবিধ বর্ণ বিচ্ছুরণকারী স্ফটিকাবরণ। এই বিবিধবর্ণের উৎসরূপে কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে—ধর্মের দীপশিখা। তাঁহার এই জীবনচ্ছটার কয়েকটিমাত্র রশ্মির বিষয় এখানে আলোচনা করিব।

সমন্বয়ী ধর্মের প্রচারক

প্রথমেই আমরা স্বামীজীকে দেখিতে পাই ভারতের সমন্বয়ী আর্যধর্মের পুনরুজ্জীবকরূপে। ভারতেতিহাসের সূচনা হইতে রাজনৈতিক কীর্তিকাহিনীর বহিরঙ্গ কাঠামোর অন্তরালে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তার সমন্বয়ী আর্যধর্মের ধারা—বহুর মধ্যে একের সাধনা। এই সমন্বয়ী ধর্মের প্রভাবে শুধু আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়ই সাধিত হয় নাই, গ্রীক, শক, পহ্লব, কুশান, হূন, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতিগুলিও সম্পূর্ণ ভারতীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি বহুল-প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সনাতন ধর্মের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। খৃঃ দশম শতকের পর মুসলমান বিজয়কালে এই সমন্বয়ী ধর্ম সাময়িকভাবে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেও পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবার তাহার উজ্জীবনের জন্য আবির্ভূত হন রামানন্দ, কবীর, নানক ও নিমাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে মূল সুর আবার হারাইয়া যায়। তারপর আসিল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্ঘাত এবং তাহার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়, যাহার কথা পূর্বেই উল্লিখিত

হইয়াছে। এই সময়ে সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' মন্ত্রে দীক্ষিত বিবেকানন্দ এই মহাসমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়া ভারতের সমন্বয়ী ধর্মের পুনরুজ্জীবন করিলেন। এবার আর এ ধর্ম ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না; স্বামীজীর নেতৃত্বে চলিল তাহার বিজয় অভিযান দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া।

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মকে আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে মুক্ত করিয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ও সহনশীল করিয়া তুলিবার জন্য, তাহাদের আধ্যাত্মিকতাকে কুজ্ঝটিকা-মুক্ত করিয়া অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে পরিণত করিবার জন্য, সর্বপ্রকার সীমার মাঝে অসীমের যে সুর বাজিতেছে, তাহার প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে এমন এক সর্বজনীন দার্শনিক মতবাদের সাধারণ ভিত্তিভূমির উপর দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান জানাইলেন, যে-মতবাদ মানুষের সত্যানুভূতির ও সুসংবদ্ধ চিন্তাশক্তির মহত্তম বিকাশ। 'বেদান্তবাদ' নামে পরিচিত এই জ্ঞানরাশি স্বকীয় মহিমায় ও তাঁহার প্রচেষ্টায় সমগ্র সভ্য জগতে শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠা দ্বারা বিভিন্ন ধর্মমতকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন করিয়া উৎসরূপে তাহাদের মধ্যে সঞ্জীবনী রসের সঞ্চার করিতেছে। আধুনিক কালের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মনীষী টয়েন্‌বী বলিয়াছেন:

> The spirit of Indian religions, blowing where it listeth, may perhaps help to winnow the traditional Pharisaism out of Muslim, Christian and Jewish hearts.

—অর্থাৎ ভারতীয় ধর্মের ভাবধারার স্পর্শে মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদীদের হৃদয় হইতে আত্মকেন্দ্রিকতার অপসরণ সম্ভবপর। টয়েন্‌বীর আশার সফলতা নির্ভর করিতেছে স্বামীজীর নেতৃত্বে আরব্ধ সমন্বয়ী ধর্মের এই অভিযানের উপর। শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে দণ্ডায়মান ভারতের এই তরুণ সন্ন্যাসী প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম করিয়া আমেরিকাবাসিগণকে 'ভাই ও ভগিনীগণ' বলিয়া যে সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহাও এই মনোভাবেরই সার্থক প্রয়োগ এবং আমার বিশ্বাস, এই ঐতিহাসিক সম্বোধনের উচ্চারণ-জাত তরঙ্গ অহর্নিশ সক্রিয় থাকিয়া এই বিশ্বকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইতে পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

ধর্মজগতে এই সমন্বয়-অভিযান ছাড়া বর্তমান আদর্শ-বিপর্যয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বিপরীতমুখী আদর্শের মধ্যে স্বামীজীর প্রচেষ্টায় রচিত হইতে চলিয়াছে সমন্বয়ের মহাসেতু, অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে—কিপ্লিং-এর উক্তি: 'East is East and West is West; never the twain shall meet'—অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্; এই দুই-এর মধ্যে কখনও মিলন হইবে না। স্বামীজীর শিক্ষায় আজ ভারত বুঝিয়াছে তাহার আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ব্যাবহারিক জীবনের বলিষ্ঠ মিলনের অপরিহার্যতা, আর পাশ্চাত্য উপলব্ধি করিয়াছে তাহার উন্নত ব্যাবহারিক জীবনে দিব্য পিপাসার ('Divine dis-content'-এর) শান্তিবিধানের প্রয়োজনীয়তা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ই আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে, সুখ ও শান্তি লাভ করিতে হইলে 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চ অপরা চ'; এবং মানুষকে হইতে হইবে, কবি Words-worth-এর ভাষায়, 'True to the kindred points of heaven and home'—অর্থাৎ স্বর্গ-সন্ধানী, কিন্তু সংসার-সচেতন। তাই আজ ভারত চায় বিবেকানন্দকে তাহার আধ্যাত্মি-কতাকে ব্যবহারমুখী করিবার জন্য, আর পাশ্চাত্য

জগৎ তাঁহাকে চায় তাহার ব্যাবহারিক বা পার্থিব জীবনকে শুদ্ধ, সংস্কৃত ও ঊর্ধ্বগামী করিবার জন্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের এই যে সমন্বয়, তাহা রূপ পরিগ্রহ করিবে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে,—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে,—এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে', গাহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।

শুধু দেশের ভিত্তিতে নয়, কালের ভিত্তিতেও এই সমন্বয়ী ধর্ম আজ সুস্পষ্টভাবে ক্রিয়াশীল। আদর্শগত বিপ্লবের জন্য অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যেও ছিল না ক্রমবিকাশের সূত্র। 'উদ্বোধনের' ভাদ্র (১৩৬৬) সংখ্যায় 'কথাপ্রসঙ্গে' এই আদর্শ-বিপর্যয় 'মানসিক স্তরচ্যুতি' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। একমাত্র স্বামীজীর সমন্বয়ী ধর্মের প্রভাবেই স্তরচ্যুত মানবের মানসিক পুনর্বাসন সম্ভব এবং তার চিহ্নও সুস্পষ্ট। তাঁহার শিক্ষায় সভ্য ও চিন্তাশীল জাতি বা মানবমাত্রেই আজ বুঝিতে শুরু করিয়াছে যে অতীতের প্রান্তভূমির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে বর্তমানের আলোকস্তম্ভ, যাহার উজ্জ্বলজ্যোতি দিক নির্দেশ করিবে ভবিষ্যৎ মহামানবতার দিগ্বিজয়-অভিযানের।

আমরা স্বামীজীকে দেখি মনুষ্যত্বের উদ্বোধকরূপে। তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে লীন থাকিতে চাহিলে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তুই এত স্বার্থপর, নিজের মুক্তি খুঁজছিস্! ওরে, তোর মুখ চেয়ে যে কোটি কোটি মানুষ বসে আছে।' এইখানেই জন্ম হইল মানবধর্মী বিবেকানন্দের; অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত গুরুর মুখে শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন, লীলার মধ্যেই নিত্যের প্রকাশ। তাই শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের করুণা লইয়া দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন: জীবের কল্যাণের জন্য এই দুঃখময় সংসারে হাজার বার জন্মগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। এই রোগ-শোক-অজ্ঞতা-অভাবক্লিষ্ট জীবগণই আমার উপাস্য দেবতা, সর্বজাতির দুষ্ট ও দুর্বৃত্তগণই আমার আরাধ্য ঈশ্বর। শুধু সঙ্কল্প গ্রহণ নয়, অদ্বৈতজ্ঞানের আলোকে তিনি মানবমনের পুঞ্জীভূত অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটনে সমর্থ করিবার জন্য মানুষে মানুষে, জীবে জীবে, আত্মায় আত্মায় প্রেমের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য—এক কথায় মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন এবং কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন জ্ঞান ও প্রেমের, তথা সেবাধর্মের মহাবাণী:

> বহুরূপে সম্মুখে তোমার
> ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
> জীবে প্রেম করে যেইজন
> সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

তাঁহার এই প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠায়, যাহা অরণ্যচারী পর্বতগুহাবাসী মায়ামমতাহীন সন্ন্যাসীকে টানিয়া আনিয়াছে জীবসেবায় লোকালয়ে, ত্যাগের সহিত ঘটাইয়াছে সেবার অপূর্ব সমন্বয়।

সমাজ-দর্শনের ব্যাখ্যাতা

মার্ক্স-এর সমাজদর্শনে ধর্মের স্থান নাই; কারণ তাঁহার মতে ধর্মের উৎপত্তি ভয় হইতে ও শোষণের যন্ত্ররূপে এবং যেহেতু তাঁহার পরিকল্পিত শ্রেণীহীন সমাজ হইবে শোষণহীন, সেই হেতু শোষণের যন্ত্রস্বরূপ ধর্মের স্থান সেই

সমাজে থাকিতে পারে না। কিন্তু স্বামীজীর সমাজ-দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত; কারণ তাহাতে ধর্মের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে ও স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি দ্বারা মানুষের ধর্মজিজ্ঞাসার যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, মানুষের ধর্মচেতনার উৎপত্তি ভয় হইতে তো নয়ই, বরঞ্চ তাহা মানুষের এক স্বাভাবিক বৃত্তি, যাহার প্রভাবে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অন্তরালে সে পায় তাহার পরম দেবতার সন্ধান। এই যে স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রবণতা বা ধর্ম, তাহা কখনও শোষণের যন্ত্র হইতে পারে না। যখনই প্রকৃত ধর্মের অভাব ঘটে, তখনই হয় অচলায়তন-রূপ বিশেষ বিশেষ সুবিধাবাদ বা Privilege-এর সৃষ্টি এবং তাহাই হইয়া উঠে ধর্মনামে ভয়ের কারণ ও শোষণের যন্ত্র। প্রকৃত ধর্ম শোষণের নয়, শোষণ-অবসানের উপায় এবং সেইজন্যই দেখা যায় ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভেদ-বৈষম্যের নিগড় ভাঙিয়া ফেলিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। তাই বিবেকানন্দ পরি-কল্পিত সভ্যসমাজের ভিত্তি ধর্ম। এই সমাজের সাধারণ মানুষও দেবভাব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিবে; কারণ তাঁহার মতে—মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা স্বতই বর্তমান রহিয়াছে, তাহার বিকাশের নামই সভ্যতা, 'Civilization is the manifestation of the spirituality in man'. সামাজিক উদারতা ও প্রীতির বন্ধন মানুষের মধ্যে এই আধ্যাত্মি-কতার বিকাশের উপরই নির্ভরশীল।

দেশপ্রেমিক স্বামীজী

গুরুর নির্দেশে শিবজ্ঞানে জীবের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ স্বামীজী পরাধীন মাতৃভূমির—দুর্গত দেশবাসীর সেবাকেই তাঁহার সেবাব্রতের প্রথম সোপানরূপে গ্রহণ করিলেন। পরিব্রাজক-রূপে সমগ্র ভারত পরিক্রমা দ্বারা পরাধীন দেশবাসীর অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা দৃষ্টিগোচর করিয়া তাঁর চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। কন্যাকুমারিকার সমুদ্রতটে শিলাসনে ধ্যানমগ্ন যোগীর অন্তরে ভাসিয়া উঠিল শাশ্বত ভারতের মহিমময়ী মূর্তি, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আসিল উদাত্ত ঘোষণা: 'আগামী পঞ্চাশ বৎসর জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য হউন।'

দেশবাসীর দুঃখদুর্দশা স্বামীজীর কাছে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়মাত্র ছিল না, এজন্য তিনি মর্মে মর্মে তীব্র বেদনা অনুভব করিতেন। দেশবাসীর দারিদ্র্যস্মরণে আমেরিকার ধনকুবেরগণের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ শয্যাও তাঁহার নিকট কণ্টকশয়নবৎ প্রতীয়মান হইত, তিনি গৃহতলে পতিত হইয়া হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণায় মুখ ঘর্ষণ করিতেন। এই দেশপ্রেমের তুলনা কোথায়?

ঝঞ্ঝার মতো তিনি সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া বেড়াইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মাতৃভূমি—তাঁহার শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী—তাঁহার চিত্তপটে ছিল অনুক্ষণ জাগরূক। শুধু ভাবাবেগই নহে, তাঁহারই জীবন হইতে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন পাইয়াছিল প্রত্যক্ষ প্রেরণা; তাঁহারই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সৈন্যগণ; তাঁহারই সাধনায় মেষত্বপ্রাপ্ত ব্যাঘ্র শাবক ভারতবাসীর জীবনমুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহার স্বস্বরূপের প্রতিচ্ছবি।

দেশের উন্নয়নের জন্য তাঁহার ছিল বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম এবং তদনুযায়ী

দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে, উপনিষদের আত্মজ্ঞানের আলোকে দেশের প্রাণহীন আচারসর্বস্ব আধ্যাত্মিকতাকে কলুষ-মুক্ত করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পরিণত করিতে, জাতির কূপমণ্ডুকতা দূর করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ের দ্বারা জাতীয় জীবনে শক্তি সঞ্চার করিতে এবং শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা দ্বারা দুর্বলকে প্রবলের শোষণ হইতে মুক্ত করিতে ও নারীজাতির যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা তাহাদিগকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহার স্বল্পপরিসর জীবনে তিনি যে অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হউক বা না হউক, স্বাধীন ভারতের জয়যাত্রায় আবার তাহাই করিবে পথ-নির্দেশ, তাহাই করিবে স্তিমিত গতিতে বেগের সঞ্চার।

মুমূর্ষু মাতৃভূমির ধমনীতে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে সুস্থ ও সবল করিয়া তোলার মধ্যেই কেবল তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল না। দেশের সুযোগ্য সন্তানরূপে আমেরিকা হইতে শুরু করিয়া পৃথিবীব্যাপী বিজয়-অভিযানের দ্বারা তিনিই সর্বাগ্রে দীনা ভারতজননীকে মহিমময়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন জগৎসভায় সম্মানের উচ্চাসনে। তাঁহার বিদেশ-যাত্রাকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীঅরবিন্দ 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন: 'বিবেকানন্দের বিদেশযাত্রা দ্বারা ইহাই সর্ব-প্রথম সুস্পষ্টরূপে সূচিত হয় যে, ভারত শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই জাগে নাই, পরন্তু আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় করিবার জন্যও তাহাকে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।' . . . . . .

শিক্ষা-প্রসঙ্গে

মনোবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে শিক্ষা-বিদ্গণ প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, তদনুসারে আধুনিক কালে শিক্ষা বলিতে বুঝায়—মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরি-স্ফুরণ। শিক্ষার এই উদ্দেশ্যকে ভারতীয় দার্শনিক ভাবধারার সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া স্বামীজী বলিয়াছেন: মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা স্বতই বর্তমান, তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা, 'Education is the manifestation of the perfection already in man.' এই শিক্ষাদর্শ নির্দেশ করিতেছে—মানুষের আত্মোন্নতির এক অনন্ত পথ, যেহেতু মানুষের অভ্যন্তরস্থ পূর্ণতার বিকাশ যতই বিরাট হউক না কেন, বস্তু- ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক (objective & subjective) জগৎ অতিক্রম করিয়া উপলব্ধির স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি সেই আদর্শে পরিচালিত হইতেছে না। লর্ড মেকলে-দ্বারা কেরানি-তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে এবং একটু আধটু পরিবর্তনের ভিতর দিয়া এখনও চলিতেছে। স্বামীজীর ভাষায় এই শিক্ষাব্যবস্থায় হাতুড়িপেটা করিয়া শিশুর মস্তিষ্কে বিভিন্ন-বিষয়ক তথ্যরাশি প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয় এবং অজীর্ণ অবস্থায় তাহা তথায় ঘুরপাক খাইতে থাকে। স্বামীজীই জানাইলেন, Man-making education অর্থাৎ মানুষ তৈয়ার করিতে পারে—এমন শিক্ষার দাবি। দেশের অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, 'শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি যথার্থ কার্যকর জ্ঞান অর্জন; বর্তমান পদ্ধতি যাহা পরিবেষণ করে, তাহা নহে।

শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চলিবে না। আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার, যাহা দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে। চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত বেদান্তের সমন্বয়—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস হইবে তাহার মূলমন্ত্র।' তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির পরিস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবহারিক এবং শারীরিক শিক্ষারও ইঙ্গিত দিতেছেন এবং চরিত্রগঠন ও সংযমশিক্ষার জন্য ধর্মকে প্রধান স্থান দিয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে কল্যাণমুখী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন।

কিন্তু স্বাধীন ভারতেও স্বামীজী-প্রদর্শিত এই শিক্ষাদর্শ এখনও গৃহীত হয় নাই। শিক্ষাকে ব্যবহারমুখী করার জন্য কিছুটা প্রয়াস হইতেছে বটে, কিন্তু গতি মন্থর ও পরিকল্পনা বিতর্কের বিষয়ীভূত। শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা ও খেলাধূলার কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাই এখনও পর্যন্ত হয় নাই। সবল দেহই সুস্থ মনের ধারক ও বাহক। স্বামীজী দুর্বলতাকেই পাপ মনে করিতেন। শরীরচর্চা ও খেলাধূলা কেবল শারীরিক পটুত্বলাভের উপায় নহে, পরন্তু শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তাহাকে শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নিয়মানুবর্তী করিবার পক্ষেও তাহার প্রয়োজনীয়তা সমধিক। কিন্তু আমাদের বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই ক্রীড়াক্ষেত্র বা ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের অবসরকালীন জীবনধারা সুস্থ ও আনন্দময় খাতে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগের অভাবে পূতিগন্ধময় খানা-ডোবার সৃষ্টি করিতেছে।

ধর্মকে শিক্ষার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার জন্য স্বামীজীর যে সুস্পষ্ট নির্দেশ, এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে শ্রীপ্রকাশ-কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও তাহার সম্ভাবনা কতটুকু, তাহা রাষ্ট্রের কর্ণধারগণই জানেন। 'ধর্ম' বলিতে স্বামীজী কোন সাম্প্রদায়িক আচারসর্বস্ব ধর্মের কথা বলেন নাই; বলিয়াছেন—উপনিষদের আত্মতত্ত্বের কথা, যাহা মানুষের হৃদয় হইতে সকল প্রকার দুর্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত করিতে সক্ষম। এই ধর্মকে বলা যায় মানব-ধর্ম। রাষ্ট্র সাধারণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ হইলেও মানবধর্ম-নিরপেক্ষ হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই মানব-ধর্মকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থান দিলে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নষ্ট হইতে পারে না, বরং ঐ শিক্ষা দেশবাসীকে উদার করিয়া সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিবে।

বর্তমানে ছাত্রমহলে একটা অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার ভাব এমন ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা জাতীয় সঙ্কটের আকার ধারণ করিতেছে। স্বামীজীর সুনিশ্চিত অভিমত অনুযায়ী ধর্মকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থান দিলে তাহা শিক্ষার্থীদের সম্মুখে মহৎ আদর্শ স্থাপনের দ্বারা তাহাদিগকে চরিত্রবান্, সংযত ও নিয়মানুবর্তী হইতে উদ্বুদ্ধ করিবে।

এ বিষয়ে কেবল রাষ্ট্রকে দায়ী করিলে বা কেবল রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; পিতা-মাতা বা অভিভাবকদেরও এ-বিষয়ে সচেতন হইতে হইবে। পারিবারিক শিক্ষাই শিক্ষার ভিত্তি, যাহার উপর রচিত হয় জীবনের কাঠামো। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কয়েকটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম ছাড়া আজকাল অধিকাংশ পরিবারেই সন্তানগণের ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। হয় উদাসীন, না হয় অতিমাত্রায় সংসারব্যস্ত আমাদের মতো পিতা-মাতা বা অভিভাবক-

বর্গের নিজেদের চালচলনই যে অনেক ক্ষেত্রে সন্তানদের সম্মুখে মহৎ আদর্শ স্থাপন করে না, একথা রূঢ় শুনাইলেও সত্য। ঠাকুরমা-ঠাকুরদার দলও আজকাল আর পৌত্র বা পৌত্রীকে রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য নিয়োগ করেন না। এই সব কারণে বালক বালিকারা সবপ্রকার উচ্চ সংস্কার, মহৎ আদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধের ধারণায় বঞ্চিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল আরণ্য মনোবৃত্তি লইয়া বাড়িয়া উঠে এবং যখন তাহারা শিক্ষার্থীরূপে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহাদের আগাছা-পূর্ণ মনের অরণ্যকে উদ্যানে পরিণত করা বিদ্যালয়ের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। অসংযম ও বিশৃঙ্খলার আতিশয্য এই মৌলিক অবস্থারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

যুগাচার্যের নির্দেশিত পথে নিজ নিজ সন্তানদের মধ্যে উদার ধর্মীয় সংস্কার, আদর্শবাদ ও সামাজিক মূল্যবোধ ফুটাইয়া তুলিতে যদি পিতামাতারা সচেষ্ট হন, তবেই দেশের কল্যাণ।

শিক্ষার্থীরাও যেন এই উদার, সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত, তরুণ ভারতের প্রতীক বীর সন্ন্যাসীকে আদর্শরূপে বরণ করে এবং নিয়মিতভাবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিয়া উচ্চ মনোবৃত্তিসম্পন্ন, সংযমশীল ও বীর্যবান্ হইয়া উঠিতে সচেষ্ট হয়। ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনে তাহারা এমন কোন বড় সমস্যার সম্মুখীন হইবে না, যাহার সমাধান 'বিবেকানন্দ'রূপ বিশ্বকোষে নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে আরব্ধ ধর্মীয় আদর্শগত বিপ্লবের যুগে, তাহার জটিল সমস্যাবলীর সমাধানে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মনীষিবর্গের চলিয়াছে যে দীর্ঘ শোভাযাত্রা, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকাবাহী যুগাচার্য বিবেকানন্দ তাহার পুরোভাগে থাকিয়া তাঁহাদের মধ্যে করিতেছেন প্রেরণার সঞ্চার, ও তাঁহার সমন্বয়ী মানবধর্মের উজ্জীবন-মন্ত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের মনে করিতেছেন শুভচেতনার উদ্বোধন, যাহার ফলে 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে' ভরা হইবে বিশ্বমৈত্রীর মঙ্গলঘট, রচিত হইবে ভবিষ্যতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এক কথায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে জগৎ-কল্যাণে মূর্ত হইয়াছে ভারত-আত্মার বাণী, নূতন করিয়া শোনা যাইতেছে উদাত্ত ঝঙ্কার :

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথ

স্বামী আপ্তকামানন্দ

হিন্দু ভারতের অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে মন্দিরে। ত্রিচিনাপল্লী বা তিরুচিরপল্লী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর। ইহা বিষ্ণুভক্ত মহাপুরুষগণের আকরসদৃশ, শ্রীরামানুজাচার্য-প্রবর্তিত শ্রী-সম্প্রদায়ের লীলা-ভূমি। কলিকাতা হইতে প্রায় চৌদ্দ শত মাইল দক্ষিণে ত্রিচিনাপল্লী, শহরের প্রান্তভাগে শ্রীরঙ্গম্। শ্রীরঙ্গনাথের আকর্ষণে চলিয়াছি। দেবতা ভক্তকে ভালবাসিয়া বাঁধিয়া রাখেন। তাঁহার কৃপার তুলনা নাই; দুঃখে বিপদে, অনলে অনিলে—নিকটে থাকিয়া ভক্তকে তিনি রক্ষা করেন। ভক্তও পূজার্চনায় তাঁহাকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। ভক্তের ঐকান্তিক সাধনায় পাষাণ-প্রতিমা স্পন্দিত হন, মৃন্ময় মূর্তি চিন্ময় হইয়া উঠেন।

বিশ্ববীজ নারায়ণের লীলাস্থল দেখিবার জন্য চলিয়াছি; অনন্ত-শয্যায় শায়িত নারায়ণকে দর্শন করিব, প্রতি দ্বাদশ বর্ষ অন্তর যাঁহার পূজা বিধান করিবার জন্য রাক্ষসরাজ শ্রীরামৈক-শরণ বিভীষণ ঐ পুণ্য পীঠে আসিয়া থাকেন।

মাদ্রাজ হইতে বাহির হইয়া মনে মনে কত প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলাম। এই অজানা অচেনা দেশে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কেমন করিয়া ঘুরিব? কোথায় যাইব, কোথায় আশ্রয় লইব? ক্রমে ক্রমে তিরুওনি, তিরুপতি, শ্রীকালহস্তী, বিল্লুপুরম্, ত্রিভন্নামালাই, পণ্ডিচেরী, কাডালোর, চিদাম্বরম্, কুম্ভকোনম্, তাঞ্জোর প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিলাম।

তাঞ্জোর হইতে ত্রিচি বাসে মাত্র ষাট মাইল। গ্রামের দরিদ্র পল্লী, কৃষিক্ষেত্র, ত্রিফসলী ধান্য রোপণ, মাইলের পর মাইল নারিকেল কলা ও টেপিওকার চাষ দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ৭॥ টায় ত্রিচি শহরে আসিয়া বাস হইতে নামিলাম। তামিল-ভাষাভাষী অঞ্চলে মন্দির ছাড়া কোন গ্রাম আছে বলিয়াই মনে হয় না। কয়েক দিন ধরিয়া শিব বিষ্ণু কার্তিক গণেশ কত বিগ্রহই না দেখিলাম! প্রত্যেকের মধ্যেই আমার আরাধ্য দেবতার আভাস লক্ষ্য করিয়াছি। দেবালয়ে দেবালয়ে কত ভক্ত দেখিলাম—তাঁহাদের চালচলন ও হাবভাব, তাঁহাদের শারীরিক মানসিক প্রয়াস কেবলমাত্র প্রভুর দর্শনের নিমিত্তই। তাঁহারা আপনাদিগকে তৃণ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র মনে করেন। তাঁহারা সহনশীলতার জীবন্ত প্রতীক। তাঁহাদের দর্শন করিয়া, তাঁহাদের পূতসঙ্গে কাল কাটাইবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। প্রকৃত ভক্তের হৃদয় ভগবানের বাসভূমি। দুঃখ মানুষের প্রকৃত বন্ধু। অন্ধ যেরূপ চক্ষুষ্মানের সাহায্য ব্যতীত স্বীয় পথ চলিতে পারে না, অজানা জায়গায় আমিও সেইরূপ। একটি পথ-প্রদর্শকের চিন্তায় আকুল হইলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন, 'চলুন'।

শ্রীরঙ্গমের দক্ষিণ দিকে কাবেরী নদী ও উত্তর দিকে উহারই শাখা কোল্লিড়ম্ নদী প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দ্বীপাকারে পরিণত করিয়াছে। সহস্র দস্যুর বিনাশ সাধন করিয়াছে বলিয়া ঐ শাখা 'কোল্লিড়ম্' নামে খ্যাত। তামিল ভাষায় উহার অর্থ 'হত্যাস্থল'। শ্রীরঙ্গমের

নৈসর্গিক শোভা পরম রমণীয়। শ্রীরঙ্গম্ শ্রীরঙ্গনাথের আপন ধাম। শ্রীরামচন্দ্র পরম সুহৃদ্ বিভীষণকে এই রঙ্গনাথ-বিগ্রহ উপহার-স্বরূপ দিয়াছিলেন। বিভীষণ তাঁহার পুষ্পক-রথে করিয়া বিগ্রহটিকে স্বীয় দেশ লঙ্কায় লইয়া যাইতেছিলেন। প্রাকৃতিক শোভায় বিমোহিত হইয়া দেবতা এখানেই বসিয়া যান। শ্রীরঙ্গম্ সর্বসৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের লীলানিকেতন।

সহযাত্রী আমায় শ্রীরঙ্গমে না লইয়া শহরের দশ মাইল দূরে ত্রিপুরাইতরাই গ্রামে 'শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবনম্'-এ লইয়া গেলেন। দিবসত্রয় এইখানেই যাপন করিলাম। এখানে কখন কাবেরী-তীরে মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কখন নদীর অগভীর স্বচ্ছ জলে স্নান করিতাম; কখন বা তপোবনের তপোভূমিতে, অরণ্যে, মাঠে-ঘাটে, নদীসৈকতে একান্তে বসিয়া থাকিতাম। একদিন প্রাতঃকালে একজন ব্রহ্মচারী আমায় ত্রিচিনাপল্লীর দর্শনীয় বস্তু দেখাইতে লইয়া চলিলেন। কাবেরীর তীরে তীরে কিছু দূর পর্যন্ত 'বাস' চলিল। এক স্থানে দেখিলাম কাবেরী-পারাপারের সেতু, অন্য এক স্থানে খেয়া ঘাট। বিচিত্র দেশের বিচিত্র খেয়া-নৌকা, প্রকাণ্ড বাঁশের চুপড়ি ত্রিপল দ্বারা আচ্ছাদিত। যাত্রী-গণ সমতা রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট।

বরাবর পীচ-ঢালা রাস্তা, এক পার্শ্বে জলাভূমি, আর এক পার্শ্বে সমতলভূমি, কোথাও কল-কারখানা, কোথাও বাসস্থানের ঘর-বাড়ী। শহরের মধ্যস্থল পর্যন্ত 'বাস' আসে। আমরা তাহার পূর্বেই বাস হইতে অবতরণ করিলাম। 'টেপ্পাকুলম্' নামে এক বৃহৎ সরোবর দর্শন করিলাম—ইহার মধ্যভাগে কারুকার্য-শোভিত মণ্ডপ, ইহারই দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সেণ্ট জোসেফ কলেজ। অনতিদূরে পুরাতন প্রাসাদ, টাউন হল্, চুন্দ্ সাহেবের স্মৃতি-স্তম্ভ। উহারই পশ্চাতে 'স্বর্ণ-রক্' মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। তাহারই সন্নিকটে জেলখানা। প্রধান বাজার অতিক্রম করিয়া 'ত্রিচি রকে' উঠিলাম। পাহাড়ের স্তরে স্তরে মন্দির। প্রথম স্তরে গণেশের মূর্তি, দ্বিতীয় স্তরে বড় হল্। দেওয়ালগুলি বিভিন্ন প্রকারের পৌরাণিক চিত্রকলায় সমুজ্জ্বল। তৃতীয় স্তরে মাঙ্গাভুতেশ্বর দেবতা ও পার্শ্বে মাতৃমূর্তি—মাতুয়াকারেলেমুয়ি। উপরে বিনায়ক বা গণেশজীর মন্দির। উহারই অল্প নীচে দক্ষিণ দিকে পানীয় জলের সরোবর, শহরের জল সরবরাহ—এখান হইতে হইয়া থাকে। গণেশজীর মন্দিরের চারিধার রেলিং দ্বারা ঘেরা।

পর্বতচূড়া হইতে চারিদিক নিরীক্ষণ করিলাম। রাজপথে মানুষের শ্রেণী, মাঠে গরু ও ভেড়ার পাল, মন্দির, মসজিদ্, চার্চ, ক্ষুদ্র বৃহৎ বাড়ী, নদী, নালা, ক্ষেত, খামার, বৃক্ষরাজি, জঙ্গল, খেলার মাঠ, বাগ-বাগিচা কোনটির পৃথক্ অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় নাই। সব একসঙ্গে মিশিয়া যেন পটে আঁকা ছবির মতো দেখা যাইতেছে। দূরে রেল লাইনের উপর ট্রেনগুলিকে দিয়াশলাই-বাক্সের ন্যায় বোধ হইতেছে।

কয়েক মাইল দূরে জম্বুকেশ্বরের মন্দির; বাসে করিয়া আসিলাম। পঞ্চ-প্রাকারে বেষ্টিত মন্দিরে পঞ্চ গোপুরম্ অর্থাৎ তোরণদ্বার। জম্বুবৃক্ষের নীচে মহাদেবের আবাসভূমি বলিয়া ইনি জম্বুকেশ্বর নামে বিখ্যাত। দেবী অখিলেশ্বরী অর্থাৎ শিবানী। অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে গর্ভমন্দির। জলমগ্ন অবস্থায় পাতাল-প্রদেশে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। সর্বদা জলে বাস করেন বলিয়া ইহার আর একটি নাম অপ্পলিঙ্গম্। অর্চকেরা প্রদীপের সাহায্যে

দর্শনের ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় প্রাকারের একদিকে তীর্থ-সরোবর; তৃতীয় ও চতুর্থ প্রাকারের মধ্যেও দুইটি সরোবর। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী প্রভৃতি আরও বহু দেবদেবীর মূর্তি বিদ্যমান।

১৯৫৭ খৃঃ ১লা মে। প্রখর রৌদ্রকিরণে সমস্ত শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, শহরের কোলাহলময় চঞ্চল পরিবেশ পশ্চাতে ফেলিয়া নির্জন শান্ত ধামে চলিযাছি। প্রায় এক মাইল রাস্তা। অগ্নিবৃষ্টির ঝলকায় দৃষ্টিশক্তি ঝাপ্সা হইয়া আসিতেছে, এতটুকু পথ পদব্রজে গমন করাও কষ্টসাধ্য। কাবেরীর উপর দিয়া ৪৯ ফুট লম্বা একটি সেতু—শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপের সহিত সাধারণ ভূমির যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। সেতু পার হইয়া আমরা তীর্থের সীমানায় উপনীত, তীর্থ-দেবতার সুউচ্চ প্রাচীর ও গোপুরম্ আমাদের ডাকিতেছে, আমাদের গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে। প্রথম প্রাকারের ভিতরে বাজার।

একে একে সপ্ত প্রাকার পার হইয়া শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। শ্রীবিষ্ণু শ্রীরঙ্গনাথ অনন্ত-শয্যায় শায়িত। শত শত ভক্ত ভক্তি-অর্ঘ্যহস্তে অপেক্ষমাণ। আমিও করজোড়ে স্থির হইয়া রহিলাম। তালে তালে দামামা কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে, শানাইএর মধুর রাগিণী ভাসিয়া আসিতেছে। পূজারী পূজা শেষ করিয়া আরতি করিতেছেন। গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য স্থানটিকে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে, মন্দির-প্রাঙ্গণ গম্‌গম্ করিতেছে। আরতি থামিতে কুসুম কর্পূর ফল ভগবৎ-উদ্দেশে সমর্পণ করিবার জন্য অর্চকের হস্তে দিলাম। তিনি যথাবিধি নিবেদন করিয়া প্রসাদ দিলেন। ভগবৎ-পাদুকা-চিহ্নিত স্বর্ণমুকুট (শঠকোপ) আমাদের অবনত মস্তকে স্পর্শ করাইতে লাগিলেন। গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবতার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়া শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীকে দর্শন করিলাম। যেমন বিশাল মন্দির, তেমনি বিরাট দেহ অনন্তনাগের শয্যায় শায়িত, নাগগণ তাঁহার মস্তকে ছত্রাকারে ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। জগৎকারণ ব্রহ্মা নাভিকমলে সমাসীন, লক্ষ্মীদেবী পদ-সম্বাহনে রত।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর তিন মূর্তি। প্রথম রূপ—শ্রীদেবী, শ্রীবিষ্ণুর বক্ষঃস্থল-বিলাসিনী; দ্বিতীয় রূপ—ভূদেবী, নারায়ণের দৃষ্টিরূপ বিলাসের ক্ষেত্র; তৃতীয় রূপ—নীলাদেবীই বিগ্রহবতী অণ্ডাল নামে বিখ্যাত, বিষ্ণুকে পতিভাবে পাইয়াছিলেন,—নারায়ণের মাধুর্য ও মহিমাদি কীর্তন করিয়া ও হরিপ্রেম-মদিরাপানে নিরন্তর বিহ্বল হইয়া উন্মত্তা থাকিতেন, ইনিই শ্রীরঙ্গনায়কী বা শ্রীরঙ্গনাথ-মহিষী।

মন্দিরটি ওঁকারাকৃতি। প্রশস্ত গম্বুজ চূড়াসহ স্বর্ণনির্মিত। প্রবাদ—এই গম্বুজ-স্পর্শ বিগ্রহ-স্পর্শের তুল্য। বেশকারীর কৃপায় আমাদের উহা স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। মন্দির, নাটমন্দির, উৎসব-মন্দির, চারিপাশের অলিন্দ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুদ্ধভাবপূর্ণ। শয্যা-গৃহ মণিমাণিক্য-খচিত মহামূল্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ, শয়নের নিমিত্ত সোনার খাট। দাক্ষিণাত্যে প্রতি মন্দিরে দেবতার দুইটি বিগ্রহ। অচল ও সচল। অচল বিগ্রহ মন্দিরাভ্যন্তর হইতে কখন বহির্দেশে গমন করেন না। সচল বিগ্রহই বিশ্রামের জন্য শয্যাগৃহে নীত হন, উৎসবের সময় উৎসব-মন্দিরে বিমানযোগে বাহিত হন। সচল বিগ্রহের আর একটি নাম উৎসব-বিগ্রহ।

দ্বিপ্রহর সমাগত। সাথী বলিলেন 'এখন

প্রভুর বিশ্রামের সময়। মন্দির-দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে।' শ্রীরঙ্গমে কয়েকদিন অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প সাথীকে জ্ঞাপন করিয়া বলিলাম, 'ঐ যে মঠ দেখা যাইতেছে, ঐখানেই পড়িয়া থাকিব, মাধুকরী করিয়া খাইব।' ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সমস্ত ব্যবস্থা পূর্ণ হইল।

* * *

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিরুমঙ্গই আলোয়ারের চেষ্টায় শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের সুবৃহৎ দেবালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা এক দেবাদিষ্ট নির্মাণকার্য। 'আল্' শব্দের অর্থ শাসন, 'ওয়ার' শব্দের অর্থ কর্তা। সর্বকালে সর্বদেশে ইঁহাদের শাসন ও আধিপত্য জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের উপর অক্ষুণ্ণ থাকায় 'শাসনকর্তা' নামটি সর্বতোভাবে সমীচীন। বিংশ বৎসর বয়সে তিরুমঙ্গই তাঁহার চারিজন শিষ্য সমভিব্যাহারে নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীরঙ্গমের পবিত্রভূমিতে পদার্পণ করেন। ভগ্নপ্রায় শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির, গভীর জঙ্গল, অসংস্কৃত পথঘাট, হিংস্র জন্তুর ভয়ে পুজারীর পূজায় অবহেলা, টিকটিকি ও চামচিকার দুর্গন্ধে মন্দিরাভ্যন্তর কলুষিত। বিগ্রহের দুর্দশা-সন্দর্শনে ভক্ত-হৃদয় বিগলিত হয়। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীমন্দির-নির্মাণ-বাসনা প্রবলভাবে চাপিয়া বসিল। তিনি ধনীদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অর্থগৃধ্নু ধনিক-মণ্ডলী তাঁহাকে এক কপর্দকও দান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার চারিজন শিষ্যই যোগবলে বলীয়ান্, অনতিবিলম্বে তাঁহারা দস্যুদের সহায়তায় প্রভূত রত্ন সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন। দেশ-দেশান্তর হইতে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পিগণ আনাইয়া শুভক্ষণে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। শুভযোগে মন্দির আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র শিল্পী অহরহ পরিশ্রম করিয়া প্রথম প্রাকারবেষ্টিত গর্ভমন্দির, মহোচ্চ গোপুরম্-সমন্বিত অন্তঃপুরী বৎসরদ্বয়ে গড়িয়া তুলিল। চারি বৎসর অনবরত পরিশ্রম করিয়া প্রথম বহিঃপুরী, ছয় বৎসরে দ্বিতীয়, আট বৎসরে তৃতীয়, দশ বৎসরে চতুর্থ, দ্বাদশ বৎসরে পঞ্চম ও অষ্টাদশ বৎসরে ষষ্ঠ বহিঃপুরী লক্ষাধিক শিল্পীর প্রাণপাতী সাধনায় নির্মিত হইল। পঞ্চদশ গোপুরম্-সহ সপ্তপ্রাকার-বেষ্টিত পুরীর নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইলে দিকে দিকে বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হইয়া উঠিল। নিকটবর্তী নৃপতিগণ স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সহস্রাধিক দস্যুর দলপতি বলিয়া ভয় ও শ্রীহরির যথার্থ ভক্ত বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন। ইহার পর কত বার কত বিপর্যয়ে, ধর্মবিপ্লবে, মুসলমানদের অত্যাচারে মন্দির স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, আবার গড়িয়া উঠিয়াছে। অধুনা বহু গোপুরম, প্রাকারের কতকাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তীর্থ-সরোবরগুলির চতুঃসীমায় নন্দনকাননগুলি আর শোভাবর্ধন করে না, নিশিদিন অন্নসত্রের মেলা আর শ্রীরঙ্গম্‌দ্বীপকে মুখরিত করিয়া তুলে না। শ্রীরঙ্গমস্থ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির দক্ষিণ ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ঐশ্বর্যপূর্ণ মন্দির। সুন্দর কারুকার্যের তুলনায় ইহা অনেকাংশে নিষ্প্রভ হইলেও, বিশালত্বই ইহার গৌরব। সুবৃহৎ অঙ্গনের মধ্যে অসংখ্য অর্চক-পরিবারের বসবাস। তাঁহাদের সুখ-সুবিধার্থে বাজার-হাট, দোকান-পসার কিছুরই অভাব নাই। শান্তি-বিধানার্থ ইহারই একপার্শ্বে দণ্ডনিবাস (পুলিশ থানা) অবস্থিত। প্রাঙ্গণের বিশালতার পরিমাপ সহজ ব্যাপার নয়। ইহারই একাংশে সহস্রটি স্তম্ভের উপর এক মহামণ্ডপ.

* * *

শ্রীরঙ্গমে তিন দিন তিন রাত্রি মহানন্দে কাটাইলাম। সূর্য পাটে বসিয়াছে, ভক্তটির সহিত আমি গ্রামাঞ্চল ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলাম। গ্রামের মানুষ অতি সহজ ও সরল, তাহারা ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া পায়ের কাছে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের অধরের মধুর হাসি আমার হৃদয়ে স্পর্শ করিল, তাহাদের নীরব সম্ভাষণ জানাইলাম। কাবেরী-তীরে বালুর শয্যায় গ্রাম্য বালকেরা গড়াগড়ি দিয়া খেলা করিতেছে, আমরা কাবেরী-প্রবাহে ডুব দিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। পথে পড়িলেন ভক্ত-শিরোমণি আলোয়ারগণের বিগ্রহ—পোহে, পূদত্ত, পে, তিরুমড়িশি, শঠারি, মধুরকবি, রাজা ফুলশেখর, পেরিয়া, অণ্ডাল, তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি, তিরুপ্পানি, তিরুমঙ্গই—এই দ্বাদশ জন বিষ্ণুভক্ত মহাপুরুষ বিষ্ণুর সাধনায় সিদ্ধ।

সান্ধ্য পূজা ও আরতি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতার শয়ন আরতি পর্যন্ত দেখিলাম, শ্রীবিষ্ণুর নিত্যসেবকদের পদচ্ছায়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইলাম। কিন্তু কই কমলনয়ন নারায়ণ? তবে কি সাধন-ভজন, রাগ-অনুরাগ—সবই বৃথা? শেষশায়ী নারায়ণের জয়ধ্বনি দিয়া সকলেই দর্শনের জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ উজ্জ্বল পীতবস্ত্র-পরিহিত, প্রস্ফুটিত অতসী-পুষ্পের ন্যায় সুশোভিত, দীপ্তিমান্ কিরীট, অঙ্গদ, হার, কণ্ঠিকা ও মণিশ্রেষ্ঠ এবং নূপুর প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া বিমানে উপবিষ্ট। অগ্রে সঙ্গীত-অর্চক সুমধুর আহ্বান-গীতি গাহিতেছেন, অপূর্ব সুরলহরীতে ভগবান ও ভক্তগণ আমোদিত। হৃদয়ের গভীর অনুরাগ ও প্রগাঢ় প্রেম-সুধাসিক্ত এই স্তোত্র-মালা! ভক্তগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ত্রিলোকনাথের শ্রীপাদপদ্মে উপহার দিতেছেন, শ্রীরঙ্গনাথ ভক্তিমান্ বাহক কর্তৃক বাহিত হইয়া আসিতেছেন। ভক্তদের প্রাণে এক সুর, এক ধ্যান, এক চিন্তা! সেই স্বর্গীয় পরিবেশ অবর্ণনীয়। সেই অপরূপ ভাবের সমাবেশ, সেই অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার কে সন্ধান দিবে? শিল্পীর তুলি এ রূপ অঙ্কন করিতে অসমর্থ, কবির কল্পনাও ইহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। এ শুধু প্রাণ দিয়া স্পর্শ বুঝিবার বস্তু, হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার চিত্র। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও বিষ্ণুপাদ-নিঃস্যন্দিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গার পবিত্রতা ও শীতলতা অনুভূত হইতেছে। দেবতার বিগ্রহ পালঙ্কে শায়িত। রাত্রি সাড়ে নয়টায় এই দিব্য দৃশ্য দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

* * *

অদূরে শ্রীরামানুজাচার্যের মঠ। একটি মন্দিরে রামানুজাচার্যের মূর্তি স্থাপিত। প্রস্তরময়ী প্রতিকৃতিটি ভক্ত ও শিষ্যগণের অনুরোধে তাঁহার জীবিতাবস্থায় নির্মিত হইয়াছিল। শুদ্ধ কাবেরীর জলে সুস্নাত করাইয়া তিনি নিজেই এই প্রতিমূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরঙ্গমে বিষ্বক্সেনের মূর্তিও প্রসিদ্ধ। ইনি নারায়ণের দ্বিতীয় মূর্তি, বৈষ্ণবী সেনার অধিনায়ক—নারায়ণের সেনা-নায়ক, সর্ববিঘ্নবিনাশী। বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীগণপতি ও শ্রীশ্রীকার্তিকের পরিবর্তে বিষ্বক্সেনের পূজা করেন। আরও বহু দেব-দেবীর মূর্তিতে শ্রীরঙ্গম্ পূর্ণ।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভক্তবৎসল শ্রীমৎ রামানুজাচার্য শ্রীরঙ্গম্‌কে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন

শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রচারিত অদ্বৈতমতের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ; শ্রীরঙ্গনাথ যেন শ্রীরামানুজাচার্যকেই বৈষ্ণব ধর্মের উপযুক্ত প্রচারক নির্বাচিত করিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ব্যতীত বিষ্ণু-মাহাত্ম্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না, সেইজন্য শেষশায়ী শ্রীরঙ্গনাথ আচার্যপুঙ্গবকে 'উভয়বিভূতিপতি' উপাধিতে ভূষিত করেন। এখন হইতে সন্তপ্তের সন্তাপ-নিবারণ ও ভক্তপরিপালন-ক্ষমতা তাঁহার বিভূতি হইয়া রহিল। শ্রীরামানুজ নারায়ণের সেবাপূজার অভিনব ব্যবস্থা করিলেন। নারায়ণের মন্দিরে 'বৈখানস্' প্রথার পরিবর্তে 'পাঞ্চরাত্র' প্রথার প্রবর্তন তাঁহার জীবনে এক অপূর্ব কীর্তি। কেবল সেবাপূজাই বৈখানস্ প্রথার উদ্দেশ্য। এমনকি নারায়ণের সাঙ্গোপাঙ্গ দেবগণ, আলোয়ার-মণ্ডলী, মঠাধিপতি, আচার্যের পূজা ইহাতে নিষিদ্ধ ; আলোয়ার-গণের স্তোত্র আবৃত্তি, অণ্ডাল-প্রবন্ধ পাঠ, দেব-শরীরে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অঙ্কিত করা অশাস্ত্রীয় বলিয়া পরিগণিত। পাঞ্চরাত্রপ্রথা ইহার বিপরীত ও বিস্তৃত। দেবতা প্রধান হইলেও তাঁহার লীলা-পার্ষদের ও বিশিষ্ট ভক্তজনের পূজা এ-মতে বাঞ্ছনীয়। বৈখানসে যে সমস্ত নিষিদ্ধ ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া বর্জনীয়, পাঞ্চরাত্রে সেইগুলি গ্রহণীয়। পাঞ্চরাত্র প্রথার উদ্দেশ্য তৈলধারাবৎ নারায়ণের সেবন, পূজন ও কীর্তন। শ্রীরামানুজের সংগঠন-শক্তি ছিল অপরিসীম। দৈনন্দিন বিধিব্যবস্থায় সজাগ দৃষ্টি। উৎসব-সময়ে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হইত। আদর-আপ্যায়ন আহারাদির ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইত না। তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রত্যেকের প্রতি প্রীতির সম্বন্ধ দেশবাসী কোনদিন ভুলিতে পারিবে না। শ্রীরঙ্গম্ তাঁহার হৃৎপদ্মাসন। শ্রীরঙ্গনাথই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-দাতা।

নারায়ণের স্বীয় ধাম শ্রীরঙ্গম্। নিত্য পঞ্চবার পূজার্চনায় উপস্থিত হইয়া কয়দিন ধরিয়া মাতিয়া রহিয়াছি। দিবাভাগে শ্রীরঙ্গম্ তীর্থের এক রূপ, রাত্রিতে অন্য রূপ। এক সময়ে প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তি, আর এক সময়ে স্নেহময় প্রফুল্ল মূর্তি। প্রাতঃকালে বিশ্বনিয়ন্তার শ্রীচরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রাণের প্রার্থনা জানাইলাম। বিরাট পুরুষের সত্তায় সত্তাবান্ শ্রীরঙ্গম্।

স্বপ্নের পুরুষোত্তম আজ ধরা পড়িয়াছেন। শিশুর প্রফুল্ল বদনে সেই অমৃতময় হাস্য, নারীর কমনীয় স্মিতবিকশিত মুখেও সেই হাস্য, ফলে ফুলে বৃক্ষরাজিতে, আকাশে বাতাসে সেই একই আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণের ঐকান্তিকী উন্মুখতা ও প্রাণেশ্বরের দুর্নিবার আকর্ষণ—আজ সব মিশিয়া একাকার। নদী আসিয়া সাগরে মিলিয়াছে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের দুইখানি পত্র

শ্রীহরিঃ ৺কাশী
শরণম্ ২.৫.২০

শ্রীমান—,

তোমার ২৮শে এপ্রিলের পত্র পাইযাছি। তোমার শরীর এখনও বেশ সুস্থ হয নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আরও কিছুদিন ওখানে থাকিলে যদি ভাল হয তো থাকিবে। শরীর সুস্থ থাকার দরকার, নহিলে কোন কাজই হইবার নহে। তোমার প্রশ্নের আর কি দিব উত্তর? দীক্ষা তো গ্রহণ করিতেই হয। আমি কিন্তু দীক্ষাদি কখনও দিই নাই এবং দিবও না। সুতরাং এ সম্বন্ধে তোমাকে অন্যত্র চেষ্টা পাইতে হইবে। আমি যেমন বুঝি—যথাসাধ্য উপদেশাদি দিয়া থাকি, এই মাত্র। কর্ণে মন্ত্র দেওয়া প্রভৃতি কার্য আমার দ্বারা হইবে না, হয়ও নাই। সোজা কথা সোজা ভাবে বলাই ভাল। ভগবান অন্তর্যামী। শ্রদ্ধা থাকিলে তিনি তোমার ইচ্ছামত সকল বিধান করিবেন। আমি ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তিনি তোমার আন্তরিক দীক্ষাগ্রহণ-কামনা পূর্ণ করুন—প্রার্থনা। আমার শরীর পূর্বের ন্যায়ই চলিয়াছে। অত্যন্ত দুর্বল ও গরমের জন্যও কষ্ট তো আছেই।…অন্যান্য সংবাদ কুশল। আমার শুভেচ্ছা ভালবাসা জানিবে। ইতি—

* * * *

১০.৫.২০

তোমার ৮.৫.২০ তারিখের পত্র পাইলাম। তুমি ক্রমে বেশ ভাল বোধ করিতেছ জানিয়া প্রীতিলাভ করিতেছি। যখন ভাল বুঝিবে, তখনই এখানে আসিবে। আমরা তোমাকে দেখিলে সুখী হইব। দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে তোমার মনের চিন্তা দূর হইয়াছে জানিযা আনন্দ হইল। তুমি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। দীক্ষাগ্রহণ ধর্মজীবন-লাভের সহায়ক নিশ্চিত। তবে যিনি জীবন ধর্মলাভের জন্য উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, অন্তর্যামী স্বয়ংই তাঁহাকে সকল প্রকার সুযোগ করিয়া দেন। দীক্ষার জন্য তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। আসল কথা হইতেছে, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অন্তরের ব্যাকুলতা এবং যাহাতে লাভ হয়, তাহা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত থাকা এবং নিজেকে নিযুক্ত করা। তাহা হইলেই কার্যসিদ্ধি আপনিই হইয়া যায়। গুরুরূপে তিনিই সকল দীক্ষা শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা আমি দীক্ষাগ্রহণের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতেছি না। অনেকের ইহাতে উপকার হয় এবং অধিকাংশের ইহা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু অন্তরের শ্রদ্ধাই বিশেষ কার্যকরী, ইহা বলাই আমার অভিপ্রায়।

গীতাপাঠ করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা। গীতা ভবেদ্বেষিণী। গীতা ভগবানের হৃদয়। গীতার তুলনা নাই। যাহারা বোঝে না, তাহারাই শঙ্করের দোষ দেয়। শঙ্কর জ্ঞানের অবতার; তাঁহার দোষদর্শনে মহা অপরাধ। 'অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্য-শেষতঃ'—এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত। গীতার অনুশীলন ও সেবা করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়। সকল

বিষয় সম্যক্‌ অবধারণের ক্ষমতা জন্মে। পরা শান্তি লাভ হয়। তোমার বুদ্ধি পরিষ্কার হইতেছে বুঝিতে পারিতেছ, ইহাতে আমি যার-পর-নাই প্রীতি অনুভব করিতেছি। তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ কর, তিনি তোমার পক্ষে যাহা ভাল তাহাই করাইবেন। অধীর হইও না। তিনিই পথ দেখাইয়া দিবেন। যেখানেই থাক, তাঁহাকে ধরিয়া থাকিলে কোন ভয় নাই। খুঁটি ধরিয়া ঘুরিলে পড়িতে হয় না। সম্পূর্ণরূপে যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তাহার কোন কর্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না। 'দেবর্ষিভূতাত্মনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্‌! সর্বাত্মনায়ং শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যম্‌'—ইহা ভাগবতোক্তি। কোন চিন্তা নাই, যেমন চলিতেছ, চলিয়া যাও। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব তাঁতে অর্পণ কর। নিজে কিছু কল্পনা করিও না। দেখিবে, তিনিই তোমার জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। লাটু মহারাজের ভাণ্ডারা প্রভৃতি হইয়া গেল।……

তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

স্বামী সারদানন্দ

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সান্যাল

ঠাকুরের মহাভক্ত, হে সাধক! লীলা-ভাষ্যকার,
তোমার কৃপায় মোরা হেরি আজি অতীতের ছবি।
অবতার জীবনের তুমি কিগো শুধু গ্রন্থকার?
বিশুদ্ধ রসের স্রষ্টা, তুমি কবি, শুধু মাত্র কবি?
ভাষার বাহ্যিক ছটা নয় এতো প্রাণহীন লেখা,
কঠোর সাধনা মাঝে এ যেন গো স্বরূপ দর্শন,
শোনা নয়, গল্প নয়, দিব্য চক্ষে সব হ'ল দেখা;
হৃদয়ের ধ্বনি শুনি সাক্ষ্য তার—করিলে বর্ণন।

ভিতরে বাহিরে যুদ্ধ—কত জয়, কত না প্রার্থনা,
সংগ্রামের পরে শান্তি—জগতেরে দিলে তা বিতরি
অন্ধকারে জাগিতেছে শাশ্বতের অভয় দ্যোতনা,
সবার কল্যাণ তরে দেহাতীত আসে দেহ ধরি।
কত ভক্ত সাধকের দিবানিশি হ'ল আনা-গোনা—
অপূর্ব দর্শন কত—সমুজ্জ্বল সেদিনের স্মৃতি,
সকল মতের তত্ত্ব আধ্যাত্মিক ভাবে হ'ল বোনা
মনের বসন এক—সহিষ্ণুতা সেবা-ত্যাগ-প্রীতি।
প্রতি গৃহে মনে মনে এনে দিলে তাহার স্পন্দন,
তোমার হৃদয়ে পড়ে মহাসূর্য মহিমার আলো—
চন্দ্রের মতন তুমি—তারে করি নিতুই রচন,
বলিতেছ কানে কানে 'বাসো ভালো, তাঁরে বাসো ভালো'।

সমালোচনা

The Fundamentals of Hinduism—(A philosophical Study) by Sri Satis Chandra Chatterjee M.A., Ph. D.—First published by author in 1950. Reprinted in 1960. To be had of Das Gupta & Co. (P) Ltd , 54/3 College St. Calcutta, pp. 180 + x, Price Rs. 3·50.

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর উদ্দেশে ভক্তিভরে উৎসর্গীকৃত 'হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব' বিষয়ক সুন্দর সুলিখিত পুস্তকখানি কয়েক বৎসর পূর্বেই রচিত হইয়া দেশে বিদেশে সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল, বর্তমানে উহা পুনর্মুদ্রিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

১২টি অধ্যায়ে হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা, ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, জগৎ-তত্ত্ব, জন্মান্তর, কর্মবাদ, বন্ধন ও মুক্তি, মুক্তির স্বাভাবিক গতি—বর্ণাশ্রম ধর্ম; যোগচতুষ্টয়—রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ সরল ভাষায় যথাযথভাবে আলোচিত হইয়াছে।

যাঁহারা একখানি পুস্তকের মধ্যে 'হিন্দুধর্মে'র মূল কথাগুলি জানিতে চান, পুস্তকখানি তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য। কোন একটি পুস্তকে নিবদ্ধ নয় এবং ব্যক্তিবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভুল ধারণা শুধু অহিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত নয়, হিন্দুগণও জানেন না—তাঁহাদের ধর্মের মহিমময় স্বরূপ; এ পুস্তকখানি উভয়েরই অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞতা দূরীকরণে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি, এবং ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করি।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা (প্রথম ভাগ)—প্রকাশক: রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত, ২৪ পরগনা। পৃ: ২০৪; মূল্য—আড়াই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত, তাঁরা জানেন যে এই মহামানবকে কেন্দ্র ক'রে একদল সাধকপুরুষ এই দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন—যাঁরা যে কোন দেশে, যে কোন যুগে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারতেন। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ এই সাধকপুরুষদের অন্যতম। তাঁর অমূল্য জীবন ও অমৃত বাণী অধ্যাত্মপিপাসুদের চির-আদরের সম্পদ।

আলোচ্য স্মৃতিকথার সঙ্কলনটিতে মহাপুরুষ মহারাজের আশ্রিত কয়েকজন ভক্ত তাঁদের স্মৃতিসম্পদ সাজিয়ে দিয়েছেন। সূচনায় স্বামী গম্ভীরানন্দ-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনীটি এই গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ। সহজ সরল ভাষায় যে ঈশ্বরতন্ময়তা এই স্মৃতিকথায় ফুটে উঠেছে, তা পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে শান্তি সঞ্চার করবে। পুস্তকে একটি সূচীপত্রের অভাব অনুভূত হয়।

—**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

বিজ্ঞানস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীতারকদাস মল্লিক প্রণীত। ১১১৪এ, বেণীনন্দন স্ট্রীট, কলিকাতা-২৫ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৫৯ + ৮৶০; মূল্য চার টাকা।

শিরোনামায় শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ও প্রচ্ছদ-পটে শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিবেদিত-পুস্তকের প্রতিকৃতি থাকায়, বইখানি দেখে ভক্তমণ্ডলী স্বভাবতই আকৃষ্ট হবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন যে সনাতন ধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়েরই পরিপূরক—এই ভাবটুকু ছাড়া, এই বই থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাবার আশা করলে নিরাশ হ'তে হবে।

আইনস্টাইনকেও লেথক বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের সমগোষ্ঠীতে ফেলেছেন। বইটিতে অজস্র বানান ভুল, কতকগুলি সংখ্যাগত ভুলও আছে, শেষ দুই পৃষ্ঠায় ভ্রম-সংশোধনের তালিকায় সবগুলি উল্লিখিত হয়নি। আবার অশুদ্ধ (?) 'নির্দিষ্ট' স্থলে শুদ্ধ 'নিদৃষ্ট' এবং অশুদ্ধ 'অব্যাং মানস্ গোচরম্' স্থলে 'আবাং' কি ক'রে শুদ্ধ হ'ল তা বোঝা গেল না।

তবে লেখকের চিন্তাধারা বহুমুখী; জীব জগৎ, চিৎ জড়, শক্তিসঞ্চার, পরমাণুবাদ, আপেক্ষিকতাবাদ, পুনর্জন্ম ও ক্রমবিকাশবাদ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদকে তিনি স্বমতে আনবার জন্য বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনা করেছেন; পাঠককে তা প্রচুর চিন্তার খোরাক দেবে।

বর্তমান বিজ্ঞানের সব তথ্য সঠিক না জানা থাকায় (যেমন বস্তুর মূল উপাদান এখন ৩টির স্থলে ১৬টি) এবং কোন কোন স্থলে দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিভাষার যথাযথ প্রয়োগের অভাবে রচনায় যথেষ্ট প্রমাদ উপস্থিত হয়েছে।

এইরূপ প্রবন্ধ প্রধানতঃ যাঁদের (অর্থাৎ বিজ্ঞানসেবীদের) উদ্দেশ্যে লিখিত; তাঁরা এই পুস্তকের প্রতি আকৃষ্ট হবেন কিনা সন্দেহ। মনে হয় মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে ছোট ছোট প্রবন্ধাকারে বিজ্ঞানের কোন মুখপত্রে প্রকাশিত হ'লে লেখকের উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। —**শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

ভারত-কোষ (নমুনা সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা)—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হইতেছে। আকার ডবল ক্রাউন ¼, আনুমানিক মোট ৩২০০ পৃষ্ঠা, প্রতি পৃষ্ঠায় দুই কলম, টাইপ ১০। আনুমানিক মূল্য চল্লিশ টাকা ধার্য হইয়াছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে অন্যূন দুই বৎসর সময় লাগিবে।

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই প্রামাণিক কোষ-গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন। অ-কারাদি ক্রমে মুদ্রিত হইয়া ইহা চারিখণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

ভারত-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান বিষয় এবং ভারতের বাহিরের ভারত-সংক্রান্ত বহু বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য আলোচনা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবে। বঙ্গ ও বঙ্গ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি স্বভাবতই প্রাধান্য লাভ করিবে।

আলোচ্য মূল বিষয়গুলি নির্বাচন করিবেন এক একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি এবং তাঁহাদের নির্দেশে লিখিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ যথারীতি সম্পাদিত হইয়া কোষগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইবে। সম্পাদক-সমিতির সভাপতি: শ্রীসুশীলকুমার দে; সদস্যবৃন্দ: শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীঅমল হোম, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই বিরাট প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

আলোচ্য নমুনা সংখ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তব্য আছে: ইহাতে প্রকাশিত সর্বপ্রথম প্রবন্ধ 'চৈতন্যদেব' আশানুরূপ সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। 'সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ণ নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র'—ইহা ঠিক নহে। '...নিমাই কাটোয়ায় **পলাইয়া** গিয়া কেশব ভারতী কর্তৃক সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন।' এরূপ গ্রন্থে এ-জাতীয় শব্দপ্রয়োগ বর্জনীয়।

বানান মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে, সেদিকে সম্পাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'পুঁথি' শব্দের চন্দ্রবিন্দু লুপ্ত করিলে চলিবে না। 'কখনও' বানানের পর 'এখনো' চলিবে কিনা, তাহাও বিবেচ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ: গত ৯ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের ৯৯তম শুভ জন্মোৎসব সারাদিন-ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। ষোড়শোপচারে পূজা, কঠোপনিষদ্-ব্যাখ্যা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কালীকীর্তন, ভজনগান, ভোগরাগ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামীজীর মন্দির ও ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ভোগারতির পর প্রায় ৭,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বহু ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান।

অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ বিভিন্ন দিক হইতে স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী তেজসানন্দ বলেন, বর্তমান সঙ্কটকালে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে হইবে। সারাদিন সহস্র সহস্র ভক্তসমাগমে মঠ-প্রাঙ্গণ আনন্দ-মুখরিত হইয়াছিল।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটী: যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্যস্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা হোম ও কালীকীর্তন হইয়াছিল। প্রায় ১২,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী বোধাত্মানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর 'কল্পতরু ও কাশীপুর উদ্যান-বাটী' কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ (সভাপতি), স্বামী সুন্দরানন্দ এবং স্বামী মিত্রানন্দ। রাত্রে বিশিষ্ট গায়ক-গণের ভজন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দেয়।

২রা জানুআরি অপরাহ্নে স্বামী মহানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী তেজসানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবন এবং স্বামী সুন্দরানন্দ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বধর্ম-সমন্বয় বিষয়ে ভাষণ দেন। সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য ও আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলেন। রাত্রে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী 'রাবণ-বধ' পালা কথকতা করেন।

৩রা জানুআরি স্বামী নিরাময়ানন্দের উপনিষদ্-ব্যাখ্যার পর পণ্ডিত শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী 'মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। রাত্রে সালিখা বীণাপাণি সমিতি-কর্তৃক মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরব' যাত্রাভিনয় হয়।

উৎসবের কয়েক দিন উদ্যানবাটীতে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

কাঁকুড়গাছি: যোগোদ্যানেও প্রতি বৎসরের ন্যায় 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে সারাদিন-ব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। এতদুপলক্ষে পূজা, হোম, ভোগরাগ, কীর্তন ও ভজন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

উদ্বোধন-ভবনে গত ২৩শে ডিসেম্বর স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মোৎসব পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় মহা উৎসাহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, সারদানন্দ-জীবনীপাঠ, ভজন এবং প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। পূজ্যপাদ মহারাজের প্রতিকৃতি পত্রপুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হয়। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভক্তসমাগমে উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখর ছিল। প্রায় ৬০০ নরনারী বসিয়া এবং বহু ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

কার্যবিবরণী

কোয়েম্বাতুর : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৫৯-৬০ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত ইহার কর্মধারা :—

বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় : বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছবি আঁকা, বাগান করা, গান বাজনা প্রভৃতিও শেখানো হয়। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ে ১৮২ জন ছাত্র ছিল।

বেসিক ট্রেনিং স্কুল: প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে যথাক্রমে ৩৪ ও ৩৯ ছাত্র ছিল। '৫৯ খৃঃ ৩৭ জন ট্রেনিং পরীক্ষা দেয়, সকলেই উত্তীর্ণ হয়।

সিনিয়র বেসিক স্কুল : 'কলা-নিলয়ম্' নামে পরিচিত এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৫৬৩ (ছাত্রী ২২২)। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষার সুযোগ দিবার জন্য এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।

বি. টি. কলেজ : ৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪২ জন উত্তীর্ণ হয়। জুলাই মাসের শেষ দশ দিন শিক্ষাশিবির পরিচালনা করা হইয়াছিল। পার্শ্ববর্তী উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে পাঁচ সপ্তাহ যাবৎ শিক্ষাদান-অভ্যাসের ব্যবস্থা করা হয়।

সমাজসেবা : S. E. O. T. C.তে এ যাবৎ পাঁচ বারে ১৬৮ জন শিক্ষা লাভ করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৩৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাদ্রাজের ১৮, অন্ধ্রের ১৩, মহীশূরের ২ এবং বোম্বাইএর ৫ জন।

শিক্ষাবিস্তার-প্রচেষ্টা : সভাসমিতি, পাঠ-চক্র, গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রদর্শনী, পত্রিকা-প্রকাশন, কারখানা, শ্রুতিচাক্ষুষী শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা করা হয়। কোয়েম্বাতুর, সালেম ও নীলগিরি জেলার ১৭৪টি বিদ্যালয়ের ৮৬৬ জন শিক্ষক এই কার্যে সহযোগিতা করেন।

গবেষণা : '৫৮ খৃঃ কোয়েম্বাতুর জেলার হাইস্কুলের ছাত্রদের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা নির্ধারণের জন্য এই বিভাগ কার্য করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা-বিষয়ক গবেষণা করা হইয়াছে।

শারীর শিক্ষা কলেজ : আলোচ্য বর্ষে ৮৫ জন ছাত্রের মধ্যে ১৭ জন উচ্চতর শারীরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ৮৩ জন।

গ্রামীণ শিক্ষা : ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, কৃষি-বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গ্রামের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মহা-বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৭৪, কৃষিবিদ্যালয়ের ২৯ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ১৫২।

গ্রামে চিকিৎসা : এক্স্-রে-সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসালয় আছে। ১৪,২৮৭ রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে পুরুষ ৮,৩০৮, নারী ১,৫৬৯ এবং শিশু ৪,৪১০।

গ্রন্থাগার : বিভিন্ন বিষয়ের ২২,৩০০ বই রাখা হইয়াছে। ১৭,৩১৭ বই ছাত্রদিগকে এবং ৫,৮৮২ বই শিক্ষক ও কর্মীদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ১,৮০৫ বই সংযোজিত হইয়াছে।

কনখল : সেবাশ্রমটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে হরিদ্বারের নিকটে অবস্থিত। ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। ১৯০১ খৃঃ স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ইহার ৬টি ওআর্ডে ৫০টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১,৫৮৪ রোগী ভরতি হয় এবং ১,৪২৫ রোগী আরোগ্য-লাভ করে।

বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১০০,৪৪৫ (নূতন ২৪,৭৪৭); অস্ত্র-চিকিৎসা ৩৩৬, দন্ত-চিকিৎসা ৬২২, চক্ষুকর্ণাদি চিকিৎসা ২,০৪৮, ইলেক্‌ট্রোথেরাপি চিকিৎসা ৭৭৫। লেবরেটরিতে ৪,৯৭৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা ৪,৫২৬; পাঠাগারে ১৮টি পত্র-পত্রিকা আসে। গড়ে দৈনিক ২৯১ জনকে গুঁড়া দুধ দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

মাঙ্গালোর : ১৯৪৭ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত মঠ কেন্দ্রটি ১৯৫১ খৃঃ মঙ্গলাদেবী রোডে অবস্থিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এই আশ্রমের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে দৈনিক নিয়মিত পূজা ভজন ও সাময়িক উৎসবাদি ছাড়া প্রতি সপ্তাহে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে 'আত্মবোধ', 'জীবন্মুক্তিবিবেক' প্রভৃতি বেদান্ত-গ্রন্থের আলোচনা হইয়াছিল। আশ্রম-গ্রন্থাগারের পাঠকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আশ্রম কয়েকটি ধর্ম পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে, তন্মধ্যে কন্নড় ভাষায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, মানসোল্লাস, শরণাগতি-গদ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বিষ্ণু-সহস্রনাম এবং ইংরেজীতে বিষ্ণু-তত্ত্ব-বিনির্ণয় (মূল সংস্কৃত সহ অনুবাদ) উল্লেখযোগ্য।

রেঙ্গুন : রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি সমগ্র ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত। ১৯৫৯ খৃঃ কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত সোসাইটি-পরিচালিত বিভিন্ন কর্মের বিস্তার ও তাহার পরিচিতি :

৭টি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ২৬,৩৫৪ গ্রন্থ-সমন্বিত ফ্রি লাইব্রেরি, আলোচ্য বর্ষে ৩০,২৭০ (পূর্ববর্ষে ৩০,৭৫৮) পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল। পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, গুজরাটী, তামিল, তেলুগু ভাষায় ২৭ দৈনিক এবং ১২৫ সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা :

বর্ষ	১৯৫৫	'৫৬	'৫৭	'৫৮	'৫৯
পাঠক	১২৫	১৭৫	২০০	২২৫	৩২৫

গীতা, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও মহাপুরুষ-বাণী অবলম্বনে ৯৬টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, শ্রোতৃসংখ্যা গড়ে ২০। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনাও উল্লেখযোগ্য। ১৫টি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হইয়াছিল। সপ্তাহে দুই দিন বর্মী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণের জন্মদিন-গুলি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র

প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অশেষানন্দ প্রথম বক্তৃতাটি প্রদান করেন; অন্যগুলি দেন কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ অথবা তাঁহার সহায়ক স্বামী বুধানন্দ।

সেপ্টেম্বর : অমরত্বের সন্ধানে মানুষ; হিন্দুধর্মের সার; মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা।

অক্টোবর : বেদান্তে যুক্তির স্থান; অসৎ জগতে কেন সৎ হইতে হইবে? বাহিরে কর্মকুশলতা, অন্তরে শান্তি; হিন্দুর উদারতার যুক্তিসহ ব্যাখ্যা; অগ্রগতি—ঐহিক ও পারমার্থিক।

নভেম্বর : মানুষ চায় ঈশ্বর; অতীন্দ্রিয় জ্ঞান; পুরুষকার ও ভগবৎকৃপা।

এতদ্‌ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৮-৩০ মিঃ ধ্যান ও রাজযোগের ক্লাস এবং শুক্রবার ঐ সময় গীতা ব্যাখ্যা হয়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শ্রীসতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১লা ডিসেম্বর ৬০ বৎসর বয়সে সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করেন। তিনি আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া আশ্রমের উন্নয়ন-মূলক কার্যে আজীবন সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীভগবান তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উৎসব

কলিকাতা : ১লা জানুআরি শ্রীহরেন্দ্রকুমার নাগ মহাশয়ের কলিকাতা বাসভবনে ৫১ তম 'কল্পতরু' উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগ সমস্ত দিনব্যাপী নামগান ও কীর্তনাদি ও 'কল্পতরু' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উৎসবে বহু ভক্ত ও সাধু উপস্থিত ছিলেন।

বারাসত : গত ১৪ই ডিসেম্বর স্বামী শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজ) ১০৫ তম জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থান বারাসত শহরস্থিত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে পূজা এবং চণ্ডী ও 'শিবমহিম্নঃ-স্তোত্র'পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে সমবেত ভক্ত নরনারীগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক শ্রীরামনাম-সংকীর্তন গীত হইবার পর স্বামী সংশুদ্ধানন্দ শিবানন্দ-জীবনী এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শিবানন্দ-বাণী আলোচনা করেন।

আমেদাবাদ : স্থানীয় অখণ্ডানন্দ-হলে গত ৩রা ডিসেম্বর বিবেকানন্দ পাঠচক্রের দশম বার্ষিক অধিবেশন গুজরাত রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী বলেন, স্বামীজী ভারতের নৈতিক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক

জাগরণের পথ-প্রদর্শক। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে স্বামীজীর উদার সার্বভৌম ভাব ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

কার্যবিবরণী

লক্ষ্মীপুর ২৪ পরগনা: স্বামীজী সেবাসংঘের ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯ খৃঃ মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়াছি। গ্রামের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পূর্ববঙ্গ হইতে আগত কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রের প্রচেষ্টায় গত ১৯৫২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র সংঘটি নানা সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম হইতেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, লোকশিক্ষা-পরিষদ-কর্তৃক অনুপ্রাণিত। উল্লিখিত দুই বছরের কার্যবিবরণী নিম্নরূপ:

বিভাগ	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	
	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯
গ্রামের দুঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থা (৫ম—১০ম শ্রেণী)	২৭	৩৪
দুঃস্থ ছাত্রদের ছাত্রাবাস	২১	২৮
শিশু-বিভাগ (৬-১৪ বছর পর্যন্ত)	৩৪	৪৪
বয়স্কশিক্ষা-বিভাগ	৩১	৪০
সারদা পাঠচক্র (সভ্য-সংখ্যা)	২৭৬	৩০০
দুগ্ধবিতরণ (প্রতিদিন)		৩০০

কলিকাতা: দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডারের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আলোচ্য বর্ষের কার্যধারা পরিস্ফুট। দুঃস্থদিগকে সাহায্য, দুগ্ধবিতরণ, গ্রন্থাগার-পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। চিকিৎসা-বিভাগে লক্ষাধিক রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে। কর্মকুশলতার জন্য প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে, ইহাতে আমরা আনন্দিত।

নবদ্বীপ: শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির ১৩৬২-৬৫ বর্ষের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। সমিতি কর্তৃক নির্মিত মন্দিরে প্রাত্যহিক পূজার্চনা, ভোগ ও আরাত্রিক ব্যতীত সাময়িক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস পরিচালিত হইতেছে।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

গত ১লা জানুআরি বোম্বাই ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে ৮ দিন ব্যাপী ৩৬তম নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু। শ্রীনেহরু বলেন, রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ তাঁহার যে গভীর বেদনাবোধ তাহার মর্ম উপলব্ধি করিতে হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহা-রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবন বাংলা সাহিত্যের সহিত মারাঠী সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ কবির বাল্যকাল হইতে শুরু করিয়া তাঁহার সমগ্র জীবনালেখ্য বিবৃত করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ, সম্মেলনের উদ্যোক্তা শ্রীসঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। সম্মেলনে বহু বিদেশী প্রতিনিধির সমাবেশ হইয়াছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

গত ৩রা জানুআরি রুড়কীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন: প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্তে আনিবার জন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়া মানুষ যে ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে, উহা এত বিশাল যে, উহার অপব্যবহারে আবিষ্কারকের দলও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে দুই সহস্রাধিক প্রতিনিধি ও বিদেশ হইতে আগত কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এই অধিবেশনে যোগদান করেন। সাত দিন ব্যাপী সম্মেলনে বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ে সভাপতিত্ব করেন, মূল সভাপতি ছিলেন ডক্টর নীলরতন ধর।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী সম্মেলন

গান্ধীগ্রাম (মাদ্রাজ): এ বৎসর আন্তর্জাতিক যুদ্ধপ্রতিরোধী সম্মেলনের দশম ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন (Tenth Triennial of War Resisters' International) অনুষ্ঠিত হয় ভারতে। এশিয়াতে এরূপ সম্মেলন এই প্রথম। গত ২১শে হইতে ২৭শে ডিসেম্বর মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরাই জেলায় গান্ধীগ্রামে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনে প্রায় ৩০টি দেশের প্রতিনিধি সমবেত হন। ভারতের সর্বোদয়-কর্মিগণ এবং ইওরোপ ও আমেরিকার যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিগণ অহিংস উপায়ে বিশ্বশান্তি স্থাপনের একটি কর্মপন্থা উদ্‌ভাবনের জন্য আলোচনা করেন।

এ বৎসর সম্মেলনে আন্তর্জাতিক শান্তিসেনা-গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সেনাবাহিনী সমস্ত সরকার এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে স্বাধীন থাকিবে। আলোচনার সার সিদ্ধান্তসমূহকে একটি বিবৃতির আকারে উত্থাপন করেন বৃটেনের প্রধান শান্তিবাদী নেতা স্টুয়ার্ট মরিস। আন্তর্জাতিক সংস্থার সভাপতি হ্যারল্ড বিং এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন দেশের অগ্রগণ্য চিন্তানায়কগণ বিশ্বশান্তিসেনা-সংক্রান্ত আলোচনা করেন। সম্মেলনের আবেদন অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশের ১০।১২ জন প্রতিনিধি প্রস্তাবিত সেনাবাহিনীর সৈনিকরূপে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৫ই ফাল্গুন (১৭.২.৬১) শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজাপাঠ, উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার (১৯.২.৬১) এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।

ঊর্ধ্বমূল

> ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
> অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্ অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥
>
> ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
> তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥
>
> —শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৫ ৩,৪

সাধারণ বৃক্ষের মূল নিম্নদিকে, শাখাপ্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তারিত—কিন্তু সংসাররূপ বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বদিকে, মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই ইহার মূল। অহঙ্কার প্রভৃতি ইহার শাখাসমূহ নিম্নদিকে এবং কর্মকাণ্ডরূপ বেদসমুদয় ইহার পত্র। যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে 'অশ্বত্থ' অর্থাৎ আগামীকাল পর্যন্ত থাকিবে কিনা বলিয়া মনে করেন, তিনিই বেদবিৎ। এই সংসার-বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়ের দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়গুলি নূতন পল্লবের ন্যায় সেই শাখাসমূহ হইতে ঊর্ধ্ব ও অধোভাগে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সংসাররূপ অশ্বত্থের অবান্তর মূলসমূহ ধর্মাধর্মরূপ কর্মের কারণ। অধোদিকে এইগুলি মনুষ্যলোকে প্রসৃত হইতেছে।

ইহলোক এই অশ্বত্থ বৃক্ষের রূপ, ইহার আদি অন্ত—এমন কি মধ্যও উপলব্ধ হয় না, স্বপ্ন ও মরীচিকার ন্যায় ইহা দৃষ্ট হয় ও লুপ্ত হয়। এই সংসারের আরম্ভ নাই, ইহা অনাদি; ইহার অন্ত নাই, ইহা জ্ঞাননাশ্য, অন্য প্রকারে নাশ্য নহে; ইহার স্থিতিও জানা যায় না, কারণ ইহা যথার্থ নয়, প্রতীতি মাত্র; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, রজ্জুজ্ঞান হইলেই সর্প আর অনুভূত হয় না, তেমনি আত্মজ্ঞান হইলে আর পৃথক্ জগৎ অনুভূত হয় না।

দৃঢ়মূল অনিত্য সংসার-বৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ শাণিত অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া সেই নিত্য ব্রহ্মপদের অন্বেষণ করা উচিত। যে অনুভূতি হইলে আর সংসার অনুভূত হয় না, তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে। 'যেখান হইতে এই অনাদি সংসার-প্রবাহ নিঃসৃত হইয়াছে, আমি সেই আদি ব্রহ্মপুরুষের শরণাপন্ন হইতেছি'—এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে।

কথাপ্রসঙ্গে

অচিনে গাছ

১৮৮৩ খৃঃ ২১শে জুলাই কলিকাতার রাজপথে গাড়ীতে করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ চলিয়াছেন ভক্তগৃহে ভক্তের ব্যাকুল আহ্বানের আকর্ষণে। পথিমধ্যে 'মণি' ('কথামৃত'-লেখক মাস্টার মশাই) উঠিলেন গাড়ীতে। ভক্তি ও বিশ্বাসের কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার সঙ্গে কি আর কারু মেলে? কোনো পণ্ডিত, কি সাধুর সঙ্গে?'

মণি কি উত্তর দিবেন? বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া স্বত-উৎসারিত স্তবের মতো বাহির হইল দুটি কথা: আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন; যেমন আইন অনুসারে সব সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে পার্শ্ববর্তী রামলাল প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন: ওরে বলে কি রে?

বালকস্বভাব ঠাকুরের হাস্য আর থামে না। এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইল না।

কিছু দিন পরে সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণেশ্বরের ঘরে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন, বলিতেছেন: সেদিন কলকাতা গেলাম—গাড়ীতে যেতে যেতে দেখলাম, জীব সব নিম্নদৃষ্টি—সবাইয়ের পেটের চিন্তা!… তবে দু-একটি দেখলাম ঊর্ধ্বদৃষ্টি—ঈশ্বরের দিকে মন আছে।…

ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া অবতারের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন: যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্য! শেষে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন:

আচ্ছা আমার সঙ্গে আর কারু মেলে?

মণি: আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ: কোন পরমহংসের সঙ্গে?

মণি: আজ্ঞে না! আপনার তুলনা নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে): অচিনে গাছ শুনেছ?

মণি: আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ: সে এক রকম গাছ আছে, তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।

মণি: আজ্ঞে, আপনাকেও চিনবার যো নেই!

*　　*　　*

'মণি'র সহিত নিভৃত গুহ্যকথায় শ্রীরামকৃষ্ণ আভাসে ইঙ্গিতে কি আত্মপরিচয় দিতেছেন? তিনি কি সূর্যোদয়ের সূর্য? রাত্রির রুদ্ধ অন্ধকারের শেষে—প্রভাতের প্রথম লগ্নে বিস্ফারিত নেত্রে অনায়াসে যাহাকে দেখিতে পারা যায়?—যাহাকে দেখিলে নয়ন-মনের তৃপ্তি হয়? মধ্যাহ্নের রৌদ্রদীপ্তিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, চোখ চাহিয়া সে সূর্য দেখা যায় না—চারিদিকের তীব্র বিচ্ছুরিত আলোকেই তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। কিন্তু সূর্যোদয়ের সূর্য?—ঐশ্বর্য সংবৃত, মাধুর্যের প্রতিমূর্তি; আশায় সমুজ্জ্বল, আশীর্বাদে টলমল। 'ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়। তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে ভক্তের কাছে আসেন।' শেষের কথা দুইটি 'কথামৃতে'র উদ্ধৃতি, শ্রীরামকৃষ্ণের স্বীকৃতি!

অচিনে গাছ?

না, দেখিবার কথা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই জিজ্ঞাসা করিলেন 'অচিনে গাছ শুনেছ?'

কে কোথায় শুনিবে? তন্ত্র-পুরাণে পড়িবার

কথা নয়, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল শ্রুতিতেও কি কেহ কখন শুনিয়াছে এই অশ্রুতপূর্ব 'অচিনে গাছে'র কথা?—যাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না। কি করিয়া চিনিবে? চেনা তো পূর্ব-দৃষ্ট বস্তুকে পুনর্বার দর্শন করিয়া পূর্ব অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া লওয়া?—কিন্তু এখানে কে কাহাকে কিসের দ্বারা চিনিবে? যাহার দ্বারা আমরা সব কিছু জানিতেছি, সেই জ্ঞানস্বরূপই যে জ্ঞেয়বৎ সম্মুখে দণ্ডায়মান। 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?'—সূর্যের আলোক দ্বারাই আমরা সব কিছু দেখিতেছি, কিন্তু সেই আলোকস্বরূপ সূর্যকে দেখিব কিসের দ্বারা? তবু তো দেখিতে হয়। অনন্তকোটি যোজন বিস্তৃত জ্বলন্ত সূর্য কিরণজাল সংহত করিয়া যখন প্রতিদিন দিক্‌চক্রবালে উদিত হন—তখন তো আমরা প্রতিদিনই দেখি বা দেখিতে পারি—সেই উদীয়মান সূর্যকে, সেই জবাকুসুমসঙ্কাশ ধ্বান্তারি দিবাকরকে।

কিন্তু অচিনে গাছকে চিনিব কি করিয়া?

নামেই যে তাহার পরিচয়—তাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না। গাছ চিনিবার উপায় তাহার পাতা, ফুল ও ফল। কিন্তু এ গাছের পাতা, এ গাছের ফুল, এ গাছের ফল—কিছুরই সহিত আমাদের জানা গাছপালার কোন মিল নাই।

এ সংসারের গাছপালার শিকড় শক্ত মাটিতে, ডালপালা ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত কি এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষায়, এ-সকল গাছের ফুল ফুটিয়া ওঠে নববসন্তের সমীরণ-স্পর্শে, এ-গাছের ফল দেখা দেয় ফুলের পর, ফলের ভারে গাছ হয় অবনত পৃথিবীরই অভিমুখে।

আর অচিনে গাছ? ঊর্ধ্ব আকাশে ইহার মূল, অধঃ ঊর্ধ্বে প্রসৃত শাখা—ইহার আদি অন্ত মধ্য—কিছুই বোঝা যায় না! এ গাছের নিত্য নূতন ধারা, অনিত্যের মাঝে নিত্য, পুরাতনের মাঝে চির নূতন—সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোত থাকিয়াও সৃষ্টির অতীত, সৃষ্টির বহির্ভূত অথচ সৃষ্টির কারণীভূত—এ এক অনির্বচনীয় সত্তা।

মাঝে মাঝে এ তরুর এক একটি জঙ্গম রূপ দেখা দেয় ধরণীর ধূলিতে, মানুষ মনে করে তাহাকে চেনে; কিন্তু জানা শত-সহস্র জিনিসের সহিত মিলাইতে গিয়া দেখে, মেলে না—কিছুরই সঙ্গে মেলে না; ভাবে, একি বাস্তব, না স্বপ্ন, না কল্পনা! ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া চাহিয়া দেখে—না বাস্তব ঠিকই। তবে তথাকথিত বাস্তব পদার্থের মতো নশ্বর নয়, ক্ষণভঙ্গুর নয়—অনিত্য নয়! এ এক শাশ্বত অমোঘ শক্তির অপরূপ বিকাশ! সংসারের মানুষ তাহাকে নিজের প্রয়োজনের মাপকাঠিতে মাপিতে যায়। বেগুনওয়ালা দেখিতে যায়—এ গাছে বেগুন ফলিবে কি না! রুটিওয়ালা হিসাব করে, ইহার ফলন হইতে কতজনের খাদ্যসংস্থান হইতে পারে! কিন্তু সকলের সাংসারিক সকল আশা ব্যর্থ করিয়া এ গাছ বলিয়া ওঠে: এ অচিনে গাছ—এ লাউ কুমড়া বা বেগুনের গাছ নয়, ধান যব বা গমের চারা নয়, যে পাতা দেখিয়া চিনিয়া লইবে! এর পাতা ফুল ফল—সব একাকার!

অচিনে গাছের অমৃত ফল! দেহের অতীত যে ক্ষুধা, মনেরও মনে যে তৃষা—তাহা মিটাইবার জন্যই এ গাছের অঙ্কুরোদ্‌গম!

অবতার অচিনে গাছ! তিনি না চিনাইলে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে না, তিনি ধরা না দিলে কেহ তাঁহাকে ধরিতে পারে না! সংসারের সৃষ্ট পদার্থের কোন কিছুর সহিত তাঁহার মিল নাই। সৃষ্টির ভিতরে থাকিয়াও তিনি সৃষ্টির ঊর্ধ্বে!

বুদ্ধিবৃত্তি ও শ্রুতিযুক্তি সহায়ে বেদান্তের অখণ্ড সত্তা-চৈতন্য-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম-তত্ত্ব যদি বা কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হয়, অবতার-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা আদৌ সহজ নহে, ইহা প্রধানত বিশ্বাসের বস্তু! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ঈশ্বর কিভাবে সার্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত মানব-শরীরের মধ্যে বাস করেন?—এবং যে কয় বৎসর এরূপ বাস করেন, সে কয় বৎসর নিখিল ব্রহ্মাণ্ড চালাইবার ভার কাহার উপর দিয়া আসিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন?—কি ভাবে এবং কেনই বা তিনি ক্ষুদ্র নশ্বর মানবদেহ পরিগ্রহ করেন? অবতারবাদ মানিয়া লইবার বিরুদ্ধে এগুলিই প্রবল প্রশ্ন! এ প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাইব? অবশ্যই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে। উপনিষদের অতিরিক্ত যদি কোন তত্ত্ব গীতায় ব্যক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহা এই অবতার-তত্ত্ব!

গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন: 'আত্ম-মায়াকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত জন্ম এবং ধর্মস্থাপনাদি কর্ম যাহারা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে, তাহাদের জন্ম ও জীবন সার্থক; তাহারা জন্মমৃত্যুর রহস্য ভেদ করিয়া অমৃতের অধিকারী হয়। অপরপক্ষে মূঢ় মানব তাঁহাকে প্রাকৃত মানুষের মতো মনে করিয়া অবজ্ঞা করে, ঈর্ষা করে, এবং নিজ অজ্ঞতার জন্য অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

মানুষ যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে চায় বা বুঝিতে চায়, তবে এই অবতার-তত্ত্বের ভিতর দিয়াই বুঝিতে হইবে। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা করা দেহবান্ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইলেও দৃঢ়সংকল্প অদ্বৈতবাদী সাধকের ধ্যানের শেষে বাক্যমনের অগোচর 'বোধে বোধ'রূপে সেই তত্ত্ব স্বতঃপ্রকাশিত! সগুণ নিরাকার ব্রহ্মই সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তা ঈশ্বর। ইনিই তথাকথিত 'একেশ্বরবাদী'দের উপাস্য এবং প্রার্থনার লক্ষ্য। তদপেক্ষা আরও নিকটে ধ্যান-চিন্তার উপযোগী সগুণ সাকার দেবতা-মূর্তি; সেবা-পূজার মাধ্যমে ইনি সাধকের অন্তর্যামী, হৃদয়-বিহারী! অবতার ঈশ্বরের করুণা-বিগ্রহ, ভক্তের জন্যই অবতার, নরলীলা না দেখিলে যে মানুষের বিশ্বাস হইবে না। তাছাড়া ভক্তি ও ভক্ত লইয়া খেলা করাই অবতার-লীলার প্রধান অঙ্গ, ধর্মস্থাপন তাহার অবান্তর ফল।

নির্গুণ এবং নিরাকার সত্তার ধ্যান যতই উচ্চ হউক, জীব যতদিন নিজেকে দেহমন-বিশিষ্ট মানুষ বলিয়া মনে করিবে, নিজের উন্নতির জন্য ততদিন তাহার একটি আদর্শ প্রয়োজন, শ্রেষ্ঠ আদর্শের জন্য তাহাকে ঈশ্বরের মানুষী লীলার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। সে নিজে চিন্তা করিয়া, কল্পনা করিয়া যত উচ্চ আদর্শই খাড়া করুক না কেন, দেখা যায়—ঈশ্বরের অবতাররূপে পূজিত মহচ্চরিত্রের আদর্শভূত এই মহামানবেরা তাহার কল্পিত আদর্শ হইতে অনেক উচ্চে। আমাদের কল্পিত আদর্শগুলি নিতান্তই অপূর্ণ। তবে দেশকালের প্রয়োজনে তাহাদের প্রকাশ বিভিন্ন; মানব মনের ধরিবার বুঝিবার শক্তি অনুযায়ীই তাঁহাদের প্রকাশ। আদর্শ মানব-জীবনের একটি ছাঁচ (cult) তাঁহারা রাখিয়া যান, নিজ নিজ জীবন সেই ছাঁচে ঢালিয়া দিলে মানুষ ঐ ভাবে ভাবিত হইয়া আদর্শ জীবন লাভ করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের দ্রুত উন্নতির জন্য এই সকল আদর্শচরিত্র মহামানবের উপাসনা ব্যতীত অন্য কোন নিশ্চিত উপায়

নাই। উপাসনা অর্থে এখানে শুধু মন্দিরে বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে পূজা বা প্রার্থনা করা নয়। উপাসনা অর্থে সমীপে আসীন হইয়া আদর্শানুযায়ী চারিত্রিক গুণগুলি আয়ত্ত করা, নতুবা শুধু স্তবস্তুতি পূজাপাঠেই যদি উপাসনা পর্যবসিত হয়, তাহা হইলে মতান্তরিত বা ধর্মান্তরিত হইলেও তাহাতে জীবন রূপান্তরিত হইবে না।

ঈশ্বর-শক্তি যখনই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনই তিনি নিজ জীবন দ্বারা অতি কঠোর কঠিন আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন এবং এই পৃথিবীর মাটি হইতে কতকগুলি মানুষ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে দিব্য জীবন সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রভৃতি কথাগুলি লইয়া মানুষের কত মত-বিরোধ! মানুষ এটুকু বুঝে না একই জিনিস বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়। চরম-জ্ঞানে যিনি ব্রহ্ম, সৃষ্টির দৃষ্টিতে তিনি ঈশ্বর। অন্তর্যামি রূপে তিনিই পরমাত্মা—ভক্তের চোখে তিনি ভগবান্, কখন বা নরদেহধারী অবতার।—'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি কথ্যতে।'

কি অভ্রান্ত ভাষায় বিরোধের মীমাংসা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া গেলেন সমন্বয়ের বাণী: বেদে যাঁকে বলেছে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, পুরাণে তাঁকেই বলেছে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ। আবার তন্ত্রে তাঁকেই বলেছে সচ্চিদানন্দ শিব।—আমি তাঁকেই 'মা' বলে ডাকি।

কি অপূর্ব সমন্বয়! একই জলকে কেহ বলে জল, কেহ বলে পানি, কেহ বলে ওয়াটার, কিন্তু বস্তু সেই একই জল, পানে হয় তৃষ্ণা-নিবারণ। আমরা বস্তু ছাড়িয়া নাম-রূপ লইয়া কলহ করিতেছিলাম; শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া নিজের জীবন দিয়া দেখাইয়া গেলেন—শত শত উপমা দিয়া বুঝাইয়া গেলেন, প্রকৃত তত্ত্ব কি! 'ষড়্দরশনে না পায় দরশন' এমনই গভীর এই তত্ত্ব। আবার সরল পবিত্র হৃদয়ে ইহা আপনা হইতেই উদ্ভাসিত হয়।

অচিনে গাছের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে শত শত হৃদয়ের আঁবিলতা দূরীভূত হয়, কুটিলতা সরল হইয়া যায়। শত শত রাজপুত্র ও কত বণিক্শ্রেষ্ঠ ত্যাগের জীবন গ্রহণ করিয়া সিদ্ধ-সাধকে পরিণত হয়। ব্যর্থকাম ধীবরের দল মাছ ধরা ভুলিয়া মানুষ-ধরা সাধুসন্তে রূপান্তরিত হয়! তার্কিক জ্ঞানী অশ্রু-অভিসিক্ত ভক্তে পরিণত হয়!

মানুষ তাঁহাদের নানা নাম দিয়াছে—ঋষি, অবতার, মেসায়া, প্রফেট; ইঁহারা জগতের হইয়াও জগতের অতীত, যেন দুই জগতের সংযোগ-সূত্র। ইঁহারা আর এক জগতের এক উচ্চতর জীবনের বার্তা লইয়া আসেন; মানুষ ইঁহাদের না চিনিয়াও বুঝিতে পারে—ইনি আত্মার আত্মীয়।

এমনই এক অঁচিনে মানুষের প্রভাবে আবার এক রূপান্তরের পালা শুরু হইয়াছে। এবার বাহ্য ঐশ্বর্যের একান্ত অভাব, শাস্ত্রপাণ্ডিত্য প্রায় বর্জিত বলিলেই হয়। অথচ তাঁহার গ্রাম্য ভাষার কি অমোঘ শক্তি, বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াও তাহার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। ভাষার খোসার অভ্যন্তরে ভাবের শস্য লুকানো রহিয়াছে; ক্ষুধার্ত মানবের মনের প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য। দেশ-বিদেশে বিদ্বান্-মূর্খ নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা পড়িয়া, আলোচনা করিয়া জীবন-পথের পাথেয় সঞ্চয় করিতেছে। কেহ মনে করেন, তিনি জ্ঞানী; কেহ বলেন, না,

তিনি ভক্ত; কেহ বলেন, তিনি সাধক; কেহ বলেন, তিনি সিদ্ধ; সংসারী দেখেন, তিনি সংসারী; সন্ন্যাসী ভাবেন, তিনি সন্ন্যাসী; কাহারও মতে তিনি অবতার; কেহ বা অনুভব করিয়াছেন: যেখান হইতে যুগে যুগে অগণিত অবতার আবির্ভূত হইতেছেন, তিনি সেই অবতরণের উৎস-মুখ! শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ এই 'অচিনে গাছ'কে কে চিনিতে পারিয়াছে?

মাঝে মাঝে তিনি স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন 'কথামৃতে'র অমৃত-কথায়—সেই বহুরূপীর গল্পে! বহুরূপীর বহুরূপ; কেহ দেখে উহা লাল, কেহ দেখে উহা নীল, কেহ বা দেখিযাছে উহা সবুজ, কখনও বা উহা হলদে। বিবদমান ব্যক্তিদের বিরোধের সমাধান করিবে কে? বহুরূপীর সেই গাছের তলায যে সর্বদা বসিয়া আছে সেই পারে সমাধান করিতে, আর বহুরূপীই জানে নিজের স্বরূপ!

আবার একটি গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মপ্রকাশ করিতেছেন—সেই কাপড় ছোপানোর গল্পে! 'তুমি কি রঙে তোমার কাপড় ছোপাতে চাও, লাল? এই নাও লাল। তুমি? নীল? এই নাও নীল।' শেষে একজন নীরব দর্শককে প্রশ্ন করিলে সে বলিল, 'তুমি যে রঙে রঙেছ আমার সেই রঙ চাই!' সে রঙ কি? সে রঙ অচেনা, অতি-চেনা! সে বর্ণ বর্ণাতীত, বর্ণনাতীত।

তাই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ আক্ষেপ: বাউলের দল এসেছিল, নেচে গেয়ে তারা চলে গেল। কেউ চিনতে তাদের পারলে না।' তবু এ বাউলের দলকে আসিতে হইবে, বারে বারে আসিতে হইবে—অচেনাকে চিনাইয়া দিবার জন্য; যে ধরিতে চায় না, যে ধরিতে পারে না, তাহার কাছে নিজেকে ধরা দিবার জন্য।

'বীরেন ও ধীরেন'

আসামের অভিমুখে পদযাত্রার পথে—আচার্য বিনোবা ভাবে গত ১০ই ফেব্রুআরি বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই দিনই ইসলামপুরে একটি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বঙ্গবাসী মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। বাঙালী চরিত্রের যে দুইটি দিক বিনোবার চোখে ধরা পড়িয়াছে, তাহাই তিনি অতি সুন্দর স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিযাছেন। বাঙালী যদি ইহার মর্ম গ্রহণ করিয়া জীবন গঠন করিতে পারে, তবে সে নিশ্চয় একটি শক্ত ও সবল জাতিতে পরিণত হইয়া আজিকার দুরবস্থা অতিক্রম করিতে পারিবে।

বিনোবা বলিয়াছেন: বাংলা দেশে দুটি নাম প্রায় শোনা যায, বীরেন ও ধীরেন। এ দুটির মধ্যে 'ধীরেন'ই বেশি প্রচলিত। 'বীরেন্দ্র' শক্তি এবং সাহসের প্রতীক, তবু অনেক সময় সে অধৈর্যের লক্ষণ প্রকাশ করে। কিন্তু সাহস ও ধৈর্যকে একসঙ্গে চলিতে হইবে। তাই চাই—'বীরেন' ও 'ধীরেন' মিলিত হউক; অর্থাৎ চাই বীরত্বের সহিত ধীরতার মিলন।

মানুষ যদি এই দুইটি গুণের অনুশীলন করে—অর্থাৎ রজোগুণের অনুশীলন করিযা বীর হয় এবং সত্ত্বগুণের অনুশীলন করিয়া ধীর হয়, তবেই সে তমোগুণ-জনিত জড়বৎ অবস্থা অতিক্রম করিয়া মনুষ্য-সমাজে মানুষের মতো দাঁড়াইতে পারে; সচেতন মানুষের মতো জীবন যাপন করিতে পারে।

চলার পথে

'যাত্রী'

ছোট ছেলে তার সুমুখের সাজানো খেলনার সবগুলিকেই চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কোন একটার উপরেই তার মন বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। সেই রকম আমাদের সুমুখে বাসনার নানান খেলনার ভিড়ে, আমাদের চিরন্তন শিশুমন নানান চাহিদাকে আঁকড়ে রাখতে চাইলেও কোন একটিমাত্র বাসনাই তাকে বেশীক্ষণ আকর্ষণ ক'রে রাখতে পারে না। তাই দেখা যায়, এই মুহূর্তে যে বাসনা আমাদের উৎপীড়িত করছিল পরমুহূর্তেই আবার তাকে ছেড়ে, অন্য আর একটাকে ধরেছি। এর কারণ বোধ হয়, শিশুর মতো মন নিয়ে, আমরাও ঠিক কোন্‌টিকে যে চাই, তা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারি না। তাছাড়া, কোন্‌টা যে চাই তা সঠিক বুঝতে হলেও মন ও মননের যে স্তরে আমাদের ওঠা উচিত, সাধারণতঃ তার অনেক নীচেই থাকি ব'লে আমাদেরও যথার্থ দিগ্‌দর্শন হয় না।

ঐ দিগ্‌দর্শন করতে গেলে আমাদের আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পেতে হবে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের মধ্যে আমি তো একটি কণামাত্র। কথাটা ঠিকই, তবুও এইভাবে নিজের ক্ষুদ্রত্বকে ধরে নিজের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করলে আমাদের স্বমহিমার প্রকাশ হয় না। আমাদের মনে রাখা উচিত, আমরা পরিমাণে ক্ষুদ্র হলেও মহিমায় বিরাট। আমাদের ক্ষুদ্রবিন্দুর মধ্যেই তো জ্বলছে সেই স্বয়ংজ্যোতি! আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির উত্তরাধিকার দাবি করতে পারে, সমুদ্রের সামান্য জলকণাও যেমন স্বরূপত সমুদ্রের পরমাত্মীয়; তেমনি আমি মানুষ, দেহের পরিমাপে ক্ষুদ্র হলেও, অন্তর-সত্তায় ব্রহ্মের বিরাট সত্তার উত্তরাধিকারী। তাই আমার যোগ—অল্পের সঙ্গে নয়, ভূমার সঙ্গে। আর ঐ যথার্থ সম্বন্ধের আবিষ্কারের পথেই আমার স্বরূপ, আমার মনুষ্যত্ব, আমার 'আমিত্বকে' ধরতে পারি। আমি সামান্য বীজ হলেও মহামহীরুহের সম্ভাবনাও যে রয়েছে আমারই মধ্যে—এই বোধকেই তো করতে হবে আবিষ্কার। আর সেই জন্যই আমার শক্তি, সেই জন্যেই তো এই হৃদ্‌-স্পন্দন।

আমার মধ্যেকার বিরাট-সত্তার 'বোধকে' আবিষ্কার করবার জন্যই তো এই জগৎ। আর এই জগতের মাঝে সেই 'সঠিক'কে অনুভব করবার জন্যই তো এই জগদ্‌-ভ্রান্তি। চারিদিকে এই ভুলের পুঞ্জীভূত সমারোহের মধ্যে কোন্‌টি নির্ভুল, কোন্‌টি ধ্রুব, কোন্‌টি সত্য, তা জানাই তো মানুষের মনুষ্যত্ব!

তাহলে মাতৃরূপা মায়া-শক্তির রচা এই জগৎ বা সৃষ্টিরও একটা প্রয়োজন রয়েছে। মা-ই এ সব করেছেন—তাঁর ছেলেদের ভোলাবার জন্য, আবার ভুল ভেঙে সে যথার্থকে পাবে বলেও। মা দেখতে চান: ছেলে মাকে চায়, না খেলনাকে চায়। এ জগতে এসে যে কেবল খেলনা নিয়েই মেতে রইল, তার আর নিরন্তর মায়ের কোলে চড়া হ'ল না। তা বলে, মা কিন্তু এজন্য দায়ী নন। তিনি তাঁর সন্তানের মধ্যে দুটো বৃত্তিই দিয়ে রেখেছেন। এক বৃত্তিতে সে খেলে, আর এক বৃত্তিতে সে খেলা ছেড়ে মাকে ধরে। এই বৃত্তিদ্বয়ের যে কোন

একটিকে বাছাই করবার জন্য কিন্তু মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তবে মা চান, ছেলে ভালটাই বেছে নিক—তার রুচি মতো। তাই তাঁর ছেলেদের শিক্ষা দেবার জন্য মা এ জগতে এনে দেন তাঁর ভাল ছেলেদের, সাধকদের, সত্যপথে চলার বিভিন্ন যাত্রীদের। যাঁরা এসে তাঁদের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যান—শ্রেষ্ঠ পথের সন্ধানটিকে, পথ-শেষের মহান্ গন্তব্যটিকে। এই সঙ্গে তাঁরা আবো বুঝিয়ে দিয়ে যান—জীবনই মানুষের সবচেয়ে দামী জিনিষ; এবং এই দামী জিনিষ সবচেয়ে চড়া মূল্যেই বিকিয়ে দেওয়া উচিত অর্থাৎ মহত্তম উদ্দেশ্যেই জীবন যাপন করা উচিত।

আমরা কিন্তু তা না ক'রে সাধারণভাবে উদরপূর্তির চেষ্টায় ও বাসনা-ভোগেই জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে এ পৃথিবী থেকে সরে যেতে বাধ্য হই। মহারত্ন এই জীবনকে সামান্য কাচখণ্ডের মতো হেলায় হারাই। এই হারানোকে তথা নষ্ট করাকে আটকাতে গেলে আমাদের বাসনার ঊর্ধ্বায়ন চাই।

বাসনা থেকে নিবৃত্ত হওয়াটাই সব নয়। প্রবৃত্তির পরগাছা ও আগাছা শুধু কেটে ফেলে দিলেই হবে না—একেবারে শিকড়-সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিতে হবে। তা না হ'লে, আবার তারা অনুকূল আবহাওয়ায় সঞ্জীবিত হ'য়ে আবার আমাদের প্রবৃত্তির আওতায় টেনে নিয়ে আসবে। তাইতো সংসার ছেড়ে হিমালয়ের কন্দরে ছুটে গেলেই যে সব ছাড়া হ'য়ে গেল, তা নয়। কারণ, বাসনার বীজ ও শিকড়গুলো যদি সেই সঙ্গে মনের আঙিনায় গুপ্ত ও সুপ্ত থেকে যায়, তা হ'লে সেই নির্জন হিমেল আলয়েও তারা আমাদের দুর্বল-মুহূর্তের বারিসিঞ্চনে পত্রে পুষ্পে শোভিত হ'য়ে উঠবে। তাই বাহ্যত্যাগ বা ছাড়াটাই বড় কথা নয়; যোগটাই অর্থাৎ ধরাটাই আসল কথা। তাইতো বাসনা ছাড়লাম, সেটাই সব কথা নয়—ঈশ্বরকে ধরলাম, তাঁর সঙ্গে যোগ-সৃষ্টি করলাম, সেইটেই আসল কথা। ভগবান নিজ মুখেই বলেছেন: তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।—যারা তাদের চিত্ত নিঃশেষে আমাকে দিয়েছে, ভালবাসায় যারা আমারই ভজনা করে, তাদের আমি নির্মল জ্ঞান দান করি, আর তারাও সেই নির্মল জ্ঞানের পথ ধরেই আমাকে লাভ করে।

চল পথিক ফাগুনের ঝরা-পাতার সূত্র ধরে আমরাও আমাদের বাসনার হলদে পাতার রাশি ঝরিয়ে, নতুন পাতায় সবুজ হ'য়ে উঠি, চল। শুধু ত্যাগের শূন্যতা নয়, গ্রহণের পূর্ণতায় ভরে উঠি, তারপর চল সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ হবার পথে চলি। চল, চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

ভারতের আধ্যাত্মিক নবজাগরণ

স্বামী নির্বেদানন্দ

ভারতের সংস্কৃতি-প্রবাহের ভাটার টান

কালের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরাট ক্রমোন্নতি ঘটে এসেছে। ভারতের অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, তার ললাট উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে মহামূল্য মণিরত্নে—বৈদিক যুগের তরুণ আর্যজাতির আধ্যাত্মিক পিপাসায় উপনিষদের ঋষিদের অনুভূতির আবেগোচ্ছল বাণীতে এবং বৌদ্ধ ও জৈনদের নৈতিক নিষ্ঠায়। দেখা যায়, তাকে মহিমান্বিত ক'রে রেখেছে অমর মহাকাব্যগুলির আদর্শ জীবনালেখ্য, পুরাণের সর্বজন-বোধ্য আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা, দর্শনের সূক্ষ্ম বিচার-প্রবণতা এবং মুনিঋষিদের অনুপম পবিত্রতা ও বিমল ভক্তি। আর দেখা যায়—সংস্কার-সাধনের প্রবল ইচ্ছা-প্রবাহ ছুটে চলেছে তার যুগান্তকারী ধর্মান্দোলনগুলিব সঙ্গে সঙ্গে। আদিম ও মধ্যযুগের ভারতের এই অপূর্ব সাফল্যের কথা ভাবলে, শতাব্দীর পর শতাব্দী-ব্যাপী সংস্কৃতির এই গৌরবোজ্জ্বল ক্রমোন্নতির কথা চিন্তা করলে হিন্দুজাতির পূর্বপুরুষদের অদ্ভুত প্রতিভা দর্শনে সশ্রদ্ধ প্রশংসায় মন ভরে ওঠে।

ভারতীয় সংস্কৃতির অতীতের এই মহিমা দেখে তার ঐতিহাসিক অভিযানের পরিণতির কথা জানবার ইচ্ছা স্বতই মনে জেগে ওঠে। নবযুগের আবির্ভাবে এই অভিযান কি থেমে গেছে? মধ্যযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারত কি মিশরীয় 'মমি'-র মতো গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সুচারু অলঙ্কার-ভূষিত, ক্রমক্ষীয়মাণ মৃতদেহমাত্রে পরিণত হয়েছে? মহত্তর গরিমময় ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলার মতো তার জীবনের স্পন্দন, তার প্রাণশক্তি কি চির-স্তিমিত? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হ'তে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে নিরপেক্ষ দর্শকের মনে এ প্রশ্ন জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। যে সময়ের কথা হচ্ছে, তখন ভারত চলেছে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের পঙ্কিল পথ বেয়ে অতিকষ্টে। ইংরেজ এসে দেশের স্বাধীনতা হরণ করার পর তার ওপর বিদেশী সভ্যতার প্রভাব অতি দ্রুত বিস্তৃত হ'তে থাকে। রাজনীতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ভারত সন্দিহান হ'য়ে উঠল তার প্রাচীন সভ্যতায়; হীনতা-বোধের কালিমায় তার ললাট হ'ল কলঙ্কিত। বিজেতার সভ্যতাকে নিজের সভ্যতার চেয়ে মহত্তর ব'লে মনে করার ফলে সে-সভ্যতার দিকে চেয়ে তার চোখ গেল ঝলসে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতবাসীর মনের ওপর এই প্রাধান্যের আসন বিস্তৃত করার সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় আদর্শবাদের যে প্রবাহ উত্তাল-তরঙ্গে এসে দেশের বুকে আছড়ে প'ড়ল, প্রাচীন সভ্যতার নোঙর থেকে ভারতকে ছিনিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে তাই-ই ছিল যথেষ্ট।

নতুন শাসন-ব্যবস্থার ফলে দেশে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত হ'ল, তার ঝোঁক ছিল এমন সব মানুষ গ'ড়ে তোলার দিকে, জাতিতে ভারতীয় হলেও তাদের রুচি ও চিন্তাধারা হবে ঠিক ইংরেজদের মতোই। সে শিক্ষার প্রভাবে ভারতের অন্তর্জীবন ভেঙে যাবার গতিবেগ হ'য়ে উঠল দ্রুততর। এই বিজাতীয় শিক্ষায়

মাধ্যমে তরুণের দল সংস্কৃতি সম্বন্ধে অদ্ভুত সব ধারণা অর্জন করতে লাগল ; যেমন : সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, ভারতে তার কিছুই নেই ; তার সমগ্র অতীত ব্যয়িত হয়েছে শুধু কতকগুলো অলীক সত্যের সন্ধানে ; সত্যি যদি ভারত বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে নিজেকে পুরোপুরি ইওরোপীয় সভ্যতার ছাঁচে ঢেলে গড়তে হবে। বলা বাহুল্য, এই সব যাদুমন্ত্রের মোহিনী শক্তিতে ভারতের চেতনা ঝিমিয়ে প'ড়ল।

সাংস্কৃতিক মোহের প্রচণ্ড প্রভাবে ভারত-বাসীরা যখন এভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়েছে, তখন নবপ্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির অনুগামী কতকগুলো অশুভ প্রভাব এসে নিজস্ব আদর্শ থেকে তাদের ছিনিয়ে নেবার জন্য প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠল।

ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে দেশের ওপর দিয়ে নাস্তিকতার প্লাবন বয়ে গেল। নামজাদা নাস্তিকদের বিপুলশক্তিময় চিন্তাধারায় ও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের জড়বাদ-সহায়ক আবিষ্কার-কাহিনীতে ইংরেজী সাহিত্য তখন ভরপুর। শূন্যবাদী চিন্তাও হিন্দুবিশ্বাসের দুর্গ আক্রমণ ক'রল। শতশত চিন্তাশীল মনীষী তখনই আত্মসমর্পণ ক'রে প্রকাশ্যভাবেই বশ্যতা স্বীকার করলেন জড়াত্মক বস্তুবাদের কাছে ; আর শুরু করলেন তারই ছাঁচে জীবন গঠন করতে। এত বড় আঘাত হিন্দুসমাজ সহ্য করতে পারল না, ভিত নড়ে গিয়ে তার ভাঙন শুরু হ'ল।

এ আঘাত সয়েও যাঁরা রয়ে গেলেন, আরও একটা বিধ্বংসী শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হ'ল তাঁদের। ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন আর খৃষ্টধর্ম-প্রচার একসূত্রে গাঁথা ছিল, খৃষ্টান মিশনারীরা এ-দুটি কাজ একসঙ্গেই করতেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁদের যোগ্যতা প্রশ্নাতীত ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, প্রচারক হিসাবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল খুব সঙ্কীর্ণ। গীর্জার মতবাদের ওপর তাঁদের একগুঁয়ে বিশ্বাস, আর মানবজাতির মুক্তির জন্য তাঁদের ধর্মীয় উৎসাহ, এই দুই মিলে তাঁদের ক'রে তুলেছিল অন্যধর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে সম্পূর্ণ অসমর্থ এবং অন্য মতবাদের উৎকট সমালোচক। অখৃষ্টান ধর্মগুলিকে কোন মহৎ বা হিতকর ভাবের মর্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা, খৃষ্টধর্ম ছাড়া আর সব ধর্মের ওপরই তাঁরা উপেক্ষাভরে ঘৃণার বিষ উদ্‌গিরণ করতেন, আর বর্ষণ করতেন অজস্র অভিসম্পাত।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, পদমর্যাদার জন্য তাঁদের প্রচারকার্য দেখাতও খুব জমকালো। জনসেবক-মর্যাদা-ভূষিত ও শাসকজাতির কুলগর্বমণ্ডিত হ'য়ে তাঁরা দেখা দিতেন শিক্ষা-ব্রতী, সংবাদপত্র-সেবী ও সমাজসেবক রূপে। তাছাড়া আচরণে তাঁরা লোকের চিত্তহরণ করতে পারতেন, এবং তাঁদের ভেতর কয়েকজন অন্ততঃ এদেশের লোকদের সত্যই ভাল-বাসতেন। এই সব কারণে তাঁদের প্রভাব আরও ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছিল। খৃষ্টধর্মের এই সব দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা শিক্ষামন্দিরগুলির তোরণদ্বারে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের শিক্ষিত ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সন্তর্পণে তাদের খৃষ্টধর্মে অনুরাগীও ক'রে তুলতেন। এইসব ধর্মান্ধ উৎসাহীদের অপরকে ধর্মান্তরিত করার প্রবৃত্তি হিন্দুসমাজে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

এভাবে পরাধীনতা আর তার সহচর নতুন শিক্ষাপদ্ধতির দোষগুলি হিন্দুসমাজের বুকে দারুণ দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে। উৎকট সংস্কৃতি-সঙ্কট-জাত লোকের দল সারা দেশ-জুড়ে হঠাৎ মাথা তুললেন। রুচি, আচরণ,

চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবননীতি—সব বিষয়েই এঁরা ছিলেন না ভারতীয়, না ইংরেজ। নিজেদের পূর্বপুরুষদের ও প্রাচীন সংস্কৃতির ওপর এঁদের বিশেষ কোন আস্থা ছিল না; দেশ-শাসক ও দেশের চিন্তাধারার নিয়ন্তারূপে আবির্ভূত ইংরেজদের অনুকরণ করাকেই এঁরা সমীচীন ব'লে ধরে নিয়েছিলেন, যদিও সে অনুকরণ ঠিকমত হ'ত না।

কাজেই কোন নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে সে-সময়কার সমাজে, বিশেষ ক'রে ইংরেজী-শিক্ষা-প্রাপ্ত মহলে, সংস্কৃতির চরম বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর অন্য কিছু দেখতে না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। হিন্দুসমাজের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি সেদিন ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছিল, সে-কাঁপনে হয়তো একেবারেই গুঁড়িয়ে যেত সে। হিন্দুজাতি তখন চিরবিলুপ্তিরূপ বিপদ্-সাগরের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, ভারত তখন টলমল করছে; মনে হয়েছিল ধ্বংস তার অবশ্যম্ভাবী।

সংস্কার-আন্দোলন

কিন্তু তা হবার নয়। আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে ভারত যেন মন্ত্রবলে বেঁচে গেল। অলক্ষিতে কি যেন একটা ঘ'টল! বোধ হয় দৈবী ইচ্ছাতেই সেটা হয়েছিল, যার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের বহু অভ্রান্ত লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে সংস্কৃতি-সঙ্কটের পঙ্কে ভারত যখন প্রায় পূর্ণ নিমজ্জিত হ'তে বসেছে, তখন পায়ের তলায় হঠাৎ শক্ত মাটির সন্ধান পেয়ে বেঁচে থাকার জন্য সে প্রাণপণ সচেষ্ট হ'য়ে উঠল। জাতির অন্তরের অন্তস্তলে যে প্রাণশক্তি এতদিন মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, হঠাৎ জেগে উঠে সে অভিযান শুরু ক'রে দিল ভারতীয় সংস্কৃতির বিলোপসাধনে উদ্যত প্রচণ্ড বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির এই সংগ্রামেচ্ছা বাঞ্ছিত ফলই প্রসব করেছিল। হিন্দুজাতির জাগরিত আত্ম-প্রত্যয়ের ক্রমবর্ধমান আঘাতে বিদেশী সভ্যতার মোহের আবরণ ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে সরে যেতে লাগল। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে মহিমোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে তাকে চালিত করার জন্য একের পর এক দেখা দিতে লাগল সমাজ-সংস্কারের ও ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন।

ব্রাহ্মসমাজ

ব্রাহ্মসমাজই এই-জাতীয় আন্দোলনগুলির অগ্রণী। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নবভারতের প্রথম বরেণ্য দেশপ্রেমিক ও সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এর প্রতিষ্ঠা করেন। গোঁড়া হিন্দু-আচারপ্রিয়তার পরিবেশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও রাজা রামমোহন মুসলমান এবং খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে সম্পূর্ণ আধুনিক ও উদার এক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করেছিলেন। ফলে তাঁর ধারণা হয়েছিল, খৃষ্টান মিশনারীদের দোষদর্শী সমালোচনার ও নাস্তিকদের যুক্তিতর্কের সামনে দাঁড়িয়ে, সে-সবের প্রভাব কাটিয়ে হিন্দুধর্মকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে তার ভেতর থেকে কিছু কাটছাঁট ক'রে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন, হিন্দুদের সমস্ত দেবতাকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ না করলে আধুনিক সমালোচকদের নিরস্ত করা সম্ভব হবে না কিছুতেই। ভেবেছিলেন, যেমন করেই হোক সর্ববিধ সাকারোপাসনার অবসান ঘটাতেই হবে; সেটুকু ঘটানো সম্ভব হ'লে হিন্দুধর্মের ভেতর লজ্জাজনক কিছু আর থাকবে না। বোঝা যাচ্ছে, ঈশ্বরের সাকার-ভাবের

সঙ্গে যুক্তিবাদের সামঞ্জস্য-বিধান তিনি করতে পারেননি। ঈশ্বরের সাকারত্বের বিরুদ্ধে যুক্তিচালিত আধুনিকবুদ্ধিজাত গোঁড়া বিদ্বেষ নিয়ে তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হন। উপনিষদ্ থেকে সগুণ নিরাকার ব্রহ্মবিষয়ক অংশগুলি পরমানন্দে গ্রহণ করলেন তিনি। ঈশ্বর সম্বন্ধে উপনিষদের এই ধারণা একেশ্বরবাদী মুসলমান ও খৃষ্টানদের ধারণারই সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দেখে তিনি বোধ হয় স্বস্তির নিশ্বাসও ফেলেছিলেন। উপনিষদে ঈশ্বরের নিরাকার ভাব ছাড়া আরও যে সব ভাবের উল্লেখ রয়েছে, সে-সবের সন্ধান যে তিনি পাননি, তা সহজেই বোঝা যায়। যাই হোক, হিন্দুধর্ম থেকে প্রয়োজনমত উপাদান আহরণ ক'রে এবং সগুণ নিরাকার ঈশ্বরকে কেন্দ্রে রেখে রাজা রামমোহন একটি উচ্চাঙ্গের একেশ্বরবাদ গ'ড়ে তুললেন। বৈদেশিক একেশ্বরবাদগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে অবলীলাক্রমে জয়ী হবার মতো শক্তি ছিল সে মতবাদের।

এই মতবাদ তুলে ধরার জন্য রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। যদিও আধ্যাত্মিক অনুভূতির সর্ববিধ সুরলহরী তোলার মতো তন্ত্রীর অধিকার-গৌরবে হিন্দুধর্ম মহিমান্বিত, তবু আসর জমাবার জন্য তৎকালীন প্রবল চাহিদার অনুরোধে ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বর-বাদের একতারাটিই বেছে নিয়েছিল। যাই হোক, যারা সর্বতোভাবে সাকারোপাসনা পরি-ত্যাগ করতে স্বীকৃত, তাদের সকলের জন্যই জাতি-বর্ণ-সমাজ-নির্বিশেষে ব্রাহ্মসমাজের দ্বার ছিল অবারিত। শর্তটি অবশ্য অনেকের পক্ষেই প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, অনমনীয় বা একগুঁয়ে গোঁড়ামি বলতে যা বোঝায়, ব্রাহ্মসমাজে তার কিছুই ছিল না।

এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের একটা সাড়া প'ড়ে যায়। সামাজিক প্রথাগুলির পুনর্বিন্যাসের এই কাজ পেয়ে নবশিক্ষাপদ্ধতি-সঞ্জাত সাম্য ও স্বাধীনতাবোধ স্বচ্ছন্দ বিহারের একটা অবকাশও পেয়েছিল। সর্বপ্রকার সামাজিক দুর্নীতির হাত থেকে স্ত্রীজাতিকে উদ্ধার করার কাজে ব্রাহ্মসমাজ উঠে প'ড়ে লাগল। বাল্যবিবাহ ও বাধ্যতা-মূলক বৈধব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল সে; এবং নিঃশঙ্কচিত্তে ব্রতী হ'ল আধুনিক প্রথায় স্ত্রীশিক্ষা-প্রদানের কাজে। পরবর্তীকালে জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু ক'রে ব্রাহ্মসমাজ নিজ গণ্ডির ভেতর জাতিভেদপ্রথা একেবারে তুলে দিতেও সমর্থ হয়েছিল।

এই ধরনের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক মতবাদ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল নাস্তিকতা, খৃষ্টধর্ম ও গোঁড়া হিন্দুমতের বিরুদ্ধে—একই সঙ্গে। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ কয়েকজন প্রতিভাবান্ নেতা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর এসে যান। সুযোগ্য পরিচালনায় সমাজকে কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অবস্থার ভেতর দিয়ে উন্নতির পথে নিয়ে যান তাঁরা। আন্দোলনটি মোটামুটি বাংলা দেশেই এবং ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে। বাংলার বাইরে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বড় একটা ছিলেন না কেউ।

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় ব্রাহ্মসমাজ কখন কখন বৈদেশিক আদর্শের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে প'ড়ত। তার ওপর খৃষ্টধর্মের ছাপ পড়েছিল প্রথম থেকেই। উপনিষদ্ সম্বন্ধে নিজ মতবাদের ব্যাখ্যার জন্য রামমোহন প্রটেস্টান্ট একেশ্বর-

বাদীদের যুক্তিগুলি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের অস্থিমজ্জায় খৃষ্টান আদর্শকে ঢুকিয়ে দিতেও দ্বিধা করেননি। সামাজিক প্রথাগুলিকেও পাশ্চাত্যভাব-রঞ্জিত করা হয়েছিল—একটু বেশী রকমেই। বিদেশী ধর্মভাব ও সমাজপ্রথা গ্রহণেচ্ছার এই উৎকট আগ্রহ ব্রাহ্মসমাজকে চিরাচরিত হিন্দুত্বের কাছে পর ক'রে তুলেছিল। তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ হিন্দুসমাজের গণ্ডির বাইরে এসে দাঁড়াতে হয় তাকে।

তবু যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে লড়াই করার জন্য ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, তার কথা চিন্তা করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যা করা অতি প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়েছিল, ঠিক তাই-ই করেছে সে। হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের কাঠামোটি ইওরোপীয় সভ্যতার চকচকে পাত দিয়ে মুড়ে না দিলে এ-সময় দেশের শিক্ষিত যুবকগণকে পুরোপুরি বিদেশী ভাবাপন্ন হওয়ার উন্মাদনা থেকে রক্ষা করতে পারা যেত না কিছুতেই। ব্রাহ্মসমাজ ঠিক এই কাজই করেছিল—যেন হিন্দুদের একটি বিশেষ ধরনের সুরা সে বিতরণ করেছিল পাশ্চাত্য হ'তে আমদানী-করা পাত্রে পুরে। আশানুরূপ ফল এতে পাওয়া যায়। শত শত যুবককে নাস্তিকতা ও খৃষ্টধর্মের বজ্রমুষ্টি থেকে রক্ষা করার কাজে সমাজ এতে খুবই সহায়তা লাভ করে। ব্রাহ্মসমাজের এ-কাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদানরূপে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে, সন্দেহ নেই।

আর্যসমাজ

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে ব্রাহ্মসমাজ যখন খৃষ্টীয় আদর্শের আবর্তে প্রায় মজ্জমান, তখন সর্ববিধ বৈদেশিক ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাব নিয়ে আর একটি প্রবল ধর্মান্দোলন ভারতের অন্যত্র দেখা দেয়। আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, সর্ববিধ পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে নির্ভীক, অটল, নিরাবরণ প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে তার আবির্ভাব। এই আন্দোলন অবলম্বন ক'রে ভারত আবার তার নিজের পায়ের ওপর সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। এবার তার কতকগুলি আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শকে সে নির্বাধ, বলিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ আপসহীনভাবে অভিব্যক্ত ক'রল। আধুনিকতার প্রবাহে প্রায় ভেসে যাবার মুখে নিজস্ব আদর্শের সুদৃঢ় আশ্রয় অবলম্বন ক'রে ভারত হঠাৎ রুখে দাঁড়াল।

এটি হ'ল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ কর্তৃক বোম্বাই প্রদেশে প্রবর্তিত আর্যসমাজ-আন্দোলন। হিন্দুধর্মের সর্ববিধ ঐতিহাসিক আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনেরও প্রবর্তক ছিলেন একজন সন্ন্যাসী। দয়ানন্দ ছিলেন অভিজাত হিন্দু সন্ন্যাসী, বেদে অগাধ জ্ঞানবান্ পণ্ডিত এবং ভারতীয় রীতিসম্মত দুর্দান্ত তার্কিক। সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ হিন্দুসন্তান। সেজন্য হিন্দুমত ও আধুনিতার মধ্যপন্থানুসন্ধী, পাশ্চাত্যধারায় চিন্তাশীল ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে মতের মিল হ'ত না তাঁর মোটেই। হিন্দু-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে বেদের পক্ষ নিয়ে দুর্ধর্ষ যোদ্ধার মতো তিনি নির্ভয়ে লড়ে যেতেন। বিদেশী প্রচারকদের বিদ্বেষের আঘাত সহ্য ক'রে যাবার মতো লোক তিনি ছিলেন না, সমভাবে প্রত্যাঘাত করতেন তাঁদের। খৃষ্টান প্রচারকেরা হিন্দুধর্মের ওপর যে আক্রমণ চালাত, তার প্রত্যুত্তরে তিনিও খৃষ্টধর্মের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতেন। কোনরূপ হীনম্মন্যতা তাঁর ছিল না। মুসলমান

ধর্মের বিরুদ্ধাচরণেও তিনি ছিলেন কৃতসঙ্কল্প। প্রধানতঃ যোদ্ধা ছিলেন ব'লে সামনাসামনি একহাত না ল'ড়ে কারও সঙ্গে আপস করতে চাইতেন না তিনি। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও অভ্রান্ততা-স্বীকারে এবং পুনর্জন্মবাদ-স্বীকারে তাঁর মতে মত দিতে পারেননি ব'লে ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গেও তিনি হাত মেলাতে পারেননি। তাছাড়া হিন্দুধর্মের বৈদিকযুগোত্তর ক্রমোন্নতিতে কোন শ্রদ্ধা ছিল না তাঁর। যথার্থ বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণার সঙ্গে না মিললে তিনি অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রচারিত বৈদিক ধর্মমতের সমালোচনা করতেন নির্মমভাবে।

নিজের মতো ক'রে তিনি বেদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। নিজ মতানুগ শুদ্ধ বৈদিক ধর্মের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অতি প্রবল। অদ্বৈতবাদীর নির্গুণ ব্রহ্মের কোন স্থান ছিল না তাঁর ধর্মে, সাকারবাদীর বহুনামরূপ-বিশিষ্ট উপাস্যেরও না। তাঁর এই 'কালাপাহাড়ী' মনোভাবের জন্য স্বাভাবিক নিয়মেই হিন্দুসমাজ-সীমার বাইরে এসে দাঁড়াতে হ'ল তাঁকে, আর্যসমাজকে দাঁড় করাতে হ'ল আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে।

সামাজিক প্রথার আমূল পরিবর্তন-সাধনও শুরু হ'ল এই ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। ধর্মের অঙ্গ হিসাবে জাতিভেদ-প্রথা পরিত্যক্ত হ'ল, বেদের অধিকারী হিসাবে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য অস্বীকৃত হ'ল, এবং স্ত্রীলোকদের মুক্তি দেওয়া হ'ল বহু সামাজিক অক্ষমতার হাত থেকে। তাছাড়া শিক্ষাবিস্তার এবং অন্যান্য বহুমুখী জনহিতকর কর্মসাধনে উৎসাহ আর্যসমাজের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

বেদের প্রতি একদেশী মনোভাবের জন্য আর্যসমাজের ভেতর বহু দোষ এসে ঢুকেছিল! কিন্তু এ আন্দোলনটি যে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ সুরের পর্দাতেই লহরী তুলেছিল, তাতে সন্দেহের কিছু নেই। আর এইজন্যই জাতির ধর্মপ্রেরণার মর্মপ্রদেশে গভীরভাবে তা গেঁথে গিয়েছিল। তাছাড়া সাকার-উপাসনার প্রথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ব'লে আধুনিক চিন্তাশীলদেরও রুচিগ্রাহ্য হ'তে পেরেছিল। মূর্তিপূজার পরিবর্তে অগ্নিতে আহুতি-প্রদানরূপ বৈদিক যজ্ঞের প্রচলনও একটা রোমাঞ্চকর আকর্ষণের সৃষ্টি করে। শেষকথা, সমাজ-প্রথার আমূল পরিবর্তন-সাধন তৎকালীন মনোভাবের সর্বথা অনুকূলে গিয়েছিল। এই সব কারণে আর্যসমাজের দীক্ষাদানের প্রয়াস খুব সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। সমগ্র আর্যাবর্তে, বিশেষ ক'রে পঞ্জাব-প্রদেশে, এই নতুন ধর্ম দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ে। অল্প কয়েক দশকের মধ্যে কয়েক লক্ষ লোক আর্যসমাজে দীক্ষা গ্রহণ করে। এভাবে ভারতের একটি অতি বিস্তৃত অঞ্চলে বিদেশী সংস্কৃতির ধ্বংসাত্মক আক্রমণ প্রতিহত ক'রে আর্যসমাজ এদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিপুল সাফল্যের অধ্যায় রচনা ক'রে রেখেছে।

থিওজফিক্যাল সোসাইটি

ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে বিদেশাগত আর একটি ধর্মান্দোলনের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে; সেটি হচ্ছে থিওজফি-আন্দোলন। পূর্বোক্ত হিন্দু-আন্দোলনগুলির মতো তারও প্রভাব সে সময় খৃষ্টধর্মের ও জড়বাদের আক্রমণ কিছুটা প্রতিহত করেছিল। সোয়েডেনবার্গ, মেষ্টার একহার্ট, জ্যাকব বোমে, শেলিং, ব্যাডার ও মলিটর নামক যশস্বী মনীষিগণ কর্তৃক এই মতবাদ ইওরোপে প্রবর্তিত ও পুষ্ট হয়। অবশ্য রাশিয়ান মহিলা ম্যাডাম ব্লাভাটাস্কী এবং সেনাবিভাগের একজন পূর্বতন ইংরেজ অফিসার

কর্ণেল অলকট-এর প্রচেষ্টাতেই এই আন্দোলনটি অপরকে স্বধর্মে দীক্ষিত করার মতো শক্তিশালী মতবাদে রূপায়িত হয়েছিল। এর ধারাবাহিক সুনিয়ন্ত্রিত প্রচারের জন্য তাঁদের প্রচেষ্টাতেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে একটি থিওজফিক্যাল সোসাইটিও স্থাপিত হয়।

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের রহস্যঘন নিগূঢ় তথ্যরাজি থেকে প্রভূত উপাদান সংগ্রহ ক'রে, এবং হিন্দুদের ও আধুনিক অধ্যাত্মবাদীদের রীতির অনুকরণে তাকে মার্জিত ক'রে প্রবর্তকগণ থিওজফির বহিরঙ্গে একটি প্রাচ্য-ভাবের ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের হাজার হাজার লোক যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের দলে। রহস্যময়তা অটুট রেখে নিজ মতবাদকে বিচারসম্মত ক'রে তোলার জন্য তাঁরা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দুধর্মতত্ত্বের কয়েকটি উচ্চ আদর্শ মিশিয়ে অদ্ভুত এক ভাব-সংমিশ্রণ তৈরী করেছিলেন। আধুনিক অধ্যাত্মবাদের চিন্তা-প্রণালীর ও নিয়মপদ্ধতির রহস্যময়তার সুগন্ধও একটু মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে।

সম্পূর্ণ বিদেশাগত এবং বহু ভাবের বিচিত্র সংমিশ্রণে গঠিত হলেও এর প্রভাব ভারত-বাসীদের ওপর যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। একদল শিক্ষিত ভারতবাসী দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক ভাষা ও অলৌকিকত্বের সঙ্গে নিজ ধর্মবিশ্বাস জড়িত রাখতে চাইতেন। অদ্ভুত আনন্দ পেতেন তাঁরা এতে। এই জাতীয় লোক সহজেই আকৃষ্ট হলেন এই মতবাদের প্রতি। তাঁরা দেখলেন, থিওজফি তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কৃত্রিম ঠাটটুকু রক্ষা ক'রে বুদ্ধিজ আনন্দও দিতে পারবে, আবার রহস্য-প্রিয়তার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার খোরাকও জোগাতে পারবে সেই সঙ্গে। কাজেই এ আন্দোলনটির প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে নাস্তিক বা খৃষ্টান হওয়ার হাত থেকে কোন রকমে বেঁচে গেলেন তাঁরা।

সমাজ-সংস্কার বিষয়ে অবশ্য থিওজফি হস্তক্ষেপ করেনি, বে-পরোয়া ভাবে কোন সমাজ-প্রথার পরিবর্তন-সাধন করতে যায়নি। এইজন্যই হিন্দুসমাজে থেকেও থিওজফি নিয়ে মাথা ঘামাতে কোন বাধা ছিল না। এই অভিনব ধর্মমতটিকে নিজের ঘরে স্থান দেবার মতো পরিসর হিন্দুধর্মের যথেষ্টই ছিল। তাছাড়া ব্যাপকভাবে হিন্দুশাস্ত্রের সানুবাদ প্রকাশনের মাধ্যমে থিওজফিক্যাল সোসাইটি হিন্দুধর্মের জন্য কিছু যথার্থ কাজও করেছিল। শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের হৃদয়ে স্বধর্মে শ্রদ্ধা পুনরুজ্জীবিত করার কাজে তার অবদান বাস্তবিকই অনেকখানি।

বহুধর্মের সার-সঙ্কলনে গঠিত ও নতুন মত ব'লে প্রতীত হলেও থিওজফি এভাবে এদেশে যে আন্দোলনের ঢেউ তুলেছিল, তা হিন্দুসমাজে শুভ ফলই প্রসব করে। সে দিক দিয়ে দেখলে বলা যায় যে, হিন্দুধর্ম-সংস্কারের আন্দোলনগুলির সঙ্গে তার সাদৃশ্য ছিল অনেক-খানি, নাস্তিকতার ও খৃষ্টধর্মের আক্রমণ থেকে হিন্দুদের—বিশেষ ক'রে দাক্ষিণাত্যবাসীদের বাঁচিয়েছিল সে; যেমন ক'রে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ বাঁচিয়েছে আর্যাবর্তবাসী হিন্দুদের।

[ক্রমশঃ]*

*The Cultural Heritage of India—(Sri Ramakrishna Centenary Memorial Volume) এর প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ প্রবন্ধ Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক অনূদিত। দেহত্যাগের পূর্বে লেখক অনুবাদের প্রথমাংশ দেখিয়া অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন।

তুমি শুক্লা ফাল্গুনী দ্বিতীয়া !

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্রী

আমার শরীর ঘিরে পরিপূর্ণ প্রাণের স্পন্দন,
আমার দু-চোখ ভ'রে আলোকের শরীরী প্রতিমা :
অবধার্য সীমারেখা, অবচ্ছেদি পৃষ্ঠার বন্ধন
উন্মোচিল ইতিবৃত্ত অলৌকিক আপন মহিমা।
পুরাতন পৃথিবীর তন্দ্রালীন রাত্রি-অবশেষে
উন্মুখ উষার তীরে অরুণের দীপ্ত বর্তি নিয়া,
অভীপ্সার নব বেদ-বন্দনার সুরের আবেশে
ব্যাপ্ত হ'লে শুচিস্মিতা তুমি শুক্লা ফাল্গুনী দ্বিতীয়া।

আত্মার শাশ্বত সুরে নবজন্ম মোর কবিতার :
উদ্গীত আমার কণ্ঠে অনাহত প্রাণের প্রণব ;
উজ্জীবিত হৃদয়ের মুকুলিত স্বপ্নের সম্ভার,
শতাব্দীর সম্ভাবনা—প্রত্যাশার অনন্ত বিভব।
মূর্তিমতী হে দ্বিতীয়া, হে সাবিত্রি, মনোময়ী প্রিয়া,
মনের মুকুরে তুমি পৃথিবীর হৃদয় জানিলে ;
তিমিরের তন্দ্রা ভাঙি—'জন্মদিন'—নবজন্ম দিয়া
চিরন্তনী অধরার সন্ধানেরে নিকট করিলে।

আঁধার হইতে আরো আঁধারেতে ছিল যেই গতি,
তামসী রাত্রির পথে অদ্বিতীয়া তুমি দীপান্বিতা,
আতুর আঁধারী জীবে দীপ ধরি দেখাইলে পথি,
জন্মদিন—তব শিশু শুনাইল জীবনের গীতা।
তাই আমি পথ চলি চিনে চিনে তোমার প্রদীপে
সংশয়-সন্দেহলীন পথে আঁকা জীবন্ত স্বাক্ষর ;
জীবন-জলধি ঘিরে অজানিত প্রাণ-অন্তরীপে,
পিছে ফেলি প্রতিদিন কত বন, কত মরু-চর।

আলোর প্লাবন তব ভেঙে দেছে মোর যত বাঁধ,
রুদ্ধ স্রোত খুলে দেছে মুক্ত ধারা মোর চারিদিক ;
চিত্ত আজি বিত্তবান্ শির-শীর্ষে ধ্রুব আশীর্বাদ,
বক্ষে বহি বহ্নি-শিখা আমি যাত্রী চলেছি নির্ভীক।
জন্মান্তের সঙ্গে আনা, আমার সে ভালবাসা-প্রেম,
সমগ্র চেতনা চিন্তা অনুভূতি—এষণা উথল,
আমার সাধনা দিয়ে, দিয়ে প্রাণ যাহারে পেলেম,
তারি ছন্দ গন্ধ আলো পৃথিবীরে করুক উজল।

বিশ্বকল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণের দান

শ্রীকৈলাসচন্দ্র কর

ধর্মই ভারতীয় ভাবধারার সনাতন গতি-নিয়ামক। বলিষ্ঠ ধর্ম জ্ঞানাশ্রয়ী। তাই নিরন্তর অজ্ঞানান্ধকারের বিরুদ্ধে জ্ঞানালোকের সাধনায় নিমগ্ন অর্থাৎ 'ভা-রত' বলিয়া এদেশের নাম ভারত। কিন্তু উত্থান-পতনের স্বাভাবিক নিয়মে এই 'ভা-রত' ভারতেও পর্যায়ক্রমে ধর্মের অভ্যুত্থান ও অধঃপতন ঘটিয়া আসিতেছে। তবে আশার কথা এই যে, যখনই কোন 'দানবোথা' বাধা বা 'ধর্মের গ্লানি' উপস্থিত হয়, তখনই আবির্ভাব ঘটে এমন কোন শক্তিধর পুরুষের, যিনি স্বকীয় মহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন মহামানবের আসনে এবং বিস্ময়-বিমূঢ় মানব তাঁহাকে ভগবৎ-সত্তার বিশেষ প্রকাশ জ্ঞানে শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে জানায় প্রণতি। ঊনবিংশ শতকে বর্ণাঢ্য পাশ্চাত্য ভাবধারার প্লাবনে এদেশে ঘটিয়াছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং তাহারই পটভূমিকায় অবতীর্ণ হন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচ্যের সাধনার অপূর্ব প্রতীকরূপে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-কাহিনী আজ সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় তাঁহার জীবনের স্বরূপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে :

The life of Sri Ramakrishna was an extra-ordinary search-light under whose illumination one is able to really understand the whole scope of Hindu religion. He showed by his life what the Rishis or Avataras really wanted to teach. The books were theories, he was the realisation. The man had in fifty-one years lived the five thousand years of national spiritual life, and so raised himself to be object-lesson for future generations.

—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অনন্যসাধারণ সন্ধানী আলোর উজ্জ্বল প্রভায় মানুষ হিন্দুধর্মের সমগ্র পরিসর সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে সমর্থ হয়। ঋষি ও অবতার-পুরুষগণ বাস্তবিকপক্ষে যাহা শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার জীবন দ্বারা তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ধর্ম-গ্রন্থগুলি মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদের সমষ্টি; কিন্তু তিনি ছিলেন তাহাদের বাস্তব রূপায়ণ। তিনি তাঁহার একান্ন বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে জাতীয় জীবনের পাঁচ হাজার বৎসরের আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি দ্বারা ভবিষ্যৎ মানবের জন্য নিজেকে আদর্শ দৃষ্টান্তে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জীবন ছিল যেমন অলোকসামান্য, তাঁহার অবদানও ছিল ঠিক তদনুরূপ। অপরাপর ধর্মগুরুগণ নিজ নিজ নামাঙ্কিত বিশেষ ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতকের এই মহান্ ধর্মগুরুর কার্যক্রম ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি এই 'ইজ্‌ম্' বা মতবাদ-কণ্টকিত পৃথিবীতে নূতন কোন 'ইজ্‌ম্' বা মতবাদ প্রচার করিয়া অধিকতর বিভেদসৃষ্টির পথ প্রশস্ত করেন নাই। বিভিন্ন ধর্মীয় বা দার্শনিক মতবাদের মধ্যে যে পারস্পরিক সংগ্রামশীলতা রহিয়াছে তাহা বিদূরিত করিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল করিয়া তুলিবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার এই অভিনব অবদান বিশ্বকৃষ্টিকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন করিয়া বিশ্বশান্তির পথ সুগম করিতেছে।

তিনি নিজ জীবনে কেবল হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা ও দ্বৈত অদ্বৈত দার্শনিক মতবাদেরই নহে, পরন্তু খৃষ্টীয় এবং মহম্মদীয় ধর্মেরও সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সকল ধর্মীয় মতেই সত্যের স্ফুলিঙ্গ নিহিত রহিয়াছে এরূপ সাধারণ শিষ্টাচার-সঙ্গত কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তদ্ভাবভাবিত-সাধনা-জাত উপলব্ধির ফলে তাহাদের প্রত্যেকটিই যে একক ও সামগ্রিকভাবে সত্য, একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বর-লাভের জন্য আবহমান কাল হইতে যে প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সাধারণভাবে বলা যায় —Eternal Religion বা শাশ্বত ধর্ম। সেই প্রচেষ্টার বিশেষ বিশেষ পন্থা হিসাবে সকল ধর্ম বা দার্শনিক মতবাদই সেই শাশ্বত ধর্মের অঙ্গীভূত। শ্রীরামকৃষ্ণ এই 'যত মত তত পথ' মন্ত্রের উদ্গাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ী ধর্মের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাহা কার্যকর। সকল ধর্ম যেমন মূলতঃ এক, তেমন যাহাদের ভিতর দিয়া এই সকল ধর্ম অভিব্যক্তি লাভ করে, নানারূপ বৈষম্যসত্ত্বেও সেই মানবজাতিও মূলতঃ এক। আত্মোন্নতি বা ক্রমবিকাশ সব ক্ষেত্রে এক তালে চলে না এবং সেইজন্যই প্রকৃতির রাজ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ, সেখানে একঘেয়ে সমতার স্থান নাই। কিন্তু এই যে বৈচিত্র্য তাহার ধারকরূপে রহিয়াছে এক শাশ্বত সত্তা—ঠিক চলচ্চিত্রের পর্দার মতো, যাহার উপর অনুক্ষণ পরিবর্তনশীল আলোক-পাত সত্ত্বেও তাহার স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী ভাবধারার অনুবৃত্তিক্রমে বহুর মধ্যে একের বা মৌলিক ঐক্যের এই যে জ্ঞান, একমাত্র তাহাই বর্তমান জাতিধর্ম-বিদ্বেষ ও আত্মকেন্দ্রিকতার দ্বারা বহুধা-বিচ্ছিন্ন মানবজাতির মধ্যে প্রেমের যোগসূত্র স্থাপন করিতে সক্ষম। এই জ্ঞান ব্যতিরেকে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বুলি নিতান্ত মৌখিক ও ভিত্তিহীন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আর একটি দান তাঁহার সামাজিক উদারতা। জ্ঞানাশ্রয়ী প্রেমের সাধনার উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা। ইহা দ্বারা তিনি মানুষের পারস্পরিক বা সামাজিক সম্পর্ককে প্রীতির বন্ধনে পরিণত করার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। অদ্বৈত-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন লীলার মধ্যে নিত্যের প্রকাশ এবং তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল শঙ্করের জ্ঞান ও চৈতন্যের প্রেম—এই দুয়ের অপূর্ব সমাবেশ। তাই প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে মানব-সাধারণের প্রতি ছিল তাঁহার শিবজ্ঞানে জীবসেবার নির্দেশ—যাহা মানুষে মানুষে, প্রাণীতে প্রাণীতে, পারস্পরিক সম্পর্কের মহত্তম আদর্শ স্থাপন করিয়াছে।

ব্যক্তিজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ দান—ধর্ম-ভিত্তিক জীবনাদর্শ। তিনি স্বীয় জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন যে মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবান-লাভ। মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করিতে শিখুক, ভগবানকে লাভ করিতে চেষ্টা করুক, এই তাঁহার উপদেশ। কিন্তু তিনি সকলের জন্য একটিমাত্র নির্দিষ্ট পন্থার ব্যবস্থা করেন নাই। বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তিনি প্রতিভাত হইতেন বিভিন্নরূপে—বহুরূপীর মতো, এবং তাহাদের ভাবানুযায়ী প্রেরণা দান করিতেন। কিন্তু যে যে-ভাবেই অনুপ্রাণিত হউক না কেন, সিদ্ধি-লাভের উপায়স্বরূপ তিনি সকলকেই মন-মুখ এক করিয়া সরল হইতে, ভগবানে মন ন্যস্ত

রাখিয়া সংসারে কাজ করিয়া যাইতে, কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পাঁকাল মাছের মতো সংসারের কাদামাটি হইতে মুক্ত থাকিতে এবং স্ত্রী-জাতিকে মাতৃ-ভাবে দর্শন করিতে বলিয়াছেন এবং নিজের জীবনে সেই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন।

অবশেষে শিক্ষাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, চালকলা-বাঁধা বিদ্যায় আমার প্রয়োজন নাই। কথাটি নিতান্ত সাদাসিধা রকমের হইলেও ইহার তাৎপর্য গভীর। ইহা দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, শুধু ব্যাবহারিক জ্ঞান দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না; সুতরাং সেই বিদ্যা বিদ্যাই নহে। অবশ্য পার্থিব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য শিক্ষাকে ব্যবহারমুখী করা দরকার। স্বামী বিবেকানন্দও তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত-জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। তাহা না হইলে বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক জ্ঞানলব্ধ শক্তির মত্ততায় জীবনের মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইবে। বর্তমান জড়বাদী জগৎ তাহার জলন্ত উদাহরণ।

উপনিষদের ঋষির নির্দেশ: দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ। ভারত চিরদিন পরা বিদ্যার সহিত অপরা বিদ্যারও সাধনা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু পরা বিদ্যার সহায়ক ও অনুসারীরূপে। শুধু প্রয়োজনের গণ্ডির মধ্যেই তাহা ছিল সীমাবদ্ধ; কখনই তাহা খুব গৌরবের আসন লাভ করিতে পারে নাই। মহাভারতে ইন্দ্রপ্রস্থ-নগরের স্থপতির কলা-কৌশলের প্রশস্তি আছে, কিন্তু সেই ব্যক্তিটি 'দানব'-আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছেন; 'ময়দানব'-রূপেই তাঁহার পরিচয়।

আধুনিক কালের মানুষ টেক্‌নোলজির মধ্যেই খুঁজিতেছিল তাহার নূতন দিনের স্বর্গকে; কিন্তু দৈত্যরূপী ফ্র্যাঙ্কেনস্টিনের—আণবিক শক্তির—আবিষ্কারের পর হইতে তাহার সর্ব-প্রকার স্বাধীনতাকে বিপন্ন দেখিয়া আজ সে বুঝিতে পারিতেছে যে, ধর্মের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে তাহার নবজীবনের সমুদয় সম্ভাবনা।

ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা বলিতে কোন আত্মকেন্দ্রিক মতবাদ বা আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি বুঝাইতেছে না, বুঝাইতেছে স্বামী বিবেকানন্দ-নির্দেশিত বেদান্তজ্ঞানের কথা, যাহা সকল শক্তির উৎস এবং যাহা মানুষের মন হইতে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সর্বপ্রকার দুর্বলতা দূরীভূত করিয়া সৃষ্টি করে এমন এক নূতন মানুষের, যাহার প্রয়োজন আমাদের ঘরে ঘরে। এই ধর্মকে বলা যায় 'মানবধর্ম'। ভবিষ্যৎ মানবকে এই ধর্মে বিশ্বাসী করিয়া তুলিতে হইলে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুযায়ী ইহাকে শিক্ষা-সূচীতে বিশিষ্ট স্থান দিয়া শিক্ষার্থীকে চরিত্রবলে বলীয়ান্ করিয়া তুলিতে হইবে। একমাত্র ধর্মনিষ্ঠ ও চরিত্রবান্ ব্যক্তির হাতেই বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক জ্ঞান মানবজাতির কল্যাণপ্রদ হইতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সরল বিশ্বাসের সঙ্গে ঘটিয়াছে অভিজ্ঞতার অপূর্ব মিলন, দার্শনিক মতবাদ হইয়াছে কার্যকর ধর্মে (Practical Religion-এ) রূপান্তরিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাময় জীবনই তাঁহার বাণী। দেশের সমুদয় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যে সকল তরুণ-প্রাণের উপর ন্যস্ত, তাহাদিগকে তাঁহার এই জীবন্ত বাণী হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিতে হইবে।

শিশু-শিক্ষা

শ্রীমতী রেণুকা সেন

শিশুর জন্মের পর থেকেই তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ; শিশুর স্বভাব বা প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে তার অভ্যাস ও চিন্তাধারা সৎপথে চালিত করা প্রত্যেক পিতা-মাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্তব্য। মনোবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শিক্ষাবিদ্ ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ আজ বুঝতে পেরেছেন যে, শৈশবের অভিজ্ঞতার উপরেই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গ'ড়ে উঠে। তার মধ্যে আবার প্রথম পাঁচ-ছ বছরের মূল্য অতুলনীয়। 'লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি'—এই শাস্ত্র-বাক্যানুসারে প্রথম পাঁচ-ছ বছরের লালনের মাধ্যমে শিক্ষাই শিশুর সারা জীবনের ভিত্তিস্বরূপ।

বর্তমান শতাব্দীতে তাই পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষাবিদ্‌গণ শিশুশিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য শিক্ষাকে 'শিশুকেন্দ্রিক' ক'রে গ'ড়ে তোলার আশায় আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, আর সুফলও পেয়েছেন। অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন দেশের মনীষীরা মানব-জীবনের শৈশবকালকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। গ্রীস দেশের কয়েকজন মনীষী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ব'লে গেছেন যে, যে দেশ শিশুশিক্ষাকে অবহেলা করে, সে দেশে কখনও উৎকৃষ্ট জাতি গ'ড়ে উঠতে পারে না। তাঁরা বলেছেন যে শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক ক'রে তৈরী করার ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত।

আধুনিক কালে শিশুশিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা ফ্রোয়েবেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানির এক ক্ষুদ্র গ্রামে ফ্রোয়েবেল জন্মগ্রহণ করেন। নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ হ'য়ে অবশেষে তিনি জঙ্গল-পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত হন। তখন থেকেই প্রকৃতি-মাতার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে এবং তিনি শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করতে মনস্থ করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রোয়েবেল কিণ্ডারগার্টেন অর্থাৎ 'শিশু-কানন' —এই নাম দিয়ে শিশুদের উপযোগী একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। 'শিশু-কানন' সংজ্ঞা দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বাগানের চারাগাছ যেমন উপযুক্ত জল, হাওয়া, মাটির রস আর রোদ পেলে আপনিই বেড়ে ওঠে, তেমনি শিশুরাও উত্তম পরিবেশে স্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পাবে। ফুল যেমন বাগানে ফোটে তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের নিয়মে, শিশুও তেমনি কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে তার নিজস্ব শক্তির প্রকাশ করবে আপনার স্বাভাবিক নিয়মে, অনুকূল পারি-পার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ; জোর ক'রে ফোটাতে গেলেই সে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়বে।

এর পর আমরা আসি 'মন্তেসরি' প্রণালীর যুগে। মাদাম মন্তেসরি (Madame Montessori, ১৮৭০-১৯৫২ খৃঃ) ছিলেন ফ্রোয়েবেলের সুযোগ্যা উত্তরাধিকারিণী। ফ্রোয়েবেলের প্রধান শিক্ষা ছিল যে শিশু-প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে তবেই তার সম্পূর্ণ বিকাশ-সাধনে অগ্রসর হওয়া শিক্ষকের কর্তব্য। মাদাম মন্তেসরিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাকালে শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের নিজের কাজ ক'রে যাবে। শিক্ষিকা শিশুর প্রয়োজন মতো তাকে সাহায্য করবেন, নির্দেশ দেবেন মাত্র ; কিন্তু তার কোন

প্রচেষ্টায় বাধা দিতে পারবেন না। শিশু তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা মন্তেসরি-উপকরণগুলির সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবে, শিক্ষিকাকে সেইজন্য আগে থেকেই শিক্ষা-সম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশ (environment with educational possibilities) রচনা ক'রে রাখতে হবে এবং তারই ফলে শিশুর আনুভূতিক, আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ হবে।

ফ্রোয়েবেল অপেক্ষা মাদাম মন্তেসরি শিশুদের স্বাধীনতা দিয়েছেন অনেক বেশী এবং ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষাদান-প্রণালীর প্রবর্তন তিনিই প্রথম করেন। শিশু স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাই তার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রচেষ্টাই ফলপ্রসূ হ'তে পারে না। সুতরাং বিংশ শতাব্দীকে 'শিশুর শতাব্দী' আখ্যা দিয়ে সমস্ত সভ্য দেশই যে আজ শিশুশিক্ষার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হ'য়ে উঠেছেন, সেটা অত্যন্ত আনন্দ ও আশার বিষয়।

ভারতবর্ষে প্রগতিশীল শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথেরও দান অপরিসীম। শিশু-মন কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে, তাঁর শত শত গানে ও কবিতায় সে কথা তিনি ঘোষণা ক'রে গেছেন। শিশুর জীবন কিভাবে প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দর্যের সঙ্গে, মানুষ ও সমাজের সঙ্গে এবং পরিশেষে স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে রয়েছে, তা তিনি নিজে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মা ও শিশুর স্বাভাবিক সম্পর্কের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তাঁর 'শিশু' কবিতা-গ্রন্থের পাতায় পাতায় তার অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

মায়ের সঙ্গেই শিশুর যত আদর-আবদার, ভাব-বিলাস আর কল্পনা! মাকে কেন্দ্র করেই শিশুর মনের স্বপ্ন সার্থক হ'য়ে ওঠে। তাই শিশুর বিচিত্র মনের সন্ধান মাকেই প্রথমে রাখতে হবে। আশানুরূপ শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা যতদিন আমাদের দেশে না হচ্ছে, ততদিন শিশুশিক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব মাকেই নিতে হবে। ভূমিষ্ঠ হবার পর অসহায় শিশু নিকটতম নির্ভররূপে পায় তার মাকে। তাই মায়ের প্রতিই অধিকতর ভালবাসা ও আকৃষ্ট হওয়া শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। ঠিক এই কারণেই মায়ের সুষ্ঠু পরিচালনার ও তত্ত্বাবধানে শিশুর আত্মবিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করে। শিশু অমানুষরূপে গ'ড়ে ওঠবার প্রধানতম কারণ শৈশবে লালন-পালনে ত্রুটি ও পরিবেশের প্রতিকূলতা। তাই প্রয়োজন সুশিক্ষিতা সুদক্ষা ধৈর্যশীলা স্নেহময়ী মায়ের।

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সমানভাবে হচ্ছে কি না, তা প্রত্যেক পিতা-মাতারই লক্ষ্য রাখা উচিত। জন্মের পর থেকে শিশুর শারীরিক সুস্থতার দিকে যেমন নজর রাখা দরকার, ঠিক তেমনি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তার পারিপার্শ্বিকতার ওপর। কারণ, শিশুর মানসিক বিকাশ প্রধানতঃ নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপরেই। এই পরিবেশ সৃষ্ট হয় দু জায়গায়—এক গৃহে আর এক বিদ্যালয়ে। তাই গৃহের সঙ্গে বিদ্যালয়ের আর অভিভাবকের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংযোগ প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শিশুর মঙ্গলার্থে অভিভাবক ও শিক্ষক এক আদর্শ নিয়ে যদি পথ চলতে পারেন, তবে ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে, কারণ সু-নাগরিকের ওপরেই তো সমাজ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করছে।

মা ও ছেলে

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী

মথুরানাথের অচলা ভক্তি,—করেছে সমর্পণ
শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণকমলে আপনার প্রাণ-মন।
ঠাকুরের মাঝে মূর্ত দেখেছে জগজ্জননী কালী,
তাঁহার সেবায় দেয় অকাতরে আপন অর্থ ঢালি।
ভাবিছে মথুর : বিশাল বিত্ত অথবা কণিকা তার
'বাবা'র চরণে দিতে পারি যদি, সার্থক হবে ভার।
সংশয় পুন জাগিতেছে মনে : ঠাকুর লবে কি বিত্ত,
মাটি আর টাকা দুই যাঁর সম, শিশুর সমান চিত্ত?
আহার-নিদ্রা যে জন ভুলেছে, পাগল মায়ের গানে—
বিষয়ের কথা বলিলে কি তাহা উঠিবে তাঁহার কানে?

তথাপি একদা আবেগের ভরে হৃদয়ের অভিলাষ
জানালো ঠাকুরে ; পলকের মাঝে ঘটিল সর্বনাশ!
বিষয়ের নামে (যেন) লাঠির আঘাতে ঠাকুর মূর্ছা যায়,
—সুস্থ হইলে ভয়েতে মথুর পলায়ে রক্ষা পায়।
সেই দিন হ'তে বিষয়ের কথা ঠাকুরে কহে না আর,
মনে জানে সদা বিষয়-বিত্ত সকলি ব্যর্থ তার।
চিত্ত তাহার শান্তি মানে না, ঠাকুর নিলে না দান!
শয়নে স্বপনে, দিবসে নিশিতে, ভাবনা নাহিক আন।
অবশেষে ভাবে, চন্দ্রাদেবীরে দিবেক বিত্ত ধন,
জননীরে দিয়ে দিবে সে পুত্রে,—পূরাবে আকিঞ্চন।

ভূমিতে লুটায়ে প্রণমি কহিলা, 'ঠাকুমা, একটি কথা—
তোমায় আজিকে রাখিতেই হবে, নহিলে পাইব ব্যথা ;
মোর হাত হ'তে লবে কিছু দান, যেমন ইচ্ছা হয়,
তোমাকে অদেয় কিছু নাই মোর।' চন্দ্রাজননী কয়—
'কিবা নিব ভাই, সকলি তো আছে, কিছুরই অভাব নাই,
যখনি যা লাগে, তোমার আদেশে, তখনি পেতেছি তাই।'
এবারে মথুর নাছোড়বান্দা, কহিল, 'নিতেই হবে।'
গদাই-জননী কহিলা হাসিয়া, 'দিবে যদি দাও তবে—
তামাকের পাতা একটি আনিয়া, দাঁতের নাই যে গুল।'
শুনিয়া মথুর শিরে হানে কর—হায়রে আবার ভুল!

এমনি মায়ের এমনি পুত্র, বিষয়-বাসনাশূন্য,
এই ভারতের মাটিতেই ঘটে এমন কাহিনী পুণ্য।

ব্যক্তি-সত্তা ও বৃহৎ চৈতন্য

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

ব্যক্তি একরূপে একক, নিঃসঙ্গ, ক্ষুদ্র চৈতন্যের অধিকারী। আর একরূপে সে সামাজিক; তার চেতনার ব্যাপ্তি বিশ্বময়—এই প্রসারিত ব্যক্তি-সত্তাকে বলা চলে বিশ্বরূপ। সভ্যতার আদি যুগ থেকে মানুষের সকল প্রয়াস নিযুক্ত হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিচৈতন্যের পরিধি থেকে মুক্ত হ'য়ে বৃহৎ চৈতন্যময় সত্তায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনায়। এই সাধনার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; কঠিন কঠোর কণ্টকাকীর্ণ সে পথের রেখা 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।' এই দুস্তর পথের যাত্রী ব্যক্তিমানব সকল বাধা অতিক্রম ক'রে বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছেন, আর নিজের মধ্যে মহাশক্তির লীলা অনুভব ক'রে ব্যক্তিচেতনায় বিমূঢ় ক্ষুদ্র মানুষকে শুনিয়েছেন মহৎ জীবনের বাণী। অধিকাংশ ব্যক্তিস্বার্থমগ্ন মানুষের মধ্যে বাস করেও এঁরা তাই মহামানব—এঁরা দেশোত্তীর্ণ, কালোত্তীর্ণ; সমগ্র বিশ্ব এঁদের দেশ, অখণ্ড কালের এঁরা সাক্ষী। এঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেন, প্রচলিত সংস্কার ও জীর্ণ জীবনধারাকে আঘাত ক'রে এঁরা সমাজকে ক'রে তোলেন সজীব ও সচল। এঁদেরই বৃহৎ চেতনাস্পর্শে সমস্যাজর্জর মানুষ যুগে যুগে নতুন পথের ইঙ্গিত পেয়েছে, সমকালীন সীমায়িত জীবনদৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রে বৃহৎ জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে নতুন জীবনের বাণী শুনিয়ে মানবেতিহাসে যাঁরা অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন বুদ্ধ, খৃষ্ট, জরথুষ্ট্র, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি মহামানব। ভিন্ন যুগে ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেও দুর্লভ জীবনসাধনার সাহায্যে এঁরা যে সত্য লাভ করেছিলেন, বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের জীবন কার্যতঃ না হোক, বাহ্যতঃ সে জীবনদর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এমনি একজন বৃহৎ-চৈতন্যময় মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমাদেরই বাঙলা দেশে—যিনি সমকালীন জড়তাগ্রস্ত দেশবাসীর কানে মহৎ জীবনের বাণী শুনিয়ে জীবনকে জাগিয়ে তুললেন ব্যক্তিসত্তাব পূর্ণতর উপলব্ধিতে। ইনি হলেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনা মুখ্যতঃ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি ও সে শক্তির জাগরণের সাধনা। শতাধিক বৎসরের বিদেশী শাসনের ফলে দেশবাসী তখন আত্মপ্রত্যয়হীন, নিবীর্য। অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা, নিঃসীম দারিদ্র্য, বিদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ অনুরাগ এবং দেশীয় সুপ্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি বিজাতীয় অশ্রদ্ধা প্রবল অক্টোপাসের মতো ভারতীয় জীবনকে তখন চেপে ধরেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনদ্রষ্টা শক্তিমান্ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দেখলেন, ভারতবাসীকে জড়তামুক্ত করতে হ'লে প্রথমেই দরকার ব্যক্তি-সত্তার মহিমার প্রতি তার বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সে বিশ্বাস, সে আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হয় বাইরের কোন বৃহত্তর শক্তির আশ্রয়ে নয়, ব্যক্তির মধ্যে যে অনন্ত শক্তির উৎস আছে সে শক্তির উপলব্ধিতে ও উদ্বোধনে। সবল কণ্ঠে বীর সন্ন্যাসী শুনিয়েছিলেন তাই দুর্বল আত্মবিশ্বাস-হীন জাতিকে সেই পরম বিশ্বাসের বাণী।

'Never forget the glory of human nature! We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but the waves on the boundless ocean which *I am*.

ভারতীয় 'সোঽহম্'-তত্ত্বের এরূপ আধুনিক ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আর বোধ হয় শোনা যায়নি। তোমার নিজের ভিতরে ভগবানের যে অনন্ত বিভূতির প্রকাশ আছে, তাকে জাগ্রত কর। বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতিও ছিলেন অসীম সত্তা-সমুদ্রের ওপর তরঙ্গমাত্র। অন্তর্নিবিষ্ট সাধনার দ্বারা তাঁরা তাঁদের ব্যক্তি-সত্তার অনন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই তাঁদের ক্ষুদ্র সত্তা প্রসার লাভ করেছিল বৃহৎ চৈতন্যময় মহাসত্তায়। দেহধারী মানব হয়েও তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন দেশ-কালাতীত বিশ্বমানবের পর্যায়ে। অগণিত মানবজীবনের গতি দিয়েছিলেন তাঁরা ফিরিয়ে —সৃষ্টি করেছিলেন নতুন ইতিহাস!

ব্যক্তি-সত্তার ভিতর অমেয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখেছিলেন ব'লে স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান-দৃষ্টিতে ভগবান রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন 'বহুরূপে'। সমাজের যে কোন স্তরের লোক—সে যতই হেয়, যতই দরিদ্র ও নির্যাতিত হোক না কেন,—তার ভিতরকার আত্মার ঐশ্বর্য উপলব্ধি ক'রে স্বামীজী হয়েছিলেন সকল শ্রেণীর অবজ্ঞাত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত:

The only God in whom I believe, is the sum-total of all souls and above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races.

বৃহৎ চৈতন্যের অধিকারী না হ'লে অবাঞ্ছিত ও নির্যাতিত মানবতার প্রতি এরূপ প্রত্যয়শীল ভাবনা সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাই নবযুগের মানবতাধর্মের (New Humanism) প্রধান উদ্গাতা।

স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পরে আর একজন বাঙালী মনীষীর সীমায়িত ব্যক্তি-সত্তা জাগ্রত হয়েছিল বৃহৎ চৈতন্যের প্রভাবে—তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম যৌবনে বিশ্বচেতনার অনুভূতি তাঁর চিত্তে ভাবোচ্ছ্বাসিত রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও পরিণত বয়সে সে অনুভূতি একটি মননশীল রূপ পেয়েছে 'বিশ্বমানব' বা 'Universal man'-এর উপলব্ধিতে। বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে এক নিবিড় ঐক্যানুভূতি তাঁর কালজয়ী কবি-প্রতিভা ও ও শিল্পী-প্রতিভার বিকাশের মূলে। এই বৃহৎ চেতনার প্রভাবেই অতীতের সঙ্গে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে এক অখণ্ড মিলন-সূত্রে গেঁথে তিনি যে মহাজীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আজও আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করছে 'হিংসায় উন্মত্ত' বর্তমান পৃথিবীতে।

আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে বাঙলা দেশের পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বৃহৎ চেতনাময় এই দুই মহামানব, যাঁদের প্রসারিত প্রাণের স্পর্শে ধন্য হয়েছিল দেশ, ধন্য হয়েছিল জাতি, ধন্য হয়েছিল সমগ্র বিশ্বের মনুষ্য-সমাজ। বৃহৎ-চৈতন্যযুক্ত মহামানবদের স্মরণীয় ও বরণীয় জীবন অদৃশ্য সঙ্কেতে যেন আমাদের ডেকে বলছে:

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ!

মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের অধিকারী বর্তমান বাঙালী জাগরণের এ উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিবে না কী?

সৃষ্টিরহস্য-সূক্তমালা

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

'মহামৌনের প্রাক্‌কালে' নামক পুস্তকে পাশ্চাত্য মনীষী মেটারলিঙ্ক লিখিয়াছেন—পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর এ-যাবৎ মানব জীবন বা মৃত্যু, ঈশ্বর বা বিশ্বজগৎ, কাল বা আকাশ, অসীমতা বা চিরন্তনতা, পদার্থসকলের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য বা পরিণতি—কোন বিষয়ই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। সভ্যতার অগ্রগতির কথা বলা হয়—কিন্তু অজ্ঞেয়তা-বোধেরই শুধু অগ্রগতি হইয়াছে। নিখিলের স্বরূপ কি, কোথা হইতে ইহা আসিল, কোন্ দিকে ইহার গতি, এখানে আমাদিগের জীবনের সার্থকতা বা প্রয়োজন কি—এ সব প্রশ্নের উত্তরে আজিকার তুলনায় মানুষের জ্ঞান কখনই ন্যূন ছিল না। সম্ভবতঃ বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে এ সকল বিষয়ে আরও কমই আমরা জানিয়াছি; আবার যেখানে জানা হইয়াছে, সেখানে না জানি কি নিষ্ক্রিয় নৈরাশ্যই না আমাদিগকে অভিভূত করিবে? এই অসীম বিস্ময় ও অনির্বাণ কৌতূহলে বিজ্ঞানের জন্ম, জীবনের প্রেরণা, কল্পনার উল্লাস। ভারতীয় মনীষা এই বিশ্ববোধের উন্মেষে যে বিচিত্র প্রকাশে বিস্ফারিত হইয়াছিল, কয়েকটি বৈদিক সূক্ত তাহার অপূর্ব নিদর্শন। সৃষ্টির রহস্য, চৈতন্যের সর্বময়তা, সমাজ-বিন্যাস ও ধর্মের বিকাশ, দিব্য অনুভূতির স্ফুরণ এই সূক্তগুলির বিষয়-বস্তু। তাই শাশ্বত সাহিত্য-রূপে এগুলির মর্যাদা, ইহাদের প্রত্যেকটি ভূমার উপলব্ধিতে চিত্তকে উন্নীত করে।

নাসদীয় সূক্ত

(ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল, ১২৯ সংখ্যক)

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ
কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥ ১

তখন সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত দশায় সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, ভূলোক বা অন্তরীক্ষ (বায়ুমণ্ডল)-ও ছিল না, পরব্যোম (মহাকাশ)-ও ছিল না। কি আবরণ করিল, কোথায় বা তাহা অবস্থিত ছিল? কাহার জন্যই বা উহা (আবরণ ও আধার)? গহন ও গভীর সলিলরাশি কি (অখিল ব্যাপিয়া) ছিল?

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরং কিঞ্চনাস ॥ ২

মৃত্যু তখন ছিল না, অমৃত (মৃত্যুহীন প্রাণ)-ও ছিল না। দিবারাত্রির কোন বোধই ছিল না। সেই এক (পরমার্থ) সত্তা নিজ আশ্রয়ে (মায়ার সহিত অভিন্ন) থাকিয়া নির্বাত পরিবেশেও প্রাণক্রিয়া দ্বারা বর্তমান ছিলেন। তাহা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে-
ঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপসস্তন্মহিনাঽজায়তৈকম্ ॥ ৩

সৃষ্টির সেই পূর্বে অন্ধকারে আচ্ছন্ন অন্ধকারই ছিল। এ সকলই ছিল কারণরূপে অব্যক্ত কারণ-সলিল-আকারে। তুচ্ছপ্রায় ব্যাপক অজ্ঞানে সকলই পরিবৃত ছিল। তপস্যার (সৃষ্টি-সংকল্পের) মহিমায় সেই কারণে লীন তত্ত্ব তখন (নামরূপে) ব্যক্ত হইলেন।

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪

আদিতে উদ্ভূত হইল কামনা (সৃষ্টির ইচ্ছা), উহাই মনের প্রথম বীজ। যাহা কিছু পরে হইল, সে সকলের কারণ এই অব্যক্তে নিহিত ছিল। কবি (চরমদর্শী প্রাজ্ঞ)-গণ ইহা অন্তরে গভীর মনের দ্বারা জানিয়াছেন।

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষা-
মধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্
স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫

উহাদের কার্য জ্যোতিরেখার মতো মধ্যে, সকল পার্শ্বে, অধোদিকে বা ঊর্ধ্বে সকল দিকে প্রসৃত হইল কি? উহারাই (ভোক্তা জীবরূপে) কর্মবীজ নিহিত করিল, উহারাই মহিমা-সকল (ভোগ্যসমূহ) হইল—তন্মধ্যে স্বধা (অন্ন বা ভোগ্যনিচয়) হইল নিকৃষ্ট, আর বিধায়ক বা ভোক্তা জীব হইল উৎকৃষ্ট।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেন
অথা কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬

প্রকৃত তত্ত্ব কে জানে, কে বা বলিতে পারে —কোন্ উপাদান-কারণ হইতে জগৎ প্রকট হইয়াছে, কি নিমিত্ত কে এই বিচিত্র সৃষ্টি করেন? দেবগণও এই সৃষ্টির পরবর্তী। কেমন করিয়া অপর কেহ জানিবে কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি?

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭

যাঁহা (যে বিধাতা) হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি উৎপন্ন হইযাছে, এক তিনিই ইহা ধারণ করিতে পারেন, অথবা হয়তো পারেন না। যিনি ইহার কর্তা ও নিয়ন্তারূপে পরমব্যোমে (স্বয়ম্প্রকাশ-ভাবে) অধিষ্ঠিত, সেই বিশ্রুত পুরুষই সম্ভবতঃ এই তত্ত্ব জানেন কিংবা জানেন না।

হিরণ্যগর্ভসূক্ত

(ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল, ১২১ সংখ্যক)

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১

সৃষ্টির পূর্বে সম্ভূত হইলেন হিরণ্যগর্ভ (জ্যোতির্ময় সৃষ্টিবীজের মধ্যস্থ প্রজাপতি—হিরণ্যের মতো ভাস্বর ও সকলের উদ্ভাসক বিশ্বচৈতন্য)। তিনিই ভূতসমূহের (সৃষ্টির) প্রথম এবং জন্মিযাই নিখিলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক তিনি ধারণ করিলেন। হবির্দ্বারা অন্য কোন্ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিব?

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব
উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২

তাহা হইতেই সকল আত্মার উদ্ভব, তিনি বল দান করেন, নিখিল জীব এবং দেবগণ তাঁহার প্রশাসনের অনুবর্তী, অমৃত (সুধা বা

অমরতা) তাঁহার ছায়া, মৃত্যু (যম)-ও তাঁহার অনুগামী। অন্য কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

য়ঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা
এক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩

যাহারা প্রাণবান্ ও যাহারা নিমেষশীল সে জীবসকলের তিনি নিজ মহিমায় একমাত্র রাজা হইলেন। দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকল প্রাণীর তিনি শাসক প্রভু। অন্য কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা
যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪

হিমালয় পর্বতমালা যাঁহার মহিমা, নদীসকল সহ সমুদ্র যাঁহার মহিমা, দশ দিক যাঁহার বাহু-স্বরূপ, তাঁহা ভিন্ন অপর কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢা
যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫

যিনি দ্যুলোক উর্ধ্বে ধরিয়াছেন, পৃথিবী করিয়াছেন দৃঢ স্থির, স্বর্লোক সুপ্রতিষ্ঠিত ও আদিত্য সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন এবং অন্তরিক্ষে (মেঘলোকে) জলরাশি রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহা ভিন্ন আর কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে
অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬

আলোকময় দ্যুলোক ও ভূলোক স্বষ্টিরক্ষার জন্য স্তব্ধ (স্থিরভাবে বিধৃত) হইয়া মনে মনে যাঁহাকে (আপন মহিমার কারণ) জানিয়াছিলেন, যাঁহার অধীনে সূর্য উদিত হইয়া দীপ্তিময় তাঁহা ভিন্ন অন্য কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

আপো হ যদ্ বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্
গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৭

কারণভূত সলিলরাশি যখন নিখিল ব্যাপিয়া ফেলিল এবং অগ্নি প্রভৃতির স্বষ্টির জন্য প্রজাপতিকে গর্ভরূপে ধারণ করিল, তখন সকল দেবতার অনন্য প্রাণ—এক প্রজাপতি উদ্ভূত হইলেন। তাঁহা ভিন্ন অন্য কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্
দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্।
যো দেবেষধি দেব এক আসীৎ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮

স্বমহিমায় তিনি (সেই প্রজাপতি) সেই সলিলসমূহ পর্যালোকন করিলেন—যজ্ঞের (বিশ্বজগতের) উদ্ভব এবং দক্ষের (প্রজাপতির) ধারণ উহাতে হইল। তিনি হইলেন দেবতা-সকলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। অন্য কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা
যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯

যিনি পৃথিবীর জনক এবং সত্যধর্মা যিনি দ্যুলোক সৃজন করিয়াছেন, যিনি বিপুল ও আহ্লাদকর জলবিস্তারের স্রষ্টা, তিনি যেন (প্রজাপতি) আমাদিগের প্রতি হিংসা প্রকাশ

না করেন। তাঁহাকে ভিন্ন কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা আহুতি দিব ?

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো
বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু
বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্॥ ১০

হে প্রজাপতে, তোমা ভিন্ন কেহ নিখিল এই সৃষ্ট জগৎ পরিব্যাপ্ত করে নাই, যে কামনা লইয়া তোমাকে আহুতি দান করি, তাহা সিদ্ধ হউক। আমরা যেন প্রভূত ঐশ্বর্য লাভ করি।

পুরুষসূক্ত

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ৯০ সংখ্যক)

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥১

অনন্ত তাঁহার মস্তক, অনন্ত নয়ন, অনন্ত পদ—এ হেন বিরাট পুরুষ নিখিল জগৎ সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়াও দশাঙ্গুল প্রমাণ অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ বিশ্বের বাহিরও ব্যাপিয়া) অবস্থান করিলেন।

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥২

সেই বিরাট পুরুষই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ —যাহা কিছু অতীত ও ভবিষ্যৎ সকলই তাঁহার স্বরূপ। দেবত্বের বিধাতা তিনি—কারণ কর্মফল-ভোগেই সৃষ্ট প্রাণী কারণাবস্থা হইতে দৃশ্যমান অবস্থায় পরিণত হয়।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥৩

এই (ত্রিকালবর্তী) সমস্তই ঐ বিরাট পুরুষের মহিমা এবং তিনি ইহা হইতেও বৃহৎ। নিখিল জীব তাঁহার পাদমাত্র (চতুর্থ ভাগ) —তাঁহার অবিনশ্বর ত্রিপাদ (ত্রি-চতুর্থাংশ) দিব্যধামে (স্বপ্রকাশরূপে) অবস্থিত।

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥৪

সেই ত্রিপাদ পুরুষ ঊর্ধ্বে অবস্থিত হইয়া (চরাচর অতিক্রম করিয়া) রহিলেন। তাঁহার পাদমাত্র ইহ সংসারে পুনঃ পুনঃ আসিতেছে। তাহা হইতেই বহুরূপে (দেব, মনুষ্য ও ইতর প্রাণী হইয়া) আহারপুষ্ট ও আহারহীন (অর্থাৎ চেতন ও অচেতন) সৃষ্ট পদার্থসকলকে তিনি পরিব্যাপ্ত করিলেন।

তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ॥৫

তাঁহা হইতে বিরাট (ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ) জন্মিয়াছিল ও সেই বিরাট দেহের আধারে (উহার দেবতা) পুরুষ উদ্ভূত হইলেন। জাত হইয়া সেই বিরাট পুরুষ তাহারও অতিরিক্ত (দেব-মনুষ্যাদি) হইয়াছিলেন, তাহার পর ভূমি এবং অনন্তর পুর (অর্থাৎ জীবশরীর) সৃষ্টি করিলেন।

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥৬

যখন দেবগণ ঐ পুরুষকে হবিঃ জ্ঞানে (মানস) যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, তখন বসন্ত ঋতু ঐ যজ্ঞের ঘৃত, গ্রীষ্মকাল সমিধ্ ও শরৎ কাল (পিষ্টকাদি হোমে অর্পণের বস্তু) হবিঃ হইয়াছিল।

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥৭

সৃষ্টির অগ্রে উদ্ভূত, যজ্ঞের পশুরূপে কল্পিত, সেই পুরুষকে মানসযজ্ঞে সংস্কৃত করিয়াছিলেন এবং উঁহার দ্বারা দেবগণ, (সৃষ্টিসমর্থ প্রজাপতি আদি) সাধ্যগণ এবং (সৃষ্টির অনুকূল মন্ত্রদর্শী) ঋষিগণ যজ্ঞ নিষ্পাদন করিয়াছিলেন।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে॥৮

(সর্বময় পুরুষ যাহাতে হুত হন) সেই সর্বহুত যজ্ঞ হইতে দধিসহ ঘৃত প্রভৃতি ভোগ্য-সমূহ সম্পাদিত হয়, আর বায়ব্য (বায়ু-দেবতার অধিষ্ঠিত), আরণ্য (হরিণাদি বনচর) এবং গ্রাম্য (গো অশ্ব প্রভৃতি) পশুসকল উৎপাদিত হইয়াছিল।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৯

সেই সর্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সাম মন্ত্র-সকল উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহা হইতে (গায়ত্রী প্রভৃতি) ছন্দ এবং তাহা হইতে যজুর্মন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছিল।

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভযাদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥১০

তাহা হইতে অশ্বসকল এবং (গর্দভাদি) দুই-দন্তরাজিবিশিষ্ট জন্তুসমূহ জন্মিয়াছিল। তাহা হইতে গাভীসকল এবং ছাগ ও মেষসকল উৎপন্ন হয়।

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে॥ ১

যে সময়ে বিরাট পুরুষকে উদ্ভূত করেন, তখন (দেবগণ) কোন্ কোন্ বিশেষভাবে তাঁহাকে কল্পনা করিয়াছিলেন ? কি ইহার মুখ হইয়াছিল, বাহুদ্বয় কি হইয়াছিল, উরুদ্বয়ই বা কি, পাদদ্বয়ই বা কি হইয়াছিল ?

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥১২

ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়গণ বাহুদ্বয়রূপে কল্পিত হয়, তখন ইঁহার যে উরু-দ্বয়, তাহা বৈশ্য হয় এবং পাদযুগল হইতে শূদ্র উদ্ভূত হয়।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত ॥১৩

(প্রজাপতির) মন হইতে চন্দ্র জন্মিল, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু উদ্ভূত হইল।

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ
তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥১৪

তাঁহার নাভি হইতে অন্তরিক্ষলোক, মস্তক হইতে দ্যুলোক উদ্ভূত হইল, পদদ্বয় হইতে ভূমি, শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিক্‌সমূহ উৎপন্ন হইল। এই ভাবে (দেবগণ) লোকসকল কল্পনা করেন।

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥১৫

(গায়ত্রী প্রভৃতি) সপ্ত ছন্দঃ এই মানস যজ্ঞের পরিধি (উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণের বেষ্টন-কাষ্ঠ) হইয়াছিল, (দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, ত্রিলোক ও আদিত্য) একবিংশতি-সংখ্যক সমিধ্ (ইন্ধন-কাষ্ঠ) কল্পিত হইয়াছিল। যিনি বিরাট পুরুষ তাঁহাকে দেবগণ মানস যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া (যূপবদ্ধ) পশুরূপে ভাবনা করিয়াছিলেন।

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা-
স্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত
যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥১৬

(প্রজাপতির প্রাণরূপ) দেবগণ সঙ্কল্পময় সেই যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষ (প্রজাপতিকে) যজন করিয়াছিলেন। সেই (যজন) হইতে সেই (প্রসিদ্ধ) ধর্ম (জগতের ধারক)-গুলি প্রথম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) হইয়াছিল। যেখানে সেই পুরাতন (বিরাট পুরুষের উপাসক) সাধ্য দেবগণ আছেন, সেই স্বর্লোক মহাত্মগণ (অধুনা বিরাটের আরাধকসকল) পাইয়া থাকেন।

মার্কিন কবি ও দার্শনিক এমার্সন

শ্রীদেবব্রত রায়চৌধুরী

উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার নীতিগত ও ধর্মভিত্তিক মানসিকতা গড়ে তোলায় মার্কিন চিন্তানায়কগণের উপর ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র—গীতা, উপনিষদ্ ও বেদান্তের প্রভাব এবং ভারতীয় চিন্তাধারার অনুপ্রেরণা বিশ্বেতিহাসের একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এ সময়ে শুরু হয়েছিল ভারতীয় বেদান্তবাদ, অ্যাংলো-স্যাক্সন পবিত্রতাবাদ (puritanism), প্রযোগবাদ (pragmatism), বিজ্ঞানবাদ (idealism) আর প্রচণ্ড আশাবাদ (optimism) প্রভৃতির সংমিশ্রণের অক্লান্ত চেষ্টা। আমেরিকার ইতিহাসের এই আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়টির অনুধাবন ও পর্যালোচনা আগামী কালের অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের জন্য অপেক্ষমাণ। এ যুগের ঋত্বিক, চিন্তানায়ক ও চারণ হলেন এমার্সন, থোরো এবং হুইটম্যান।

প্রাচ্যের অতুল অধ্যাত্মসম্পদ্ এমার্সনকে এতখানি মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি প্রতীচ্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলেছিলেন : প্রাচ্য চমৎকার, তার তুলনায় প্রতীচ্য তুচ্ছ ব'লে মনে হয়—'The east is grand and makes Europe appear the land of trifles. ভারতের সঙ্গে তিনি যেন একীভূত হ'য়ে গিয়েছিলেন—প্রবহমান কোন নদী দেখলেই তাঁর মনে প'ড়ত পবিত্র গঙ্গার কথা, সুন্দর আবহাওয়ার কথা উঠলেই বলতেন কলকাতার আবহাওয়ার কথা। কেবল তাই নয়—নিজের বাগানে ভারতের ও প্রাচ্য দেশের নানা গাছপালাও তিনি লাগিয়েছিলেন।

তারপর তাঁর ভাবের অনুগামী কবি হুইটম্যানও আহ্বান জানিয়েছিলেন :

'ভারত-পথযাত্রী
হে হৃদয়, চলো
সেই আদিম মননে

* * *

সেই প্রথম স্বচ্ছ সজীবতায়
জীবনবেদের মুকুল যেখানে জেগেছে

* * *

এই পাড়ি কি সত্যি দিতে চাও হে হৃদয়?
লীলা তোমার কি এই মহাতরঙ্গে ?
সংস্কৃত ও বেদ কি তোমার প্রাণে ধ্বনিত ?
তাহলে মুক্ত করো বেগ।'

[অনুবাদ—প্রেমেন্দ্র মিত্র]

এর পরেই এমার্সনের শ্রেষ্ঠ অনুরাগী ও সতীর্থ মনীষী থোরোও সেই সুরে বললেন : এশিয়ায় যে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত রয়েছে, সেই আলোয় সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত কর, সেই আলোর বন্যায় সমগ্র চিত্তকে প্লাবিত কর।

মানব-জীবনের চরম লক্ষ্যসাধনের পথ এবং জন্ম, জীবন ও মৃত্যু রহস্যের উত্তর তাঁরা পেয়েছিলেন ভারতের ও প্রাচ্যের বাণীতে। এমার্সন বলেছিলেন, 'পৃথিবীর আর কোথাও যখন মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি, তখন ভারত সকল মানুষকেই নারায়ণের আসনে বসিয়েছে। নরনারায়ণের সেবার এই আদর্শকে অনাসক্ত কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা যদি মানবজাতির লক্ষ্য হ'ত, তবে তো অনেক সমস্যারই সমাধান

হ'য়ে যেত ; কোথায় থাকত পরাধীনতার অভিশাপ, দাসত্বের গ্লানি! তার পরেই বলেছেন, আমরা যে কী, কী আমাদের স্বরূপ, তার কতটুকুই বা আমরা জানি, তার জন্য চাই আসক্তিবিহীন কর্ম। অজ্ঞানতার জন্য মনে হয়, যেন আমরা ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক—এ হ'ল অবিদ্যা, বন্ধন, নিজের উপরে আবরণ। ঈশ্বর যে মানুষের রূপ পরিগ্রহ করেছেন—'Spirit incarnates itself in the human form.'—এ কথা মনে প্রাণে কর্মে উপলব্ধি করলেই সেই আচ্ছাদন খসে পড়ে, ঈশ্বরের বিশেষ ইচ্ছা পূরণের জন্যই মানুষ জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে। তবে কেবল আত্মসমর্পণ নয়, অভীপ্সাও চাই।

তিনি 'কোরাস্ অব্ স্পিরিটস্' ও 'দাইন ওন থিয়েটার আর্ট দাউ' নামে কবিতায় বলছেন: 'হে মানুষ, তোমার জীবন-রঙ্গমঞ্চে তুমিই অভিনেতা, তুমিই দর্শক'। ভক্ত ও ভগবান এখানে যেন এক হ'য়ে মিলে গেছেন। তারপরে বলছেন, 'আত্মা অবিনশ্বর—সে যে-রূপ পরিগ্রহ করে তা বদলায়, রূপ হ'তে রূপান্তরে তার যাত্রা—কত শত জীবন পেরিয়ে প্রতিটি মানুষ এই জীবনে এসে পৌঁছেছে।' পুত্রের মৃত্যুর পরে তিনি 'ওড টু টিয়ার্স্' নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তাতে এই জন্মান্তরবাদই প্রতিধ্বনিত। আর একটি বিখ্যাত কবিতায়ও তিনি বলেছেন:

হত্যাকারী যদি মনে ক'রে থাকে
　　সেই হত্যা করেছে,
আর মৃত মানুষ যদি মনে ক'রে থাকে
　　সে নিহত হয়েছে,
তবে তাদের কেউ জানে না
　　যাওয়া-আসার মরণ-জীবনের গোপনরীতি।

এ যেন গীতার বাণীর প্রতিধ্বনি:

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
　　নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
　　ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

এঁরা তিনজনই স্বামী বিবেকানন্দের পুরোগামী। স্বামীজী শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যে পৃথিবী জয় ক'রে এসেছিলেন, তার পটভূমিকায় এঁদের প্রচারের প্রভাব কম ছিল না। স্বামীজী কবি হুইটম্যানকে 'আমেরিকার সন্ন্যাসী' ব'লে আখ্যা দিয়েছেন।

তবে আমেরিকায় ভারতীয় আদর্শের বর্তিকাবাহী প্রথম পুরোহিত হলেন এমার্সন। উপরিলিখিত উদ্ধৃতি তাঁর 'ব্রহ্ম' শীর্ষক কবিতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ভগবদ্গীতার আদর্শ তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই পার্থিব সত্তার অন্তরালে যে একটি মূলগত ঐক্য রয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে একই সূত্রে গ্রথিত, তার শাশ্বত প্রমাণ ও পরিচয় রয়েছে তাঁর আত্মোপলব্ধিতে সমুজ্জ্বল এ ধরনের বহু কবিতায় ও প্রবন্ধে।

এমার্সন থোরোর মাধ্যমেই ভারতের এই অধ্যাত্ম সম্পদের সন্ধান পেয়েছিলেন। ১৮৪৬ খৃঃ এমার্সন লিখছেন: থোরো তাঁর 'এ উইক অন দি কনকর্ড অ্যাণ্ড মেরিম্যাক রিভার' নামে একটি গ্রন্থের অংশ বিশেষ পড়ে শোনাতেন। এই গ্রন্থে থোরো গীতা, ভারতীয় দর্শন ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রশংসা করেছেন পঞ্চমুখে।

১৮৪০ খৃঃ ফরাসী ভাষায় অনূদিত বার্নকের গীতা প্রকাশিত হয় এবং চার্লস উইলকিন্সনের ইংরেজী ভাষায় অনূদিত গীতা প্রকাশিত হয় এর ছ বছর পরে। থোরো এই দু-খানি

গ্রন্থেরই পরিচয় পেয়েছিলেন। আমেরিকায় গীতার আদর্শ প্রচারে এই গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। উইলকিন্সনের গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৮৬ খৃঃ এই গ্রন্থের একখণ্ড তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রেসিডেণ্টকে উপহার দিয়ে লিখেছিলেন: ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য লুপ্ত হবার পর তার সেই সম্পদ্ ও শক্তির কথা কেউ স্মরণ করবে না, সবই শূন্যে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তার বহুকাল পরেও বেঁচে থাকবেন ভারতীয় দর্শনের উদ্গাতাগণ। তিনি এ প্রসঙ্গে এই বেদভূমির আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। ১৮৫৪ খৃঃ জনৈক ইংরেজ থোরোকে প্রাচ্য দর্শন ও সাহিত্যের ৪৪ খণ্ড পুস্তক দান করেন। থোরো নিজেই বলেছেন, তখনকার দিনে আমেরিকায় এই সকল পুস্তক পাওয়া সম্ভব ছিল না। ১৮৩৭ থেকে ১৮৬২ খৃঃ পর্যন্ত এমার্সন ছিলেন থোরোর প্রতিবেশী। থোরোর সঙ্গে আলোচনা ব্যতীত এমার্সন 'দি ডায়ল' নামক একটি পত্রিকায়ও হিন্দুধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি-সহ নানা আলোচনা করতেন। প্রাচ্য দর্শন এবং সাহিত্যাদির অনুবাদও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত। তখন হাইপেশিয়া মার্গারেট ফুলার ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদিকা। ঐ সময়ে এমার্সন, থোরো, হুইটম্যান, মার্গারেট ফুলার অতীতের ইতিহাসের যত কিছু জঞ্জাল, যত কিছু মলিনতা অন্ধসংস্কার সব মুছে ফেলে দিয়ে নতুন মানুষের জয়গান ও মানুষের নতুন ইতিহাসের বুনিয়াদ রচনায় ব্রতী হলেন। এমার্সন মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললেন:

নিজকে জানা—আত্মপরিচয়-লাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। এ পৃথিবীর কোন কিছুই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, শান্তির উৎস রয়েছে মানুষের অন্তরে, আত্মবিশ্বাস—আত্মবিশ্বাস চাই, পরানুকরণ নয়।..... শান্তি-সমাহিত মুহূর্তে আত্মার মধ্যে সত্তানুভূতি উপলব্ধি করা যায়।......এই আকাশ, আলোক, কাল কিংবা মানুষ তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—এ সবের সঙ্গেই তা একীভূত হ'য়ে আছে।...সাধারণতঃ আমরা যাকে মানুষ আখ্যা দিয়ে থাকি সে মানুষ হিসেবী, খায়-দায়, চাষ-বাস করে...। আমরা যে হিসাবে তাকে জানি—তা তার আসল পরিচয় তো নয়ই বরং ভুল পরিচয়। আমরা যে সম্মান দেখাই সে মানুষকে নয়, তার আত্মাকে, সে যার যন্ত্রস্বরূপ।

* * *

র্যাল্‌ফ্ ওয়াল্ডো এমার্সন জন্মগ্রহণ করেন এক ধর্মনিষ্ঠ পরিবারে ১৮০৩ খৃঃ ২৫শে মে। তাঁর ঊর্ধ্বতন ছয় পুরুষই ধর্মযাজক। আট বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়।

বস্টনে স্কুলের পড়া শেষ ক'রে চোদ্দ বছর বয়সে ওয়াল্ডো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভরতি হলেন। প্রশ্ন দাঁড়ালো—খরচ জোগাবে কে? বেয়ারার কাজ ক'রে পড়াশুনার খরচ জোগালেন তিনি নিজেই। কিছুদিন মাষ্টারিও করলেন। ১৮২৮ খৃঃ এমার্সন বষ্টনের নর্থচার্চের সহকারী প্যাস্টরের পদে নিযুক্ত হলেন। ধর্মকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করলেও ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না তাঁর জীবনে। কিন্তু গির্জায় পৌরোহিত্য করার চেয়ে সভাসমিতিতে, আলোচনা-সভায় বক্তৃতা করতে তাঁর বেশী ভাল লাগত। তিনি বলতেন, 'সেই সব সভায় আমি মুক্ত, আমি সেখানে আমার ইচ্ছামত বলতে পারি, যুক্তি বিচার করতে পারি।'

১৮৩২ খৃঃ চার্চের কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি ইওরোপ যাত্রা করলেন। সেখানে কবি

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, কার্লাইলের মতো সাহিত্য-মহারথীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। তাঁরও জীবনের যে একটি বিশেষ ব্রত আছে, একথা তিনি এঁদের সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করলেন। গ্যেটের অতীন্দ্রিয়বাদের ধারণা ও আদর্শ ইংলণ্ডে এসেছিল কার্লাইলের মাধ্যমে, আর যুক্তরাষ্ট্রে সেই আদর্শ প্রচার করেছিলেন এমার্সন।

১৮৩৪ খৃঃ ইওরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি ম্যাসাচুসেটস-এর কনকর্ডে ঘর বাঁধলেন। এইখানেই তাঁর পিতৃপিতামহেরা বসবাস ক'রে গেছেন। ১৮৩৫ খৃঃ এলেন লুই টাকারের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। চারটি সন্তানের মধ্যে তাঁর অতি আদরের বড় ছেলেটি ১৮৪১ খৃঃ মারা যায়। তারপর ১৮৭২ খৃঃ তাঁর এই গৃহ আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হ'য়ে যায়। তবে বন্ধুবর্গ চাঁদা তুলে ঠিক পূর্বের মতো ক'রে বাড়িটি আবার তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন।

কনকর্ডে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গ'ড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন ব্রনসন অলকট, হেনরী ডেভিড থোরো, ন্যাথনিয়েল হথর্ন, মার্গারেট ফুলার প্রভৃতি। কর্নেল অলকট ১৮৭৫ খৃঃ ভারতে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। থোরো ছিলেন গৃহকর্তার মতো। আর ন্যাথনিয়েল হথর্ন থাকতেন কিছুটা দূরে। এঁরা ছিলেন সকলেই অতীন্দ্রিয়বাদী (Transcen-lentalist) ও আদর্শবাদী। তাঁরা বিশ্বাস করতেন এই পৃথিবীর সংস্কার তাঁরা ভেতর থেকে করবেন। তাঁদের আস্থা ছিল বোধি বা 'ইনটুইশানে'র ওপর, আর ভরসা ছিল মানুষের ওপর।

তাই এমার্সন বলেছেন: 'কোন দেশের সভ্যতার যথার্থ বিচার সে দেশের জনসংখ্যা দিয়ে হয় না, নগর-নগরীর বিরাট আয়তন দিয়ে হয় না, উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিপুল পরিমাণ দিয়েও হয় না। এ-সব কিছুই নয়। কোন দেশের সভ্যতার বিচার হয়—কি রকম মানুষ সে দেশে জন্মালেন তাই দিয়ে।'

তবে এমার্সন নিজেকে কোন গোষ্ঠীভুক্ত ব'লে স্বীকার করতেন না। কিন্তু তিনিই ছিলেন দলের মধ্যমণি, তাঁদের প্রেরণার উৎস। ইওরোপ থেকে ফিরে আসার পর তিনি আমেরিকার নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে ফিরতেন। এই সকল বক্তৃতাই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধাবলীর প্রথম খণ্ড ১৮৪১ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৪৪ খৃঃ প্রকাশিত হয়। তাঁর অনুগামী অতীন্দ্রিয়বাদীরা ১৮৪০ খৃঃ 'দি ডায়ল' নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাতে তিনি নিয়মিত ভাবে লিখতেন। এমার্সনও প্রায় দুই বৎসর-কাল এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।

১৮৪৬ খৃঃ এমার্সনের প্রথম কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ খৃঃ তিনি পুনরায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরিদর্শনে যান। দ্বিতীয়বার ইওরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি দাসপ্রথা উচ্ছেদ-আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

কবি হিসাবে এমার্সন খুব খ্যাতিলাভ না করলেও তাঁর কবিতা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ফসল। বিখ্যাত সমালোচক ভ্যান ওয়াইক ব্রুকস্‌ তাঁর কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন: পাহাড়ী ঝরনা-ধারার ন্যায় তাঁর কাব্যপ্রবাহ স্বচ্ছ শীতল ও চটুলগতি-সম্পন্ন, রচনাশৈলী আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে সমুজ্জ্বল।

সারাজীবন অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন এমার্সন, সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্ভীক। তিনি বলতেন, নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, কারও অনুকরণ ক'রো না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মৌলিকত্বই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

সত্যান্বেষীদের জীবনে যে দুঃখ দুর্দশা জোটে, তাঁর ভাগ্যেও তার কমতি ছিল না। কিন্তু তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে তার স্বাক্ষর নেই; কারণ তাঁর আদর্শ জীবনে রূপায়িত হয়েছিল, কেবল মুখের কথা ছিল না; তিনি ছিলেন নিরাসক্ত বৈরাগী। তাই তাঁর কাছে মৃত্যুও আনন্দময়। 'মৃত্যোর্মামৃতংগময়', এই বাণীই তাঁর কবিতায় প্রতিধ্বনিত :

The debt is paid,
The verdict said,
The furies laid,
The plague stayed,
All fortunes made,
Turn the key and bolt the door,
Sweet is death forever more.

১৮৮২ খৃঃ ২৭শে এপ্রিল কনকর্ডেই আনন্দময়ের আহ্বানে তিনি আনন্দলোকে যাত্রা করেন।

অন্তর্মুখী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

(১)

মৃত্যুর ছায়াতে শুয়ে ভাবি বারম্বার :
আয়ুসূর্য অস্ত গেলে রহিব না আর ?
নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হবো নিঃসীম তিমিরে ?
একমুষ্টি চিতাভস্ম উড়িব সমীরে ;—
এই মোর পরিচয় ? অনন্ত অনাদি
নিত্য তুমি,—এ বিশ্বাস মানসিক ব্যাধি ?
উহাদের অসংলগ্ন প্রলাপ-বচন ?
সতদ্রষ্টা ঋষি যাঁরা, যাঁদের লোচন
পরম-আনন্দ-ঘন-মূরতি তোমারে
হেরিল জ্যোতির জ্যোতি তমসার পারে—
তাঁরা কি ছিলেন ভ্রান্ত ? কখনোই নয়।
তুমি সত্য ; অমৃতের আমিও তনয়।
মৃত্যুরূপে তুমি বক্ষে লইবে তুলিয়া ;
সাগরের ঊর্মি যাবো সাগরে মিলিয়া।

(২)

পরম ঐশ্বর্য তুমি এ জীবনে মোর—
রেখে দাও মর্মে শুধু এ-টুকু গুমোর ;
আর সব গর্ব প্রভু করো চুরমার।
নাহং নাহং—আমি তোমার, তোমার।
'আমি ও আমার' চির-রসাতলে যাক্ ;
চরণ-কমলে শুধু 'দাস-আমি' থাক্।
দিব্যরত্ন তুমি মম ; ভুলিয়া তোমারে
কাচখণ্ড খুঁজে খুঁজে ফিরেছি সংসারে।
ধন-জন-প্রতিষ্ঠার গলায় ছুরিকা !
আজ আছে, কাল নাই ! ওরা মরীচিকা—
জীবনে এনেছে দাহ, নৈরাশ্য কেবল !
—আর তীব্র আত্মগ্লানি—ভুলের ফসল
কামনার পঙ্ক যত নিক্ষেপিয়া দূরে
নির্মল আকাশে তব কবে যাবো উড়ে ?

রাজনারায়ণ বসু ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

রাজনারায়ণ বসু এদেশে জন্মেছিলেন*, কিন্তু তাঁর মনটি সব দেশের সব যুগের মানুষের সঙ্গী হ'তে পারত। যে অন্তরের সারল্য মানব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ এবং যে চিরনবীনতা এই নিয়ত পরিবর্তনের রাজ্যে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত, রাজনারায়ণ সে দুটিই প্রচুর পরিমাণে পেয়েছিলেন, উনিশ শতকের যুগমনীষাকে রাজনারায়ণ নানা ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন; সে সমৃদ্ধির পরিচয়-লাভই এ প্রবন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য।

মধুসূদন ও ভূদেবের সতীর্থ রাজনারায়ণ তাঁর ছাত্রাবস্থায় একদিকে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের অধ্যাপনা, অন্যদিকে মদ্যপান—এই দুটি নেশায় বিভোর ছিলেন। কঠিন রোগের মূল্য দিয়ে তিনি মদ্যাসক্তির ব্যাধি থেকে মুক্তি পান, কিন্তু হিন্দুকলেজের অধ্যাপনার গুণে তাঁর সাহিত্যশিক্ষার মানস পরিমণ্ডলটি সুসম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।[১]

প্রবন্ধকারদের মধ্যে মেকলে এবং কবিদের মধ্যে স্পেন্সার, টমসন ও বাইবন রাজনারায়ণের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। অবশ্য মেকলে সম্বন্ধে এই প্রীতি পরে বদলে ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য লক্ষণীয়: 'তখন আমরা মেকলে-খোর ছিলাম, তাঁহাকে ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্তা বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে তাঁহার শত শত মহদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে কবিওয়ালা ও তাঁহার এক একটি রচনা (Essay) এক এক তান কবির ন্যায় জ্ঞান হয়। অমন পক্ষপাতী, একবগ্‌গা ও অত্যুক্তিপ্রিয় গ্রন্থকার অতি অল্পই আছে।'[২]

বালক-বয়সে রাজনারায়ণ অন্যান্য হিন্দু ছেলেদের মতোই পূজা দেখতে ও অনুকরণ করতে ভালবাসতেন। তাঁর বাবা নন্দকিশোর বসু রামমোহনের বেদান্ত-মতের পক্ষপাতী হলেও বাইরে লৌকিক আচার পালন করতেন। বাবার কাছেই রাজনারায়ণ শুনেছিলেন যে রামমোহন তাঁর নিজের ধর্মকে Universal Religion (বিশ্বজনীন ধর্ম) বলতেন। হিন্দুকলেজে পড়বার সময়ে রাজনারায়ণ ধর্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হন, যে-সময় যখন যে-ধর্মের বই পডতেন, কৈশোরোচিত ভাবাবেগে সেই ধর্মমতের দ্বারাই প্রভাবিত হ'য়ে পড়তেন। সর্বপ্রথম 'শেভালিয়র র‍্যামজের সাইরাসেজ্‌ ট্রাভেলজ্‌' পড়ে সেকালে প্রচলিত হিন্দুধর্মে তাঁর বিশ্বাস বিচলিত হয়, তারপর রামমোহন রায়ের 'অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাব্লিক ইন ফেভর অফ্‌ দি প্রিসেপ্টস্‌ অফ্‌ জীসাস্‌' এবং "চ্যানেঙ্গের গ্রন্থপাঠে ইউনিটেরিয়ান ক্রিশ্চিয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ-মুসলমান হই। পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে 'হিউম' পড়িয়া সংশয়বাদী হই। যে পুস্তক যখনই পাঠ করা যায়, তখনই সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকতা বলিতে হইবে, আর তখন যথার্থই বালক ছিলাম।"[৩]

মুসলমান ধর্মে তাঁর শ্রদ্ধা আসে কোরান এবং গিবনের গ্রন্থের Mahamed and his Successors. অধ্যায়টি পড়ে। এই সব বিভিন্ন মতামতের চর্চা উনিশ শতকের যুগলক্ষণ, সেদিক থেকে রাজনারায়ণের কৌতূহল শ্রদ্ধার যোগ্য, কলেজ ছাড়বার আগে তাঁর যে

---

* জন্ম ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮২৬

১, ২, দ্রষ্টব্য—আত্মচরিত রাজনারায়ণ বসু।

৩ তদেব

সংশয়বাদ দেখা দেয়, স্ত্রী ও পিতার মৃত্যুতে সে সংশয়ে আঘাত লাগে। অবশ্য রাজনারায়ণ নিজের অধ্যাত্ম-সংস্কারে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর বাবা বিশ্বাস করতেন বেদান্তের সোঽহম্-বাদে। রাজনারায়ণ কিন্তু ভক্তশ্রেণীর লোক, তাই তত্ত্ব-বোধিনীসভার প্রচারিত ভক্তিমূলক ব্রাহ্ম-ধর্মেই তাঁর অনুরক্তি দেখা দেয়, এ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞাতি নন্দলাল বসুর একটি উক্তি তাঁকে প্রভাবিত ক'রে থাকবে – 'চিনি হইবার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল।' ১৮৪৬ খৃঃ গোড়ার দিকে রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : 'যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সেদিন বিস্কুট ও শেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়।'[৪]

তখন অবধি ব্রাহ্ম হওয়ার ফ্যাশন প্রচলিত হয়নি। তাই হিন্দুকলেজের ছেলেরা রাজ-নারায়ণকে একটি অদ্ভুত জীব মনে ক'রত, কলেজের কোন ভাল ছেলে যে ব্রাহ্ম হ'তে পারে, সে কথা সেই সংশয়বাদের যুগে অবিশ্বাস্য ছিল, এই বৎসরই রাজনারায়ণ 'তত্ত্ববোধিনী' সভার উদ্যোগে উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত হন। ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অনুবাদ ক'রে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজে সর্বপ্রথম প্রীতির ভাব সঞ্চারিত হয় ব'লে তিনি নিজে দাবি করেছেন; তাঁর সাধনায় জ্ঞানের চেয়ে ভক্তির আবেগ বেশী ছিল সন্দেহ নেই।[৫] অক্ষয়কুমারের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে 'বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট কিনা' এ নিয়ে বিতর্ক ওঠে, এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণের মত এই যে—"আমরা তখন ঈশ্বর-প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।"[৬] মনে হয়, তখন অবধি বেদ রাজনারায়ণ বেশি পড়েননি।

'বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ব-বেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত—এই মত অক্ষয়বাবুর দ্বারা ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।'[৭] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সাধারণতঃ আমরা অক্ষয়-কুমারকেই যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তের পুরো গৌরব-টুকু দিয়ে থাকি, এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবুর মত : 'ব্রাহ্মসমাজের দুই নায়কের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক দ্বারা যাহা স্বীকৃত হয়, তাহার গৌরব কেবল একজনকে দেওয়া কর্তব্য নহে···। যিনি সর্বপ্রধান ও যাঁহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজে কোন পরিবর্তন আদোবেই সাধিত হইতে পারিত না, তিনি আপনার গাঢ় রক্ষণশীল স্বভাব সত্ত্বেও যেমন সত্য প্রদর্শিত হইল, অমনি তাহা গ্রহণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা ইহা বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য গৌরব প্রদান করেন না।'[৮]

১৮৫১ খৃঃ ফেব্রুআরি থেকে ১৮৬৬ খৃঃ মার্চ অবধি রাজনারায়ণ মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মেদিনীপুরকে একান্ত আপনভাবে গ্রহণ ক'রে তিনি এ জেলার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। নানা সময়ে ভাল চাকরির আকর্ষণ এসেছে; কিন্তু মেদিনীপুরের আকর্ষণই তাঁর কাছে বড় হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে সব কাজের তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়, (১) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতি সাধন (২) মেদিনীপুর ব্রাহ্ম-

৪, ৫ তদেব

৬, ৭, ৮ তদেব

সমাজের পুনঃসংশোধন ও উন্নতি-সাধন। (৩) জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভা সংস্থাপন (৪) সুরাপান-নিবারণী সভা সংস্থাপন (৫) বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন (৬) ধর্মতত্ত্ব-দীপিকা গ্রন্থরচনা। (৭) Defence of Brahmoism and Brahmosamaj গ্রন্থরচনা।[৯]

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ ছাত্রদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার দিকেই নজর দিতেন বেশী, এবং একশ বছর আগেই বুঝেছিলেন যে শারীরিক শাস্তি দান ছাত্রদের পক্ষে কল্যাণকর নয়। জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভায় ইংরেজী ভাষার আতিশয্য ছেড়ে বাঙলা শব্দের দিকে শিক্ষিতদের মনঃসংযোগের চেষ্টা করা হয়। এই সভার সভ্যেরা 'Good night' না ব'লে 'সু-রজনী' বলতেন। কথাবার্তায় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করলে তাঁদের শব্দ-প্রতি এক পয়সা জরিমানা দিতে হ'ত। ১লা জানুআরির পরিবর্তে ১লা বৈশাখে পারস্পরিক অভিনন্দন করতেন। এই জাতীয়তাবাদী মনোভাবে বাংলাদেশের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিমণ্ডলটিই এই স্বদেশী সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। সেই জন্য কেশব সেন প্রমুখ ব্রাহ্মেরা যখন খ্রীষ্টীয় মতবাদের অতিরিক্ত আবর্তনে ক্রমে এদেশী ভাবধারা থেকে একটু দূরে সরে যাচ্ছিলেন, তখন দেশের লোকও তাঁদের আপন ভাবতে পারেনি। অবশ্য কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শ ঘটবার পর এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পূর্ণ সাকার-সাধনায় আত্মনিয়োগের পর ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র ভাবধারা আর হিন্দু-সাধনার পন্থা সম্বন্ধে সংশয় জাগাতে দেয়নি। এ প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বাবু সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণীয়—পরবর্তী 'উন্নতিশীল ব্রাহ্ম'দের মতো রাজনারায়ণ কিন্তু জন্মগত জাতিভেদকে অস্বীকার করতে পারেননি। এটি তাঁর চিন্তাধারার দুর্বলতা। এ দুর্বলতার বীজ আদি ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারাতেই ছিল।

রাজনারায়ণের 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'[১০] বক্তৃতাটির প্রতি আধুনিক কালে আমরা একটু উদাসীন। তার কারণ, আজকের দিনে ধর্মগত শ্রেষ্ঠতা নিয়ে আন্দোলন উপহাসের বিষয়। কিন্তু একশ বছর আগের পরাধীন ভারতবর্ষে তা ছিল না। হিন্দুধর্মের চিন্তাধারায় যে সব দুর্বলতা ও ত্রুটি ছিল, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দু যুবারাই সর্বপ্রথম সচেতন হ'য়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যেই কেবল এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্রাহ্মযুগের সূচনা থেকে রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, প্রমুখ নেতারা হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজাকে পৌত্তলিকতা ব'লে ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা ক'রে হীন দৃষ্টিতেই দেখেছেন। অধিকারী-ভেদে মূর্তি পূজা থেকে আরম্ভ ক'রে নিরাকারবাদে উপনীত হওয়ার স্তর-পরম্পরাগুলি তাঁরা অনেকটা উপেক্ষাই ক'রে গেছেন। তাছাড়া ব্রাহ্ম-নেতাদের অধ্যাত্মচর্চা তাঁদের নৈতিক বিশুদ্ধির চেয়ে গভীরতর কোন প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিল এমন কথা সেই সত্যসন্ধ সাধকেরা কোথাও বলেননি। অথচ তাঁরা অনায়াসে ঈশ্বর-স্বরূপকে শুধুমাত্র নির্গুণ নিরাকার (রামমোহন) ও পরে সগুণ নিরাকার (দেবেন্দ্রনাথ) ব'লে গেছেন—অন্যান্য মতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে। তবে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের নেতারা হিন্দুধর্মের মধ্যে থাকতে

৯ তদেব

১০ ১৮৭৩ খৃঃ প্রদত্ত বক্তৃতা। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন।

চেয়েছেন সব সময়। কিন্তু হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাঁদের চিন্তা ও আচরণের পার্থক্য ছিল। তা-ছাড়া ডফ্ সাহেবের সময় থেকে খ্রীষ্টানী প্রচার সক্রিয়ভাবে এদেশে চলতে থাকে। এই সময় থেকে রাজশক্তির পরোক্ষ সমর্থনও খ্রীষ্টানী প্রচারের সঙ্গে এসে মিশেছিল।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি মনোভাবও সূক্ষ্মভাবে কাজ করছিল যে, জগতের সভ্যজাতিরা যখন নিরাকার ভগবানে বিশ্বাসী, তখন আমাদের ধর্মমতেও যে নিরাকার বিশ্বাস আছে, সে কথা জানিয়ে দিয়ে সভ্য সমাজে আসন লাভ করি না কেন! এই সব দিক থেকে হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জানানোটাই ছিল সে যুগের ফ্যাশান।

'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বক্তৃতাটির উৎস সম্বন্ধে রাজনারায়ণ লিখেছেন: 'হিন্দু-ধর্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার-মাত্র মনে করি। একদিন কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কথোপকথনের সময় বলিলেন যে, খ্রীষ্টীয় মত এত উৎকৃষ্ট যে, উহার পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমি বলিলাম যে, হিন্দুধর্মের পক্ষেও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দেখিতে চাও ত দেখাইতে পারি। ইহাতে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বক্তৃতার উৎপত্তি হয়।'[১১]

এক হিসেবে উনিশ শতকে হিন্দুধর্মসম্বন্ধীয় চিন্তাধারার মোড় ফিরেছে এই বক্তৃতায়, অতীত ঐতিহ্য থেকে যে সঞ্জীবনী সুধা আহরণের অভিযান রামমোহনের সময় থেকে আরম্ভ হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভ করে, সে অভিযানের উদ্দেশ্যে বঙ্গমনীষার এই প্রথম সুদৃঢ় পদক্ষেপ। ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় রাজনারায়ণ 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতাটি দেন। এই বক্তৃতায় তিনি মোটামুটি বারোটি দিক থেকে হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ প্রমাণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি কৌতূহলবশে বিভিন্ন ধর্মমতের যে চর্চা করেছিলেন, সে চর্চা এই সময়ে খুবই কাজে লেগেছিল।

রাজনারায়ণ তাঁর এই বক্তৃতায় প্রথমেই হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, তাঁর মতে—পরব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দুধর্ম। সকল হিন্দুশাস্ত্র সমস্বরে এই কথা বলে যে পরব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। ব্রহ্মই হিন্দুধর্মের মধ্যবিন্দু। হিন্দুধর্মের সর্বপ্রাচীন ঋগ্বেদ সম্বন্ধে রাজনারায়ণের বক্তব্য: সেই আদিম আর্যেরা যে কেবল সূর্যচন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনা করিতেন,—সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে যে অবগত ছিলেন না, এমনও নহে। তাঁহারা স্পষ্ট জানিয়াছিলেন যে, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।' সেই আদিম আর্যগণ ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের গাঢ় সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ঈশ্বর মনুষ্যের পিতামাতা, ইহা তাঁহারা অবগত ছিলেন। 'উপনিষদে দেখা যায় যে তৎকালের ঋষিরা যেমন ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতেন, তেমনি তাঁহাকে আত্মার আত্মা রূপে উপলব্ধি করিতেন'।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তৎকাল-প্রচলিত কয়েকটি অমূলক অপবাদ নিরসন ক'রে তিনি দেখিয়েছেন:

(ক) 'বস্তুত: হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতাপ্রধান ধর্ম নয়'।·········যে সকল অল্পবুদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তি

১১ আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু

নিরাকার অনন্ত পরমেশ্বরকে ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহাদিগের উপাসনার সহায়তার নিমিত্ত ব্রহ্মের বিবিধ রূপ কল্পনা হইয়াছে ও বিবিধ পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপের বিধান হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপকে না জানিলে কদাপি মুক্তিলাভ হয় না।—'

(খ) '......আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে—হিন্দুধর্ম অদ্বৈতবাদাত্মক ধর্ম। যে মতে বলে যে এই সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ঈশ্বর, তাহাকে অদ্বৈতবাদ বলে*।... ......বেদান্ত-দর্শনে এই অদ্বৈতবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—এই বেদান্ত-দর্শন শঙ্করাচার্য-প্রণীত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বুঝায়,—নিজ বেদান্ত-সূত্র বুঝায় না; যেহেতু শঙ্করাচার্য যেমন বেদান্তসূত্র অদ্বৈতকল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজস্বামী তেমনি দ্বৈতকল্পে (?) ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএব উপনিষদের কথা দূরে থাকুক, বেদান্তসূত্রও যে অদ্বৈতবাদাত্মক শাস্ত্র তাহা প্রমাণ হয় না।' 'বেদান্তসূত্র' সম্বন্ধে রাজনারায়ণের মতকে সমর্থন করা গেলেও 'সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ঈশ্বর' অদ্বৈত বেদান্ত এই কথা বলে না।

(গ) 'হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাসধর্মের পোষকতা করে......তাহাও অযথার্থ। শঙ্করাচার্য সন্ন্যাস-ধর্মের সৃষ্টিকর্তা।' —সন্ন্যাস-ধর্মের স্রষ্টা শঙ্কর নন, এ কথা বলা বাহুল্য। সন্ন্যাস সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল। বোধ করি, ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের বাড়াবাড়িই তার কারণ। কিন্তু সন্ন্যাস আসলে মানব-চেতনার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ, জীবনের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি। সংসারের সব আকর্ষণের মধ্য দিয়ে গিয়েই ক্রমে মানুষ ত্যাগের সার্থকতা বুঝতে পারে—তখন ফুলের ফলে পরিণতির মতো মানুষের হৃদয়ে পরম সত্যের প্রতি একান্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে।

(ঘ) রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের 'Do unto others as ye would be done by' বচনটির মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হ'যে ভেবেছিলেন যে এমন মহৎ নীতি আর কোন ধর্মে নেই, পরবর্তী ব্রাহ্মদের মধ্যেও এই মনোভাব দেখা যায়। কিন্তু রাজনারায়ণ 'আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ' এবং 'তদাত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'—বচন দুটি উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন যে এ কথা হিন্দুধর্মেও সমান গভীরতার সঙ্গেই উচ্চারিত।

(ঙ) জাতিভেদ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ দেখিয়েছেন—'ঋগ্বেদে জাতিভেদের উল্লেখ নাই।......পুরাকালে কর্ম ও চরিত্রগুণে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইত, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইত।' রাজনারায়ণ আরও কয়েকটি সংস্কারের উল্লেখ করেছেন, যাদের আলোচনা তত প্রয়োজনীয় নয়। মোটামুটিভাবে পূর্বপক্ষের যে সিদ্ধান্তগুলিকে রাজনারায়ণ নাকচ করেছেন, তা থেকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তখনকার শিক্ষিত লোকদের মতামত বুঝতে পারা যায়। রাজনারায়ণ আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'যেদিন বক্তৃতা করা হয় সেদিন লোকে লোকারণ্য, এই জন্য লোকে লোকারণ্য যে—এমন যে পচা জিনিষ হিন্দুধর্ম, ইহার পক্ষে একজন কি বলিতে পারে, তাহা শুনা কর্তব্য।' (ক্রমশঃ)

* অদ্বৈতবাদের এই সংজ্ঞা ঠিক নহে।

আমার বাঁশী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বাঁশী আমার বোবা হ'য়ে রইল প'ড়ে ভুঁয়ে।
বাজ্‌ল না আর মধুর সুরে মুখবায়ুর ফুঁয়ে।
একদা যা লাগ্‌ল ভালো
বহু জনের মন ভুলালো
বৃথাই তারে আদর করি আমার অধর ছুঁয়ে।

দীর্ঘশ্বাসের তপ্তবায়ে বাজ্‌ল এবার,
নতুন সুরে উঠ্‌ল বেজে লাগ্‌ল চমৎকার।
এ সুর আমি শোনাব কায়?
এ যে ছায়াপথ বেয়ে ধায়,
তুমি ছাড়া ইহার শ্রোতা মিলবে কোথা আর?

প্রাণ-ধারা

শ্রীনিতাইদাস সান্যাল

বহু যুগ যুগান্তর ধ'রে
বহিয়া চলেছে এক অনাবিল প্রাণ;
আজ এল মোর কাছে ফিরে;
আপন বলিয়া কত করি অভিমান।
বেঁধে রাখি ক্ষুদ্র দেহ-মাঝে
কত যত্নে, কত ভয়ে, কতই শঙ্কায়।
পেতে চাই মোর সব কাজে,
দু-জনেতে এক হ'য়ে রহিব ধরায়।
অকলঙ্ক চিন্ময় পরাণ,
দেহের কালিমা-মাখা দুষ্ট পরশনে
কভু হও তুমি যদি ম্লান,
কাঁদিবে কি সে ব্যথায় অশ্রু-বরষণে?

কবে জানি, যাত্রা-পথে মাতি,
তোমাতে আমাতে মিলি জীবন-ধারায়।
অনাদি কালের তুমি সাথী;
আমারে লইলে তুলি তোমার লীলায়।
কোন্ দূর গ্রহতারা হ'তে
এসেছ হেথায় মহাকালের আদেশে।
অনন্ত এ সময়ের স্রোতে
নিজেই দিয়েছ ধরা, দেহের আবেশে।
আমি অতি ক্ষুদ্র, শক্তিহীন;
মহা শক্তিধর তুমি অসীম অপার।
তোমাতে রয়েছি আমি লীন,
দু-জনে মিলিয়া গড়ি মর্ত্যের সংসার।

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব

[রায়রামানন্দ-মহাপ্রভু-সংবাদ]

শ্রীমতী সুধা সেন

দক্ষিণভারত তীর্থ-পরিক্রমার পথে বিদ্যানগরে গোদাবরী নদীর তীরে এক তরুণ গৌরকান্তি অপরূপ সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন—হাতে জপমালা, কমলনয়ন দুইটি যেন কাহার প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ ধাবিত।

সেদিন বিদ্যানগরে আপন ইষ্ট-মন্দিরে বসিয়া ধ্যানস্থ রায় রামানন্দ, উড়িষ্যা-রাজের অধীন এ প্রদেশের শাসনকর্তা। পরম ভক্ত রসিক-শ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ : কিন্তু আজ মন রাধাকৃষ্ণ-ধ্যানে কিছুতেই সমাহিত হইতে চাহিতেছে না, হৃদয়ে বারে বারেই চপলা-চমকের মতো এক গৌর সন্ন্যাসীর অপরূপ লাবণ্যঘন অঙ্গকান্তি যেন ঝলসিত হইয়া উঠিতেছে। কে এই সন্ন্যাসী—দীনকরুণ-নয়নে চাহিয়া? কি চাহেন তিনি রায় রামানন্দের কাছে?

পূজা-ধ্যান সমাপন করিয়া একটু বা বিক্ষিপ্ত চিত্তে রায় উঠিলেন। মধ্যাহ্ন-স্নানের আয়োজন প্রস্তুত; অগ্রে পশ্চাতে বাদ্য ভাট পুরোহিত লইয়া দোলায় আরোহণ করিয়া রায় গোদাবরী-তীরে উপনীত হইলেন।

সন্ন্যাসীর ব্যাকুল দৃষ্টি রায়ের প্রতি ধাবিত হইল, রায়ের চিত্তও চমকিত আলোড়িত হইয়া উঠিল। এ কি, এই তো সেই ধ্যানে-দেখা সন্ন্যাসী? কে ইনি? দোলা হইতে নামিয়া দ্রুত অধীর চরণে রায় সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে আসিয়া প্রণত হইলেন। সন্ন্যাসী ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া রায়কে হাত ধরিয়া উঠাইলেন, বলিলেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো—তুমি কি রায় রামানন্দ?' রামানন্দ কহিলেন, 'হাঁ, আমি সেই অধম দাস।'

শুভলগ্নটি যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াছিল; এইবার সময় হইল—রায় রামানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পরস্পর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। ভক্ত ও ভগবানের সত্তা হৃদয়ে-হৃদয়ে মিশিয়া গেল। অসহ্য আনন্দের আবেশে—অশ্রু-স্তম্ভ-পুলকের আবেগে দুইজনে দীর্ঘকাল বিবশ হইয়া রহিলেন। সঙ্গের লোকজন বিস্মিত হইলেন : এ কি, এই পরমসুন্দর সন্ন্যাসী কেন শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন? আর এই পরম মান্য, পরম ধীর আমাদের রাজাই বা কেন এই সন্ন্যাসীর স্পর্শে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন?

মহাপ্রভুর স্থৈর্য ফিরিয়া আসিল। চারিদিকে যাহারা, তাহারা বহিরঙ্গ; প্রভু তাই ধীরে ধীরে নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া বলিলেন, 'রায়, নীলাচলে বাসুদেব সার্বভৌম তোমার অপূর্ব কৃষ্ণপ্রেমের কথা আমাকে বলিয়াছেন, তিনিই তোমাকে দর্শনের জন্য আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আজ এত সহজে তোমার দর্শন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।'

রায় বলিলেন, 'সার্বভৌম আমাকে ভৃত্য-জ্ঞান করেন, তাই আমার চিত্ত-শোধনের জন্য কৃপাময় আপনাকে এই অধমের কাছে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহে আপনার রাতুল চরণ দর্শন করিলাম। আজ আমার সমস্ত দুর্দিনের অবসান হইল, আমার জন্ম সফল হইল। নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। আপনার আকৃতিতে, প্রকৃতিতেও পূর্ণ অবতার-লক্ষণ দেখিতেছি। আমি বিষয়ী—

আপনার অস্পৃশ্য, তথাপি স্পর্শ করিয়া আপনি আমাকে ধন্য করিলেন। শুধুমাত্র আপনার উপস্থিতি দ্বারা আপনি সমবেত এই সমস্ত লোকের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া কৃষ্ণনাম স্ফুরণ করাইতেছেন।'

প্রভু স্বভাবসিদ্ধ নম্র বচনে বলিলেন, 'না রায়, আমি সন্ন্যাসী, আমার চিত্ত নীরস কঠিন, তাই তাহা কৃষ্ণপ্রেমামৃতে স্নিগ্ধ দ্রবীভূত করিবার জন্যই সার্বভৌম আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন।'

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্তপ্রায়, এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। অত্যন্ত অনিচ্ছায় চিত্তের প্রবল উৎকণ্ঠাকে দমিত করিয়া প্রভু উঠিলেন, রায়ও গৃহে ফিরিলেন।

কোনরূপে দিবস অতিক্রান্ত হইল, সন্ধ্যা আসিল। বন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া প্রভু প্রতীক্ষমাণ; একজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিয়া রায় আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন।

এক নিভৃত নির্জন স্থানে বসিলেন দুইজনে; একজন পিপাসার্ত, আর একজন তৃষ্ণাহর,—দুইজনেই কৃষ্ণ-রসে রসিক।

সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের বহিঃসীমানায় প্রথম পদক্ষেপ হইল; অভ্রভেদী হর্ম্যের নিভৃত মণিময় প্রকোষ্ঠে রত্নবেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত এক অপূর্ব মনোহর মূর্তির পদতলে রায় ধীরে ধীরে প্রভুকে লইয়া উপবেশন করিলেন। প্রভু বলিলেন: রায়, পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে, স্বধর্মাচরণে বিষ্ণু-ভক্তি হয়॥

প্রভু রায়ের কাছে শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সহ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। রায় তাঁহার উক্তির সমর্থনে বিষ্ণুপুরাণ হইতে বলিলেন:

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥

—পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন, বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষ্ণুপ্রীতি-সাধনের অন্য উপায় নাই।

'প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর।' প্রভু যাহা জানিবার জন্য এতদূরে আসিয়াছেন, রসিকশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ ছাড়া যে-তত্ত্বের আর দ্বিতীয় বক্তা নাই, তাহা এত স্থূল, এত বাহিরের নয়; তাহা অকৈতব শুদ্ধ প্রেম—ঐশ্বর্যের নামগন্ধ তাহাতে নাই।

অল্প-অধিকারীর জন্যই কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম আচরণের ব্যবস্থা। বিষ্ণু ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান, বিশ্বধাতা; তিনি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দান করিতে সক্ষম, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম দেওয়া তাঁহার কাজ নয়। কাজেই প্রভু বলিলেন, 'রায়, এত বাহিরের কথা শুনাইও না—অগ্রসর হইয়া চলো।'

রায় বলিলেন, 'কৃষ্ণে কর্মার্পণ সর্বসাধ্য-সার।' নিজের মতের সমর্থনের জন্য তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে বলিলেন:

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

—হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, হোম-দান-তপস্যাদি যাহা যাহা কর, তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।

প্রভু বলিলেন, 'না রায়, এও বাহিরের কথা তুমি আরও অগ্রসর হও।'

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে কর্ম ও কর্মফল ত্যাগের উপদেশ দিলেন, প্রভু তাহাকে 'বাহ্য' বলিলেন কেন?

অর্জুন ক্ষত্রিয়; যুদ্ধ আসন্ন—ধর্মযুদ্ধ। আকস্মিক বৈরাগ্যের উদয়ে অর্জুন আজ যে যুদ্ধে নিরুদ্যম ও নিরাসক্তি দেখাইতেছেন, তাহা তাঁহার স্বভাবধর্ম নয়। জ্ঞানমিশ্র কর্মেই

তাঁহার অধিকার, শুদ্ধ প্রেমে কোন অভিরুচি বা অধিকার তাঁহার নাই, কাজেই তাঁহার জন্য কর্ম তথা কর্মফলত্যাগের ব্যবস্থা।

যাঁহারা সংসারী—যাঁহারা বৈধী ধর্মের আচরণকারী, তাঁহাদের জন্যও এই ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধা অনন্যা ভক্তির অধিকারী, তাঁহাদের স্বকীয় কোন কর্মই নাই, তাঁহাদের দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ দ্বারা অনুষ্ঠিত যত কর্ম সকলই কৃষ্ণময়। কেবল কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থেই তাহা অনুষ্ঠিত, কাজেই কৃষ্ণময় কর্ম আর কৃষ্ণে অর্পণ করিবার কোন প্রয়োজনই তাঁহাদের হয় না।

প্রভু সন্তোষ লাভ করিলেন না। রায় এইবার বলিলেন, 'স্বধর্ম-ত্যাগ ভক্তি সাধ্যসার'। প্রমাণ-স্বরূপে তিনি ভাগবত হইতে একটি ও গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন :

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥
(ভাঃ ১১।১১।৩২)

—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন, হে উদ্ধব, ধর্মশাস্ত্র আমাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে. তথাপি তাহার দোষগুণ জানিয়া স্বকীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম অতিক্রমপূর্বক যে ব্যক্তি আমার ভজন করে, সেই ব্যক্তিই সাধুত্তম।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮।৬৬)

—হে অর্জুন, সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব।

প্রভু বলিলেন, 'এহো বাহ্য'।

কর্ম, যোগ, জ্ঞান—সমস্ত সাধনার কথা বর্ণনা করিয়া সমগ্র গীতার শেষে শ্রীকৃষ্ণ সারাৎসার সর্বগুহ্যতম কথাটি পরম প্রিয় অন্তরঙ্গ অর্জুনের কানে কানে বলিলেন : অর্জুন! এতক্ষণ এত পথ—এত সাধনার কথা বলিয়াছি, কিন্তু এইবার তোমাকে—শুধু তোমাকেই বলি, আমাকে পাওয়ার উপায়টির কথা; সব ধর্মাধর্ম – সব কিছু ত্যাগ করিয়া তুমি আমার শরণ লও, একবার শুধু বলো, 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার।' তাহা হইলে সব মলিনতা—সব ধূলা ঝাড়িয়া আমি তোমাকে বক্ষে তুলিয়া লইব।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা—শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, পার্থেরই সারথি পার্থ-সারথি। তাই শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিতে যে দূরস্থিত দেউলের স্বর্ণচূড়াগ্রের দীপ্তির আভাসমাত্র তাঁহাকে দেখাইলেন, সে দেউল মথুরা দ্বারকা ইন্দ্রপ্রস্থে নয়, সে দেউল হৃদয়ের বৃন্দাবনে। কি করিয়া সর্বধর্ম, কুল-শীলমান, আর্যধর্ম, বেদধর্ম, লোক-লজ্জা, দেহ-মন-প্রাণ, নিজ সুখবাঞ্ছা - এমন কি মুক্তিবাঞ্ছা পর্যন্ত অবহেলায় বিসর্জন দিয়া একমাত্র তাঁহারই শরণ লইতে হয়, তাহা দেখাইয়াছেন ব্রজগোপীগণ—আর কেহ নয়।

অর্জুন সখা, গোপীভাব তাঁহার নয়। তাঁহার সর্বধর্ম-ত্যাগজনিত আশঙ্কার (!) পশ্চাতে আছে কৃষ্ণের আশ্বাস-বাক্য—'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

অর্জুনের আশ্বাসের প্রয়োজন আছে, কিন্তু গোপীর তাহা নাই; তাই গোপী সকল কলঙ্ককে অঙ্গের ভূষণ করিতে পারেন।

প্রভুর কর্ণ তৃষিত হইয়া আসে, সেই সব-দেওয়া প্রেমের সুধা পান করিবার আশায়, তাই বলিলেন, 'রায়, এ-ও বাহিরের, আরও ভিতরে চলো।'

রায় বলিলেন, 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার' সমর্থক শ্লোক (গীতা ৮।৫৪) :

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

—ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া তিনি আমাতে পরা ভক্তি লাভ করেন।

প্রভু বলিলেন, 'ইহাও বাহিরের কথা।'

মুণ্ডক উপনিষদ্ ১।১।১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে—'পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'—পরাবিদ্যা দ্বারাই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়। শ্রুতি-মতে বিদ্যা দুইটি—অপরা ও পরা। অপরা—মায়াশক্তির বৃত্তি এবং পরা বিদ্যা ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির বৃত্তি। ইহাই শুদ্ধসত্ত্ব-স্বভাবা, যাহা হৃদয় হইতে অবিদ্যার আবরণ দূর করিয়া ব্রহ্মকে প্রকাশ করে।

পরা বিদ্যা ও পরা ভক্তি একই বস্তু। মূলতঃ দুইটি অভিন্ন, প্রভেদ কেবল আস্বাদন-বৈচিত্র্যে। যিনি ব্রহ্মভূত, তিনি সর্বত্র সমদর্শী, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ তথা ব্রহ্মবিহার-জনিত এক সমাধিরসে মগ্ন থাকেন। ভক্তির সাহচর্য ব্যতীত পরাবিদ্যা লাভ করা দুষ্কর। পরা বিদ্যায় সংবিদ্ তথা শুদ্ধ জ্ঞানেরই প্রাধান্য, কিন্তু হ্লাদিনী তথা ভক্তির আনন্দদায়িনী শক্তিরও যথেষ্ট বিকাশ থাকে, নতুবা ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিই অসম্ভব হইত।

আর পরা ভক্তির যে পরিণতি কৃষ্ণবিহার, তাহাতে হ্লাদিনীর প্রাধান্য, কিন্তু সংবিদ্ তথা জ্ঞানের সাহচর্যেরও যথেষ্ট প্রয়োজন, নতুবা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করাও অসম্ভব।

প্রভু এই পরা বিদ্যা তথা পরা ভক্তিকে 'বাহ্য' বলেন নাই, বলিয়াছেন—ঐশ্বর্য-জ্ঞানমিশ্রা, মমত্ব-বুদ্ধিহীন, সঙ্কুচিত যে কৃষ্ণভক্তি, তাহাই বাহ্য।

ভাদ্র মাস; কৃষ্ণা অষ্টমীর গভীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ-তলে, মধ্য নিশীথের নীরব কারাগৃহে, কঠিন লৌহশৃঙ্খলের ব্যথার মধ্যে যখন সর্বদুঃখহর শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হইলেন, তখন পুত্র জানিয়াও বসুদেব ও দেবকী নবজাত শিশুকে বিষ্ণু-জ্ঞানে স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ সম্বরণ করিয়া দ্বিভুজ হইলেন, তথাপি যেন দেবকীর সশঙ্ক হৃদয় ব্যগ্র ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া পুত্রকে বক্ষোলগ্ন করিতে দ্বিধা করিতেছিল। দেবকী জানেন, তাঁহার পুত্র বিশ্বের অধীশ্বর; কাজেই তাঁহার মমত্ব-জ্ঞান দ্বিধাগ্রস্ত, সঙ্কুচিত।

শুধু মথুরায় নয়, দ্বারকায়ও দেখিতে পাই এই ঐশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির প্রকাশ।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ প্রধানামহিষী স্বয়ং লক্ষ্মী-রূপা রুক্মিণীকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন: দুষ্ট শিশুপালের হাত হইতে রুক্মিণীর অনুরোধে তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু রুক্মিণীতে তাঁহার কোন স্পৃহা নাই। তিনি অকিঞ্চন, নিরাসক্ত, অসংসারী; কাজেই তিনি রুক্মিণীর পতি হওয়ার অযোগ্য। তিনি রুক্মিণীকে মুক্তি দান করিতেছেন, রুক্মিণী যাঁহাকে ইচ্ছা পতিত্বে বরণ করুন।

পতির পরিহাস শুনিবামাত্র রুক্মিণীর মন ভয়ে ও আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল—সত্যই তো তিনি কেবল আমার পতি নহেন, তিনি যে জগৎ-পতি। মায়ার সংসার কি ইঁহাকে বাঁধিতে পারে কোন দিন? তবে কি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? ভয়াতুরা কপোতী মূর্ছিতা হইয়া ধূলিতে লুণ্ঠিতা হইলেন।

মহাপ্রভু এই ঐশ্বর্য-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই বলিলেন, 'এহো বাহ্য'।

রায় এবার বলিলেন—'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার'। প্রমাণ-শ্লোক:

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভির্যে
প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'হে অজিত, তোমার স্বরূপের বা ঐশ্বর্যাদি মহিমার বিচারের কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা কেবলমাত্র সাধুগণের আবাস-স্থানে অবস্থান পূর্বক সাধুগণের মুখোচ্চারিত এবং আপনা হইতেই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার রূপ-গুণ-লীলাদির কথা, তোমার চরিতকথা বা তোমার ভক্তদের কথার কায়মনোবাক্যে সৎকার পূর্বক জীবন ধারণ করেন, ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহাদের দ্বারাই প্রায়শঃ তুমি বশীভূত হও।

প্রভু বলিলেন—'এহো হয়'। সুনিপুণ সুদক্ষ পথিকৃৎ রায় রামানন্দ এতক্ষণ যেন পাষাণময় নানা রুক্ষপথের মধ্য দিয়া প্রভুকে লইয়া আসিয়াছিলেন, এবারে ছায়াঘন কুসুমাস্তীর্ণ পথে প্রভুসহ আসিয়া পৌছাইলেন—অদূরে প্রেম-দেউলের চূড়া দৃষ্ট হইতে লাগিল। আর বেশী দূর নয়; এই জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া অচিরেই পৌছাইয়া দিবে সেইখানে, যেখানে বালগোপাল যশোদার স্নেহ-বন্ধনে ধরা পড়িয়াছেন।

কচি মুখখানি ভরিয়া মাটির দাগ; সখা ভ্রাতা সব সাক্ষী উপস্থিত—তবুও দুষ্ট ভীত বালক বলিতেছে, 'আমি মাটি খাই নাই, মাগো, এরা মিথ্যা কথা বলিতেছে, এই দেখ না আমার মুখ?'

গোপাল হাঁ করিলেন, যশোদা দেখিলেন তাঁহার গোপালের মুখবিবরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, মুহূর্তের জন্য পুত্রজ্ঞান তিরোহিত হইল, নারায়ণ-জ্ঞানে স্তুতি করিলেন ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকিত হইয়া উঠিলেন! কি সর্বনাশ! কোন যক্ষ, রক্ষ না প্রেতাশ্রিত হইল আমার গোপাল? রক্ষা-কবচ বাঁধিয়া দিলেন পুত্রের কণ্ঠে, পুত্রের মঙ্গল-কামনায় বারে বারে প্রার্থনা জানাইলেন নারায়ণের পায়।

ঘরে ঘরে ননী চুরি! রোজ অভিযোগ কানে আসে। আজ চোর ধরা পড়িয়াছে—আর নয়, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না গোপালকে; আজ তাহাকে বন্ধন করিতে হইবে—মাতা রজ্জু লইলেন।

ঐটুকু তো কোমল অঙ্গ—বেষ্টন করিতে কতোটুকুই বা রজ্জুর প্রয়োজন? কিন্তু কি আশ্চর্য! রজ্জুর পর রজ্জু সংগৃহীত হইতে লাগিল, তবু ঐ পরিমিত শিশু-তনুখানি বেষ্টিত হইল না। যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, ভিতর নাই, বাহির নাই, তাঁহাকে বন্ধন করিবে কে—কিসের দ্বারা? শ্রান্ত ক্লান্ত—ঈষৎ বা ক্রুদ্ধ যশোদার বদন হইতে স্বেদধারা নির্গত হইতে লাগিল, তথাপি চলিল বন্ধনের চেষ্টা। একবার মনে হইল, না—এ তো গোপাল নয়, এ যে বিশ্বপালক বিশ্বধাতা।

মায়ের ক্লান্তির বেদনার ছোঁয়া বুঝি স্পর্শ করিল ঈশ্বরকে—তাই ক্রন্দনরত ভীরু চোখে-মুখে অপরূপ মায়ার কাজল মাখিয়া বন্ধনে ধরা দিলেন গোপাল।

অঘাসুর, বকাসুর, পুতনাবধ, কালীয়দমন—ঐশ্বর্যের কত লীলাই তো ঘটিল বৃন্দাবনে, কিন্তু নন্দ-যশোদা, গোপ-গোপী তাঁহাদের কানাই-এর উপরে নারায়ণের কৃপার প্রকাশই প্রত্যক্ষ করিলেন মাত্র? গোপাল তো সাধারণ বালক, তাহার আবার কোথা হইতে আসিবে এই অলৌকিক ক্ষমতা? তাহাকে রক্ষা করিতেছেন নারায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে সমস্ত ব্রজধাম যখন শোকসাগরে মগ্ন, তখন শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার

পরম প্রিয় উদ্ধবকে একবার ব্রজে পাঠাইলেন—সখা-সখী, গোপ-গোপী ও মাতা-পিতাকে সান্ত্বনা দিতে।

রাজরথে আরোহণ করিয়া রাজপ্রতিনিধি কৃষ্ণের সংবাদ লইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন; মনে আছে গুরুদায়িত্বের গৌরব। জ্ঞানী-ভক্ত উদ্ধব—সর্বত্র তাঁহার ব্রহ্মদৃষ্টি, জানেন না কৃষ্ণ-বিরহের তীব্রতা কত দূর। শোকাচ্ছন্ন ব্রজে প্রবেশ করিয়া মন বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু নন্দগৃহে প্রবেশ করিয়া বিরহের যে রূপ দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কথা কহিবার সাহস হইল না। দীর্ঘকাল সেই সীমাহীন শোকের সম্মুখে নীরব থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'নন্দ মহারাজ! ধন্য আপনার ভাগ্য, ধন্য আপনার কৃষ্ণপ্রেম! কত জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলে আপনি কৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং ভগবান—এ নিখিল বিশ্ব যাঁহার সৃষ্টি।'

যে প্রবল মানসিক শক্তিতে নন্দ আপন উদ্বেলিত হৃদয়ের গভীর শোককে এতদিন দমিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, উদ্ধবকে দর্শন করা অবধি তাহা আর বাধা মানিল না, প্রবলবেগে উৎসারিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, 'উদ্ধব, জানিতাম—মহাজ্ঞানী মহাশাস্ত্রজ্ঞ আপনি, কিন্তু কি অজ্ঞের মতো কথা বলিতেছেন আজ? কে স্বয়ং ভগবান, আমার গোপাল? উদ্ধব মহাশয়! আপনি কি জানেন না, সে যে আমার কত অবোধ, কত বা তাহার শিশুসুলভ চঞ্চলতা? সারাদিন ঘরে ঘরে ননী ক্ষীর চুরি করিয়া খায়, কতদিন তাহার মায়ের কাছেও তো ধরা পড়িয়াছে? চুরি তো করেই—আবার ধরা পড়িয়া মিথ্যা কথাও বলে; বলে, আমি ননী খাই নাই। বলুন তো মহাজ্ঞানী উদ্ধব! ভগবান কি চুরি করেন—না মিথ্যা কথা বলেন?'

মহাজ্ঞানী উদ্ধব নীরব হইলেন। কি বলিবেন তিনি এই বাৎসল্যকাতর নন্দ মহারাজকে? এই প্রেমের রাজ্যের খবর তো তাঁহার জানা নাই!

আর এক ভক্ত দেবর্ষি নারদ—একদিন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় দ্বারকায় আসিয়াছেন; দেখেন অপরিসীম শিরঃপীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ কাতর। নারদ বিস্মিত হইলেন, তথাপি ব্যাকুলচিত্তে প্রতিকারের উপায় জানিতে চাহিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া নারদের পদধূলি ভিক্ষা করিলেন, বলিলেন, শিরঃপীড়ার এই একমাত্র মহৌষধ—ভক্ত-পদধূলি মস্তকে ধারণ।

শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া, জিহ্বা দংশন করিয়া নারদ শত হস্ত দূরে সরিয়া গেলেন। দ্বারকার মহিষীবৃন্দ, উদ্ধবাদি ভক্তবৃন্দ, ত্রিভুবনের সমস্ত দেব, ঋষি—সকলের কাছেই শ্রীকৃষ্ণ নারদকে পাঠাইলেন—ভক্ত-পদধূলির আশায়। শূন্যহস্তে বিষণ্ণচিত্তে নারদ ফিরিয়া আসিলেন, কে দিবেন ভগবানের মস্তকে পদধূলি, কাহার আছে সেই মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ?

পথে পড়িল বৃন্দাবন—গোপপল্লী। কি যে আকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের এই মূঢ় গ্রাম্য গোপ-গোপীর প্রতি—দেবর্ষি তাহা বুঝিতে পারেন না; তথাপি আজ হতাশার শেষ সীমায় আসিয়া ভাবিলেন, একবার দেখিয়াই যাই না?

ব্রজধামে আসিয়া দাঁড়াইলেন দেবর্ষি, অমনি চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন ব্রজগোপীগণ—তাঁহাদের কণ্ঠে ব্যাকুল প্রশ্ন: 'বলুন দেবর্ষি! শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন কি? তাঁহার কুশল বলিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করুন।'

নারদ শ্রীকৃষ্ণের পীড়া ও অদ্ভুত ঔষধের কথা বলিলেন; এবং ত্রিভুবন ঘুরিয়াও যে তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহাও জানাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর কিশলয়তুল্য শত শত পদ মহাপূজ্য দেবর্ষির সম্মুখে প্রসারিত হইল, গোপীগণ কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—'নিন মহর্ষি, এই মুহূর্তে আমাদের পদধূলি নিয়া শীঘ্র কৃষ্ণকে আগে সুস্থ করিয়া তুলুন; আমাদের পাপের কথা পরে ভাবা যাইবে।'

ইহাই শুদ্ধ অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, স্বার্থগন্ধ-হীন ভালবাসা। এই প্রেম যেন মধ্যাহ্ন জ্ঞান-সূর্যের প্রখর জ্বালার পর্যবসান গোধূলির স্নিগ্ধ প্রেমের আলোতে, যেন প্রজ্বলিত ধূপকাঠির শিখাটি স্তিমিত করার পরে স্নিগ্ধসুগন্ধ-বিস্তার।

তাই একদিন ব্রজকান্তাদের এই প্রেমের পদমূলেই মহাজ্ঞানী উদ্ধব আপনাকে নতলুণ্ঠিত করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি যেন বৃন্দাবনের লতা গুল্ম তৃণ হইয়া জন্ম লাভ করি; গোপীগণের চরণধূলায় সেদিন আমি অভিষিক্ত হইব।'

প্রভু আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন; প্রসন্ন স্মিত হাস্যে বলিলেন, 'এহো হয়, আগে কহ আর,'

'রায় কহে, প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য-সার।'

প্রমাণ স্বরূপ 'পদাবলী' হইতে তিনি দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকটি এই:

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥ (পদ্যাবল্যাং ১৪)

—যদি কোন ক্রমে (সৌভাগ্যাতিশয্যে) কোন কারণবশতঃ মিলিয়া যায়, তবে (যেমন করিয়াই হ'ক) কৃষ্ণভক্তিরসের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত (জারিত) মতি (বুদ্ধি) ক্রয় করিবে। কৃষ্ণে তাদাত্ম্য-বুদ্ধি ক্রয় করিতে গেলে লালসাই হইবে একমাত্র মূল্য। কিন্তু কোটি জন্মের সুকৃতির ফলেও সেই লালসা পাওয়া যায় না। [ক্রমশঃ]

লহ প্রণাম

শ্রীশান্তশীল দাস

শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম,
হে মহাজীবন, হে অভিরাম!
অন্তর-মাঝে ধ্বনিত নিত্য
সঙ্গীতসম ও-প্রিয়নাম।

তুমি অপরূপ, তুমি অভয়,
তুমি নিরুপম, জ্যোতির্ময়!
চিরসুন্দর ও-মূরতিখানি,
ও-জীবন চির দিব্যধাম।

তুমি দীপশিখা চির-উজ্জ্বল,
শান্ত, সৌম্য, অচঞ্চল!
'নর'রূপে তুমি এলে 'নারায়ণ'—
ধন্য হ'ল এ মর্ত্যধাম।

অশরণে তুমি দিলে শরণ,
মন্ত্রটি দিলে দুখহরণ:
সেখানেতে জীব সেখানেই শিব,
এ-মন্ত্র জপি অবিশ্রাম।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা দেশে দেখা দেয় নবযুগের অপূর্ব লক্ষণ। স্বামীজীর জাগরণের বাণী সুপ্তোত্থিত ভারত-বাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল ধর্মে, কর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে ও দেশপ্রেমে। কক্ষভ্রষ্ট বহু ধূমকেতুই স্বামীজীর আহ্বানে ও আকর্ষণে কল্যাণের কক্ষপথে চালিত হইয়া জাতীয় জাগরণের মহাব্রতে নিয়োজিত হয়। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাহাদেরই একজন; আমরা তাঁহাকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। আত্মবিস্মৃত বঙ্গবাসীর অধিকাংশই আজ জানে না শতবর্ষ পূর্বে (১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৬১) মুক্তির এই উপাসক বাংলাদেশে—হুগলি জেলার এক অখ্যাত পল্লীতে (খন্যান গ্রামে) জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মবান্ধবের জীবন বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়া বালক ভবানীচরণ (বন্দ্যোপাধ্যায়) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন, কেশব-চন্দ্রের মর্মস্পর্শী ভাষণ শুনিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; ক্রমশঃ খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে প্রটেস্টান্ট, পরে রোম্যান ক্যাথলিক সাধু হইয়া তিনি সিন্ধুদেশে প্রচার করিতে থাকেন; তখন তাঁহার নাম হয় রেভারেণ্ড থিওফিলাস (Theophilus = Lover of God). ১৮৯৪ খৃঃ ভারতীয় সন্ন্যাসীর মতো গৈরিক ধারণ করিয়া নাম পরিবর্তন করেন 'ব্রহ্মবান্ধব'। তখনও তিনি Sophia পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া ক্যাথলিক ধর্মই প্রচার করিতেন।

১৮৯৩ খৃঃ শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্য তাহাকে বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট করে। এই কালে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে তাঁহার মনের এই পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

১৯০২ খৃঃ স্বামীজীর দেহত্যাগের পর স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তিনি কপর্দকশূন্যহস্তে ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার করিতে যান এবং অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় অক্সফোর্ডে ও কেম্ব্রিজে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রচলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন।

১৯০৩ খৃঃ ভারতে ফিরিয়া তিনি সম্পূর্ণ নূতন এক পথে পদক্ষেপ করিলেন। এক পয়সা মূল্যের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া তিনি জাতীয়তাবোধ ছড়াইতে লাগিলেন। বিদেশীর মোহ কাটাইয়া দেশবাসীকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ও ভারতীয় সংবাদ-পত্রের ইতিহাসে 'সন্ধ্যা'র স্থান অতি উচ্চে। উপাধ্যায় ক্রমশঃ 'স্বদেশী আন্দোলনে'র নেতাদের সহিত মিলিত হইয়া ঐ আন্দোলন শক্তিশালী করেন।

১৯০৭ খৃঃ কঠোর দমননীতির ফলে 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার পরই 'সন্ধ্যা' রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়। 'সন্ধ্যা' প্রকাশনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মবান্ধব সরকারকে জানান, তিনি বিচারের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবেন না; আরও জানান, বিদেশী সরকারের সাধ্য নাই যে তাঁহাকে শাস্তি দেয়। দেশপ্রেমিক ও ঈশ্বর-প্রেমিক এই সাধুর উক্তি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। বিচারাধীন থাকা কালেই ২৭শে অক্টোবর হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সমালোচনা

শিখের মন্ত্র— অনুবাদক : শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা কারুচারাল সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় অমৃতসর শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৫ ; মূল্যের উল্লেখ নাই।

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যেমন বেদ, খৃষ্টধর্মের বাইবেল এবং ইসলাম ধর্মের কোরান, সেইরূপ শিখধর্মের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের নাম 'আদি-গ্রন্থ'। শিখেরা ইহাকে 'গুরু-গ্রন্থ'ও বলেন। উপনিষদের সার যেরূপ 'গীতা', 'আদিগ্রন্থে'র সারভাগ সেইরূপ 'জপজী'। 'জপজী' গ্রন্থই 'শিখের মন্ত্র' রূপে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থ।

'জপজী' গুরু নানকের মর্মবাণী, তিনি যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সাধকের মঙ্গলের জন্য তাহা 'জপজী'তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সত্যগুলি সাধনপথের বিশেষ সহায়ক—ইহাতে যে কোন মতের ও যে কোন পথের সাধক সাধনার সার্বভৌম ভাব ও আদর্শ উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইবেন। সুধী গ্রন্থকার এই মূল্যবান্ পুস্তকখানি বাংলা ভাষায় সহজ সরস অনুবাদ করিয়া বঙ্গবাসীর নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শিখধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে আগ্রহশীল পাঠককে এই বইটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভক্তমালা—সাধু অঘোরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। নববিধান পাবলিকেশন কমিটি কর্তৃক ৯৫, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১২ ; মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও দেবর্ষি নারদের আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে সমবেত উপাসনা ও প্রার্থনার উপর জোর দিলে ব্রাহ্ম ভক্তগণের মন ব্যাকুলতা ও ভক্তির দিকে আকৃষ্ট হয়। সেই ভক্তি-রস ব্রাহ্মসমাজ-জীবনকে সরস ও উর্বর করিয়া তোলে। সেই সময় কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় অঘোরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ভাগবত-পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে আদর্শ ভক্ত-জীবনের আখ্যায়িকা সঙ্কলন করিয়া সকলকে শুনাইতেন, পরে সেইগুলি একত্র করিয়া তিনি 'ভক্তমালা' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহার মধ্যে 'ধ্রুব ও প্রহ্লাদ' ১৮৭১ খৃঃ এবং 'দেবর্ষি নারদের নবজীবন-লাভ' ১৮৭৬ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই দুইটি একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বহুদিন পূর্বে রচিত এরূপ একখানি পুস্তকের পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করিয়া শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় এইরূপ গ্রন্থের মূল্য অনস্বীকার্য। বইটিতে শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও নারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে ভক্তিরসের সঞ্চার হইবে।

পুস্তকে উদ্ধৃত ভাগবত ও পুরাণের শ্লোক-গুলি কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি সন্ধান করিয়া সন্নিবেশিত হইলে পুনঃপ্রকাশের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর: গত ৯ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের নবনবতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীসারদামঠে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও কঠোপনিষৎ পাঠ হয়। প্রসাদ-বিতরণের পর অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে একটি মহিলা-সভায় স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা কর্তৃক মঙ্গল-গীতি আবৃত্তির পর সুরশিল্পী শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার স্বামীজীর স্তব ও গান গাহিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা স্বামীজী-চরিত্রের বিভিন্ন দিক এবং নবসমাজ-গঠনে স্বামীজীর অবদান সম্বন্ধে ইংরেজীতে ভাষণ দেন। অতঃপর প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা 'প্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে সহজ সরল ভাষায় আলোচনা করেন। সভানেত্রী ডাঃ কল্যাণী মল্লিক শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক মিলন ও উহার প্রভাবে তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার সার্থক প্রকাশ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রায় ৪০০ মহিলা সভাতে উপস্থিত ছিলেন।

ব্রহ্মানন্দ-জন্মোৎসব

ভুবনেশ্বর: স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ১৮ই জানুআরি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নবনবতিতম জন্মোৎসব মহা উৎসাহে সম্পন্ন হয়। অতি প্রত্যূষ হইতে মঙ্গলারাত্রিক, ভজন, পূজা ও চণ্ডী-পাঠাদি হইতে থাকে। বেলা ১১টায় কলিকাতা হইতে আগত পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ' নামক তদ্রচিত কথকতা সুমধুর গীত-সহযোগে পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করেন।

দ্বিপ্রহরে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রায় তিন সহস্র নরনারী পরম ভক্তি-ভরে অন্ন-প্রসাদাদি গ্রহণ করেন।

বৈকাল ৫টায় সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে উড়িষ্যা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ কে. এন. মিশ্রের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভায় স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ ও শ্রীগৌরীনাথ ব্রহ্ম গাম্ভীর্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। পরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুমধুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের আগমনের কারণ বর্ণনা করেন।

সভাশেষে কলিকাতার কীর্তন-বিশারদ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় সুমধুর কীর্তনে সকলকে আপ্যায়িত করেন।

সর্বশেষে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর একান্ত প্রিয় শ্রীশ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তন সাধু ও ভক্তগণ কর্তৃক গীত হইলে ঐ দিনের উৎসব সমাপ্ত হয়।

অনুষ্ঠানে ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত বহু ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীসুকৃথঙ্কর মহাশয়ও কিছু সময়ের জন্য আশ্রমে আসিয়া তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া যান।

কার্যবিবরণী

বারাণসী: কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ১৯০০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তদবধি ইহা জাতি-ধর্মনির্বিশেষে আর্তসেবায় রত।

১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত সেবাশ্রমের কর্মধারা:

(১) সাধারণ হাসপাতাল (অন্তর্বিভাগ): আলোচ্য বর্ষে ৩,৪০১ রোগী ভরতি হয়, ২,৯০৩ আরোগ্য লাভ করে। অস্ত্র চিকিৎসা: ৭২৬। গড়ে দৈনিক ১০২টি শয্যায় রোগী ছিল।

(২) বৃদ্ধ অসমর্থ পুরুষ ও নারীর আশ্রয়-ভবন: ভবন দুইটিতে যথাক্রমে ২৫ জন পুরুষ ও ৫০ জন নারীর স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে, কিন্তু পুরুষ-বিভাগে ৯ জন এবং মহিলা-বিভাগে ২২ জন আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন; অর্থাভাবে অধিক ভরতি করা সম্ভব হয় নাই।

(৩) সাধারণ চিকিৎসালয় (বহির্বিভাগ): আলোচ্য বর্ষে (শিবালা শাখা-কেন্দ্রের রোগীসহ) মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা: নূতন ৬২,৯০২; পুরাতন ২,০১,৯৭২। গড়ে দৈনিক রোগী ৭৩৫; অস্ত্র-চিকিৎসা (ইঞ্জেকশন সহ) মোট ৫২,৫৫৯।

(৪) সাহায্য: ১০৬ জন দরিদ্র অসহায় নারীকে সাহায্য বাবদ ২,২৮৫'৬০ টাকা এবং ২৬ জন ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বেতন, বইপত্র, খাদ্য ও পোষাকের জন্য ৫৬৪৲ টাকা ব্যয় করা হয়। এতদ্ব্যতীত ৫৪০ জনকে ১,১৯৫'২৪ টাকা সাময়িক সাহায্য প্রদত্ত হয়। ১৪১টি কম্বল ও ৫৫ খানি ধুতি বিতরণ করা হয়।

(৫) দৈনিক ৭৯৮ (বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, জননী, শিশু ও রুগ্‌ণ) জনকে দুধ দেওয়া হইয়াছিল।

(৬) প্যাথলজি এবং এক্স্‌-রে ও ইলেক্ট্রো-থেরাপি বিভাগের পরীক্ষা-কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জামসেদপুর: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯৫৯ খৃঃ (৩৯ তম) কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র কর্তৃক ৫টি হাই স্কুল (২টি বালিকাদের), ৪টি মিডল স্কুল, ৩টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ২টি নিম্ন প্রাথমিক—মোট ১৪টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে খেলাধুলা ও স্বাস্থ্যচর্চার সুব্যবস্থা আছে।

গত ৫ বৎসরের ছাত্রছাত্রী-সংখ্যার তালিকা:

বর্ষ	সংখ্যা
১৯৫৫	৪,৩১৪
'৫৬	৪,৬৩৯
'৫৭	৬,০২০
'৫৮	৬,৪৭৩
'৫৯	৬,৭৯৭

শেষোক্ত সংখ্যার মধ্যে বালক—৩,৭৩৮, বালিকা—৩,০৫৯; ক্রমিক-বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। ছাত্রাবাস-দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে মোট ৩৪ জন ছাত্র ছিল। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রধান গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৩,৫০৩ (পূর্ব বর্ষের সংখ্যা ২,৯৮৬); পাঠাগারে ২টি দৈনিক, ৩টি সাপ্তাহিক এবং ১২টি মাসিক পত্রিকা লওয়া হইয়াছে। ১২টি স্কুল লাইব্রেরির মোট পুস্তক-সংখ্যা ১৪,১৩৬। সাপ্তাহিক ক্লাস এবং সভার মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সিংহল: রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৫৮ ও '৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের কার্য প্রধানতঃ শিক্ষা-বিস্তার। বাট্টিকালোয়া, বাদুল্লা, জাফনা, ভাবুনিয়া ও ত্রিঙ্কোমালি জেলায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাবিস্তার-কার্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৪টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সমেত মোট ২৬টি বিদ্যালয়ে ২৯৬ জন শিক্ষাদান-কার্যে নিযুক্ত আছেন। বিদ্যালয়-

গুলিতে সর্বসমেত ৮,৬৭৬ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা-লাভের সুযোগ পাইতেছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যচর্চা ও ধর্মানুশীলনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়; শিল্প ও কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। ৩টি অনাথ-ভবন (২টি বালিকাদের) এবং ২টি ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাস সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালিত হইতেছে, এইগুলির মোট ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৩৩৫।

কলম্বো আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য পূজা হয় এবং আশ্রমের বাহিরেও নিয়মিত ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় জন-সাধারণ তাঁহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। গ্রন্থা-গারের পুস্তক-সংখ্যা ২,১৫০; পাঠাগারে ৫টি দৈনিক ও ৩১টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত আসে।

আলোচ্য বর্ষে সিংহলের বিভিন্ন জেলায় মিশনের বন্যার্ত-সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৩৫টি গ্রামে ৪,৬৬৮ পরিবারকে দুইমাসব্যাপী সাহায্য এবং ২০০ পরিবারের গৃহনির্মাণে অর্থ সাহায্য করা হয়।

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার): প্রতি শনিবার নিম্নোক্ত সূচী অনুযায়ী পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল:

বিষয়	বক্তা
১৯৬০, জুলাই :	
গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
ভগবদ্‌ভক্তি	শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী
চণ্ডীর কথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ধর্ম ও শিক্ষা	স্বামী অজজানন্দ
শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী
আগস্ট :	
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	স্বামী জীবানন্দ
গীতা	„ সাধনানন্দ
শ্রীকৃষ্ণ-জন্মকথা	„ জীবানন্দ
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ
গীতা	ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য
মহাভারত	শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
সেপ্টেম্বর :	
চণ্ডীর কথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কথামৃত	স্বামী দেবানন্দ
স্বামী অভেদানন্দ	„ নিবৃত্ত্যানন্দ
শক্তিপূজা	„ নিরাময়ানন্দ
অক্টোবর :	
গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
ভারতের জাতীয় বিশেষত্ব	„ সুন্দরানন্দ
ধর্মপ্রসঙ্গ	„ শুদ্ধসত্ত্বানন্দ
নভেম্বর :	
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	স্বামী সুশান্তানন্দ
„ সুবোধানন্দ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ধর্মের দশবিধ লক্ষণ ও তাহার প্রয়োগ	স্বামী জীবানন্দ
গীতার বাণী	„ বোধাত্মানন্দ
নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী
ডিসেম্বর :	
বর্তমান ভারত ও স্বামীজীর আদর্শ	শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ-প্রসঙ্গ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কীর্তন (দানলীলা)	রাধারমণ কীর্তন-সমাজ
নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান	শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী
চণ্ডীর কথকতা	শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি) ঃ

নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং প্রতি বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয় ঃ

সেপ্টেম্বর ঃ ধ্যান ও সমাধির প্রকার ; ধর্মে যুক্তি ও অনুভূতির স্থান ; ঈশ্বর আছেন কি ?—তাহার প্রমাণ , যোগ ও বেদান্ত।

অক্টোবর ঃ মরণের পারে ; মানুষ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ ; আমরা যাহা অনুসন্ধান করি, তাহা এখানেই আছে এবং এখনই পাওয়া যাইতে পারে ; আধ্যাত্মিক শিক্ষা কি ? শ্রীকৃষ্ণ ও গীতার শিক্ষা ; জগন্মাতাকে কিরূপে উপাসনা করিব ? কর্মের বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায় ; ঈশ্বরের জন্যই জীবনধারণ ; ঈশ্বর ও স্বেচ্ছাচারী রাজা।

নভেম্বর ঃ যে শক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করে ; কুণ্ডলিনী শক্তিকে কিরূপে জাগানো যায় ? ধ্যান কাহাকে বলে ? জীবাত্মার উন্নতি ও অবনতি ; আত্ম-প্রভুত্ব কিভাবে লাভ করা যায় ? আত্মা ও মনের সম্পর্ক ; ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরলাভ ; স্বামী প্রেমানন্দকে যেরূপ জানিয়াছি ; শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং সম্মুখস্থ হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

পুরাতন মন্দিরে ঃ প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮ টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আলোচনা করেন। রবিবার ব্যতীত অন্যদিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেলা ১১টা হইতে ১২টা শিশুদের সময়।

বক্তৃতা-সফর

দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গত ১১ই জুলাই হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বক্তৃতা-সফর করেন। ভারতের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগরে এবং মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সাইগন, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েটনাম ও ব্রহ্মদেশের প্রধান নগরগুলিতে বিশিষ্ট জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা করেন। তাঁহার প্রধান বক্তৃতাগুলি সিঙ্গাপুর, জাকর্তা, কুয়ালা-লামপুর, সাইগন, ব্যাঙ্কক ও রেঙ্গুনে প্রদত্ত হয়। নির্বাচিত কয়েকটি বিষয় ঃ

ভারতীয় কৃষ্টির তাৎপর্য, ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক জীবন, উপনিষদের সৌন্দর্য, হিন্দু-ধর্মের মূল উৎস, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক পট-ভূমিকা, বুদ্ধের শাশ্বত বাণী, গীতার প্রধান ভাব, যীশুখৃষ্টকে কেন পূজা করি, ইসলামের মূল ভাব, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন, ভারতে ও বাহিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা, ভারতীয় দর্শন ও আধুনিক চিন্তা, বিজ্ঞান গণতন্ত্র ও ধর্ম, ভারতের নবজাগরণ, ভারতে নারীজাতির অভ্যুদয়, নাগরিকতার নীতি, শিল্পযুগে আধ্যাত্মিকতা, শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত, বিবেকানন্দের বাণী, ভারতের মহাপুরুষগণ।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

ভক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন : আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২১শে জানুআরি রাত্রি ৮-৩০ মিঃ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ সুরেন্দ্রকুমার সেন ৮৬ বৎসর বয়সে 'করোনারি থ্রম্বসিস্' রোগে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে দেহত্যাগ করেন। ঢাকার বিক্রমপুরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশব হইতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল ছিল। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অল্প বয়সে সামান্য বেতনে তিনি বরিশালে সরকারী চাকরি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। মাঝে কিছুকাল তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গলাভ ও তাঁহার সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। স্বামীজী তাঁহাকে লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বলেন। অবসর পাইলেই তিনি নিয়মিতভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা দরিদ্রের সেবা করিতেন। 'স্বামীজীর কথা'-গ্রন্থে সুরেন্দ্রকুমার স্বামীজী সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বরিশালে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র-স্থাপনে স্বামীজীর শিষ্য ৺শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি যথাসাধ্য সহায়তা করেন এবং আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ঐ কেন্দ্রের উন্নতিসাধন করেন। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত।

তাঁহার আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মচারী নরেন্দ্র : দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২২শে জানুআরি রাত্রে ব্রহ্মচারী নরেন্দ্র বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৭২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল নরেন্দ্র চন্দ্র সেন। পূর্বে তিনি অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

১৯২৪ খৃঃ নরেন্দ্র চন্দ্র ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সোনার-গাঁ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যোগদান করেন। কিছুকাল ময়মনসিংহ আশ্রমে কাটানোর পর তিনি হিমালয়ে অবস্থিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রেরিত হন, শেষ জীবনে তিনি বারাণসী সেবাশ্রমে কাটান। রাঁচি যক্ষ্মা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাকালে অর্থ-সংগ্রহের জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উৎসব

সালেপুর (কটক) : গত ১লা জানুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে পূজা, হোম, কীর্তন, ভজন ও গ্রন্থপাঠাদি হইয়াছিল। রেভেন্‌সা কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীহরিহর মিশ্র ও শ্রীবংশীধর মিশ্র প্রমুখ ভক্তগণ সহযোগিতা করেন। প্রসাদ-বিতরণ ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবাদি সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

গত ৯ই জানুআরি শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ ৯৯তম জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, কীর্তন, ভজন ও সাধুসেবা এবং 'সন্ন্যাসীর গীতি' পাঠ করা হইয়াছিল।

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে গত ৯ই হইতে ১৪ই জানুআরি পর্যন্ত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ৯৯টি প্রদীপ জ্বালাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সুবোধ মিত্র অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রথম দিনের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ডক্টর রাধাবিনোদ পাল, মেয়র শ্রীকেশবচন্দ্র বসু, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। অন্যান্য দিন ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

বিভিন্ন বক্তার মূল বক্তব্য: স্বামীজী ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ। তিনি তৎকালীন পাশ্চাত্যমুখিতা ও অনুকরণপ্রিয়তা হইতে ফিরাইয়া যুগোপযোগী আদর্শ দ্বারা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন।

১৫ই জানুআরি রবিবার জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে বেলা ৩ ঘটিকায় শ্যাম স্কয়ার হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কলেজ স্কয়ার পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে।

বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব গত ২৯শে জানুআরি সন্ধ্যায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী প্রভৃতি স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

মূর্তিপ্রতিষ্ঠা

বিষ্ণুপুর: গত ১৩ই জানুআরি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূজা, পাঠ, হোম, কথকতা ও দরিদ্র-নারায়ণসেবা হয়।

ব্রহ্মানন্দ-জন্মোৎসব

শিকড়া-কুলীনগ্রাম (২৪ পরগনা): শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ৯৯তম শুভ জন্মোৎসব তদীয় পুণ্য জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রামস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২২শে জানুআরি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য, রামনাম, তীর্থপরিক্রমা, রামায়ণ-কথকতা (লবকুশ-যুদ্ধ), তরজা-গান, যাত্রা, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা হয়। উৎসবের শেষ দিনে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী অচিন্ত্যানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে পল্লীগ্রামটি আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

জাতীয় কৃষিমেলা

আলিপুর টাঁকশালের সন্নিকটে তারাতলা রোডের পার্শ্বে প্রায় ৩৩ একর জমির উপর আয়োজিত জাতীয় কৃষিমেলা কলিকাতার ইতিহাসে নূতন। ভারত কৃষকসমাজের উদ্যোগে ১৯৫৯ খৃঃ ডিসেম্বরে নয়াদিল্লীতে প্রথম বিশ্ব কৃষিমেলা হইয়াছিল। সেই কৃষিমেলার সাফল্য ও প্রেরণায় এই কৃষিমেলা আয়োজিত হয়।

এই মেলায় আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানে উন্নত পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জাপান, পশ্চিম জার্মানি ও সোভিয়েট রাশিয়া অংশ গ্রহণ করেন। মণ্ডপগুলির রূপসজ্জা ও আয়োজন বিশেষ আকর্ষণীয়।

পশ্চিম জার্মানির মণ্ডপটিতে বিগত বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানি দুর্জয় আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া গঠনমূলক কাজে কিরূপ বিস্ময়কর উন্নতি করিয়াছে তাহা দেখানো হইয়াছে।

আধুনিক কৃষিতে সমবায়ের ব্যাপক প্রযোগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি রাশিয়ার কৃষিমণ্ডপের আকর্ষণীয় বস্তু। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কৃষিক্ষেত্রে উহার ব্যবহার দেখিবার জন্য বহু দর্শক পশ্চিম জার্মানি ও রাশিয়ার মণ্ডপ-দুইটিতে ভিড় করে।

বিদেশী রাষ্ট্র ছাড়া ভারতের নয়টি রাজ্য যথা পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর, আন্দামান এই মেলায় যোগদান করিয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যের বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য ও বিভিন্ন বিষয়ে তাহার অগ্রগতি ও বৈশিষ্ট্য দেখানো হয় নানাবিধ চিত্র মডেল প্রভৃতির মাধ্যমে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, সঞ্চয় পরিকল্পনা, কুটীরশিল্প প্রদর্শনীও সুন্দর হইয়াছে।

সমগ্র মেলাটির তিনটি ভাগ: জাতীয় বিভাগ, রাজ্য বিভাগ এবং গ্রামীণ শিল্প বিভাগ।

জাতীয় বিভাগে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা, ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, গ্রামীণ গৃহনির্মাণ-প্রণালী ও কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং গ্রামীণ শিল্প বিভাগে খাদি কুটীর-শিল্প ও তন্তুজ শিল্প প্রদর্শিত হয়।

জাতীয় বিভাগের ৪৬টি মণ্ডপ এবং রাজ্য-বিভাগের ১০টি মণ্ডপ ছাড়া আরও ২৮টি কেনাবেচার পশরা বসে এই মেলায়। মেলাটি জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে নানা বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও আছে।

রেঙ্গুনে সংস্কৃত ও পালি অভিনয়

গত খ্রীষ্টমাসের বন্ধে রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে রেঙ্গুনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল বিরচিত সংস্কৃত নাটক 'শক্তি-সারদম্' ও 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্' এবং পালি নাটক 'বিম্ব-সুন্দরী-পটিবিম্বনম্' প্রাচ্যবাণী মন্দির কর্তৃক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। ইহাই ভারতের বাহিরে সর্বপ্রথম সংস্কৃত অভিনয় এবং জননী যশোধরা-গোপার পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত পালি নাটকটি সুপ্রাচীন ও সুবিশাল পালি সাহিত্যের সর্বপ্রথম নাটক। তিনদিনই রামকৃষ্ণ মিশনের সুপ্রশস্ত সভাকক্ষে বহু বাঙালী ও অবাঙালী দর্শক-সমাগমে তিলধারণের স্থান ছিল না। প্রারম্ভে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌধুরী সুললিত সংস্কৃত ও ইংরেজীতে মাতৃলীলাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। ভবিষ্যতে প্রচারের নিমিত্ত রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পালি নাটকটির টেপ রেকর্ড করা হইয়াছে।

প্রকাশিত পুস্তক-সংখ্যা

গত বৎসর (এপ্রিল '৫৯—মার্চ '৬০) জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত নূতন পুস্তকের একটি তুলনামূলক তালিকা প্রদত্ত হইল।

	গত বৎসর	তৎপূর্ব বৎসর
মোট	২৪,৮৫৬	২৭,৬৬০
ইংরেজী	১২,৫৮৫	১২,৮৭৩
হিন্দী	৩,৭৫১	৪,৮৪১
বাংলা	১,৭৫০	১,৫৬১
মারাঠী	১,৪০১	১,৪২৭
গুজরাতী	১,১২৪	১,৮১৬
তেলুগু	৮১১	৯৮৬
মালায়ালাম্	৬৭৮	৮৩৮
কন্নাড়	৪৬৩	৫৮৭
উর্দু	৩৯১	২৭২
গুরুমুখী	২৪১	৩৫৪
ওড়িয়া	২১৬	২৪২
তামিল	১৭২	২৭২
সংস্কৃত	১৩৭	২৭২
অসমীয়া	১১০	৮৪
অন্যান্য	১,০২৬	১,০৭৮

মিলন-মন্ত্র

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্ ।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

[সংজ্ঞানসূক্তম্—ঋগ্বেদ ১০।১৯১।২-৪]

বহু মতের জন্য ছিন্ন ভিন্ন সমাজে এবং মতান্তর হইতে মনান্তরের জন্য দুঃখসাগরে পরিণত এই সংসারে বৈদিক যুগের সংবনন ঋষি সংজ্ঞান বা সকলের ঐকমত্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন :

হে স্তবকারিগণ! তোমরা মিলিত হও, একসঙ্গে স্তব উচ্চারণ কর, একপ্রকার বাক্য ব্যবহার কর, তোমাদের মন সমানভাবে একই প্রকার অর্থ অবগত হউক—অর্থাৎ তোমরা সকলে একমত হও, পূর্ববর্তী উন্নতস্বভাব দেবতাগণ যেরূপ একমত হইয়া হবির্ভাগ (নিবেদিত ভোগ্যবস্তু) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপ ধনধান্যাদি ভোগ কর।

এই সকল পুরোহিতগণের মন্ত্রোচ্চারণ একরূপ হউক, সম্মিলিত প্রাপ্তি একপ্রকার হউক, অন্তঃকরণ একই ভাবে ভাবিত হউক, জ্ঞান একই বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হউক, আমিও ঐক্য-বিধানের জন্য তোমাদিগকে একই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতেছি। হে দেবগণ, সর্বসাধারণের হবির দ্বারা আমি তোমাদিগকে আহুতি প্রদান করি!

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, তোমাদের হৃদয়গুলি মিলিত হউক, তোমাদের অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি) এক হউক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হইতে পার। ঐক্য ভিন্ন উন্নতির অন্য উপায় নাই।

কথাপ্রসঙ্গে

'গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ'

এ বৎসর আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা উপলক্ষে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আর্ল এটলি ভারতে আসিয়াছিলেন। ক্লিমেণ্ট এটলির সহিত ভারতের সম্পর্ক একাধিক কারণে চিরস্মরণীয় ; তিনি ইংলণ্ডের অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীদের মতো রূঢ় হস্তে ভারত শাসন করিবার জন্যই প্রধানমন্ত্রী হন নাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 'দেউলিয়া' করিবার জন্যও তিনি সে গৌরবের আসন গ্রহণ করেন নাই, শ্রমিকদলের এই সমাজতন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বহু পূর্ব হইতেই 'দেওয়ালের লেখা' পড়িতে পারিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যুগ-প্রয়োজন বুঝিয়া ভারতকে স্বায়ত্তশাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক জনমানসে তিনি আবেদন জানাইয়াছিলেন। বহু আলাপ-আলোচনার পর—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ভারত বিভক্ত করিয়া ইংরেজ এ দেশের শাসনভার তুলিয়া দিয়াছে দেশবাসীর হাতে। এ অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়াছে মিঃ এটলিরই মন্ত্রিত্বকালে। ভারত তাঁহার নিকট ঋণ অস্বীকার করিতে পারে না।

তিনি সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাহার আগমনের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আরোপ করা সঙ্গত নয়। ভারতের মৃত্তিকায় রোপিত পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের বৃক্ষশিশুটি কত বড় হইয়াছে, কেমন বাড়িতেছে—তাহাই যেন তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। এই অভিজ্ঞ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ বিশ্বরাজনীতির পটভূমিকায় আমাদের স্থান লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়া গেলেন, তাহা যেন আমরা উপেক্ষা না করি।

দিল্লীতে তাঁহার দুই দিনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল (১) Future of U. N. O.—রাষ্ট্রসংঘের ভবিষ্যৎ, (২) Future of Democracy গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলিকাতাতেও বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে আহূত সভায় তিনি (১) ভারতের গণতন্ত্র (২) বিশ্বশাসন-ব্যবস্থা (World Government) (৩) কমনওয়েলথের ভবিষ্যৎ (Future of Commonwealth) আলোচনা করেন। মোটামুটি তিনি নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের মধ্যেই তাঁহার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

তাঁহার আলোচনার প্রথম ও প্রধান বিষয়—বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি ও ব্যাপক শান্তিপ্রতিষ্ঠার উপায় সন্ধান। এতদুদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের কার্যের তিনি সময়োপযোগী সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রসংঘের গঠনতন্ত্র আজ যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিবর্তিত করিতে হইবে। কয়েকটি বৃহৎ শক্তির উপর অত্যধিক ক্ষমতা অর্পিত রহিয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকসংখ্যার সহিত মতামত প্রকাশের বা ভোটসংখ্যার কোন সম্বন্ধ নাই। পৃথিবীর অধিবাসীর এক বৃহৎ অংশকে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলে রাষ্ট্রসংঘ কখনই বিশ্বজনীন সংস্থারূপে পরিগণিত হইতে পারে না এবং প্রয়োজনীয় শক্তিও সংগ্রহ করিতে পারে না।

লর্ড এটলি বিশ্বশান্তির জন্য আরও দুইটি বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন: সুসংগঠিত রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যখন রাষ্ট্রসংঘ (U. N.O.) স্থাপিত হয়, তখন পৃথিবীর তিন বৃহৎ শক্তি ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিত। তারপর এশিয়া ও আফ্রিকায় যুগোপযোগী জাগরণের ফলস্বরূপ নব নব জাতীয় শক্তি উদ্বুদ্ধ হইতেছে। আজ সেগুলিকে বাদ দিলে বা উপেক্ষা করিলে রাষ্ট্রসংঘের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। জাতীয় শক্তি ছাড়াও আর একটি শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহা মানব জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চয় করিয়া তুলিয়াছে, সে শক্তি মানুষেরই বুদ্ধিজাত অপরিমেয় আণবিক শক্তি।

এই শক্তি—একদিকে যেমন বিশ্বশান্তি বিপন্ন করিয়াছে, আবার অন্যদিকে যুদ্ধ প্রায় অসম্ভব করিয়া ইহা স্থায়ী শান্তি স্থাপনের গৌণ কারণ-রূপেও পরিগণিত হইতে পারে। উহা নির্ভর করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক ঐ শক্তির নিয়ন্ত্রণের উপর।

রাষ্ট্রসংঘ এখন যেভাবে গঠিত আছে, তাহা দ্বারা ইহা সম্ভব নয়; অতএব বিশ্বের এই পরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন সাধন করিয়া যদি রাষ্ট্রসংঘকে বিশ্বশাসন-সংস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়, তবেই মানবজাতির ভবিষ্যৎ কতকটা নিরাপদ, নতুবা শক্তির লড়াই য কতদূর গড়াইবে, কেহ বলিতে পারে না। াসেল প্রভৃতি বড় বড় মনীষীরা শুধু লিয়াছেন, সমগ্র মানবজাতির না হইলেও াণবিক যুদ্ধে সমুদয় সভ্যজাতির ধ্বংস নিবার্য।

রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন রাষ্ট্র যদি নিজ নিজ াভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ব্যতীত আন্তর্জাতিক ান্তি ও সীমানা রক্ষার ভার রাষ্ট্রসংঘের উপর র্পণ করে এবং ঐ বিষয়ে তাহার বিচার ও নর্দেশ মানিয়া চলে, তবেই উহা একটি বিশ্বশাসন-সংস্থায় পরিণত হইয়া বিশ্বশান্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। আসন্ন ভবিষ্যতে এইরূপই একটা ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

আজাদ-বক্তৃতার দ্বিতীয় দিনের বিষয়টি জীবননীতির দিক্ দিয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ। আভিজাত্যপূর্ণ কাঠামোর মধ্যেই রচিত গণ-তান্ত্রিক ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের আসন রচনা করিয়াছেন যে ক্লিমেণ্ট এটলি, তাঁহার চোখে 'গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ' কিভাবে প্রতিফলিত হইতেছে—তাহা সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য। তাঁহার বিশ্লেষণে টয়েনবি-র ঐতিহাসিক দৃষ্টি না থাকিতে পারে, পেশাদার রাজনীতিকের উন্মাদনাও তাহাতে নাই, আছে অভিজ্ঞতার কঠোর ব্যাবহারিক মাপকাঠি!

তিনি গণতন্ত্রকে রাজনীতি হিসাবে না দেখিয়া জীবননীতি হিসাবেই দেখিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, সভ্য ও শিক্ষিত মনুষ্য-সমাজেই ইহা সম্ভব, অন্যত্র নহে। গণতন্ত্রের পথ তা বলিয়া নিরঙ্কুশ ও নিরাপদ নহে। পদে পদে ইহার বাধা। একনায়কত্বই ইহার প্রধান বাধা নয়, ইহার প্রধান বাধা আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়—শাসন-ব্যাপারে জনগণের উদাসীনতা। গণতন্ত্র এক নিরবচ্ছিন্ন সহিষ্ণুতার ও জীবনব্যাপী সতর্কতার সাধনা। এজন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত ও সর্বদা সচেতন জনগণ। সরকার-পক্ষের স্বাধীনতা থাকিবে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিবার, বিরোধী পক্ষের স্বাধীনতা থাকিবে উহার গঠনমূলক সমালোচনা করিবার, সামর্থ্য থাকিবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিকল্প সরকার গঠন করিবার। শুধু প্রতিবাদ করিয়াই তাহার শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যাইবে না, তাহার প্রতিকার করিবার ক্ষমতাও থাকিবে।

ভারতে গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলিতেছে। অপরিবর্তনীয় সংবিধান গণতন্ত্রের পরিচয় নয়। মুক্ত জীবনবিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করাই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। নূতন গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষে এখনও গঠনতন্ত্র অপূর্ণ রহিয়াছে। আর্ল এটলি ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন: ভারত কয়েকটি রাজ্যের সমষ্টি (federation); আমি জানি না—রাজ্যগুলির সহিত কেন্দ্রের সঠিক সম্বন্ধ কি, কোন্ কোন্ বিষয় কাহার হাতে আছে। তবে ভারত যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া চালাইয়া যাইতেছে, ইহা তাহার যথেষ্ট শক্তির পরিচয়।…পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যাইতেছে যে গণতন্ত্রের সহিত একনায়কতন্ত্রের অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে।

গণতন্ত্র চালু রাখিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজ-চেতনা ও সামাজিক বিবেক (Social consciousness and Social conscience); তাহা হইতেই দেখা দিবে—প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা ও উপযুক্ত শিক্ষা,—বিশেষত কিছু পরিমাণ রাজনীতিক শিক্ষা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে কি ধরনের মানুষ নির্বাচিত হইতেছে তাহার উপর। শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলী জাগ্রত স্বার্থবোধ (enlightened self-interest) দ্বারা চালিত হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করিবে। এই শিক্ষা শুধু বড় বড় শহরে সীমাবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না। পল্লীর সমস্যা সমাধান করার উপরই দেশের উন্নতি নির্ভর করে। অতএব নবতম শিক্ষার স্রোত হইতে পল্লীকে বঞ্চিত রাখিলে গণতন্ত্র পঙ্গু হইয়া যাইবে; স্বার্থপর বুদ্ধিজীবী বা মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে গণতন্ত্র একটি প্রচণ্ড রাজনীতিক-আর্থনীতিক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া অজ্ঞ দুর্বল দরিদ্রকে শোষণ করিবে। এ অবস্থা রোধ করিতে গেলে প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ও গণতান্ত্রিক ভাবের প্রচার। গণতন্ত্রের ভিত্তি পল্লীর কুটিরে। 'নাগরিক' কথাটি আজকাল খুব চালু হইয়াছে, কিন্তু ইহা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত বা অন্য শব্দ চয়ন করা কর্তব্য। 'নাগরিক' বলিতে যেন শুধু নগরবাসীকেই না বুঝায়। সুদূর গ্রামের কুটিরের অধিবাসীরাই গণতন্ত্রের অদৃশ্য একক (unit), ভিত্তির প্রস্তর।

ভারতকে বাহিরের রাজনীতির দিকে বেশি তাকাইতে না বলিয়া লর্ড এটলি ঘরের দিকেই অধিক মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের পূর্বে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সাম্য রক্ষাই অধিকতর প্রয়োজন। এরূপভাবে সাবধান করা সত্ত্বেও ভারতকে উৎসাহিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন: এশিয়ায় এই নূতন পরীক্ষার সফলতা নির্ভর করিতেছে—বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত কিভাবে ইহাকে কার্যকর করে তাহার উপর। কয়েকটি দেশে নবপ্রবর্তিত গণতন্ত্র ব্যাহত হইয়াছে, তাহারাও ভারতের দিকে চাহিয়া আছে। ভারত যদি সাফল্যের সহিত গণতন্ত্রের পথে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভে সমর্থ হয়, তবে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও গণতন্ত্রের পথে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

গণতন্ত্র পৃথিবীতে নূতন কিছু নয়, যেদিন মানুষ নিজ ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজ ও শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছে, সেদিনই গণতন্ত্রের সূচনা হইয়াছে! গ্রীসে নগররাষ্ট্রগুলি ইহার দৃষ্টান্ত; ভারতে যদিও রাজতন্ত্র অধিকতর প্রচলিত ছিল, তথাপি গ্রাম-জীবনে পঞ্চায়েত-

প্রথা সুপ্রাচীন। পাঁচজনের মত লইয়া একটি বিষয়ের মীমাংসা করা এখানে চির-প্রচলিত।

গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলি রোমের সামরিক শক্তির নিকট পরাভূত হইল; গণতন্ত্র সাম্রাজ্য-বাদরূপ রাহুদ্বারা গ্রস্ত হইল। নানা বিপর্যয়ের পর ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের সময় আবার গণতন্ত্রের অভ্যুদয়! কিন্তু এক এক দেশে ইহা এক এক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। ইংলণ্ড রাজার হাতে কলম দিয়া 'ম্যাগ্না কার্টা' সহি করাইয়া লইয়াছে, রাজার শিরশ্ছেদ করিয়াছে, আবার রাজভক্তির পরাকাষ্ঠাও দেখাইয়াছে। রাজচ্ছত্র স্বীকার করিয়াও গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত!

ইওরোপীয় সভ্যতার উৎক্ষিপ্ত এক অংশ আমেরিকায় এক বিভিন্ন ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেখানে রাজা নাই, কিন্তু বলা যায়, চার বৎসর অন্তর সেখানে একজন 'রাজা' নির্বাচিত হন! পশ্চিম গোলার্ধে বা 'নূতন পৃথিবী'তে উহাই একপ্রকার আদর্শভূত। ভাষার বিভিন্নতায় ইওরোপ আজও বিচ্ছিন্ন, আমেরিকার অনুকরণে 'সংযুক্ত ইওরোপীয় রাষ্ট্র'গঠন এখন স্বপ্ন হইতে শূন্যে বিলীনপ্রায়। ইওরোপের পূর্বপ্রান্তে যে মহান্ আদর্শ জনগণের মুক্তির পতাকা উড়াইয়া বিপ্লবের বন্যায় 'জার'কে ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহা কিন্তু এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, হয়তো সুদীর্ঘকাল জার-শাসিত সেই মহাভূখণ্ডে এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার মতো মুক্ত মনোভাবের আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই।

ভাবের দিক দিয়া এইখানেই পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। ওয়েণ্ডেল উইল্কির 'এক পৃথিবী' হয়তো চিরদিন স্বপ্নেই থাকিয়া যাইবে। হয়তো বা তাহাতেই কল্যাণ, কারণ জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত একত্ব একনায়কত্ব। ঐ একত্ব বৈচিত্র্য স্বীকার করে না, উহা কদর্য যান্ত্রিক একরূপতায় পর্যবসিত হয়।

বর্তমান সভ্যতার সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। কিন্তু আজ বিচার করিবার দিন আসিয়াছে – এই যন্ত্রবিজ্ঞান আমাদের জীবনে কতটা সুখের এবং কতটা দুঃখের কারণ হইয়াছে; আরও দেখিতে হইবে—ইহা গণতান্ত্রিক জীবন ও চিন্তাধারার সহায়ক না অন্তরায়!

যখন যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, সংবাদ আদানপ্রদান দুরূহ ছিল, তখন স্বভাবতই শাসন-শক্তিও সীমিত ছিল; দূরবিস্তারী সাম্রাজ্য থাকিলেও শাসনযন্ত্র স্থানীয় অধিবাসীদের আয়ত্তাধীন ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কারে দ্রুত ও দ্রুততর যানবাহন পৃথিবীকে সঙ্কুচিত করিয়া শাসন-পদ্ধতিকে ক্রমশঃ কেন্দ্রাভিমুখী করিতেছে, ইহার শেষ ফল একনায়কত্ব। তাই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি বজায় রাখিতে হইলে প্রয়োজন অতি উচ্চমানের শিক্ষাদীক্ষা।

আধুনিক প্রচার-যন্ত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আর্ল এটলি বলিয়াছেন: রেডিও টেলিভিসন এবং নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাযন্ত্র (Controlled Press) হইতে গণতন্ত্রের বিশেষ বিপদ। রেডিও বা টেলিভিসন যতই বাড়িবে, পথের ধারের সভা—হাটে-মাঠে বৈঠক ততই উঠিয়া যাইবে, নেতা ও জনগণ ততই পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ঐ সকল সভায় ও আলোচনায় নির্বাচন-প্রার্থী ও নির্বাচকমণ্ডলীর সাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘটিত; ইহার অভাবে ব্যক্তিগত চরিত্র অপেক্ষা দলগত আদর্শ ও উদ্দেশ্যই প্রধান হইয়া উঠিবে।

সংবাদপত্রের ব্যাপারেও দেখা যায় ছোট-খাট কাগজ আজকাল বড় বড় কাগজের কুক্ষিগত হইতেছে। কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বহু ছোট ছোট সংবাদপত্র প্রয়োজন ; বড় বড় সংবাদপত্রের মালিকদের না আছে মহৎ কোন নীতি, না আছে চিন্তার কোন উচ্চ মান।

রাষ্ট্রসংঘকে যদি কার্যকরী বিশ্বশাসন-সংস্থায় (World Government) রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়, তবেই আসন্ন বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত হইবে ; নতুবা এ পৃথিবী তিন পৃথিবীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে, তাহারই সম্ভাবনা সমধিক। দুই প্রান্তে দুই বিরোধী শক্তি, মধ্যে একটি নিরপেক্ষ মণ্ডল, কিন্তু নিরপেক্ষ মণ্ডল নিষ্ক্রিয় বা শক্তিশূন্য নয়। এইখানেই পড়িবে সর্বাধিক চাপ, এই নিরপেক্ষ শক্তিপুঞ্জই পৃথিবীর শান্তি ও সাম্য রক্ষা করিতে সক্ষম। আর্ল এটলি ইঙ্গিত করিয়াছেন : গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছা-সম্মিলিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলিকেই হয়তো ভবিষ্যতে এই ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন নিজ নিজ রাষ্ট্রগুলিকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে সম্মান করা ও সাহায্য করা। পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি সুস্থ থাকে, তবেই পরিবারের সামগ্রিক শান্তি। রাষ্ট্রেও যদি এই ভাব প্রতিফলিত হয়, তবেই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ।

কলিকাতায় একটি বক্তৃতায় কমনওয়েলথ-ভাবটির উপর বিশেষ জোর দিয়া লর্ড এটলি কমনওয়েলথকে একটি পরিবারের সহিত তুলনা করেন। একটি পরিবারের সকলে যেমন পারিবারিক সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়া সমাধান করেন, তেমনি কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রগুলি ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন। এখানে নির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র বা ভোটাধিক্যের কোন ব্যাপার নাই। কিন্তু দেখা যায় বহুক্ষেত্রে আলোচনার সিদ্ধান্তগুলি কল্যাণপ্রসূ হইয়াছে। বিভিন্ন বিশ্বসমস্যা তাঁহারা বিভিন্ন দিক হইতে দেখেন, কিন্তু সমাধানের লক্ষ্য একটি।

লর্ড এটলি মনে করেন, কমনওয়েলথ-ভাব বিস্তার লাভ করিতেছে। কালক্রমে ইহাই একটি শক্তিশালী বিশ্বসংস্থায় পরিণত হইতে পারে। কমনওয়েলথের দুটি বড় কথা : ব্যষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান এবং সমষ্টিগত কল্যাণ। বৈধ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্জন করিতে হইবে ও রক্ষা করিতে হইবে। এখানে পারস্পরিক সাহায্য ও শুভেচ্ছা থাকিবে, কিন্তু শর্ত থাকিবে না ; বন্ধুত্ব থাকিবে, কিন্তু বন্ধন থাকিবে না।

সর্বকল্যাণ একটি বিশ্বজনীন ভাব। সর্বোদয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক উন্নতিসাধন (Co-prosperity) প্রভৃতি নানা রূপে ইহা আজ প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নিছক রাজনীতি বা অর্থনীতির পথে জাতীয়তার ঊর্ধ্বে এই বিশ্বভাব কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন হৃদয়ের বিস্তার, ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাই মানুষের ভিতর এই পরিবর্তন আনিয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতে নগরে প্রান্তরে কুটিরে মন্দিরে সর্বত্র সর্বকল্যাণের জন্য প্রার্থনা-মন্ত্র ধ্বনিত হইত:

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু ॥

তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা আজ প্রার্থনা করি : মানব-কল্যাণের জন্য মানুষের সকল সাধুপ্রচেষ্টা সফল হউক, সকলে সুখী হউক, সকলের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হউক, মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হউক, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক।

চলার পথে

'যাত্রী'

নিজেকে বড় করতে হ'লে বড় হবার আদর্শ সামনে রাখতে হবে, আব রাখতে হবে তার পেছনে মহতী প্রচেষ্টাকেও। এই দুটোর উপযুক্ত সংমিশ্রণেই সঠিক ফল লাভ হয়। কয়লা যদি হীরা হবার স্বপ্ন না দেখে, তাহলে হীরা হবে কি ক'রে? তাই তো হীরার আদর্শ নিয়ে কয়লা নিজেকে একান্তে মাটির চাপের তলে লুকিয়ে রাখে শতসহস্র বৎসর ধরে। ওখানেই আরম্ভ হয তার আদর্শ-সাধন ও তপস্যা। তারপর হীরা হ'লে সেই হীরার খোঁজ পড়ে—তার তখন মূল্যও যায় বেড়ে। কয়লার হীরত্ব-প্রাপ্তিতে তখন আর সেই কয়লা হেলা-ফেলার জিনিষ থাকে না, রাজারাণীর মাথার মণি হয় তখন সে।

কয়লার এই হীরা হওয়ার স্বপ্নই মানুষের সত্যকার মানুষ হওযার স্বপ্ন। শতসহস্র কলঙ্ক ও কালিমার প্রলেপ লেগে লেগে আমরা তো সকলেই এক-এক খণ্ড কযলা হয়ে আছি। বারে বারে নিজেকে ঘষছি, মাজছি কিন্তু তাতে কয়লার মলিনত্ব ঘুচছে না। কারণ বাইরের ঘর্ষণে এবং চেষ্টায় যথার্থ পরিবর্তন আনা শক্ত, তাইতো শতবার ধুলেও কয়লার ময়লা দূর হয় না। কিন্তু একবার আন্তর পরিবর্তন হ'লে সব কিছুই পালটে যায়। তখন অমন যে মসীবর্ণ কয়লা, তাও শুভ্র দ্যুতিতে ভরে ওঠে; তখন তার ভারও বাড়ে, দামও বাড়ে। তাই তো আমাদের হীরা হওয়ার এত আগ্রহ।

হীরা হ'তে গেলে কয়লাকে যে সাধন—যে নিভৃতে অবস্থান—করতে হয়, তাও আমাদের অনুকরণীয। আমাদের যথার্থ সাধনা বা তপস্যাব আরম্ভ সেখানেই। আর এই তপস্যার জন্য আমাদের তীব্র তপস্যার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। কিছু হ'তে গেলে কিছু করতে হবে। কেবল স্বপ্নবিলাস দিয়ে 'হওয়া' যায় না, নিজেকে ফাঁকি দেওযা যায় মাত্র।

এই তপস্যার জন্য একটা বিশেষ যোগ সৃষ্টি করা চাই, তা না হ'লে সবই বৃথা। দেশলাই ও কাঠি পাশাপাশি রাখলেই আগুন জ্বলে না—ঘষবারও দরকার আছে। এই ঘষাটাই যোগ।

পূর্ণ হ'তে গেলে, শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন আনতে গেলে নিষ্ঠা ও চেষ্টার মূল্য তাই সর্বাগ্রে। মনে রাখতে হবে:

> "We must endure
> On going hence, e'en as our coming hither
> Ripeness is all."

এই সাধনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সদ্‌বস্তুর জন্য প্রার্থনাও থাকবে প্রচণ্ড। এই প্রার্থনা নিজের কাছে নয়, তাঁর কাছে—যাঁকে আমরা সর্বনিয়ন্তা বলে জানি। যদি এই সর্বনিয়ন্তা আমার 'আমি' হয়, তাহলে তাকেই উদ্দেশ্য ক'রে বৈদিক ঋষির মত ব'লব: স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতাঽঘ্নতা জানতা সং গমেমহি—সূর্য ও চন্দ্রের মতো আমরা যেন নিত্যই মঙ্গলকর পথে চালিত হই; এবং দাতা, অহিংসক ও বিজ্ঞ লোকেদের সঙ্গে যেন সতত মিলিত হই। কারণ আমরা ঐ ভাবে যদি আলোর পথে চলতে পাই, তাহলে সূর্য-চন্দ্রের মতোই

অন্তকে আলোক ও জীবন দিতে পারব। সেই চলাই তো সার্থক চলা, যখন আমরা চাইব সদাই সৎসঙ্গ ও শুভ পরিবেশের মধ্যে চলতে। দাতা, অহিংসক ও বিজ্ঞদের মাঝে তাই থাকার প্রার্থনা জানিয়ে ব'লব: যো দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজতা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। তো নো রাসান্তামরুগায়মদ্য য়ূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ যাঁরা অমর, নির্ভীক ও ধার্মিক এবং দেবলোক ও পার্থিব লোকের দ্বারা পূজিত ও সম্মানিত তাঁরা এখন আমাদের শ্রেয়ের পথ দেখান। এবং ঐ সকল লোক তাঁদের সদিচ্ছা দিয়ে আমাদের পালন করুন।

এই ভাবে চারিদিকের অনাদর ও অযত্নের কান্না ছেড়ে আলোকের পথে, সত্যের পথে, চলতে হবে আমাদের। বহু দীর্ঘনিশ্বাসে বিষাক্ত এই যুগের মধ্যেই প্রেমে ও তপস্যায় আমাদের হ'তে হবে নির্বিষ ও পবিত্র। এর জন্য দেহের মৃত্যু যদি আসে আসুক, মনের মৃত্যু যেন না আসে। বাইরে বসন্তের ঐ পত্রঝরা গাছের মধ্যেও এই সত্য-সাধনা চলছে। ঐ বৃক্ষের বাইরের আপাত-মৃত্যুর মধ্যে মনের মৃত্যু নেই। তাইতো সে আবার একদিন ত্যাগের মহিমার মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। আবার ফিরে পায় তার পত্রসম্ভারকে—পুরাতনের জীর্ণ-মলিন পত্রসম্ভার নয়—নূতন কিশলয়ের শতসহস্র শিহরণের লীলাখেলাকে। ঐ শিহরণের মধ্যেই জীবনের অসীম অভিনন্দন সদাই মূর্ত হয়ে রয়েছে। সাধক কবি ব্রাউনিং বলেছেন:

Earth changes, but the soul and God stand sure
What entered into thee
That was, is, and shall be ;
Time's wheel runs back or stops ; Potter and clay endure.

তাই বলি, চল পথিক, আদর্শ-সাধনার পথে চল। শুধু বাহিরের ক্ষুধা নয়, অন্তরের ক্ষুধার আহার জোগাবে চল। মনে রেখ, অন্তরের ক্ষুধা মানুষকে অন্তরের সাধনায় টেনে নেয়। এই সাধনার বিকাশ বিভিন্ন, প্রকাশও বিচিত্র। সাহিত্যে, কলায়, চিত্রে, সঙ্গীতে—এক কথায় অব্যক্তকে ব্যক্ত করার সাধনায় তার পরিপূর্তি। বড় হবার সাধনাই তাই সবচেয়ে বড় সাধনা। বসন্তের এই মহা আহ্বানে পত্র-ঝরা বৃক্ষশ্রেণীর মতো আমরাও চলো সেই অব্যক্তকে ব্যক্তের সবুজ সম্ভারে ভরিয়ে দিতে যাই চল। চল, চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

সন্ন্যাসী ও সেবাধর্ম*

স্বামী অখণ্ডানন্দ

অনেকেই মনে করেন এবং আমাদিগের নিকট বলিয়াও থাকেন যে—'আপনারা সন্ন্যাসী, কোথায় নিভৃতগিরিগুহাবাসী ভগবদ্ধ্যানাবস্থিত তদ্গত-মানস হইয়া জীবনযাপন করিবেন, তা না এই অনাথ-বালক প্রতিপালন-রূপ [আশ্রম-চালনারূপ] বিষম সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন !'

ইহার প্রকৃত উত্তরদানে আমরা সক্ষম কিনা বলিতে পারি না, তবে আমরা যতদূর পারি—সন্ন্যাসী হইয়াও উক্ত কার্য করার বিশেষ আবশ্যকতা-বিষয়ে দুই চারিটি মনের কথা সাধারণকে জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি।

* * *

এ জগতে মনুষ্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী জীব আর নাই। মনুষ্যই সমুদয় শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ। মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য কি আছে? তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে ?

মনুষ্যাকার ঋষি-হৃদয়েই অপূর্বছন্দোময়ী বেদরাশির প্রকাশ; চিরশান্তিপ্রদ, জ্ঞানগর্ভ উপনিষদ্—মনুষ্যোন্নতির চরম সীমা—এই দ্বিপদ-হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যের বহু তপস্যা, সাধনা ও আদরের ধন ! বাক্যমনের অগোচর সর্বব্যাপী মহান্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্যসত্তার আবির্ভাব এই মনুষ্যহৃদয়ে ! বেদমূর্তি ঋষিবৃন্দ, অবতার, জ্ঞানী, ভক্ত ও কবি প্রভৃতির আবির্ভাব আমরা এই মনুষ্যেই দেখিতে পাইয়াছি।

মনুষ্যের উপমা-স্থান এ জগতে নাই ! নিগূঢ় শাস্ত্রতত্ত্ব, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সত্যের বিকাশ-স্থল একমাত্র মনুষ্যে ! মানুষিক, অমানুষিক, লৌকিক ও অলৌকিক যাবতীয় শক্তি একমাত্র মনুষ্যেই কেন্দ্রীভূত। মনুষ্য এতাদৃশ শক্তিশালী হইয়াও যদি আপন শক্তি-সমষ্টির উন্মেষ করিবার চেষ্টা না করে তো তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। লুপ্ত-গৌরব মনুষ্য-সমাজের উন্নতি কামনা করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই পরম পুরুষার্থ !

মনুষ্যে মনুষ্যে পরস্পর প্রেমের অসদ্ভাব হইলে ঈশ্বরে প্রেম ও ভক্তি—কেবল কথার কথা মাত্র, ইহা সকল সভ্য জাতিই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। তত্ত্ববেত্তা পুরুষমাত্রেরই জীবনে আমরা বিশ্বপ্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই।

এই ভারতে এই মনুষ্যত্বের জন্য কে জানে কত শত শত জন আনন্দমনে স্ব স্ব জীবন অর্পণ করিয়াছে !—যাহার বিশেষ উল্লেখ করিতে হইলে লেখনীশক্তি নিঃশেষিত হইবে। সেই বিপুল প্রবন্ধের অবতারণা না করিয়া আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ভারতের বর্তমান অধঃপতনের কারণ : বৈষম্য ও ভেদবুদ্ধি

জীবন-ধারণোপযোগী সামান্য অন্নবস্ত্রাভাবে যে ভারতবাসী হতজ্ঞান, সামান্য ঔষধপথ্যাভাবে যে ভারতবাসী রোগ-শোকে জরজর, সামান্যবাসোপযোগী কুটীরাভাবে যে ভারতবাসী শীতাতপের নিদারুণ যন্ত্রণায় বিকল-

* একটি পুরাতন অপ্রকাশিত প্রবন্ধ

শরীর, সামান্যশিক্ষা-বিহনে যে ভারতবাসী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, প্রবলের অত্যাচারে যে ভারতবাসী সদাকাল উৎপীড়িত, এবং সংসারের যাবতীয় দুঃখের আধার-স্বরূপ তাহার এই মহান্ দুঃখের উপশমোপায় চিন্তা বা নিবারণ চেষ্টা না করিয়া—তাহাকে এক্ষণে বেদান্তের 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্যের ব্যাখ্যা শুনাইতে যাওয়া কি বাতুলতামাত্র নহে? —তাহার নিকট স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে যাওয়া কি হৃদয়বান্ মনুষ্যের কার্য?

সকল কার্যের উপযুক্ত সময় আছে। ভারতবাসী আজ যে কি কঠিন জীবন-সমস্যায় উপস্থিত, তাহা কি একবার আমাদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত নহে? কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কেবল জীবনীশক্তিহীন কতকগুলি অস্থিসার পুত্তলিকামাত্র, কি এক ভৌতিক-ক্রিয়াতেই যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, কেবল মনুষ্যের আকার ভিন্ন তাহাদিগের মনুষ্য-জনোচিত আর কিছুই নাই!

এই অধঃপতনের কারণ কি? একমাত্র সামাজিক বৈষম্যদোষেই এই মহান্ অনর্থ ঘটিয়াছে। সকল উন্নত জাতিকেই একদিন এই বৈষম্যদোষে উন্নতির চরম স্থান হইতে—অতুল সুখসমৃদ্ধিকে জলধির অতল জলে ডুবাইয়া—পতনের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। মানবজাতির ইতিহাস চিরকাল এই সত্য ঘোষণা করিবে!

যে জাতিতে বা যে সমাজে স্বার্থের বশীভূত হইয়া কতকগুলি লোক মনুষ্য-জীবনের প্রধান উপকরণগুলিকে নানা কৌশলে বলপূর্বক নিজস্ব করিয়া সাধারণের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছে, তাহাদের অধঃপতিত হইতে হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতে যেমন একমাত্র ভেদবুদ্ধি হইতেই যত অনিষ্টের সূত্রপাত, লোক-সমাজেরও যত অকল্যাণ তাহা একমাত্র ভেদবুদ্ধি হইতেই হইয়া থাকে। স্বয়ং শ্রুতি বলিতেছেন:

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ।
ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ।
লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ।

—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক প্রভৃতি তাহাকে ঘৃণা করে, যে তাহাদিগকে আপন আত্মা হইতে ভিন্ন জ্ঞান করে।

এই ভেদবুদ্ধি হইতেই উচ্চনীচ-জ্ঞান ও ব্যবহার-বৈষম্য। আর এই বৈষম্যই যাবতীয় দুঃখের মূল। জাতিগত, সম্প্রদায়গত, কুলগত ও অন্যান্য প্রকার বৈষম্য-দোষেই মনুষ্যসমাজে ঈর্ষা দ্বেষ প্রবল হয়, এবং আপনি আপনাকে নষ্ট করে।

জাতির উন্নতি যুগ: সাম্য ও উদারতায়

কোন জাতিরই উন্নত দশায় এইরূপ বৈষম্য দোষ থাকা সম্ভব নহে। আর্য জাতির প্রথম অভিব্যক্তি-স্বরূপ বৈদিকযুগে পূর্বোক্ত বৈষম্য-দোষের আদৌ কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদসমূহের আদি সংহিতা-ভাগে এরূপ অনেক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই সমানভাবে কল্যাণ কামনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

বৈদিক কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বৌদ্ধ যুগের কথার অবতারণা করিতেছি। —ভগবান্ বুদ্ধের অভ্যুত্থানের পর ভারতে যে শান্তি বিরাজ করিয়াছিল, সেই শান্তি ও সেই সর্বজনীন ভাব কি ভারতের ইতিহাসের আর কোন অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়? ভগবান্ বুদ্ধ যে শান্তি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কি

এই মহান্ অনিষ্টজনক বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ-কারী নহে? সেই সময়ে ভারতগর্ভে যে কত শত সুসন্তানই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই শান্তির ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া জগতে তাঁহারা যে অক্ষয় কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন—তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারে? বৌদ্ধ যুগে ভারতে যে সকল মহাসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কীর্তিস্তম্ভ ও বিজয়-পতাকা আজও সমগ্র সভ্য জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভারতের এই গৌরব-কাহিনী কি বৌদ্ধ ধর্মের উদারতার নিদর্শন-স্বরূপ নহে? ভারতের সে সৌভাগ্য-রবি আজ অস্তমিত! সঙ্কীর্ণতা ও বৈষম্যরূপ অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আজ ভারত সমাচ্ছন্ন! ভারত পুনর্বার সেই মহাসূর্যের উদয় প্রতীক্ষা করিতেছে! বিশ্বপ্রেমের সেই সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

আমরা সর্বদাই অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে ভগবৎসমীপে এই প্রার্থনা করিতেছি যে: হে প্রভো! আমাদিগকে তেজ দাও, ওজঃ দাও, বল দাও!—যাহা দ্বারা পুনর্বার আমরা সেই লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে পারি!

প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্ব স্ব সুখ সাধনের সমান অধিকার আছে; যে সমাজ-শাসন ইহা স্বীকার করে, এবং স্বাধীনভাবে মনুষ্যমাত্রকেই উন্নতির দিকে লইয়া যায়, তাহাই ঈশ্বরাভিপ্রেত এবং সেই সমাজেই চিরশান্তি, সেখানেই মনুষ্যাকারে ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হন। মহাশক্তি তাঁহার হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া থাকেন। মনুষ্যোন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ শাসন কু-শাসন; এবং সেই কু-শাসনের বিষময় ফলেই আজ ভারত মহাদুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত!

উন্নতিচেষ্টার প্রথম সোপান: প্রাথমিক অভাব পূরণ

আমরা এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিব যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে ভারতের উপস্থিত দুঃখের কথঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে, কিসে ভারতবাসী সবলকায় হইয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে এবং আর্য জাতির লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে পারে।

ভারতবাসীর জীবন মরণ সমান হইয়াছে। ভারতবাসী একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত; তাহাকে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞানের কূটতর্ক, সাংখ্যের জটিল মীমাংসা ও বেদান্তের মায়াবাদ শুনাইলে কি তাহার সেই অভাব পূর্ণ হইবে?

ঐ সকল বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় এখন নয়। ঐ সকল দুর্বোধ্য বিষয়ের আলোচনা মনে হয় যে 'মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা'!

কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান চর্চায় যদি প্রসুপ্ত ভারত জাগিয়া উঠিত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, এরূপ জ্ঞান-চর্চার সার্থকতা আছে; তাহা হইলে আর আজ সমগ্র ভারতকে এইরূপ কালনিদ্রা-সম অবস্থায় থাকিয়া মহাবিভীষিকা উৎপাদন করিতে হইত না।

যাহার পেটে অন্ন নাই, পরনের কাপড় নাই, থাকিবার স্থান নাই এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণ-চিন্তায় যে সদাকাল বিব্রত, তাহার চিত্তে কি ঐ সকল বিষয় স্থান পায়? তাহার কি অন্নচিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা করিবার সময় আছে?

অতএব আইস, আমরা সর্বাগ্রে তাহার শুষ্ককণ্ঠ সিক্ত করিবার উপায় করি। তাহার প্রদীপ্ত জঠরানল নির্বাপিত করিবার কোন সহজ উপায় উদ্ভাবন করি। 'শরীরমাদ্যং খলু

ধর্মসাধনম্'—শরীরই ধর্মসাধনের প্রধান কারণ, তাহার সংরক্ষণ না করিলে ধর্মজীবন লাভ করিবার কোন উপায় নাই। আবার সকল চেষ্টাই যদি একমাত্র শরীর-সংরক্ষণে পর্যবসিত হয়, তাহা হইলে আর ধর্মজীবন লাভ করা যায় না।

সুতরাং জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি ও যাহাতে তাহারা সহজসাধ্য জীবিকা উপার্জনোপযোগী কার্যে দক্ষতা লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করণান্তর জীবনের অবশিষ্ট কাল মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করাই কি আজ দেশের শিক্ষিত, সমর্থ, স্বদেশের কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি-মাত্রেরই কর্তব্য নয়?

ভারতের এই বিষম অন্নচিন্তার কিছুমাত্র উপশম হইলেই ধর্মপ্রাণ ভারত পুনর্বার স্বধর্মে বলীয়ান্ হইয়া, পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া, ধর্মরাজ্যের অশ্রুতপূর্ব অননুভূত তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিবে!

ঐ-কালে কাশীর প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত দুইখানি পত্র হইতে সংকলিত :

এখন আপনার প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য উত্তর এই যে, অর্থসাধ্য লোকহিতে ব্রতী হইয়া আমাকে অর্থচিন্তারত হইতে হয় নাই, বরং ঈশ্বরচিন্তাতেই অধিক সময় গিয়াছে ও যাইতেছে, এবং ইহাও জানি যে, তাঁহার কার্যই তিনি আমাদিগকে দিয়া করাইতেছেন। বহু জীবনের কল্যাণ সাধন করিতে করিতে স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিসাধন ভিন্ন কোন ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা নাই।

আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে নির্জন সেবা করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা কি চিরকালই করিবে? মানুষ যতই আত্মবিস্তার লাভ করিবে, ততই তাহার হৃদয় কোমল ও সরল হইবে। জীবসেবা করিলে শমদমাদি ভূষণ আরও উজ্জ্বল হয়, নিষ্কাম অনুষ্ঠান যে করে তার। ইহা যে অমুক করিবে, অমুক করিবে না, এইরূপ বাঁধাবাঁধি হওয়া অসম্ভব। কারণ যাবৎ শরীর তাবৎ ক্রিয়া, অতএব সে ক্রিয়া নিষ্কাম হওয়াই চাই; এবং আত্মজ্ঞানী সহস্র কার্য করিয়াও স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকেন। এ নিগূঢ় তত্ত্ব মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবের বুঝিবার সাধ্য নাই। ইহা সেই সৎকর্মনিষ্ঠ আত্মজ্ঞানী পুরুষের হৃদয়েই লুক্কায়িত আছে। (১৯.১০.১৮৯৮)

আত্মজ্ঞানই মানুষের কল্যাণস্বরূপ, এবং সেই আত্মজ্ঞান ভগবদ্‌ভক্তি ও ভগবৎপ্রসাদ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু যদি স্বীয় ক্রিয়ার নিদর্শন দ্বারা ও বাক্য দ্বারা ভগবদারাধনার উপদেশ করিতে হয়, তবে লোকের প্রধান অভাব দূর করিতে হইবে।

দেশের রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য জমিদারগণ যদি লোকের সেই অভাব দূর করিতেন, তাহা হইলে আর সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা লোকদুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য এত শ্রম ও যত্ন করিতেন না। দেশের বড় বড় গৃহস্থেরা পাষাণ দিয়া বুক বাঁধাইয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয় এমন বজ্রোপম কঠিন উপাদানে নির্মিত বা বর্মদ্বারা আবৃত যে, আর্তের কাতর ক্রন্দনধ্বনি সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না। আর শুষ্ক শাস্ত্রীয় কথায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না।

আমার প্রভু আমার হৃদয়েই আছেন এবং সদাকালই থাকিবেন। আমার প্রভু গিরিশৃঙ্গে বা নীলাকাশে বসিয়া নাই, আমার প্রভু আমার আত্মা—সর্বজীবে। সেই সর্বজীবরূপী ভগবানকে আমি মুহুর্মুহুঃ বলিতে শুনিতেছি যে, ওরে মানুষেই বৈদিক ঋষিবৃন্দ, মানুষের মধ্যেই রাম-কৃষ্ণাদি অবতার, সেই মানুষের কি শোচনীয় অবস্থা—দেখছিসনি?" একথা যে শোনে, তার কি স্থির থাকবার জো আছে? এই মানুষ-ভগবানের সেবায় এ জীবন দিয়াছি; আরও কত জীবন যে দিতে হইবে বলিতে পারি না। (১০.১.১৮৯৯)

সংসারে সাধন-ভজন*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ চিরতরের—চিরকালের। আগে তিনি তারপর তো সব। এটা ভুলে গেছি। উপনিষদ্‌ও এই কথা আমাদের শেখাচ্ছেন: তদেতৎ প্রেয়: পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ।

সংসারে আসক্তি টান কার প্রতি? এই সব সম্পদ্‌-ঐশ্বর্য, পুত্র-বিত্তের প্রতি। এই সবেই তো আমাদের আসক্তি। কিন্তু আমাদের ভিতর যিনি রয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে—এ সবের চেয়েও প্রিয়। কাজেই তাঁকে প্রিয়-ভাবে উপাসনা করতে হবে। সত্যি আগে ভগবান, তার পর সংসার। আগে এক, তার পর শূন্য বসাতে হয়। এটা আমরা ভুলে গেছি। আগে তিনি। তিনিই সব দিয়েছেন। কাজেই সবার প্রতি আমার কর্তব্য যেটুকু তা পালন করতে হবে। এই হ'ল আসল কথা। এটা আমরা ভুলে যাই। কাজেই এই কথাটা সব সময় মনে রেখে চলতে হবে যে, আগে তিনি—তারপর সংসার। এই যে ছেলেমেয়ের প্রতি, সংসারের প্রতি আসক্তি—ভালবাসার আকর্ষণ, টান, সব তাঁরই জন্য। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। 'আর সব তাঁর ইচ্ছায় পেয়েছি, তাঁর ইচ্ছা হ'লে চলে যাবে। এই সব তিনি আমার কাছে দিয়েছেন, আমার কর্তব্য পালন করতে হবে।' এইটি ভাবো যে, সব তিনি, সব তাঁর। কতটা ভালবাসা আসলে এটা সম্ভব হয়, বল দেখি? আর সেই ভালবাসাটা আসে না কেন? এই টানটা আসে না কেন? সংসারে টেনে রেখেছে। সংসার—জরু-জমি-রূপেয়া, এই সংসারকে জন্ম জন্ম ধরে ভালবাসছি, আপনার ব'লে মনে ক'রে রেখেছি। সেটা থেকে মন ওঠাতে হবে। সেইজন্যই ঠাকুরের শিক্ষা: হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙতে হবে, তা না হ'লে আঠা জড়িয়ে যায়। আর সেই আঠা ছাড়ানো যায় না। হাতে যদি তেল মাখানো থাকে, তা হ'লে আর আঠা লাগে না। লাগলেও অল্প চেষ্টাতেই উঠিয়ে দিতে পারা যায়। আসক্তি হ'ল আঠা। সেই আঠা মনে লেগে আছে। তেলটি কি? অনুরাগ, ভক্তি, ভালবাসা, ভগবানের প্রতি একটা আকর্ষণ। তিনি আমার চিরকালের আপনার। তিনি আছেন বলেই তো আর সব কিছু। যা কিছু আমাদের আকর্ষণ, ভালবাসা, টান সব তাঁরই জন্য। সেই জন্য হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গা—ভক্তিভাব নিয়ে সংসার করা। সংসারের প্রতি টান ভালবাসা, এতো থাকবেই; ভগবান দিয়েছেন আমাদের ভেতর, না হ'লে সংসার চলবে কি ক'রে? আমরা কি দেয়াল, ইট, কাঠ, পাথর হবো? স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা নিয়েই তো এই সংসার। সংসার থেকে কি প্রীতি ভালবাসা একেবারেই চলে যাবে? মোটেই না। সেই প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা নিয়ে সংসার প্রতিপালন করতে হবে। ছেলে-মেয়ে, স্বামীর সেবা সব। বুঝতে পারলে? এসব তাঁরই দান। তবে সংসারের সেবা করতে গিয়ে যে একেবারে সব গুলিয়ে

---

* ১৩.১১.৫৯, লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ অবলম্বনে। শ্রুতলেখক—শ্রীজয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলছি। সেই আসক্তি আর ছাড়াতে পারছি না। সেইজন্যই ওই হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙার উপদেশ।

প্রীতি ভালবাসা অনুরাগ ও টান সংসারের প্রতি যা রয়েছে, তা থাকুক। তা না হ'লে আমাদের সংসারের কর্তব্য পালন হয় না। প্রীতি, ভালবাসা আবার ভগবানকেও দিতে হবে তো? সেই অনুরাগ, সেই যে টান, সেই প্রীতিটুকু, সংসারের প্রতি যা রয়েছে, সেটি তো ভগবানকে আমরা দিতে পারি না।

এই সংসারের কর্তব্য পালন ক'রে যখন আবার পূজায় বসি, তখন কোথায় সেই প্রীতি? কোথায় সে ভালবাসা, আকর্ষণ, টান?

কিন্তু যদি সংসারে অনাসক্তি ও ঈশ্বরে ভক্তি থাকে? কর্তব্য পালন করলে, আঠা লাগলো না। আবার সেই প্রীতি, ভালবাসা, অনুরাগ নিয়ে বসো পূজায়, বসো জপে, বসো ধ্যানে, বসো প্রার্থনায়। সেইটি আমরা শিখিনি। এই জন্যই ঠাকুরের শিক্ষা: হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙো।

Attachment and 'Detachment—এই দুটো কথা আছে, মানে আসক্তি এবং অনাসক্তি। হাতে তেল মাখানো না থাকলে আঠা লেগে যাবে; ভালবাসা নিয়ে সংসারের যেমন কর্তব্য করছি, তেমনি আর একটা বড় কর্তব্য আছে। যাঁর সংসার, যিনি এই সব দিয়েছেন, তাঁর প্রতিও একটা কর্তব্য আছে। উপাসনার সময় ডাকতে যাই, কিন্তু হয় না; এরা সব টেনে রেখে দিয়েছে, আঠা লেগে গেছে, যেহেতু হাতে তেল মাখানো নেই। কি সুন্দর ছোট্ট উপমা, আঠা-মুক্ত হয়ে প্রীতি ভালবাসা নিয়ে বসো পূজায়, ডাকো তাঁকে। এই প্রীতিটুকুই হ'ল আসল। ঠাকুর বলতেন, 'খোল মাখানো জাব'। ছেলে বলো, স্বামী বলো, সকলে যেন কি একটা বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। নিজেদের সংসারে দেখছ তো? সেইটুকু যদি পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আস্বাদন না করে তো সংসারটা একেবারে শুকনো হয়ে যায়। এ তো তোমরা জানো। অনেক সময় শুনেছি, ছেলে মাকে বলছে, 'মা তুমি আর আগের মতো ভালবাস না।' সেই প্রীতিটুকু পাচ্ছে না ব'লে এই কথা বলে। স্বামী স্ত্রীকে বলছে, 'তুমি যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছ!' এই প্রীতি নিয়ে সংসারের এত আকর্ষণ। এইটুকু নিয়ে সংসারে প্রেম, ভালবাসা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি এত আকর্ষণ। তেমনি ভগবানের দিকেও আকর্ষণ আছে তো! সকলের ভিতর তিনি। তিনি না থাকলে কোথায় থাকবে এ সব? এটা ভুলে গেছি। শরীরের সম্বন্ধই সার করেছি। কাজেই এর বেশী আর আমরা দেখতে পাই না। কাজেই এই প্রেম প্রীতি ভালবাসা আবার ওঠাতে হবে। উঠিয়ে ভগবানকে দিতে হবে। এই জন্যই গীতায় এত উপদেশ; ভগবান শ্লোকের পর শ্লোকে বলছেন: অনাসক্ত হও, আমায় ভালবাস। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, 'পানকৌটির মতো সংসারে থাকো'। দেখ, আর একটি দৃষ্টান্ত! পানকৌটি জলে রইল, ডানা ভিজে গেল, একবার ঝেড়ে নিলে, একেবারে শুকনো হয়ে গেল।

ঠাকুর বলতেন, পাঁকাল মাছের মতো সংসারে থাকবে। দেখ, পাঁকের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তেলা গায়ে পাঁক লাগে না। অনাসক্তির মূলে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা। ভগবানের কাছে সেইটি আমরা দিতে পারি না। সংসারে আমরা প্রত্যেক জিনিসটি করছি প্রীতির সঙ্গে। এমনকি কুকুর, বেড়াল—তাদেরও

ভালবাসা দিচ্ছি। কুকুরটা পর্যন্ত তোমার প্রেম প্রীতি আস্বাদন করছে, তোমার পায়ে পায়ে ঘুরছে। সেখানে ভাষা নেই, কিন্তু তুমি কিভাবে তাকে যত্ন ক'রছ। খাওয়ানো দাওয়ানো সব কিছু ব্যাপারে। কি হয়ে যাচ্ছে? গোলাম হয়ে যাচ্ছে।

যেমন এসেছ, ঠিক তেমনি যাবে। সেই উলঙ্গ হয়ে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছ, আবার সেই ভাবেই ফিরে যেতে হবে। কোন্ অজানা দেশ থেকে এসেছ, কোন্ অজানা দেশে যেতে হবে! এই মাঝখানেরটা নিয়েই আমাদের যত কিছু। তিনি সব সময় আছেন। সকলকে ধরে আছেন। আমরা সব তাঁতেই রয়েছি। তিনিই আমাদের গন্তব্য স্থল। সংসার তো আর গন্তব্য স্থল নয়। তবে সংসার কিভাবে করতে হবে? আগে তিনি, তাঁকে ভালবাসতে হবে; সংসারে যারা আছে, তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে, কেন না তিনি ইহকাল পরকালে রয়েছেন। সব সময় আমার আপনার। ছেলেমেয়েদের দেখছ তো সংসারে। কখন দিচ্ছেন, কখন নিচ্ছেন, আবার কার কখন ডাক আসে! তার জন্য নিজেকে তৈরী থাকতে হবে। এইটি হ'ল বড় কথা। এইটি যেন কখনো ভুলো না।

সংসারে কিভাবে থাকতে হবে? ঠাকুর বলতেন, ছুতারনির মতো। এটি অভ্যাস করতে হয়। একদিনে ছুতারনি হওয়া যায় না। চিঁড়ে কোটে ছুতারনি। চিঁড়ে তুলছে, দেখছে—চিঁড়ে কাঁড়া হ'ল কি না। খদ্দের এসেছে, তাকে চিঁড়ে বিক্রি করছে। আবার কে কবে কি দাম বাকি রেখেছে, তার হিসাব ক'রে বলছে। ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে। কত কর্তব্য পালন করছে। কিন্তু মনটা রেখেছে কোথায়? ঢেঁকির মুষলের দিকে।

দেখ, ঠাকুরের আর একটি দৃষ্টান্ত: আড়ায় ডিম রয়েছে। কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মন আছে সেই ডিমের দিকে। এইটি হ'ল আসল জিনিস। নিত্যকর্মের ভেতর দিয়ে অভ্যাস করতে হবে। এ সব কি একদিন, কি এক ঘণ্টা বসে জপ করলে বা ধ্যান করলে হবে? তা নয়। কর্মের ভেতর দিয়ে সব সময় এ যোগটি তাঁর সঙ্গে রাখতে হবে। এটা কি ক'রে সম্ভব? তাঁকে ভালবাসতে পারলে হয়, না হ'লে অসম্ভব। এটি যেন আমরা কখন না ভুলি। তার কারণ হচ্ছে সংসারের সব জিনিস কাঁটালের আঠার মতো জড়িয়ে গেছে। তোমাদের এইগুলি সব মনে ভেবে নিয়ে সাধন করতে হবে। আর সেইটি দৈনন্দিন প্রত্যেক কাজের ভেতর দিয়ে কি ভাবে হবে, ঠাকুর তাও দেখাচ্ছেন। যা কিছু করবে ভগবানকে স্মরণ ক'রে।

যা কিছু আমরা দৈনন্দিন জীবনে করি, ভগবানকে স্মরণ ক'রে করতে হবে। সব সময় এটা করতে হবে। কুরুক্ষেত্রে ভগবান বলছেন, 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'—সব সময়ে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে আমাকে স্মরণ কর আর কর্তব্য পালন কর। এইটি হ'ল আসল জিনিস। আর আমাদের এইখানেই ভুল! তাঁকে স্মরণ ক'রে, তাঁকে আশ্রয় ক'রে কর্তব্য করতে হবে। এটি অভ্যাস ছাড়া হয় না। তবে ভোগের মধ্যে এ ভাব আসে না। তাই চাই সাধুসঙ্গ।

সাধুসঙ্গ একটা বড় জিনিস; ঠাকুরের ভাষায় 'ঘড়ি মেলানো'। ঠাকুরের কাছে যাঁরা যেতেন, তাঁরা তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারতেন, তাঁদের মনটা বিষয়ের দিকে কতটা এগিয়েছে

আর ভগবানের দিক থেকে কতটা পিছিয়ে এসেছে। 'ঘড়ি মেলালে' বিবেক জাগে। বিবেক ব'লে দেয়, আমরা ভগবানের থেকে কত দূরে চলে এসেছি। এইজন্য মন-ঘড়িটিকে মিলিয়ে নিতে হয়—regulate ক'রে নিতে হয়। এই এক বড় জিনিস জানবে তোমাদের জীবনে—'সাধুসঙ্গ'। এইটি ঠিক থাকা চাই।

সাধুসঙ্গ হুঁশ এনে দেয়। এইটি ঠাকুর বার বার বলতেন। সাধুসঙ্গে বিশ্বাস, অনুরাগ লাভ হয়; এমন কি ভগবৎদর্শনও হয়। হচ্ছে না কেন! কারণ মন বিষয়ে বাঁধা পড়েছে। মন তো আমাদের হাতে নেই। কাজেই কি ক'রব? সাধুসঙ্গের দ্বারা সেই বন্ধকী মন নিজের কাছে ফিরে আসে। সাধুসঙ্গ খুব দরকার, এইটি সর্বদা মনে রাখবে।

আর একটা জিনিস খুব মনে রাখবে, যা রোজ শোনো, শোনার পর একটু চিন্তা করবে। তোমাদের শোনা হয়ে গেল, ব্যস্, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে এ-গল্প সে-গল্প জুড়ে দিলে। কিছুই মনে থাকে না যা শুনলে; শ্রবণ হয়, কিন্তু মনন নিদিধ্যাসন হয় না। কি কঠিন সংস্কার! ভাল সংস্কার হ'লে মন্দ সংস্কারটা চলে যায়। তোমাদের শ্রবণ হয়, মনন হয় না। চিন্তা করা চাই। ঠাকুর যেমন বলতেন, গরু একপেট খেলো, তার পর এসে জাবর কাটতে লাগলো। এইগুলি তোমরা দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস করতে চেষ্টা করবে। তা না হ'লে হবে না। এই ভাবেতে তোমরা চলবে। অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ দেখবে অন্য সংস্কারগুলো চলে যাবে; তোমাদের রাজসিক মন এই সবের দ্বারা সাত্ত্বিক হবে, ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাবে। দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস কর, এই ভাবে কর্ম কর, তাহলে দেখবে মন ক্রমশঃ সাত্ত্বিক অবস্থায় উঠবে।

ভগবানের লীলা-চিন্তন, নাম-জপ, সাধুসঙ্গ সব কিছু দ্বারা মনকে শুদ্ধ, পবিত্র করবে। এইগুলি দৈনন্দিন করতে হবে, না হ'লে মনটা ওঠানামা করবে। সেইজন্য গীতায় বলেছেন, 'সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'। ঠাকুরও বলতেন, মনটাকে তাঁতে রেখে কাজ করতে হবে। কচ্ছপ জলে চরছে, আড়ায় ডিম আছে, মনটা তাতে ফেলে রেখেছে। ছুতারনি চিঁড়ে কুটছে, কত কি করছে, কিন্তু খানিকটা মন সর্বদা পড়ে আছে মুষলের দিকে। তোমরাও খানিকটা মন তাঁতে রেখে সংসারের কর্তব্য কর্ম করবে। এইটি রোজ অভ্যাস করবে।

ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে দিয়ে একটা বড় শিক্ষা পাই। মনটাকে সংসার থেকে একেবারে তুলে নেওয়া নয়। গীতারও শিক্ষা: আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর। দৈনন্দিন জীবনে খানিকটা মন তাঁর স্মরণে, তাঁর চিন্তায় রাখবে। এইটি তোমরা অভ্যাস কর দেখি, ধর্ম একটা আস্বাদন করার জিনিস। ভগবান রয়েছেন, তাকে আস্বাদন করতে হবে। কুকুরটাকে ভালবাসছ, বেড়ালটাকে ভালবাসছ, তারাও তোমার ভালবাসা আস্বাদন করছে। তেমনি তোমাদেরও আস্বাদন করতে হবে তাঁর ভালবাসা। ওইটি হচ্ছে না বলেই সংসারে অশান্তি। তাঁর সংসার তিনি দিয়েছেন: তাঁকে নিয়ে তো এটা আস্বাদন করতে হবে। এই শুনলে, কিন্তু আবার হয়তো সব গুলিয়ে যাবে। কাজেই সাধুসঙ্গ চাই। যেখানে সাধুসঙ্গের অভাব সেখানে সদ্‌গ্রন্থ পড়বে যেটা শুনবে, সেটা ভাল ক'রে চিন্তা করবে মনে করবে, অভ্যাস করবে।

সংসারের কর্তব্য যেমন করছ, তেমনি কর যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থা থেকেই তাঁর দিকে এগোতে হবে।

ভারতের আধ্যাত্মিক নব-জাগরণ

স্বামী নির্বেদানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সিংহাবলোকন

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভাটা আসার সঙ্গে সঙ্গে এভাবে বহু সামাজিক ও ধর্মমূলক জাগরণের উদ্ভব হয়। নিমজ্জমান হিন্দু-বিশ্বাসকে উদ্ধার করার কাজে এদের সবগুলিই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব-বিশেষকে গ্রহণ ক'রে সেটিকে পাশ্চাত্যের গোঁড়া ও যুক্তিবাদী ব্যক্তিদের সমালোচনা সহ্য করার মতো সবল ক'রে তুলতে এগুলির প্রত্যেকটিই চেষ্টা করেছিল। বহিরাগত সভ্যতার ধ্বংসাত্মক তরঙ্গাঘাত প্রতিরোধ করার জন্য হিন্দুধর্মের অন্ততঃ কয়েকটি দিকে এভাবে মাথা তুলেছিল কয়েকটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

ঘটনাস্রোতের গতিপথও পরিবর্তিত হ'ল এতে। যে-সব মনীষীরা প্রলোভনে পড়ে হিন্দুয়ানি ছেড়ে বিপথগামী হয়েছিলেন, তাঁরা আবার ঘুরে দাঁড়ালেন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ফিরে চাইলেন পূর্বপুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে। সে শিক্ষার উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করা, এমনকি তার কিছু কিছু গ্রহণ ক'রে জীবন গঠন করাও শুরু হ'য়ে গেল।

এভাবে এ-সব আন্দোলনগুলির ভেতর দিয়ে হিন্দুদের আত্মপ্রত্যয় পুনরুদ্বুদ্ধ হ'য়ে সব বাধা ঠেলে হিন্দুসংস্কৃতিকে নব প্রাণশক্তিতে বলীয়ান ক'রে তুলেছিল। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিজয়লাভেচ্ছার যে যে অভিযান শুরু হয়েছিল, এবং ইংরেজী শিক্ষা ও মিশনরীদের প্রচারের ফলে যার গতিবেগ হয়েছিল দ্রুততর, তাকে হটিয়ে দেবার জন্য তার পশ্চাদ্ধাবন শুরু হয় এইভাবে। এই সাফল্য এইসব সময়োচিত আন্দোলনগুলির মূল্যকে অতুলনীয় ক'রে রেখেছে। কিন্তু সবটা প্রয়োজন এতেও মিটল না; হিন্দু-বিশ্বাসের পূর্ণ পুনরুজ্জীবনের জন্য আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন ছিল। এইসব আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল হিন্দুধর্মের অংশবিশেষকে অবলম্বন ক'রে। সেখান থেকে সযত্নে বেছে নেওয়া কয়েকটি মতবিশেষের প্রতীকমাত্র-রূপে।

হিন্দুধর্মে কেন্দ্রগত মহান্ একটি একত্বের মূলসূত্রে বহুবিধ মতবাদ অপূর্ব সমন্বয়ে গাঁথা রয়েছে। এই একত্বের—এই মূলসূত্রের সন্ধান যে পায়নি, তার কাছে কিন্তু সর্বভাবময় হিন্দুধর্ম পরস্পরবিরোধী অসংখ্য মতবাদের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ বলেই মনে হবে। অতি নিম্ন থেকে অতি উচ্চ পর্যন্ত সর্ববিধ ভাবই সে দেখতে পাবে সেখানে—পরস্পর-বিচ্ছিন্ন রূপে। কাজেই এরূপ কোন লোক যদি হিন্দুধর্মকে সমর্থন করতে চায়, তাহলে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করার মতো একটিমাত্র মতবাদকে পছন্দ ক'রে সেখান থেকে বেছে নেওয়া ছাড়া সে আর করবেই বা কি?

সংস্কারকদেরও ঠিক তাই করতে হয়েছিল। সমন্বয়ের গূঢ় রহস্য ধরতে না পারার জন্য, এবং হিন্দুধর্মের বহুবিধ সারগর্ভ ভাবকে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ব'লে ভুল বোঝার জন্য শাস্ত্রের একদেশী অর্থবোধই হয়েছিল তাঁদের। আর সেই একদেশী বোধের আলোক ফেলে হিন্দু-ধর্মের ভেতর যা কিছু অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন

ব'লে মনে করেছিলেন তাঁরা, তা সবই ছাঁটাই করতে লেগে গিয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে হিন্দু ঋষিরা যে বিশাল সমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শগুলি প্রবর্তন ক'রে গেছেন, সর্বতঃপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে সেগুলির দিকে চাইতে পারেননি বলেই সেগুলির মর্মগ্রহণেও অসমর্থ হয়েছিলেন তাঁরা।

তবু নিজ নিজ দৃঢ় বিশ্বাসের তড়িৎ-স্পর্শে প্রাণোচ্ছল হ'য়ে তাঁরা ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের কতকগুলি মূল বিশ্বাসের ওপর।

ফলে, সম্পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়ে সমগ্র হিন্দু-সমাজের সংস্কার-সাধনে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজকে গোঁড়া হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র দল গঠন করতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভেতর যাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণে উদ্যত হয়েছিলেন, তাঁরা অবশ্য নিষ্ঠা নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন এঁদের দলে। প্রাচীনপন্থী অগণিত জনগণ কিন্তু এইসব সংস্কারকদের মত গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না; তাঁদের তুলনায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সে-জন্য হিন্দুবিশ্বাসের প্রায় সবটাকেই একটা জঞ্জালের স্তূপবিশেষ ব'লে মনে ক'রে যে সংস্কারক দলগুলি তার সংস্কার-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাদের প্রত্যেককেই অকৃতকার্য হ'য়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল—অল্প কয়েকজন সমর্থক মাত্র সংগ্রহ ক'রে।

সনাতনপন্থীদের মনোভাব

সনাতনপন্থী জনসাধারণ কিন্তু সমাজ ও ধর্মের ধরাবাঁধা পথ ধরেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে চলতে লাগলেন—হিন্দু পণ্ডিতদের মামুলি নির্দেশ অনুযায়ী। হিন্দুদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার সঙ্গে বিদেশী সভ্যতার যে সঙ্ঘাত চলছিল, সেটাকে তাঁরা গ্রাহ্যই করেননি। বৈদেশিক চিন্তাধারা যে দেশের ওপর চড়াও হ'য়ে এগিয়ে চলছিল, সেদিকেও বোধহয় তাঁরা চেয়েছিলেন একটু উপেক্ষাভরে—গর্বোন্নত ভাব নিয়ে। আধুনিক সমালোচকদের বিধ্বংসী অভিযান থেকে বাঁচবার জন্য নিজেদের মতবাদকে যুক্তির বর্মে সজ্জিত করার কোন প্রয়োজনীয়তা-বোধই জাগেনি তাঁদের মনে। বহুপ্রাচীন নিজস্ব বিশ্বাসের দুর্গের ভেতরে থেকে নিজেদের বোধ হয় সুরক্ষিত ভেবেছিলেন তাঁরা। তাই অন্ধভাবে আঁকড়ে ছিলেন বৈচিত্র্যবহুল, পুরুষানুগত মত ও আদর্শকে। ভুলই হ'ক, আর ঠিকই হ'ক, সনাতনপন্থীরা হিন্দুয়ানিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে হয় বেঁচে থাকতে, নয় বিনষ্ট হ'তে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিলেন; সংস্কারকদের কাছ থেকে কোনরূপ আংশিক হিন্দুয়ানি গ্রহণ করতে চাননি তাঁরা। প্রাচীনপন্থী জনসাধারণের এই মনোভাবকে উৎকট ও একটু বিপজ্জনক বলেই ধরে নিয়েছিলেন সংস্কারকেরা! তাঁরা ভেবেছিলেন—যুগনিয়ন্তা শক্তির প্রতি, এবং নিজ মতবাদের আমূল সংস্কার-সাধনের অতি-প্রয়োজনীয়তার প্রতি জনসাধারণের এই নির্বোধ উপেক্ষা পরিণামে একটা বিপত্তি ঘটাবেই। তাঁদের ভয় ছিল, পুরাতন ধর্মাদর্শ ও ধর্মমতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে তৎকালীন সুস্পষ্ট চাহিদার অনুরূপ ক'রে সনাতনপন্থীরা যদি ধর্মকে না গড়ে তোলে, তাহলে হিন্দু-সমাজের প্রধান ইমারতটি অবশ্যম্ভাবী বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পাবে না কিছুতেই।

সংস্কারকদের এই শঙ্কাকে ভয়ার্তের যুক্তিহীন আশঙ্কা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সে সময় যে কোন যুক্তিশীল সমালোচকই মনে

করতেন যে, একটা অলৌকিক ঘটনা ঘ'টে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতাকে যদি সমগ্রভাবে বাঁচিয়ে দেয় তো আলাদা কথা, তা না হ'লে বহু ভাব ও বহু আদর্শের বিশাল সমন্বয়ভূমি প্রাণবন্ত হিন্দুধর্মের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে চিরতরে ; আধুনিক চিন্তাধারার তোপের মুখে ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে যাবে হিন্দুসমাজ। প্রাচীনপন্থীরাই অবশ্য এতদিন হিন্দুসমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তবু এই সঙ্কটকালে এরূপ একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটার কোন লক্ষণ যে পর্যন্ত না দেখা যাচ্ছিল, সে পর্যন্ত তাঁদের নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের এই স্থির সঙ্কল্প ভারতের অতি প্রাচীন ধর্মটির চিরবিলুপ্তির বিপদকে যে বাড়িয়েই তুলছিল, তাতে সন্দেহের কিছু নেই। জনসাধারণের এই মনোভাব শুধু সংস্কারকদের চোখেই নয়, নিরপেক্ষ দর্শক এবং সমালোচকদের চোখেও একটু গোঁয়ারতমি বলেই মনে হয়েছিল। কারণ, হিন্দুধর্মরূপ সুবিশাল ইমারতটির সবটাকে রক্ষা করার জন্য প্রাচীনপন্থীদের এই জেদের ফলে সমাজ-জীবনের অবস্থা হ'য়ে উঠেছিল খুবই সঙ্কটাপন্ন।

হিন্দুর নবজাগরণ

কিন্তু আসন্ন সঙ্কটের হাত থেকে হিন্দু-সমাজ আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেল। গোঁয়ারতমি ব'লে মনে হলেও প্রাচীনপন্থী জনসাধারণের এই একগুঁয়ে মনোভাব হাস্যকর বিফলতায় পর্যবসিত হ'ল না। বেশী দিন অপেক্ষাও করতে হ'ল না; হিন্দু-বিশ্বাসের সব শাখা-প্রশাখা জুড়ে অমিত শক্তি সঞ্চার ক'রে হিন্দু-ধর্মকে পূর্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করার মতো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘ'টল।

যাঁর প্রথম জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই গ্রন্থের* প্রকাশ, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনেই ঘ'টল সেটি। গভীর আধ্যাত্মিকতায় ভরা হিন্দুধর্মের উদার ও সমন্বয়-সাধক দৃষ্টি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আবির্ভাব ঘ'টল, হিন্দুধর্মতত্ত্বের সর্ববিধ ভাব ও আদর্শের অতি প্রাঞ্জল জ্ঞানালোক-সমুজ্জ্বল ব্যাখ্যারূপে।

হিন্দুভাব ও হিন্দু আকাঙ্ক্ষার প্রাচীন আদর্শগুলির সঙ্গে একই সুরে বাঁধা ছিল তাঁর জীবন ও বাণী। সেজন্য পূর্বগ মুনি, ঋষি ও আচার্যদের জীবন ও বাণীর পূর্ণ সমন্বয় সেখানে ঘটেছিল। তাঁদের মতোই প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিত্তির ওপর নিশ্চিন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কথাও বলতেন একজন আধিকারিক-পুরুষের মতো। সে সময়কার জরুরী দাবি মেটাবার মতো শক্তি ছিল তাঁর প্রাণখোলা কথায়, যা অপরের প্রাণ স্পর্শ ক'রত সহজেই। প্রাচীন-পন্থীরা এবং সংস্কার-পক্ষপাতীরা—সকলেই ধীরে ধীরে বুঝলেন যে, হিন্দু জীবন-বেদের একজন পরিত্রাতা হ'য়ে তিনি এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ডাক শোনা মাত্রই হিন্দু-সমাজ সোল্লাসে সাড়া দিয়েছিল কেন, সে কথা বোঝা যায় গোঁড়া হিন্দুদের মনস্তত্ত্ব একটু তলিয়ে দেখলেই।

অনুভূতিই হিন্দুধর্মের প্রাণ। ধর্মের সর্বোচ্চ ভাবগুলি যে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গেই যে সত্যকার ধর্ম-জীবন শুরু হয়, এই মূল বিশ্বাসই যুগ যুগ ধরে হিন্দুজীবন নিয়ন্ত্রণ ক'রে এসেছে। ভারতের মহানুভব মুনি, ঋষি ও আচার্যেরা জীবন ও অস্তিত্বের অবলম্বন—মূল চিরন্তন সত্যকে জগতের অনিত্য বিষয়ের চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতেন, অনেক বেশী মূল্যবান্ ব'লে জ্ঞান করতেন। এ ছিল তাঁদের দৈনন্দিন অনুভূতির বিষয়।

* গতমাসের লেখার শেষে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তাঁদের সব চিন্তা, সব আকাঙ্ক্ষা, সব কৃতিত্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির এই শুদ্ধ উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত। সেজন্য হিন্দুধর্মের এই সব দিব্য-ভাবময় প্রতিভূরা ব'লে গেছেন: ধর্ম যেন আলোচনা, কল্পিত মতবাদ, উপদেশ ও সম্প্রদায়-গত দলমাত্রে পর্যবসিত না হ'য়ে তার মূল সত্যগুলির অনুভূতি-লাভকেই চরম লক্ষ্য ক'রে রাখে। ধর্মজীবনে আর সব ঘটনার চেয়ে এই চরম চাহিদাটিকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়ে গেছেন বেশী। হিন্দু-মন এই সব অনুভূতি-সম্পন্ন আচার্যদের গুরুপদে বরণ ক'রে নিয়ে ধর্মের এই সহজ সুস্পষ্ট প্রবল চাহিদাটিকেই তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাণস্বরূপ ব'লে গ্রহণ ক'রে নিয়েছে।

প্রত্যক্ষ অনুভূতির এই মূল চাহিদার প্রতি আনুগত্য আছে বলেই হিন্দুরা—আধ্যাত্মিক সত্যলাভের কার্যকর পথ দেখাতে পারে, এমন যে কোন সাম্প্রদায়িক মতের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সমর্থ। এভাবেই আপাতবিরোধী বহু মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে এখানে। হিন্দুধর্ম দুহাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে তার সবগুলিকেই বুকে ঠাঁই দিয়ে এসেছে। অমর, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সত্যলাভের জন্য হিন্দুধর্মের আকুল প্রচেষ্টার ফলেই এখানে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হয়েছে অদ্বৈতবাদীদের অতি উচ্চাঙ্গের মনোবিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ধারা, রাজযোগীদের মনঃ-সংযোগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, হঠযোগীদের কঠোর শরীর-নিয়ন্ত্রণ, এবং শাক্ত, বৈষ্ণব ও অন্যান্য ভক্তিমার্গীদের উপাসনা ও ঈশ্বরকে ভালবাসার সাধনা। এই আকুল প্রচেষ্টাই জন্ম দিয়েছে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বিশেষের নীতিবিগর্হিত গুহ্য সাধন-প্রণালীর এবং কাপালিকদের তামসিক ও ভয়াবহ ক্রিয়াকলাপাদির। ঈশ্বর-লাভের জন্য হিন্দু-মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই হিন্দুধর্মের ভেতর ছোট বড় সর্বস্তরের এত বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতির একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ গড়ে তুলেছে।

তাছাড়া আধ্যাত্মিক অনুভূতি-লাভের এই একই প্রেরণার ফলে অসংখ্য সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছে এদেশে। সম্পূর্ণ ভিন্নপন্থী তাঁরা। আজও দেখা যায়, ভারতে হাজার হাজার লোক সংসার ছেড়ে এসে আধ্যাত্মিক সত্য-লাভের জন্য বিভিন্ন সাধনায় জীবনের সর্বস্ব আহুতি দিচ্ছেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁরা দেশের কোন কাজে লাগেন না, ঠিক কথা; তবু হিন্দুসমাজ স-সম্ভ্রমে তাঁদের সমর্থন করে। এতেই বোঝা যায় যে, বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ কবীর মীরাবাঈ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী ও সত্য-দ্রষ্টারা অধ্যাত্ম-অনুভূতির যে মহান্ আদর্শের জন্য জীবনপাত ক'রে গেছেন, তার ওপর সমাজের যথার্থ ও গভীর অনুরাগ আজও বেঁচে আছে। সনাতনপন্থী জনসাধারণ সন্ন্যাসজীবনে এই অত্যুচ্চ আদর্শটিকে দেখতে পায় বলেই হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে থাকে সেই জীবনের উদ্দেশে।

ধর্মজীবনের ভিত্তি আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতি প্রাচীনপন্থীদের অনুরাগ এত গভীর বলেই হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এমন একজন সত্যদ্রষ্টার আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়েছিল, চরম সত্যকে যিনি সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করেছেন। যাঁর কাছে সেই সত্য শুধু মস্তিষ্কপ্রসূত মনোরম বিষয় বা সুবিন্যস্ত কল্পনাজাল-মাত্র নয়, যাঁর কাছে তা প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য, জগতের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর চেয়ে যাঁর কাছে তার মূল্য অনেকগুণ বেশী। সর্বদা ঈশ্বরীয় ভাবে মগ্ন এরূপ একজন সত্যদ্রষ্টা ছাড়া আর কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না প্রাচীন-পন্থী জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন ক'রে তাদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করা। হিন্দু জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তাদের ধর্মে নতুন প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল একজন মহাশক্তিধর ঋষির, যাঁর জীবনের গভীর ও বিশাল অনুভূতিতে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নিহিত আধ্যাত্মিক সত্যগুলি সবই প্রতিফলিত হ'য়ে উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রয়োজনই মেটাতে এসেছিলেন। প্রাচীনপন্থী সমাজ তাঁর ভেতর দেখেছিল সমগ্র হিন্দুধর্মে বিরাট জাগরণ আনার উপযোগী বিপুল শক্তিধর এক সত্য-দ্রষ্টাকে। এই দেখাটা যে এখনও চলেছে, এবং জনসাধারণ যে এবিষয়ে সজাগ হ'য়ে উঠছে, তা বেশ বোঝা যায় মহাত্মা গান্ধীর কথায়: শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনীকে ধর্ম-সাধনার ইতিহাস বলা যায়। তাঁর জীবনী পড়লে, 'একমাত্র ভগবানই সত্য, আর সব অলীক'—এ কথায় বিশ্বাসী না হ'য়ে পারে না কেউ। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরতত্ত্বের জীবন্ত মূর্তি। তাঁহার বাণী কোন পণ্ডিতের কথামাত্র নয়, সে বাণী জীবনবেদ হ'তে উদ্ধৃত অনুভূতির বিবৃতি। কাজেই পাঠকের মনের ওপর তার প্রভাব অনিবার্য। জলন্ত জীবন্ত বিশ্বাস কাকে বলে, এই অবিশ্বাসের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ তা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। তার ফলে হাজার হাজার নরনারী আশ্বস্ত হ'ল। এটা না দেখতে পেলে আধ্যাত্মিকতার আলোকের সন্ধানই পেত না তারা।

এরূপ জীবন যে প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের মন অধিকার ক'রে সেখানে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন যাঁরা, তাঁরা পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির ভেতর তাঁদের বুদ্ধিজ সংশয়গুলির অপূর্ব সমাধান খুঁজে পেলেন। নাস্তিকতার দূষিত ভাবধারা এবং ব্রাহ্ম আস্তিকতার বিশুদ্ধ চিন্তাপ্রবাহ—এই দুয়েরই সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ)। তাঁর মতো ব্যক্তিও এই অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন অতি-মানবের কাছে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিলেন। মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁর দৃপ্ত ভাষায় বলা যায়: মহামনীষী, মহিমান্বিত ও বর্তমান ভারতের সর্ববিধ উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় যথাযথভাবে মহাগর্বিত একটি মানুষ শ্রীরাম-কৃষ্ণের চরণপ্রান্তে নিজেকে অবনত করেছিল।

এ ঘটনাটির তাৎপর্য খুব গভীর। যে-সব আধুনিক যুক্তিবাদের যথার্থ ও তীক্ষ্ণধী প্রতি-নিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তার সবগুলির ওপরই শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির প্রভাব এই ঘটনার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচণ্ড যুক্তি-নিষ্ঠ মনে এই বাস্তব সত্যটি প্রতিভাত হয়েছিল: ধর্ম-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হ'লে, সে সম্বন্ধে বিচার করতে হ'লে, প্রযোজনীয় ক্ষেত্রে তাকে নিন্দিত প্রতিপন্ন করতে হ'লে ধর্মচেতনার প্রকৃত অবস্থা আগে নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখে নিতে হবে। এইটাই হ'ল এ কাজের সর্বপ্রথম যোগ্যতা। সত্যদ্রষ্টারা নিজ অনুভূতিতে যা প্রত্যক্ষ করেন, তার বিবরণ দিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে সকলেই ঠিক সেই অনুভূতি লাভ করতে পারেন। ইচ্ছা করলেই যুক্তিবাদীরা আগে নিজ সমীক্ষা সহায়ে সত্যদ্রষ্টাদের কথার সত্যা-সত্য পরীক্ষা ক'রে দেখে নিতে পারেন। এভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখে নিলে তবে সে সব অনুভূতি সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করার বা সেগুলির মূল্য নির্ধারণ করার যোগ্য অধিকার

আসবে তাঁদের। স্বামী বিবেকানন্দের অস্থি-মজ্জায় যুক্তিপ্রবণতা প্রবল ছিল ব'লে এই পরিস্থিতিটি তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল। নিজ অনুভূতিসহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সত্যতা নিরূপণে অগ্রসর হলেন তিনি। এই গুরুতর পরীক্ষার কাজে মনেপ্রাণে ব্রতী হ'য়ে অক্লান্ত সাধনান্তে তিনি ফিরে এলেন আধ্যাত্মিকতা-দীপ্ত ও দিব্যানন্দমণ্ডিত হ'যে। নিজ অনুভূতির কষ্টিপাথরে শ্রীরামকৃষ্ণের কথার সত্যতা যাচাই করার পর তিনি বর্তমান যুগোপযোগী আদর্শ ও ভাষার মাধ্যমে জগতে সেই সুপরীক্ষিত বাণী প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বুদ্ধিজ সন্দেহ, যৌক্তিক অনুসন্ধিৎসা ও সযত্ন পরীক্ষা সহাযে যে সত্যজ্ঞানাগ্নি আহরণ করেছিলেন, তা দিয়ে আধুনিক চিন্তারণ্যের রাশীকৃত অবাঞ্ছিত জঙ্গল পুড়িয়ে ফেলে যুক্তিবাদীদের জন্য একটি বিশাল রাজপথ নির্মাণ ক'রে দিয়ে গেছেন। সে পথ হিন্দুমত ও হিন্দু আদর্শের অধ্যাত্ম-জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে তাঁর জীবন একটি আলোক-স্তম্ভের মতো দাঁড়িযে আছে—তিমিরাচ্ছন্ন আধুনিক মানুষকে পথ দেখাতে। হিন্দুধর্মের যে সব তথ্যগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী ব'লে মনে হয়, তার তাৎপর্য নির্ধারণকালে বিবেকানন্দের জীবন বর্তমান যুগের চিন্তাশীল মনীষীদের সর্ববিধ অকপট জিজ্ঞাসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংশয়গুলিরও নিরসন ক'রে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোক-সম্পাতে হিন্দুধর্মকে এভাবে সহজবোধ্য, সম্পূর্ণ যুক্তি-সম্মত ও বিশ্বাসগম্যরূপে ফুটিযে তুলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ফলে এই ধর্মটিকে তিনি এমন এক যুক্তিসম্পদের অধিকারী ক'রে দিয়ে গেছেন, বিচারের তীক্ষ্ণতম বিশ্লেষণেও অটুট থেকে যা সর্ববিধ আধুনিক সমালোচনার সম্মুখে স্বপক্ষ সমর্থন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

সেজন্য হিন্দুভারতের এই জ্ঞানোজ্জ্বল আধুনিক দেবদূতের দিব্যভাবময় জীবনের ও উচ্চাঙ্গের যুক্তিপরায়ণ কথার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এক অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমান যুগের সর্ববিধ যুক্তিবাদের তরঙ্গাঘাত প্রতিরোধ করার শক্তি নিয়ে হিন্দু-ধর্মকে ঘিরে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সে প্রভাব। এই জন্যই বর্তমান হিন্দুসমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রীরাম-কৃষ্ণকে হিন্দুধর্ম-বিশ্বাসের একজন অবিসম্বাদী পরিত্রাতা ব'লে গ্রহণ করার পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বিতীয় জীবন ও বাণী হিন্দু ভারতের প্রাচীনপন্থী ও সংস্কার-পক্ষপাতী উভয় সম্প্রদায়কেই নবজীবন ও নববলে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছে। হিন্দু-পুনর্জাগরণের এক নব-যুগের সূত্রপাত হয়েছে এভাবে। মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে খাঁটি কথাই বলেছেন : 'আমি এখানে যাঁর আবাহন করছি, তিনি ত্রিশকোটি মানুষের দু-হাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিণতি-স্বরূপ। যদিও চল্লিশ বছর হ'যে গেল তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে, তবু তাঁর আত্মা বর্তমান ভারতকে উজ্জীবিত ক'রে চলেছে আজও।'

এই পুনরুত্থানের মধ্যে হিন্দুধর্মের শক্তি-শালী ও গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে। ভারতকে দেখে এখন আর গৌরবময় মৃত অতীতের সমাধিক্ষেত্র-মাত্র ব'লে মনে হয় না। এখন তার ধমনীতে বয়ে চলেছে নবপ্রাণ ও নববিশ্বাসের উষ্ণধারা। নিজস্ব সাংস্কৃতিক আদর্শের প্লাবনে সারা জগৎ ভাসিয়ে দিতে সে এখন উদ্যত। রোমাঁ রোলাঁ যাঁকে 'বাংলার মেসায়া' বলেছেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের এবং তাঁর 'সেণ্ট পল' বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করলে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়-কালটিকে আরও ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা হবে। [প্রথম খণ্ড—ভূমিকাংশ সমাপ্ত]

সংসারের ক্ষণচরে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আমন্ত্রণ লোকে লোকে লভিতেছি চিরকাল ধরি,
কিরণ-পিয়াসী মন ছুটিতেছে আনন্দলহরী—
লয়ে বেদনার সুখে। ধ্যানধূপে বিলায়ে সুরভি
তুমি তো মরমশিখা জ্বালায়েছ,—আমার পূরবী
তোমার ভৈরবী সনে মিশিবারে কেন যে ব্যাকুল,
গোধূলি বেলার গানে কোথা ফোটে প্রভাতের ফুল!

জ্ঞান-বুদ্ধি সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মদৃষ্টি বিনা,
আমার বেদনা কোথা শুধায়ো না: তুমি কহ কিনা
বাঁধিবারে ভালবাসা সবুজ দিনের আশা ল'য়ে
পুষ্প-ঝরা পথে? তুমি কি জানো না বিড়ম্বনা স'য়ে
বস্তু-বিশ্বে সুখী হ'য়ে রহিবার যত আয়োজন,
ব্যর্থ হ'য়ে গেছে সব। দিকে দিকে ধ্বনিছে ক্রন্দন।

এই মায়াবিনী ধরা মরণের ছায়া ফেলে যায়
আচম্বিতে জীবন-উৎসবে। কার ডাকে চমকায়
বিদায়-মুহূর্তগুলি! অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা
বেপমান তন্দ্রালসে, ধীরে ধীরে হারায়ে চেতনা,
ফেলে রেখে সাধ অভিলাষ রহস্যের ইন্দ্রজালে—
উড়ে যায় প্রাণপাখী সুদূরের মৌন অন্তরালে।

স্রোতের জলের মতো যাহা যায়, তা কি আসে ফিরে?
আর কেন ঘুরে মরি তার লাগি বাসনার তীরে!
কুসুমের সম ফোটে চিত্তাকাশে স্বপন-গীতিকা,
ভ্রান্ত হৃদয়ের সাথে মিশে গেছে জীবন-বীথিকা।
সংসারের ক্ষণচরে অশ্রু কত হ'য়ে আছে জমা,
ক্লান্ত দুরাশায় তবু বিপ্রকীর্ণ নিত্য পরিক্রমা।

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব

[রায়রামানন্দ-মহাপ্রভু-সংবাদ]

শ্রীমতী সুধা সেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রেমরাজ্যের সীমানায় আসা গেল; অদূরেই সেই প্রেম-দেউল। শ্রবণ কীর্তন সাধুসঙ্গ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে করিতে হৃদয় যখন শ্রদ্ধাভক্তি-লাভের যোগ্য হইবে, তখনই সাধক এই প্রেমাভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইবেন; এবং তখনই সাধকের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফুরণ হইবে। তখন সাধক দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি নিজ ভাবানুযায়ী ভজনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিবেন এবং ব্রজে প্রবেশ করিয়া ব্রজ-পরিকরদের আনুগত্যে কৃষ্ণ-ভজন তথা কৃষ্ণ-সেবার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবেন।

প্রভু বলিলেন, 'এহো হয় আগে কহ আর,
রায় কহে, দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার॥'

উক্তির সমর্থনে রায় যামুনমুনি-বিরচিত একটি শ্লোক ও ভাগবত হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলেন :

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥

—ভাঃ ৯।৫।১৬

দুর্বাসা ঋষি অম্বরীষ মহারাজকে বলিয়াছিলেন, যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র জীব সর্বোপাধি-নির্মুক্ত হইয়া নির্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসদিগের পক্ষে কি প্রাপ্য বস্তুই বা অবশিষ্ট থাকে? বাস্তবিক জীবের পক্ষে দাস্যভক্তি হইতে অধিক সুখকর, অধিক আনন্দদায়ক বস্তু আর কি থাকিতে পারে?

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' জীব এই নিত্য-দাসত্বের আনন্দ পায় না বলিয়াই বহির্মুখী হইয়া নানা দিকে আনন্দের সন্ধানে ধাবিত হয়। কাজেই দাস্যভক্তিই জীবের কাম্য।

প্রভু বলিলেন, 'এহো হয় আগে কহ আর।' প্রভু রায়কে আরও গভীরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। দাস্যভাব জীবের স্বরূপগত ধর্ম হইলেও দাস্যেরও প্রকারভেদ আছে। দ্বারকা-মথুরা-বৈকুণ্ঠাদি ধামের যাঁহারা পরিকর, তাঁহাদের দাস্য ঐশ্বর্যজ্ঞানজনিত, সঙ্কোচ ও কিছুটা ভীতি-দ্বারা খণ্ডিত, নির্বাধ মমত্বময় দাস্য নয়। ব্রজের দাসত্বে ঐশ্বর্যজ্ঞান নাই যে, সে কিন্তু তাহাও গৌরব-বুদ্ধি ও প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধজ্ঞানে খণ্ডিত। ভৃত্যের সাধ্য নাই যে, সে প্রভুর মুখে উচ্ছিষ্ট ফল তুলিয়া দিতে পারে —সখার মতো। তাই প্রভু আরও অগ্রসর হইতে চাহিলেন। রায় বলিলেন, 'সখ্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার।' সমর্থক শ্লোক :

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

—ভাঃ ১০।১২।১১

—জ্ঞানমার্গিগণ যাঁহার নির্বিশেষ সত্তামাত্র অনুভব করেন, যাঁহার লীলায় তাঁহারা প্রবেশ

করিতে পারেন না, কর্মযোগীরাও যাঁহার আনন্দচঞ্চল লীলার কোন অনুভূতিই লাভ করিতে সক্ষম হন না, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহারা তুল্যরূপে ক্রীড়া করেন, আহা! তাঁহাদের না জানি কতই পুণ্য!

রায় রামানন্দ ব্রজের শুদ্ধ সখ্যরসের কথা তুলিলেন। ব্রজ-সখাগণের এতটুকু ঐশ্বর্য বুদ্ধি নাই, তাই নিঃসঙ্কোচে উচ্ছিষ্ট ফল তাঁহারা কৃষ্ণের মুখে তুলিয়া ধরেন, তাঁহাকে কাঁধে চড়ান, তাঁহার কাঁধে চড়েন। তাই এই সখাদের সঙ্গ কৃষ্ণের বড় মধুময় মনে হয়।

'আপনারে বড় বলে আমারে সম হীন,
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥'

প্রভু হর্ষোৎফুল্ল মুখে বলিয়া উঠিলেন, 'এহোত্তম, রায়! এতক্ষণে তুমি আমার কাছে শুদ্ধ মাধুর্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিলে। এখানে আসিয়া নীরব হইও না, আরও ভিতরে চলো।

রায় বলিলেন, 'বাৎসল্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার।'

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

ভাঃ ১০।৮।৪৬

—নন্দ মহারাজ এমন কি মহাপুণ্যজনক মঙ্গল-কার্য করিলেন, আর মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি মঙ্গল-কার্য করিয়াছিলেন যে শ্রীহরি (তাঁহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া) যশোদার স্তনপান করিলেন?

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥

ভাঃ ১০।৯।২০

মুক্তি-দাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদা লাভ করিলেন, ব্রহ্মা শিব এমন কি তাঁহার নিজের অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মীও সেই প্রসাদ লাভ করেন নাই।

কি সেই প্রসাদ—যাহার প্রভাবে সর্বকারণ বিভুতত্ত্বকে পর্যন্ত পালন শাসন তাড়ন করা যায়? পূর্ণতম শুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেম—ইহাই সেই প্রসাদ, যাহা তাঁহার জন্মদাত্রী দেবকীও লাভ করেন নাই।

প্রভুর আনন্দ-বারিধি ক্রমেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল, বলিলেন, 'রায়, কর্ণ-তৃষ্ণা মিটিতেছে না। ইহার চেয়ে আরও অন্তরের কথা শোনাও।'

রায় বলিলেন, 'কান্তা-প্রেম সর্বসাধ্যসার।'

এই স্থানে ভাগবতের দুইটি ও 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে:

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥

ভাঃ ১০।৪৭।৬০

—রাসোৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভুজলতা দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিতা হইয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে প্রসাদ কৃষ্ণের (বিষ্ণুর) বাম বক্ষঃস্থলে নিয়ত বর্তমান লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন নাই, আর অন্যান্য কামিনীগণের তো কথাই নাই।

এই কান্তাপ্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের প্রীতি, বাৎসল্যের মমতাধিক্য তো আছেই, তদুপরি আছে কায়মনপ্রাণ, জাতি-কুলমান সর্বস্ব দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবন। অন্যান্য সমস্ত প্রেম সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু এই একটি মাত্রই প্রেম—যাহা সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না—কোন সীমার বন্ধন মানে না। কান্তা-প্রেমে তথা মধুর রসেই সকল রসের পূর্ণতা। কৃষ্ণ রসস্বরূপ; যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ—কৃষ্ণেরও ততটুকুই প্রকাশ, দর্পণে প্রতিবিম্বিত বিম্বের ন্যায়।

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, কিন্তু ব্রজে তাঁহাদের পরকীয়া অভিমান। বৈধী কান্তা-প্রেম হইতে পরকীয়া প্রেমে প্রতিবন্ধক অনেক বেশী, তাই মিলনের উৎকণ্ঠাও সেখানে প্রবল, মিলনের আনন্দও অপরিসীম—'গোপন মিলন অমৃত গন্ধ-ঢালা।' শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুরে স্বজন, আর্যধর্ম, বেদধর্ম, কুলশীলমান, লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া যেদিন গোপীগণ কৃষ্ণের কাছে ছুটিয়া আসিলেন, সেদিন গীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই অস্ফুট ইঙ্গিতের উজ্জ্বল রূপায়ণ জগতের সম্মুখে প্রকটিত হইল।

গীতায় ভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন: 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'।

'কিন্তু এই প্রেমের (গোপীপ্রেমের) অনুরূপ
না পারে ভজিতে
অতএব ঋণী হয়, কহে ভাগবতে।'

বেদান্তের ভাষ্য ভাগবত, ভাগবতের রূপায়ণ শ্রীকৃষ্ণে। রাসমণ্ডলের মধ্যে যত গোপী তত কৃষ্ণ; পুরুষ আর প্রকৃতি, শক্তি ও শক্তিমান্, ব্রহ্ম আর তাঁহার সৎ চিৎ-আনন্দের লীলাবিলাস!

প্রভু অধীর আনন্দে বলিলেন, 'রায়! সাধ্যের অবধি এই পর্যন্তই, কিন্তু তোমার অক্ষয় ভাণ্ডারে আর কি কিছুই নাই? যদি আরও কিছু থাকে তবে বলো।'

রায় বিস্মিত হইলেন, ইহারও পর? কি আর আছে ইহার পরে? এই পৃথিবীতে এমন কথা আর তো কেহ কখন জিজ্ঞাসা করে নাই!

তবুও বলিলেন, 'গোপীদের মধ্যেও শ্রীমতী রাধিকা শ্রেষ্ঠা এবং তাঁহার প্রেমই 'সাধ্য শিরোমণি।' প্রমাণ-স্বরূপ ভাগবত হইতে শ্লোক তুলিয়া রায় দেখাইলেন, শারদীয় রাসমণ্ডলে শত শত গোপীর মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপনে অন্তর্ধান করিলেন, তখন একমাত্র রাধিকাই তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, কাজেই রাধিকা প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা।

প্রভু বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ শারদীয় রাসে রাধিকাকে সঙ্গিনী করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি রাধার জন্য অন্য গোপীদের ত্যাগ করেন নাই; কাজেই যেখানে গোপনতা, সেখানে শ্রেষ্ঠতা কোথায়? রাধিকার মহিমা স্বীকার করিব তখনই, যখন দেখিব রাধার জন্য কৃষ্ণ সাক্ষাতে অন্য গোপীদের ত্যাগ করেন।

জয়দেব-কবির গীতগোবিন্দ হইতে বসন্তরাস বর্ণনা করিয়া রায় রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। দেখা গেল, একমাত্র রাধিকার অন্তর্ধানেই শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীকে সাক্ষাতে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ মনে রাধিকার অন্বেষণে রাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

প্রভু বলিলেন, 'রায় তোমার কাছে আসা আমার সার্থক হইল। আর একটু কৃপা কর। কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আমাকে বল। আমি সন্ন্যাসী, কৃষ্ণ-কথা জানি না, তুমি আমাকে কৃপা কর।'

রায়ের মন বার বার বলিতেছে, না না, ইনি সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন, ইনি নিশ্চয়ই স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, কিন্তু প্রভুর প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে রায় যেন রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে গিয়াও করিতে পারিতেছেন না। তবুও বলিলেন:

'আমি নট তুমি সূত্রধার
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি যন্ত্রধারী
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥

যাহা হউক, রায় বলিলেন: ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সর্বশক্তিমান্, সর্বৈশ্বর্যময়,

সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। বেদে যাঁহাকে বলা হইয়াছে 'রসো বৈ সঃ', শ্রীকৃষ্ণই সেই রসের ঘনীভূত মূর্তি অখিলরসামৃত-বারিধি। বৃন্দাবনে তিনি অপ্রাকৃত নবীন-মদন, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ-রূপে প্রকাশিত। তাঁহার সেই ঘনীভূত রস-স্বরূপের অপরূপ মাধুর্য পতিব্রতা লক্ষ্মী, বিশ্ব-ভুবনের দেব-গন্ধর্ব স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত প্রাণীর, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিজের চিত্ত পর্যন্ত হরণ করে।

অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা ও তটস্থা—সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই তিনটি প্রধানা শক্তি; সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিত, আর আনন্দাংশে হ্লাদিনী। হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দ-দায়িনী শক্তি, যিনি কৃষ্ণকে নিজ মাধুর্য-রস আস্বাদন করান। হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের পরম সার মহাভাব; শ্রীরাধিকা মহা-ভাব-স্বরূপিণী, লাবণ্যামৃত, কারুণ্যামৃত ও তারুণ্যামৃত-ধারায় শুচিস্নাতা স্নিগ্ধ কুঙ্কুম-চন্দনে সুরভিতা পবিত্রগাত্রা কৃষ্ণময়ী শ্রীমতী রাধিকা; দেহ-মন ইন্দ্রিয়-চিত্ত কেবল কৃষ্ণ-সেবায় উন্মুখ—তদ্ভাব-ভাবিতা, তাদাত্ম্য-প্রাপ্তা।

উল্লসিত আনন্দে প্রভু বলিলেন, 'রায় কৃপা কর—দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া আমাকে অমৃতময় করিয়া তোল।'

রায় স্তম্ভিত হইলেন—নীরব হইলেন, বলিবার তো আর কিছু নাই? সহসা কি যেন মনে পড়িল, বলিলেন, 'আর আমার কিছু বলিবার সাধ্য নাই, তবে একটি প্রেমবিলাস-বিবর্তসূচক সঙ্গীত আছে, তাহা যদি শুনিতে চাও, তবে শোনাইতে পারি, জানি না ইহাতে তোমার সুখ হয় কিনা।'

তারপর গভীর রজনীর নিস্তব্ধ আকাশকে তরঙ্গায়িত করিয়া গভীর সুললিত কণ্ঠে রায় এই সঙ্গীতটি গাহিলেন;

'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
ন সো রমণ, হাম ন রমণী,
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখী সে সব প্রেম-কাহিনী
কানু ঠাম কহবি বিছুরল জানি।
ন খোঁজলু দূতী, ন খোঁজলু আন,
দুঁহুক মিলন মাঝত পাঁচবাণ॥
অব সোঈ বিরাগে তুঁহু ভেলি দূতী
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥"

প্রভু এই সঙ্গীতের মর্মকথা—'ন সো রমণ, হাম ন রমণী' শুনিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, স্বহস্তে প্রেমের সহিত রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—যেন বলিতে চাহিলেন পরম প্রেমের এই পরমতম গুহ্য তত্ত্বটি প্রকাশ করিও না, অন্তরের ধনকে বাহিরে আনিও না।

এই প্রেমবিলাস বিবর্ত-প্রেমের প্রগাঢ় পরিণতি, ইহাতে কান্ত ও কান্তার পরৈক্য হয়। কে কান্ত আর কে কান্তা, কে পুরুষ আর কে প্রকৃতি, কে আমি আর কে তুমি—এই ভেদজ্ঞান থাকে না। এইভাব একমাত্র মাদনাখ্য প্রেমেই সম্ভব।

একমাত্র শ্রীরাধিকাই মাদনাখ্য ভাবময়ী, অন্য কোন গোপীতে, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেও এই ভাব নাই। মাদনাখ্য প্রেমের অথবা প্রেমবিলাস-বিবর্তের আরও একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পরম গভীরতম মিলনের মধ্যেও ইহা বিরহের জ্ঞান জন্মায়—'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'; আবার বিরহের অতলস্পর্শী শূন্যতার মধ্যেও ইহা মিলনের গভীর আনন্দানুভূতির সঞ্চার করে।

জ্ঞানী বলিয়াছেন: 'নেতি, নেতি', ইহা নয় ইহা নয়, জগৎ মিথ্যা, সৃষ্টি মিথ্যা—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। সাধক

যখন সেই ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে উপাসক নাই, উপাস্য নাই, ধ্যান-ধ্যাতা-ধ্যেয় নাই; আমি নাই, তুমি নাই; আছে এক নিরবচ্ছিন্ন সমাধি-সত্তা, ইহাই ব্রহ্মবিহার!

আর প্রেম—তথা শ্রীমতী বলিতেছেন, 'ইতি ইতি ওগো শ্যাম! তুমি আছ তাই এই বিশ্ব আছে, তুমি সুন্দর—তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর, সুন্দর তোমার রূপ, সুন্দর তোমার বাঁশীর সুর! তুমি রস, আমি প্রেম; তোমার আশ্রয় আমি, আমার আশ্রয় তুমি।'

রস আর প্রেমের মিলন হইল—অণুতে পরমাণু গলিয়া মিশিয়া গেল, তখন 'না সো রমণ, হাম ন রমণী'—কেহ বা প্রকৃতি, কেহ বা পুরুষ?

ইহাই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ-বিহার! 'রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' লীলা-রসে জারিত উজ্জ্বলিত হইয়া বহু আকাঙ্ক্ষিত তীর্থ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন প্রভু। গভীর আলিঙ্গনে রায়কে হৃদয়ে বদ্ধ করিলেন, কিন্তু রায়ের চরম পাওয়া এখনও বাকী।

রায় রামানন্দের প্রার্থনায় কয়েকদিন বিদ্যানগরে কৃষ্ণ-কথায় কাটাইয়া এবারে প্রভু বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিদায়ের পূর্ব-সন্ধ্যা; যথানিয়মিত আসিলেন রায়। দশদিন যাবৎ যে সন্দেহ মনের কোনায় উঁকি দিতেছিল, আজ তাহা প্রকট হইয়া উঠিল। রায় বিস্মিত হইয়া প্রভুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'প্রভু, যাওয়ার আগে আমার সন্দেহের নিরসন করিয়া যাও। তোমাকে প্রথমে দেখিলাম সন্ন্যাসী-রূপে, এখন দেখি তোমার শ্যাম গোপরূপ, তোমার হাতে বাঁশী, চঞ্চল তোমার নয়ন! আর তোমার সম্মুখে এক কাঞ্চন-প্রতিমা দেখিতেছি, তাঁহার গৌর কান্তিতে তোমার সর্ব অঙ্গ যেন আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে।'

প্রভু বলিলেন, 'রায়! তুমি মহাপ্রেমিক, তাই সর্বত্রই তোমার ইষ্টদর্শন হয়।'

রায় বলিলেন, 'প্রভু, আমার চিত্ত শোধন করিতেই যদি কৃপা করিয়া আসিয়াছ, তবে—

'এবে কপট কর, ইহা কোন্ ব্যবহার?'

'তুমি ছাড ভারি ভুরি,
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি।'

তখন প্রভু হাসিলেন, রসিকোত্তম পরমভক্ত রামানন্দের কাছে আর স্বরূপ লুকাইতে পারিলেন না;

'তবে প্রভু হাসি তাঁরে দেখাইলা স্বরূপ,
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।'

রায় এই অপূর্ব রূপ দর্শনে আনন্দে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

রায় রাধাকৃষ্ণ-যুগলভাবের উপাসক, ব্রজ-লীলার বিশাখা সখী, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীলা দর্শন করিয়াছেন, আজও ধ্যানে সমস্ত লীলাই তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত হয়, কিন্তু আজ তিনি কি দর্শন করিলেন, যাহার আনন্দের গভীরতায় একেবারে নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন?

রায় সুদক্ষ পথিকৃৎ; তিনি মাদনাখ্য মহা-ভাবের দেউলে প্রভুকে লইয়া আসিলেন, কিন্তু জানিতেন না সে মন্দিরে আজ কোন্ রূপ দর্শন করিবেন! সম্মুখে চাহিয়া দেখেন—রাধা নাই, কৃষ্ণ নাই, কান্ত নাই, কান্তা নাই, আছে শুধু একীভূত, দ্রবীভূত প্রেম আর রস, একের অণুতে পরমাণুতে অপরটি মিশ্রিত, জারিত। বস্তু ও ধর্ম—সৎ ও সত্তা—শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছিন্ন, অভেদ—অখণ্ডিত।

আবার চাহিয়া দেখেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধারস-জারিত-তনুমন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

রাজনারায়ণ বসু ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে রাজনারায়ণ মোটামুটি বারোটি সূত্র আলোচনা করেছেন।

(১) "হিন্দুধর্মের নাম কোন ব্যক্তিবিশেষের নামমূলক নাম নহে।...ইহা দ্বারা হিন্দুধর্মের প্রশস্ততা প্রমাণীকৃত হইতেছে, ধর্ম সনাতন পদার্থ, তাহার নাম কোন ব্যক্তির নামে হওয়া উচিত নহে।"

(২) "হিন্দুধর্ম ব্রহ্মের অবতার স্বীকার করে না। হিন্দুধর্মে বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার বহুল অবতারের কথা কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা এমন বলে না যে, অনাদ্যনন্ত নির্বিকার পরব্রহ্ম কোন মানবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।"

(৩) "হিন্দুধর্ম কোন মধ্যবর্তী অর্থাৎ পেয়গম্বর স্বীকার করে না। খ্রীষ্টানেরা যেমন প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে 'Through Jesus Christ, our Lord and Saviour—প্রভু ও পরিত্রাতা যীশু দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর' বলে, হিন্দুরা সে প্রকার বলেন না।... আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা কেবল ব্রহ্মজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন; মুক্তিলাভ জন্য কোন মধ্যবর্তীর উপাসনা আবশ্যক করে না।"

(৪) "আর একটি বিষয়ে হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা এই—ঈশ্বরকে হৃদয়-স্থিত জানিয়া উপাসনা করিবার উপদেশ আছে। কি বাইবেল, কি কোরান, আর কোন ধর্মশাস্ত্রে কোথাও এরূপ উপদেশ পাওয়া যায় না,—এইটি হিন্দুধর্মের প্রধান গৌরবস্থল।"

(৫) "হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে, ইহাতে ঈশ্বরের সহিত যোগের উপদেশ আছে, যোগের বিষয় হিন্দুশাস্ত্রে যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারিত, নিয়মিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এমন আর কোন জাতির ধর্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না।"

(৬) "হিন্দুধর্মের আর একটি চমৎকার গুণ এই যে, তাহাতে নিষ্কাম উপাসনার বিধি আছে; হিন্দুধর্মে সকাম, নিষ্কাম—দুই প্রকার উপাসনারই বিধি আছে; কিন্তু অন্যান্য ধর্মে আদোবে নিষ্কাম উপাসনার কথা নাই।"

(৭) "হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা আর এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই যে, উহাতে সর্বভূতের প্রতি দয়া করিবার উপদেশ আছে, বাইবেল ও কোরানে কেবল মনুষ্যের প্রতি দয়া করিতে উপদেশ দেয়,—হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, সর্বভূতের হিতসাধন করিবে।"

(৮) "পরকাল-সম্বন্ধীয় মতে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ প্রকাশিত আছে, যোনিভ্রমণ অর্থাৎ পাপী মনুষ্য মৃত্যুর পর পশু-যোনিতে অথবা কীট-যোনিতে অথবা মনুষ্য-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, এই মত পরকাল-বিষয়ক, হিন্দুধর্মমতের নিকৃষ্ট অংশ; কিন্তু দেখ, ইহাতেও হিন্দুধর্মের কেমন শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের কথা আছে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি অনন্তকাল স্বর্গ ভোগ করিবে, পাপী ব্যক্তি অনন্তকাল নরকে পতিত থাকিবে, ইহাতে পাপী মনুষ্যের আর পরিত্রাণের আশা

থাকে না, কিন্তু হিন্দুধর্ম এই আশা প্রদান করিতেছেন যে—যোনিভ্রমণ দ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় উন্নতির পথে সংস্থাপিত হইবে,···এই প্রকার ক্রমশঃ উন্নতি স্বভাবের উন্নতিশীলতার সহিত সুসঙ্গত।"

(৯) "হিন্দুধর্মের ঔদার্যধর্ম সর্বধর্মাপেক্ষা অধিক। খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বীরা বলে যে, আমার এই ধর্মটি না মানিলে তুমি অনন্ত নরকে পড়িবে। হিন্দুধর্মের তেমন ভাব নয়। হিন্দুধর্মের মুখ্য উপদেশ এই যে, যাহার যে ধর্ম সে ব্যক্তি সেই ধর্ম সর্বপ্রকার পালন করিলেই উদ্ধার হইবে।···যাহারা পুত্তলিকার পূজা করে, তাহারা ব্রহ্মকে না জানিয়াই পুত্তলিকাকে ব্রহ্মের স্থানীয় করিয়া পূজা করে, নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল।"

(১০) "হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে, এই ধর্মে জীবনের প্রত্যেক কার্যে ঈশ্বরের স্মরণ করিবার বিধান দেখা যায়।"

(১১) "অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে, হিন্দুদিগের সকল কার্য ধর্মের অনুশাসনানুসারে সম্পাদিত হয়। অন্যান্য সভ্য দেশে যেমন সাত্ত্বিক ও বৈষয়িক দুই প্রকার শাস্ত্রবিভাগ আছে, হিন্দুদিগের মধ্যে সেরূপ নাই; হিন্দুধর্ম শরীর, মন, আত্মা সমাজ কাহাকেও অবজ্ঞা না করাতে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রকৃত সভ্যতা অর্থাৎ ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল।"

(১২) "অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম অতিশয় প্রাচীন, মনুষ্যের পুরাবৃত্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতে এই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন, বৌদ্ধধর্ম ইহার বিদ্রোহী সন্তান; ইহার তুলনায় মহম্মদীয় ধর্ম ত সেদিনের;···নর্মদা-তীরস্থ 'কবীর-বটে'র সহিত হিন্দুধর্মের তুলনা হইতে পারে, ঐ বট-বৃক্ষ কত প্রাচীন, উহার এক এক শাখা অপর এক এক বৃহৎ বৃক্ষ হইয়াছে, অত্যন্ত প্রাচীন হইলে যেমন লোকে দুর্বল ও বুদ্ধিহীন হয়, হিন্দুধর্ম সেরূপ নহে, উহার স্বীয় নবযৌবন সম্পাদনের ক্ষমতা আছে, উহার আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে। লোক-সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহা বুদ্ধিবৃত্তি-চরিতার্থকারী নূতন আকার ধারণ করিতে পারে। এই আভ্যন্তরিক সারবত্তা জন্য উহাকে অন্যধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।"

* * *

এই ভাবে সাধারণ আলোচনা শেষ ক'রে রাজনারায়ণ—"হিন্দুধর্মের সারধর্ম ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা, যাহা জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া আখ্যাত, তাহার শ্রেষ্ঠতা" প্রতিপাদন করেছেন। 'জ্ঞান-কাণ্ডের লক্ষ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা, ব্রহ্মের উপাসনা ঈশ্বর-ধারণে সমর্থ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে।···জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের বিষয়ে যেরূপ উপদেশ আছে, তাহার তুল্য উপদেশ অন্য কোন জাতির ধর্মগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না. বাইবেল ও কোরানে এইরূপ উপদেশ আছে যে, ঈশ্বর জগতের কোন বিশেষ স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে বিশেষরূপে প্রকাশমান আছেন, কিন্তু হিন্দুদিগের জ্ঞানশাস্ত্রে বলে যে, তিনি 'বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং' (তিনি সর্বত্র সূক্ষ্মরূপে বিরাজমান)।"

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এই শ্রেষ্ঠত্ববোধের পেছনে আদি ব্রাহ্মসমাজের স্বদেশানুরাগ এবং বিশেষ ভাবে রাজনারায়ণের জাতীয় গৌরববোধ কাজ করেছে। তাই 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতার শেষাংশে সমকালীন জাতীয় আন্দোলনের ভাবাবেগ প্রকাশিত:

"ক্রীতদাসের ন্যায় অন্য জাতির অনুকরণ

করিলে আভ্যন্তরিক বীর্যের হানি হয় এবং কোন মতেই স্বীয় মহত্ত্ব সাধন হইতে পারে না; ···আমরা নিউজিল্যাণ্ডবাসী নহি যে, একদিনেই হেট্ কোট্ পরিয়া সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব, ইহা ক্রীতদাসের কার্য, আমরা কখনই এরূপ ক্রীতদাস নহি, আমাদের আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে, হিন্দু জাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে, তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে, হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা-আপনি উন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিদের সমকক্ষ হইবে, ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা, সে সভ্যতা এখনো পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয় নাই; আবার আশা হইতেছে যে, হিন্দুজাতি পুনরায় প্রাচীন কালের ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতা, এমনকি, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতা লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইবে, আমরা ত রাজ্য বিষয়ে স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার কি—সামাজিক রীতিনীতি বিষয়েও স্বাধীনতা হারাইতে হইবে?* মহাকবি হোমর বলিয়াছেন, 'যখনই মনুষ্য পরাধীন হয়, তখনই সে অর্ধেক পুরুষত্ব হারায়।' যদি আমরা এইরূপে সর্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া পড়ি, আর কি আমাদের উঠিবার শক্তি থাকিবে? পরাধীনতাতে মনের কি বীর্য থাকে? মনের যদি বীর্য গেল, তবে উন্নতিলাভ কি প্রকারে হইবে? ···আমার ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে একস্থানে বলিয়াছেন:

Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible lock; methinks I see as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day beam.

আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর কুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে, হিন্দুজাতির কীর্তি, হিন্দুজাতির গরিমা, পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।"

রাজনারায়ণের পরবর্তী কালের বক্তৃতা 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'য় এই মনোভাবেরই উদ্দীপনায় সাকার- ও নিরাকারবাদী হিন্দুদের সম্মেলনে একটি 'মহাহিন্দু সমিতি'র পরিকল্পনা দেখা দিয়েছে। রাজনারায়ণের জাতীয়তাবাদ অনেক পরিমাণে হিন্দু চিন্তাধারার দ্বারাই প্রভাবিত হলেও সে জাতীয়বাদ সাম্প্রদায়িক নয়। কারণ, অন্য কোন সম্প্রদায়কে অনুন্নত রেখে নিজের সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনা তিনি করেননি।

রামমোহন যেমন একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে সব ধর্মমতের মৌলিকত্বে উপনীত হ'তে চেয়েছিলেন, রাজনারায়ণও তেমনি—Hindu Theists' Brotherly Gift to English

* কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মবিবাহ আইন সম্বন্ধে মনোভাবের উত্তর

Theists নামে একটি বই ছাপিয়েছিলেন, রাজনারায়ণ নিজেকে বরাবর Hindu Theist বলেই মনে করতেন। হিন্দুর নিজস্ব ঐতিহ্যের গৌরব-বোধে ধর্ম-সাধনার যে বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতাকে তিনি কতখানি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, এ সম্বন্ধে তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতাটিই প্রমাণ।

প্রতিমাপূজা ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে তাঁর মতামত সর্বাংশে গ্রহণীয়। বিশেষভাবে, সন্ন্যাস-ভীতির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যথার্থ সন্ন্যাস যে গৃহে থেকেও হ'তে পারে একথা ঠিক, কিন্তু 'চিহ্নধারী সন্ন্যাস' যদি বনে না গিয়ে তপস্যাক্ষেত্র রচনা করেন, তাতেও আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। সকলকেই গৃহ-জীবনের ছাঁচে ঢালতে হবে, এমন কোন কথা নেই। রাজনারায়ণের বক্তৃতায় যুক্তির সারবত্তাই বেশী। বস্তুতঃ এই বক্তৃতাটিই পরবর্তী হিন্দুয়ানির পুনরাবির্ভাবের সূচনা। "যে-কালে এদেশের ইংরাজী-নবীশেরা হিন্দুধর্মকে ভ্রম ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া ঘৃণা করিতেন, নূতন কৃতবিদ্য সমাজে হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই উপেক্ষার বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে একজন ইংরাজী-নবীশের পক্ষে একদিকে প্রচলিত হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপাদি প্রকাশ্য-ভাবে বর্জন করিয়াও অন্যদিকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করাতে কতটা সৎসাহস এবং স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।"[১]

ডিরোজিও-শিষ্যেরা যুক্তিবাদী চিন্তাপ্রবাহ এনেছিলেন, রাজনারায়ণ তার সঙ্গে যোগ করলেন স্বজাতিগৌরব। তাই তাঁর 'Grand-father of Nationalism' নামকরণটি সুসার্থক।[২] সমাজ-সংস্কারের দিক থেকে রাজনারায়ণ জাতিভেদের অবসানের পক্ষপাতী না হলেও বিধবা-বিবাহের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাঁর আপন এক ভাই ও জ্যেঠতুতো এক ভাইয়ের বিধবা-বিবাহ তাঁরই উদ্যোগে হয়। শেষ পর্যন্ত রাজনারায়ণের জীবনে হিন্দু-সংস্কার ও ব্রাহ্মসংস্কার মুক্তির দ্বন্দ্ব পুরোপুরি মেটেনি।

জাতীয় গৌরবের পুনরুদ্ধার-কল্পনায় লেখা রাজনারায়ণের 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (The old man's hope) প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তখনকার Indian Mirror (১৮৮৯—৪ঠা আগস্ট) পত্রিকার মন্তব্য স্মরণীয় : Patriotism of the highest type pervades every syllable of old man's thought and utterances.[৩] জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে 'হিন্দুমেলা'র পরিকল্পনা ও 'মহাহিন্দু সমিতি'র প্রস্তাব—দুইটি স্মরণীয় পদক্ষেপ। হিন্দুমেলার পরি-কল্পনায় নবগোপাল মিত্র রাজনারায়ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত। রাজনারায়ণের আর একটি কীর্তি 'জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী' বা 'গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'—এ সভার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার দ্বারা মনোভাব প্রকাশের যে চেষ্টা দেখি, পরবর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যে তারই সার্থকতার পরিচয়। এই সভার কার্যবিবরণের ভিত্তিতে রচিত 'Prospectus of a Society for the Promotion of National feeling among the Educated Natives of Bengal' —১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নবগোপাল মিত্রের National Paperএ মুদ্রিত হয়। এই লেখাটিই 'হিন্দু-মেলা'র পরিকল্পনা জুগিয়েছে।

আত্মজীবনীতে রাজনারায়ণ অনুরোধ

১ নবযুগের বাংলা—পৃঃ ১৩৪ (বিপিনচন্দ্র পাল)

২ আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু

৩ তদেব

করেছেন, যেন তাঁর সমাধি-মন্দিরে এ-কয়টি কথা লেখা থাকে: "প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম-প্রচারের একমাত্র উপায়"; "স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যাদ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম হইতে নিস্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃতপান ও যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতিসমূহের মধ্যে গণ্য জাতি হইবে, এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণকরত সেই ব্যক্তি আনন্দিত থাকেন।"[৪] রাজনারায়ণের চারিত্র পরিচয় এবং জীবনের সার সত্য ওই কয়টি ছত্রে সুন্দর ফুটেছে।

ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারায় ভক্তি বা অনুরাগের ভাবটি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে সূচিত হয়েছিল। রাজনারায়ণের চিন্তাধারায় সে ভাবের বিকাশ।

বস্তুতঃ রাজনারায়ণ ছিলেন প্রীতিযোগেরই সাধক। সে প্রীতি যেমন অনন্ত ঈশ্বরের অভিমুখী, তেমনি সর্বশ্রেণীর ও মতের মানুষদের প্রতি প্রসারিত। বৃদ্ধবয়সে তিনি বৈদ্যনাথধাম দেওঘরে বাস করতেন। দেওঘরের অধিবাসীরা এই পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। একবার শিবনাথ শাস্ত্রী দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুকে দেখতে যাচ্ছিলেন। "...মধুপুরে গাড়ি থামিলে বৈদ্যনাথের পাণ্ডারা উপস্থিত—'মশাই কি বৈদ্যনাথ যাবেন?' উত্তর—'হাঁ যাব'। পাণ্ডা হাসিয়া বলিল—'ও তো আমাদের দোসরা বৈদ্যনাথ।"[৫] শ্রদ্ধাপ্রকাশের এই অপূর্ব ভঙ্গীতে রাজনারায়ণ-চরিত্রের ভক্তি, সরলতা ও উদার মহিমা এক কথায় প্রকাশিত।

রাজনারায়ণের মনীষাপ্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর দানের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। রাজনারায়ণকে লেখা মধুসূদনের পত্রাবলী রাজনারায়ণের সমুন্নত সাহিত্যরুচির প্রমাণ। 'মেঘনাদবধকাব্য' প্রতি পদক্ষেপে রাজনারায়ণের সুচিন্তিত সমালোচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।[৬] সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যমুখী বাঙালী মন ও বাংলা সাহিত্যকে নিজস্ব সংস্কৃতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনারায়ণের আন্তরিক প্রচেষ্টাও স্মরণীয়। উদাহরণস্বরূপ রাজনারায়ণের একটি বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য: "...সামান্যত দেখ, ইউরোপখণ্ডে যে পর্যন্ত লাটিন ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফূর্তি হয় নাই, ও উত্তম উত্তম গ্রন্থ সকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎখণ্ডের লোক সেই কালের 'অন্ধকাল' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন, পোর্টুগেল ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন স্ব স্ব দেশ-ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইউরোপখণ্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ...আমাদিগের দেশ-ভাষা যে এমত সুললিত হইবে, ইহা সম্যক্ সম্ভব; কারণ তাহার বর্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্বার্থপ্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই। 'More perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more

৪ তদেব

৫ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

৬ বিবিধ প্রবন্ধ (১ম): রাজনারায়ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র সমালোচনা

exquisitely refined than either.' —Sir W. Jones' Works.'[৭]

ইংরেজী শিক্ষাসম্বন্ধে রাজনারায়ণের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী আজও আমাদের স্মরণীয় : "ইংরাজী শিক্ষাদ্বারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল এখনো ফলে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন ইংরাজদিগের ন্যায় আমরা শারীরিক বল লাভ করিব, সাহসী হইব, অধ্যবসায়শীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইব এবং স্বাধীনতাপ্রিয় হইব।" 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য'-বিষয়ক বক্তৃতায় রাজনারায়ণ মনে করিয়ে দিয়েছেন, "জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।"[৮] রাজনারায়ণের 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪) 'বিবিধপ্রবন্ধ' (১ম খণ্ড—১৮৮২), এবং 'আত্মচরিত' (প্রকাশ —১৮৬৯) বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর রচনাবলীতে ধর্মানুরাগ ও স্বদেশপ্রেম ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। রাজনারায়ণের ভাষাশৈলীতে এমন একটি ওজস্বী অথচ প্রাঞ্জল সৌন্দর্য রয়েছে, যার জন্য তাঁর গদ্যের অমসৃণতা ততটা ধরা পড়ে না। মাঝে মাঝে স্বভাবসুলভ হাস্যরসের প্রবণতা এসে তাঁর রচনাকে অম্লমধুর ক'রে তুলেছে। যেমন :

"দার্শনিকেরা ঈশ্বরের এঁচোড়ে-পাকা ছেলে ; তত্ত্বসকল যতদূর মানবীয় অবস্থাতে জানা যাইতে পারে, তাঁহারা তাহা অপেক্ষা জানিতে চেষ্টা করেন। পারলৌকিক অবস্থাতে তাঁহাদের কত ভ্রম দূর হইবে ও সত্যের আলোক কত প্রকাশিত হইবে, বলা যায় না। একটু বিলম্ব কর, এত অধৈর্য কেন ?"

"ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রত্যাশা করেন যে, লোকে তাঁহাকে মাথায় করিয়া সমস্ত দিনরাত্রি নাচিবে ; কিন্তু এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়, যেহেতু তাঁহাদিগের অন্যান্য অনেক কাজ আছে।"[৯]

উনিশ শতকের যে কয়জন মনীষী পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রবল বন্যার সামনে দাঁড়িয়ে স্বদেশ ও স্বজাতিকে আত্মস্থ করার পুণ্যব্রত গ্রহণ করেছিলেন, রাজনারায়ণ বসু তাঁদেরই অন্যতম। বিশ শতকের বাঙালীর কাছেও রাজনারায়ণের চিন্তাধারার যুগোপযোগী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, —একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

৭ দ্রষ্টব্য—রাজনারায়ণ বসু : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা ভাষার অনুশীলন সম্পর্কে বক্তৃতা

৮ হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৮৭৬) : অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

৯ তাম্বুলোপহার (১৮৮৬)

কালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাস্মৃতি

শ্রীদুর্গাপদ তরফদার

পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার নাম সাধক-সমাজে সুপরিচিত। 'মন্দিরময়' কালনা বাংলার নবজাগরণের অনেক মধুর স্মৃতি আজও বক্ষে ধারণ করিয়া শত বিভ্রান্তির মধ্যেও আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। নানাস্মৃতি-বিজড়িত কালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার স্মৃতি অনুধ্যান করিবার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধ।

কালনা প্রধানতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থল-রূপে বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত হইলেও কালনায় শক্তিসাধনার প্রভাবও যথেষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। কালনার গঙ্গাতীরবর্তী স্থান—বিশেষতঃ যে স্থানে মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন এবং যে স্থানে তিনি নিমের দন্তকাষ্ঠ মাটিতে পুঁতিয়া দিযাছিলেন, তাহা বর্তমানে সকলেরই দর্শনীয় তীর্থস্থল। কথিত আছে, ঐ দন্তকাষ্ঠটি হইতে একটি নিমবৃক্ষ উদ্গত হইয়া অদ্যাপি বর্তমান আছে। মহাপ্রভু যে স্থানে গঙ্গার তীরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাকে 'মহাপ্রভু পাড়া' বলা হয়। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রিত বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি ভগবানদাস বাবাজী এখানে আশ্রম স্থাপন করিযা সাধন-ভজনসহ বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে বৈষ্ণব-সমাজের নিকট কালনা একটি প্রধান তীর্থ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শ্রীভগবান এমন একটি লীলার অভিনয় এই স্থানে করিলেন, যাহা কালনাকে শুধু বৈষ্ণব-সমাজেরই নহে, সমগ্র ঈশ্বরপ্রেমী নরনারীর নিকট তীর্থস্থলে পরিণত করিয়াছে। আমরা সেই ঘটনার স্মৃতিই পাঠক-সমাজের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

তাহার পূর্বে মন্দিরময় কালনার কিঞ্চিৎ বিবরণ জানা থাকিলে এই গৌরবময় নগরীর কথা আরও মধুর লাগিবে। ক্ষুদ্র শহর কালনা হাওড়া-নবদ্বীপ বেলপথে অবস্থিত। এখানে একটি পৌরসভাও আছে। কিন্তু কালনার উপর বর্ধমান রাজবংশের প্রভাব, বিশেষতঃ উক্ত রাজবংশের সাংস্কৃতিক প্রভাব সুবিস্তৃত। বর্ধমানরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শত শিবের মন্দির নগরীর ধর্মভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ধমানাধিপতি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরামসীতার মন্দিরও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এতদ্ব্যতীত ২০০ বৎসরের প্রাচীন একটি বিষ্ণুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। বর্তমানে উহা বর্ধমান-মহারাজাধিরাজের নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া জনৈক সাধু উহার সংস্কার সাধনে ব্রতী হইয়াছেন।

বৈষ্ণবপ্রধান কালনায় শক্তির প্রভাবও কিছু কম নয়। বস্তুতঃ কালনার অপর নাম নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালী অম্বিকাদেবীর নামানুসারে 'অম্বিকা-কালনা' রূপে খ্যাত। মায়ের এই মূর্তি একটি কাষ্ঠখণ্ড হইতে প্রস্তুত। এই জাগ্রতা দেবীর পূজা যোগ্য অধিকারী ভিন্ন অন্য কেহ করিতে সাহসী হন না। দারুময়ী শ্রীশ্রীকালীমাতার এই বিশাল মূর্তি হঠাৎ দর্শনে ভীতির সঞ্চার হইলেও সাধক ও ভক্তের নিকট দেবীর বরাভয়-ভাব

প্রকট হইতে বিলম্ব হয় না। কালনার অপর বৈশিষ্ট্য শ্রীমহিষমর্দিনীর পূজা। বস্তুতঃ প্রতি বৎসর শ্রাবণের শুক্লপক্ষে দেবী মহিষমর্দিনীর চারিদিবসব্যাপী পূজা ও উৎসবকে কালনার অন্যতম জাতীয় উৎসব বলিলে ভুল করা হইবে না। এই পূজাকে কেন্দ্র করিয়া ষষ্ঠী তিথি হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত দেবীর পূজার সহিত মেলা ও প্রদর্শনীর যে বিরাট আয়োজন হয়, তাহা সমস্ত কালনাবাসীকে মাতাইয়া তোলে। বস্তুতঃ কালনায় গেলে ভক্ত নরনারীর নিকট এই তীর্থের পবিত্রভাব মনকে দোলা দিবেই। বাংলার দুইটি বিশিষ্ট সাধনার ধারা—বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনা—পাশাপাশি থাকিয়া 'যত মত তত পথে'রই জয় ঘোষণা করিতেছে।

এ হেন পীঠস্থানে ৯০ বৎসর পূর্বে—১২৭৭ সালে ভাগিনেয় শ্রীমান্ হৃদয়ের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি সিদ্ধবাবা শ্রীভগবানদাস বাবাজীর দর্শনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই মিলনের স্থল হইল বাবাজীর আশ্রম—যাহা 'শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্ম' আশ্রম-রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্ম আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদার্পণের কাহিনী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে (গুরুভাব উত্তরার্ধ) তৃতীয় অধ্যায়ে অতি মধুররূপে বর্ণিত আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতেও ইহার উল্লেখ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না।

এই মিলনের মূলসূত্র হইল, কলিকাতার কলুটোলা হরিসভায় শ্রীভাগবতপাঠ শ্রবণ-মানসে ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গমন; ভাগবতের অমৃতোপম কথা শুনিতে শুনিতে হরিনাম-কীর্তনে আত্মহারা হইয়া সভাস্থলে রক্ষিত শ্রীচৈতন্যের আসনে 'সহসা ছুটিয়া যাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া [তিনি] এমন গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন যে, তাঁহাতে আর কিছুমাত্র প্রাণসঞ্চার লক্ষিত হইল না। কিন্তু তাহার জ্যোতির্ময় মুখের সেই অদৃষ্টপূর্ব প্রেমপূর্ণ হাসি এবং চৈতন্যদেবের মূর্তি সকলে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার উর্ধ্বোত্তোলিত হস্তে অঙ্গুলিনির্দেশ দেখিয়া ভক্তেরা প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর ভাবমুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সহিত একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন।'

উক্ত বিবরণ শ্রবণান্তে ভগবানদাস বাবাজী তদীয় ইষ্টদেবতার আসনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাবিষ্ট হইবার ঘটনাটির মর্মার্থ হয়তো তখন ঈশ্বরেচ্ছাতেই গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন। শুধু তাহাই নহে, শোনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কটুবাক্যাদিও প্রয়োগ করিয়া—যাহাতে ঐরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না হয়—সভার উদ্যোক্তাদের প্রতি সেইরূপ নির্দেশ দেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ও হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বাংলা ১২৭৭ সনের কোন এক দিবসে কালনায় আসিয়া উপস্থিত হইলে যে মধুর নাটকীয় পরিস্থিতির পরিণতি হয়, তাহা ভক্ত ও ভাবুক চিত্তকেই যে শুধু উদ্বুদ্ধ করিবে তাহা নহে, জগতের সম্মুখে লীলাচ্ছলে উহা এই শিক্ষাই জীবন্ত করিয়া রাখিয়া যায় যে, অহংভাবের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না হইলে সাধন-ভজনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই সকল সাধনের মূল লক্ষ্য, উহার প্রধান অন্তরায় 'অহং'। শ্রীশ্রীঠাকুর 'মহাতমোবিনাশন' লীলাচ্ছলে এই সত্যকে আবার প্রকট করিলেন। বৈষ্ণব-প্রধান ভগবানদাস উপলক্ষ্য মাত্র। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' এই কথাই বলিয়াছেন:

বৈষ্ণব-দলের নেতা ভগবান দাস
তাহার খালাসে পায় অপরে খালাস।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ : শ্রীশ্রীঠাকুর যখন এই আশ্রমে উপস্থিত হন, তখন জনৈক বৈষ্ণব সাধুর অন্যায় কার্যের বিচার চলিতেছিল। ভগবানদাস বাবাজী সাধুর ঐরূপ বিসদৃশ কার্যে বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহার কণ্ঠী (মালা) কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবেন, ইত্যাদি বলিয়া শাসন করিতেছিলেন। এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। বাবাজীর সহিত পরিচযাদির পর কথাপ্রসঙ্গে হৃদয় বলিলেন, 'আপনি এখনও মালা রাখিয়াছেন কেন? আপনি সিদ্ধ হইয়াছেন, আপনার উহা এখন আর রাখিবার প্রয়োজন তো নাই?'

বাবাজী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও লোকশিক্ষার জন্য ও-সকল রাখা নিতান্ত প্রযোজন। নতুবা আমার দেখাদেখি লোকে ঐরূপ করিয়া ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ'কার বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর চিরকাল জগন্মাতাব উপর সকল বিষয়ে বালকের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আসায়, অপর কেহ অহঙ্কারের বশে নিজে কোন কাজ করিতেছে শুনিলে তাঁহার মনে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। ভগবানদাস বাবাজী সিদ্ধ হইলেও মন হইতে অহঙ্কারের পূর্ণ বিলোপসাধন করিতে পারেন নাই— শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাহা প্রতিভাত হইবামাত্র তিনি দেখিলেন, বাবাজী একজন ভক্তকে ভুলের জন্য শাস্তি দিবার কথা বলিতেছেন, 'আমি তাড়াইয়া দিব, আমি লোকশিক্ষা দিব, তাই আমি মালা-তিলকাদি ত্যাগ করি নাই— ইত্যাদি।' সরলস্বভাব ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় হঠাৎ দাঁড়াইয়া বাবাজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'কি? তুমি এখনও এত অহঙ্কার রাখ? তুমি লোকশিক্ষা দিবে? তুমি তাড়াইবে? তুমি ত্যাগ ও গ্রহণ করিবে? তুমি লোকশিক্ষা দিবার কে? যাঁহার জগৎ তিনি না শিখাইলে তুমি শিক্ষা দিবার কে?'— ভগবানদাস বাবাজীর প্রতি এই বাক্যবাণ-প্রয়োগ এক লীলাভিনয মাত্র। উহা জগন্মাতারই ইচ্ছা। এই ঘটনাব ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে বলা হইয়াছে :

ভাগ্যবান্ ভগবান আশ্রমে যাঁহার
নিজে গিয়া করিলেন চৈতন্য সঞ্চার ॥
মহাবীর ধনুর্ধারী ধনু লয়ে করে
মূর্তিমান মন্ত্র পড়ি বাণ যদি ছাড়ে ॥
দূর-ভেদ্য লক্ষ্য এত বাণ মানে তার
শ্রীপ্রভুর বাক্যবাণে হয় ছারখার ॥
প্রভু-বাক্যে কি শকতি কার সাধ্য বলে।
বিষম মায়ার গড় ভেদ করি চলে ॥
সার্থক জীবন যেবা খাইয়াছে বাণ।
অব্যর্থ প্রভুর লক্ষ্য যেথায় সন্ধান ॥
বাবাজীর অভিমানে লক্ষ্য গুরুতর।
অগ্নিবাণ ছাড়িলেন দয়ার সাগর ॥
ভস্মীভূত অভিমান তম আর নাই।
চৈতন্য-দিনেশ সমুদিত তার ঠাঁই ॥
আঁখি করি উন্মীলন প্রভুপানে চায়।
স্বরূপ-দর্শনে পদে বাবাজী লোটায় ॥

এই লীলাভিনয়ের মাধ্যমে বাবাজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের এক অপরূপ শক্তিব পরিচয় পাইলেন। তাঁহার মনে প্রতিহিংসার উদয় তো হইলই না, বরং সাধনার রসে দ্রবীভূত মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য প্রতিভাত হইলে উভয়ে উভয়ের প্রতি আরও আকৃষ্ট হইলেন। 'নাম-ব্রহ্ম' আশ্রমে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অহংকৃত মানব-সমাজের জন্য ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের আবার এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার উহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন : 'জগতে

ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় কর্তা নাই। অহংকৃত মানব যতই কেন ভাবুক না, সে সকল কার্য করিতেছে, বাস্তবিক কিন্তু সে অবস্থার দাসমাত্র; যতটুকু অধিকার তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, ততটুকুমাত্রই সে বুঝিতে ও করিতে পারে। সংসারী মানব যাহা করে করুক, ভক্ত সাধকের তিলেকের জন্য ঐ কথা বিস্মৃত হইয়া থাকা উচিত নহে।'

* * *

কিছুদিন পূর্বে কালনা-দর্শনে যাইয়া অন্যান্য স্থান দর্শনান্তে 'শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্ম' আশ্রমে যাইয়া যে তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, ভক্তমণ্ডলীর অবগতির জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

বর্তমানে আশ্রমে শ্রীভগবানদাস বাবাজীর সমাধি তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত। বার্ধক্যে অবিরাম নাম জপ করিতে করিতে তিনি ১২৯০ সালে দেহত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ শেষ বয়সে তিনি সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতেন, তাই সাধারণের মুখে মুখে তাঁহার অপর নাম 'কাঁথারাম্‌দাস বাবাজী'-রূপেও প্রচারিত হইয়াছে। বর্তমানে তাঁহার সমাধিটিও তাঁহার ব্যবহৃত কাঁথাদ্বারা আবৃত। ভক্তবৃন্দের নিকট উহা পরম পবিত্র স্থল। আশ্রমটির বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে মনে হইল, উহার সংস্কার একান্ত আবশ্যক। পুরাতন বাড়িটির সংস্কার অনেক দিন হয় নাই, মনে হয়। আশ্রমটির পাকা কূপটি দর্শনীয়। উহার এক পাশে বাঁধানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে কূপের নীচে যাইয়া মিশিয়াছে। প্রবাদ আছে, গঙ্গার প্রবাহে উক্ত কূপেও জোয়ার-ভাটা খেলিত, এবং বাবাজী সমর্থ অবস্থায় উক্ত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে সেখানে গঙ্গাস্নান করিতেন। উক্ত কূপটি অদ্যাপি বর্তমান আছে। তবে সংস্কারাভাবে জীর্ণ।—অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম আশ্রমটির পরিচালনভার ১২ জনের গঠিত একটি ট্রাস্টি-সংস্থার হস্তে ন্যস্ত আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই আশ্রমে আগমনের কোন স্মৃতি আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী উক্ত মিলনের পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি চিত্র বাঁধাইয়া উপহার দেন। উহা মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত নাটমন্দিরে ঝুলানো আছে এবং সকলেরই দৃষ্টি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ছবিটি খুব বড় নহে। ছবিটির নীচে লেখা রহিয়াছে :

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণ কর্তৃক ১৯৫৫ খৃঃ ৫ই জুন স্নানযাত্রার দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রতিকৃতি প্রদত্ত। ১২৭৭ সালে শ্রীশ্রীসিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী মহাপুরুষকে দর্শন করিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন।

এই লীলা স্মরণ করিয়া জনৈক 'সাধুভক্ত' এ স্থানের একটি বন্দনা রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহা অনুসন্ধিৎসু ভক্তগণের নিকট বিতরণ করা হয়। ভক্তমণ্ডলীর অবগতির জন্য উহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি :

'বৈষ্ণবের শিরোমণি ভগবানদাস।
লভিলেন পরাভক্তি হেথা করি বাস॥
'নাম-ব্রহ্ম' উপাসনা হ'ত এই ধামে;
আশ্রমের খ্যাতি তাই 'নাম-ব্রহ্ম' নামে॥
'খ্যাতি শুনি রামকৃষ্ণ হৃদয়-সহিতে।
একদিন আইলেন তাঁহারে দেখিতে॥
দু-চার কথার পর মহা ভাবাবেশে।
উচ্চ তত্ত্ব বাবাজীরে কন অবশেষে॥
'হেন পুণ্যভূমি আজ দরশন করি।
অতীত লীলার কথা হৃদয়েতে স্মরি॥'

সমাজবিবর্তন ও স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীধনঞ্জয়কুমার নাথ

বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মনীষীর জীবন ও বাণীকে প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিশীল অথবা সংস্কারবাদী ব'লে অভিহিত করা যায়। প্রতিক্রিয়া প্রগতির পরিপন্থী এবং সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের অন্তরায়। যে চিন্তাধারা সমাজকে পরিবর্তনের মাধ্যমে মঙ্গলময় রূপ পরিগ্রহ করতে দেয় না, সেই চিন্তাধারাই প্রতিক্রিয়াশীল। 'প্রগতি' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য 'প্রতিক্রিয়া' শব্দের বিপরীত। প্রগতির অর্থ পরিবর্তনের মাধ্যমে নূতন নূতন মূল্যবোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠা ক'রে মঙ্গলের পথে পদার্পণ। এই পরিবর্তন অবশ্যই জাগিয়ে তোলে এক নূতন প্রেরণা, যা দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে সমাজ ও জীবন হয় প্রকাশমান। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, প্রগতির অর্থ অতীতকে অস্বীকার ক'রে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হওয়া নয়, অতীতকে ভিত্তি করেই ভবিষ্যৎকে কল্যাণময় করা। কিন্তু বর্তমানে একদল মানুষ চিন্তার সঙ্কীর্ণতাবশতঃ 'প্রগতি' অর্থে অতীতের অস্বীকৃতিই বুঝে থাকেন। 'সংস্কার' শব্দে আমরা বুঝে থাকি, সমাজে প্রচলিত অথবা অনিষ্টকর সংস্থাগুলিকে ধ্বংস ক'রে সমাজের সেবা। সংস্কারে আমূল পরিবর্তনের অর্থাৎ বিপ্লবের কোন স্থান নেই। এই সকলেরই ভূমিকা ইতিহাস স্বীকার করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও কর্মধারার বিচার ও বিশ্লেষণ ত্রিধারায় বিভক্ত :

(১) একদলের মতে তিনি সংস্কারবাদী সন্ন্যাসী; সংস্কারের মাধ্যমে সমাজ-কল্যাণই ছিল তাঁর জীবন-ব্রত। কিন্তু স্বামীজী বলেছেন, 'জবরদস্তি সমাজ-সংস্কারে আমার আস্থা নেই। আমার বিশ্বাস স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির প্রচেষ্টাই সঙ্গত।' স্বামীজী সমসাময়িক সংস্কারকদের দৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন না যে, অসবর্ণ-বিবাহ অথবা বিধবা-বিবাহের প্রচলনের দ্বারাই ভারতের স্থায়ী কল্যাণ সম্ভব। তিনি সমাজের আমূল সংস্কারে বিশ্বাস করতেন এবং সেই আমূল সংস্কারের মধ্যেই সমাজবাদী বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল। অতএব প্রচলিত অর্থে স্বামীজী সংস্কারক বা সংস্কারবাদী নন।

(২) অপর একদল মার্কস্‌বাদী পণ্ডিতের মতে স্বামীজী সমাজবাদী ও প্রগতিশীল সন্ন্যাসী। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর Swami Vivekananda—Patriot and Prophet-গ্রন্থে লিখেছেন : Swamijee called himself a socialist, and so far as it is known, he was the first Indian to designate himself as such. Yet his socialism is not of the same brand as of today.—অর্থাৎ যতদূর জানা যায়, স্বামীজীই প্রথম ভারতবাসী যিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী ব'লে অভিহিত করেছিলেন। যদিও তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ আজকের প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদ থেকে স্বতন্ত্র।

(৩) উনবিংশ শতকের মার্কসীয় জড়বাদের প্রভাবে একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বামীজীকে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সন্ন্যাসী আখ্যা দিয়েছেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় 'India's Message' পুস্তকে লিখেছেন : India will not be able to

shake off her political servitude and economic miseries, her social backwardness, her intellectual coma, so long as the educated youth remains drugged by the spiritual message of a Vivekananda, a Dayananda or an Aurobindo or of any other prophet who may preach some such doctrine.—অর্থাৎ যতদিন শিক্ষিত যুবক-সমাজ একজন বিবেকানন্দ, একজন দয়ানন্দ অথবা একজন অরবিন্দের আধ্যাত্মিক শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, ততদিন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অসম্ভব।

মার্ক্‌স্ মধ্যযুগে ইওরোপীয় সমাজে ধর্মের ভূমিকা স্মরণ করেই Religion বা ধর্মকে আফিমের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু ধর্মের কল্যাণময় রূপের পরিচয় তিনি পাননি। সেই কারণে তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদে ধর্মের কোন স্থান নেই। মূলতঃ ধর্ম ও সমাজবাদ যে একই লক্ষ্যের নির্দেশক, এই সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁর এ অক্ষমতার জন্য দায়ী বিগত শতাব্দীর জড়বাদ-প্রধান বিজ্ঞান ও মধ্যযুগে পাশ্চাত্য সমাজে ধর্মের ভূমিকা। এইরূপ মার্কসীয় ভাবাদর্শে মুগ্ধ হ'য়ে বর্তমানে তথাকথিত সমাজবাদীগণ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত নতুন ধর্মবোধের সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য না ক'রে মার্কস্‌বাদী চশমা পরে ইতিহাস পাঠে মগ্ন। স্বামীজীর জীবনে ধর্ম ও সমাজ-তন্ত্রবাদের যে সার্থক সমন্বয় ঘটেছে, সে দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর নেই এঁদের। অথচ ভারতের মাটিতে যাঁরা সমাজবাদের বৃক্ষ-রোপণে প্রয়াসী, তাঁদের ধর্ম ও সমাজতন্ত্র-বাদের সমন্বয়-সাধনে বিশেষভাবে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন। কারণ কোন দেশের অতীত ঐতিহ্যকে অস্বীকার ক'রে কোন ভাবাদর্শ আমদানি করা সম্ভব নয়; এবং ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে ধর্মকেন্দ্রিক।

গভীরভাবে মনন ও বিশ্লেষণ করলে প্রতিভাত হয় যে, স্বামীজী জীবন ও চিন্তার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম সমাজতন্ত্রবাদের অনুকূল। ধর্মের স্বরূপের সম্যক্ পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন বলেই ধর্মকে প্রতিক্রিয়াশীল ব'লে মনে করতে পারেননি। তাঁর ধর্মে আত্মচিন্তার সঙ্গে সমাজচিন্তার কোন বিরোধ নেই। স্বামীজী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, তথাপি তিনি বলেছেন: 'Do you feel that the millions and millions of the descendants of gods and sages have become next-door neighbours to brutes? Do you feel that millions are starving for ages?—অর্থাৎ তুমি কি মুনিঋষি ও দেবতাদের লক্ষ লক্ষ বংশধরদের জন্য চিন্তা কর, যারা পশুপ্রায় হয়ে গেছে? তুমি কি অনুভব কর যে, তাঁরা যুগ যুগ ধরে অভুক্ত রয়েছে?

স্বামীজী-প্রচারিত আদর্শবাদের মূলসূত্র হচ্ছে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জীবন। এই সূত্রের বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে তিনি প্রগতিশীল। স্বামীজী প্রগতিশীল ছিলেন বলেই বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি বলেছিলেন: I am a socialist, not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no loaf.—অর্থাৎ আমি সমাজতন্ত্রবাদী, কারণ নাই-মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে সেই সময় এদেশে সমাজতন্ত্রবাদ অবলম্বনে চিন্তার 'বিলাস' আরম্ভ হয়নি। অতএব স্বামীজীকে ধর্মের

দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া বিকৃত মনন-শীলতার পরিচয়।

মার্কস্‌বাদে জাতীয়তাবাদের স্থান নেই। কারণ এই মতবাদে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। আন্তর্জাতিকতাবাদ ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ অর্থহীন ও অসম্ভব। কিন্তু স্বামীজী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা। অতএব তাঁদের মতে জাতীয়তাবাদী স্বামীজী প্রতিক্রিয়াশীল।

স্বামীজীর চেষ্টায় আধুনিক জগৎ ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল্য স্বীকার করেছে। এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি; এবং জাতীয়তাবাদই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা ও রাজনৈতিক মুক্তির উৎস। রাজনৈতিক মুক্তি ভিন্ন আর্থনীতিক মুক্তি অসম্ভব। এই ভাবে বৈষয়িক বন্ধন-মুক্তিই আত্মিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করে। স্বামীজী বলেছেন, 'যে কোন বিষয়ে উন্নতি-লাভের প্রধান সহায় স্বাধীনতা।' এইরূপ চিন্তার উপর ভিত্তি করেই তিনি জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন করেন।

তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, ভারতবাসী আত্মবিস্মৃত জাতি, নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি সে প্রায় ভুলে গেছে। দীর্ঘকাল পরাধীনতার নাগপাশে ভারতবাসী শিখেছিল যে, ভারত-সংস্কৃতি জগৎসভায় অপাঙ্‌ক্তেয়। স্বামীজীর প্রচারে বিশ্বের দরবার স্বাগত জানালো ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে। এই ভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বামীজী। তিনি জগৎসভায় ঘোষণা করলেন: 'প্রাচ্য জনগণ যদি যন্ত্রতত্ত্ব শিখিতে চায়, তবে তাহাদিগকে অবশ্যই পাশ্চাত্য দেশবাসীর পদতলে বসিয়া উহা শিক্ষা করিতে হইবে। আর পাশ্চাত্য জনগণ যদি পরমাত্মা, জীবাত্মা, ঈশ্বর এবং ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে জানিতে চাহে, তবে তাহাদিগকেও প্রাচ্য দেশবাসীর পদতলে বসিয়া ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।'—এই উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামীজীর জাতীয়তাবাদ হিটলারের রক্ত-কুলীন জাতীয়তাবাদ হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হিটলারের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সঙ্কীর্ণতা, দম্ভ ও আত্মাভিমান। নীট্‌শের দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয়তাবাদ অপর সকল জাতির ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। এই জাতীয়তাবাদে আমরা পাই ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের বিকৃত ব্যাখ্যা। কিন্তু স্বামীজী-প্রচারিত জাতীয়তাবাদে সকল জাতির স্বীকৃতি আছে। তাঁর মতে প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক জাতির নিকট একাধারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। এই উদারনৈতিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলেই স্বামীজী বলতে পেরেছিলেন, 'মানব-জাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের মতো প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। বোধ হয় সে প্রয়োজন আরও বেশী।'

তবে তিনি ভারতবর্ষকে ভাবী বিশ্বসভ্যতার কেন্দ্র বলেছেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, বিষয়াসক্তি এবং উহার বিষময় ফলের প্রতিষেধক জড়বাদে নেই। মানব-সমাজ কেবল বৈষয়িক উন্নতির দ্বারাই সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে না। কেবলমাত্র জড়বাদ—সে বৈজ্ঞানিক হোক বা অ-বৈজ্ঞানিক হোক—সভ্যতার সঙ্কট সৃষ্টি করে; এই সঙ্কট থেকে সভ্যতাকে রক্ষা করে আধ্যাত্মিকতাবাদ। আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই স্বামীজী বলেছিলেন, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' বর্তমান মানব-সভ্যতার সঙ্কট স্বামীজীর উক্তির সত্যতাই

প্রতিপাদন করে। এই ভারতকেন্দ্রিক চিন্তার উৎস তাঁর ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি,—সঙ্কীর্ণতা নয়। জড়বাদে অনাস্থা ও আধ্যাত্মিকতাবাদে বিশ্বাস-বলেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, সঙ্কীর্ণ দেশপ্রীতি বা গোঁড়া স্বধর্ম-প্রীতি দ্বারা নয়।

এ ছাড়া জাতীয়তাবাদের কার্যকরী শক্তিকে অস্বীকার করা নিতান্তই আত্মপ্রবঞ্চনা। স্টালিনের মতো মার্কস্‌বাদী রাষ্ট্রনায়কও জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'Those who are not rooted to the soil will wither away.' অর্থাৎ স্বাদেশিকতা ভিন্ন স্থায়ী জীবন অসম্ভব। এই উক্তির মধ্যে আমরা যে জাতীয়তাবাদের ইঙ্গিত পাই, তা নিশ্চয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-বাদের মতে প্রতিক্রিয়াশীল নয়।

এইরূপ ধর্ম ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই স্বামীজী নিজেকে সমাজ-তন্ত্রবাদী ব'লে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। এই সমাজতন্ত্রবাদে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-বাদের মতো শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজের স্থান আছে। অধিকন্তু এই সমাজবাদে—ভাব ও বস্তুতে, জড় ও চেতনে কোন বিরোধ নেই। এ ক্ষেত্রে জড়বাদ বা বৈষয়িক উন্নতি উপায়মাত্র, লক্ষ্য নয়। উপায়স্বরূপ জড়বাদকে অবলম্বন করেই আদর্শবাদের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের শাস্ত্রে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ হলেও ধর্ম অর্থ এবং কামকেও অন্যতর পুরুষার্থরূপে স্বীকার করা হয়েছে। বৈষয়িক বন্ধনমুক্তি আত্মিক মুক্তির সন্ধান দেয় বলেই জড়বাদ-ভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদকে অনায়াসে স্বামীজীর সমাজতন্ত্রবাদের অঙ্গীভূত করা যেতে পারে। এই হ'ল তাঁর চিন্তার সামগ্রিকতার প্রমাণ। অপরদিকে মার্কস্‌-প্রচারিত জড়বাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ খণ্ড-দৃষ্টিভঙ্গী সহায়ে ইতিহাসের বিচার ও বিশ্লেষণ করে বলেই মানব-জীবনের চরম আদর্শের সন্ধান দেয় না। এইটেই এই চিন্তা-ধারার দুর্বলতা ও অপূর্ণতা।

অতএব তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-বাদের সঙ্গে স্বামীজী-প্রচারিত অধ্যাত্মবাদী সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধ মার্কস্‌বাদীর নিকট প্রতিভাত হলেও উদার ও মুক্তবুদ্ধি বিবেকানন্দ-বাদীর নিকট প্রতিভাত হওয়ার কোন কারণ নেই। তাই ভারতভূমিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গঠনের প্রাক্কালে অদূরদর্শী মার্কস্‌বাদীদের নিকট আবেদন যে, তাঁরা যেন গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার ক'রে সমাজবাদের সার্থক রূপায়ণের জন্য বিবেকানন্দ-বাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ভারতের শোষিত সমাজকে শ্রেণীসংঘর্ষের বাদানুবাদের বিষময় পরিণতি থেকে রক্ষা করেন।

The West wants every bit of spirituality
through social improvement.
The East wants every bit of social power
through spirituality.

—*Vivekananda*

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ঃ ভারত-মার্কিন মৈত্রীর সেতু

মিঃ আর্থার সি. বার্টলেট*

আমার দেশে এ কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, এবং বেশ গর্ব ও তৃপ্তির সঙ্গেই বলা হয়ে থাকে যে, যে কোন একটি মার্কিন বালক উত্তরকালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-পদে অধিষ্ঠিত হ'তে পারে। অবশ্য আজ এই বিশাল ভারতীয় প্রজাতন্ত্রেও যে কোন একজন সাধারণ ছেলে ভারতের প্রেসিডেন্ট বা প্রধান-মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করতে পারে, অথবা অন্য কোন উচ্চ রাজনৈতিক মর্যাদাও লাভ করতে পারে। যখনই দেখি কোন একটি ডাগরচোখ ছেলে বা ছেলের দল খেলাধুলো করছে, বা হয়তো স্কুলের পড়া সাঙ্গ ক'রে বাড়ী ফিরছে, অথবা শ্রান্তক্লান্ত পায়ে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, কিংবা হয়তো রাস্তার ধারে শুধু দাঁড়িয়েই রয়েছে, তখনই ঐ চিন্তা আমার মনের মধ্যে উঁকি মারে। যখন ভাবি, কে জানে হয়তো এই ছেলেটিই অথবা এদেরই একজন একদিন এই সমগ্র জাতির প্রতিনিধি হয়ে কথা বলবে, এই সমগ্র জাতির যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করবে, আর এমন সব গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যা ইতিহাস সৃষ্টি করবে, তখন আমার দেহে জাগে রোমাঞ্চ, মনে লাগে বিস্ময় ও আনন্দের শিহরণ।

তবে এ কথা ঠিক যে, প্রেসিডেন্ট বা প্রধান-মন্ত্রী না হয়েও অন্য নানাভাবে নেতৃত্ব করা যায়, অন্য নানা পথেও ইতিহাস সৃষ্টি করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, রাজনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা যাই থাক না কেন, যুগে যুগে মহান্ নীতিবিদ্ ও ধর্মনেতারা প্রায়ই সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন। এই সমস্ত ধর্মনেতাদের মধ্যে যাঁরা মহত্তম, নিঃসন্দেহে তাঁদেরই একজন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই গ্রামেই, আজ থেকে একশ পঁচিশ বছর আগে। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। রাজ-নৈতিক নেতারা এই মানবজাতি ও তার ইতিহাসকে যতখানি প্রভাবান্বিত করতে পেরেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি করেছেন এই মহাপুরুষ।

আমরা শুনেছি, এই গ্রামে শৈশবাবস্থাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ এমন সব গুণের অধিকারী হয়েছিলেন, যার ফলে লোকে তাঁকে ভাল-বাসতে ও শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ ক'রল। বিশেষ ক'রে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর মতামতের ওপর সকলেই গুরুত্ব আরোপ ক'রত। তথাপি এ কথা কে কল্পনা করতে পেরেছিল যে, এই যে ছোট ছেলেটি গ্রামের চারিদিকে ছুটোছুটি ক'রে ঘুরছে, গান গাইছে, ছবি আঁকছে, তার প্রিয় ধর্ম-নাটকগুলি অভিনয় ক'রে বেড়াচ্ছে, সেই ছেলেটিই একদিন সর্বযুগের সাধু ও মহাপুরুষদের সঙ্গে একাসনে স্থান লাভ করবে, আর একদিন তাঁরই নামে তাঁর অগণিত ভক্ত পরম্পরাক্রমে জ্ঞানালোক বিতরণ করতে থাকবে, মানুষের সৌভ্রাত্র সুদৃঢ় ক'রে তুলবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতা বিশ্লেষণ করা আমার মতো একজন আমেরিকানের পক্ষে ধৃষ্টতা হবে, কারণ কোন রকম বিশেষ ধর্মশিক্ষা আমার আছে—এ দাবি আমি করি না। বাস্তবিকই এ বিষয়টি আমি উপলব্ধি করেছি,

* Mr. Arthur C. Bartlett, (Director, United States Information Service, Calcutta) কর্তৃক কামারপুকুরে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণ অবলম্বনে।

এ দাবি আমি করতে পারি না; আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, এ উপলব্ধি এমন এক বস্তু যা আমার ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির অতীত। তবে আমার মনে হয়, আমি আমার সমস্ত হৃদয় ও অন্তর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের সার কথাটুকু উপলব্ধি করতে ও গ্রহণ করতে পারি। সেই সার কথাটি হ'ল: ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছেন, এবং আমাদের মধ্যে ভগবানকে দেখতে যখন আমরা শিখি, তখনই আমরা উপলব্ধি করতে শিখি যে, তিনি সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন এবং আরও উপলব্ধি করি যে, আমাদের নিজেদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে সকল মানবজাতির মঙ্গলের মধ্যে।

বর্তমান বাংলার একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিচারপতি শ্রীপি. বি. মুখার্জী বলেছেন: আধুনিক যুগের মানুষের জন্য যে সুস্পষ্ট বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ রেখে গেছেন, তা হ'ল বিশ্বজনীনতার বাণী। তিনি যিশুখ্রীষ্টকে উপলব্ধি করেছিলেন, হজরত মহম্মদের ভাব উপলব্ধি করেছিলেন, অনাদি-অনন্ত মা কালীর ঐশী শক্তিকে তিনি অনুভব করেছিলেন এবং শিবের দিব্য প্রকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই ঐক্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যা স্থান-কালের বাধা, জাতি বর্ণ ধর্ম দেশ ও মহাসাগরের কৃত্রিম বাধা অতিক্রম ক'রে এগিয়ে যায়, চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে, এবং বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যে যবনিকার আড়াল রয়েছে, তা ছিন্ন ক'রে দেয়। তাঁর আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার জোয়ারে সকল ধর্মের তত্ত্বগত বিরোধ ও সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামি ভেঙে গিয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মমত সম্পর্কে তাঁর যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেগুলিকে তিনি নিজের অন্তরে আপন অনুভূতির সুরে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু বিভিন্ন পথে সেই এক পরমানুভূতির দিকেই আবর্তিত হয়ে চলেছে—এই সত্যটিই মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের প্রধান স্বামী বিবেকানন্দ গত শতাব্দীর শেষমুখে আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেছিলেন, এবং এইভাবে তিনি আপনাদের ও আমাদের দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শ্রদ্ধা ও সৌভ্রাত্রের মনোভাব-সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর আগে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আমেরিকানই ভারতের জীবন-ধারা ও চিন্তাধারা অবগত ছিলেন ও তা উপলব্ধি করেছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে এমার্সন ও থোরোর নাম উল্লেখ করা যায়। আবার ভারতীয়দের মধ্যেও অল্প কয়েকজনই আমেরিকা ও তার জীবনধারা উপলব্ধি করেছিলেন। তবে এগুলি বিধি নয়, ব্যতিক্রমই। অধিকাংশ সময়ই ভারত ও আমেরিকা পরস্পরের কাছে অপরিচিত ছিল। একে অপরের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ ক'রত, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট অতিরঞ্জিত ছিল, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ১৮৯৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত হলেন, প্রায়শই দেখা যেত, মার্কিন সংবাদপত্রগুলি তাঁকে 'ভারতীয় রাজা' ব'লে অভিহিত করছে। সম্ভবতঃ এর কারণ হচ্ছে, তখনকা'র দিনের সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা শুধু ভারতীয় রাজাদেরই আমেরিকায় যেতে দেখেছেন। আবার ভারতে প্রচলিত ধর্মগুলি সম্বন্ধে সে সময় আমাদের দেশে এমন সামান্য জ্ঞান ছিল যে, কোন কোন সময় স্বামী বিবেকানন্দকে অভিহিত করা হ'ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ব'লে।

তবুও এ কথা ব'লব, অপরিচিত বস্তু, অজানা অচেনা দেশের মানুষ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকেরা চিরকালই কৌতূহলী, চিরকালই তাঁরা একটা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে আসছেন। এজন্যই একেবারে প্রথম দিন থেকেই স্বামীজী বিশেষ আকর্ষণের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুতঃ আমেরিকায় যাবার পর সেখান থেকে তিনি ভারতে যে প্রথম চিঠি পাঠান, তাতে লিখেছিলেন :

আমাকে দেখবার জন্য এদেশে রাস্তায় শত শত লোক এসে ভিড় করছে। তাই আমি চাইছি কালো রংয়ের লংকোট পরতে। বক্তৃতা করবার সময়ের জন্য রেখে দিতে চাইছি আমার গেরুয়া বসন ও উষ্ণীষ।

রাস্তায় চলাফেরার সময় লোকে যে তাঁকে দেখতে চাইত, এতে তিনি হয়তো কিছুটা বিব্রত বোধ করতেন, কিন্তু তা হলেও এটা তাঁর সম্পর্কে আমেরিকাবাসীদের যথার্থ আগ্রহেরই পরিচয় দেয়। শীঘ্রই দেখা গেল, স্বামীজীর সম্পর্কে যাঁরাই জানতে পেরেছেন, তাঁরাই তাঁর সম্পর্কে এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে নূতন ধারণা গড়ে তুলছেন। এ প্রসঙ্গে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

জনৈকা মার্কিন মহিলা তাঁর সম্পর্কে যখন শুনলেন যে, তিনি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, যে কোন সুশিক্ষিত লোকের মতোই তাঁর জ্ঞান, তখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন। ঐ মহিলাটিই একখানি চিঠিতে এই কথা লেখেন। চিঠিতে তিনি আরও লিখেছিলেন : 'আঠার বছর বয়স থেকেই তিনি সন্ন্যাসী। এঁরা সন্ন্যাস-জীবনের যে দীক্ষা নেন, সেটা ঠিক আমাদের দীক্ষার মতোই, বরং ব'লব, ঠিক একজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর দীক্ষার মতোই। শুধু তফাৎ এই যে, তাঁদের দারিদ্র্য সত্যিকারের দারিদ্র্য। তাঁদের কোন মঠ নেই, নেই কোন সম্পত্তি। এমন কি তাঁরা ভিক্ষে করতেও পারেন না। যতক্ষণ কেউ এসে ভিক্ষে না দেয়, ততক্ষণ তাঁরা বসে বসে শুধু অপেক্ষাই করেন। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে বিবেকানন্দ লোকদের শিক্ষা দেন। দিনের পর দিন শুধু কথা আর আলোচনা। অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং বিচক্ষণ তিনি, নিজের বক্তব্য বিষয় উপস্থিত করেন একেবারে স্পষ্ট ক'রে, চিন্তাধারাকে একেবারে সোজা এনে হাজির করেন তাঁর সিদ্ধান্তে। কেউ তাঁকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিতে পারবে না, তাঁর আগেও কেউ যেতে পারবে না।'

স্বামীজী আমেরিকায় গেলে প্রথম দিকে যে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক তাঁকে দেখবার ও তাঁর ভাষণ শুনবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের এই সব মতামত বোঝাপড়ার শুরু মাত্র। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন 'ওয়ার্লড্ পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নস্' অর্থাৎ বিশ্ব-ধর্মসভায় যোগ দিতে। এই ধর্মসভা শিকাগোতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বিরাট বিশ্বমেলার অঙ্গহিসেবে। সেখানেই তিনি, অন্ততঃ খ্যাতির বিচারে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে গোটা আমেরিকায় পরিচিত হয়ে ওঠেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঐ ধর্মসভায় তিনি যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তার বিবরণের মাধ্যমে।

যদিও এই সভাকে 'বিশ্বধর্মসভা' নামে অভিহিত করা হয়েছিল, বস্তুতঃপক্ষে, এখানে যে প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা এসেছিলেন হয় আমেরিকার, নয় ইওরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে, অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মেরই নানা শাখার প্রতিনিধি। তবে অন্য

কতিপয় ধর্মের প্রতিনিধিও ছিলেন, যেমন ছিলেন ভারত থেকে ব্রাহ্ম সমাজের দু-জন প্রতিনিধি এবং একজন জৈন ও একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই সকলের মধ্যে সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ; তার কারণ, বোধ হয় কিছুটা তাঁর উজ্জ্বল গৈরিক বসন ও উষ্ণীষ, এবং কিছুটা, যেটা আরও বেশী, তাঁর বিরাট ও মহান্ ব্যক্তিত্ব। প্রথম দিনে স্বামীজী বলবার আগে অন্যান্য কতিপয় প্রতিনিধি ভাষণ দেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের ভাষণই যখন সমাপ্ত হয়, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী করতালি দিয়ে হর্ষধ্বনি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু স্বামীজী যখন ভাষণ দিতে উঠলেন এবং নমস্কার জানিয়ে,—কেউ কোন দিন ভুলতে পারবে না এমন ভাষায়—সম্বোধন ক'রে বললেন, 'সিস্টারস্ অ্যাণ্ড ব্রাদার্স অব আমেরিকা' (আমেরিকার ভাই ও বোনেরা), শ্রোতৃমণ্ডলীর সহস্র সহস্র নরনারী যেন একাত্ম হয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট ধরে এমন করতালি চলতে থাকল যে, স্বামীজীর প্রারম্ভিক বাক্য উচ্চারণেই দেরি হ'ল। অতি সহজ ও সরল ভাষায় স্বামীজী ভাষণ দিলেন, গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে নিজের ধর্মের কথা বললেন, জানালেন—তিনি সমস্ত ধর্মমতেই পরিপূর্ণ বিশ্বাস করেন। উপসংহারে, গীতা থেকে তিনি বললেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত মার্কিন কবি হেরিয়েট মনরো। তিনি লিখেছেন: 'তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বিরাট, চৌম্বক শক্তির মতো আকর্ষণকারী, তাঁর কণ্ঠস্বর ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনির মতোই গুরুগম্ভীর, তাঁর প্রগাঢ় অনুভূতির সুনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ, আর যে প্রতীচ্যের সম্মুখে তিনি প্রথম এসে দাঁড়িয়েছেন, তার উদ্দেশ্যে তাঁর বাণীর মাধুর্য—এই সবগুলি এক সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের দান করেছিল প্রগাঢ় আবেগের এক নিখুঁত, সুদুর্লভ মুহূর্ত।'

সেইদিন থেকে যতদিন বিশ্বধর্মসভার অধিবেশন চলেছিল, স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন যে কোন শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছেই সর্বাপেক্ষা প্রিয় বক্তা। স্বামীজীর ভাষণ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ এত গভীর হয়ে উঠেছিল যে, অনেক সময়েই দেখা যেত, কর্তৃপক্ষ তাঁকেই সর্বশেষ বক্তা হিসাবে রেখেছেন, যাতে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর আগের অন্যান্য বক্তাদের ভাষণ ধৈর্য ধরে শোনেন। শিকাগোর একটি সংবাদপত্র লিখেছিল: 'স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর চিত্তজয়ী আচরণ ও তাঁর অপূর্ব ক্ষমতায় এবং নিজের ধর্ম সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্নের নির্ভয় আলোচনা ক'রে সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এমনটি আর কেউ পারেননি। এই বিশিষ্ট হিন্দুটি সোৎসাহে প্রতীচ্য জগতের মহত্ত্ব ও তার বৈষয়িক অগ্রগতির প্রশংসা ক'রে থাকেন, স্বদেশীয় জনগণের যা উপকারে আসতে পারে ব'লে তিনি মনে করেন, তাই শিখে নেবার জন্য তাঁর আগ্রহ বিপুল এবং পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষের ধর্মই যে পরস্পর নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ, এই সত্য ও ন্যায়—তথা পবিত্রতার আদর্শ অনুসারে সর্বপ্রকার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে স্বীকার ক'রে নিতে তাঁর ইচ্ছাও অকপট। কিন্তু আবার, তিনি তাঁর হিন্দুধর্ম ও দর্শনকে এমন চমৎকার বাগ্মিতায় ও আত্মশক্তির সাহায্যে সমর্থন করেছেন যে, তা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছে এবং তাঁর শিক্ষা যে ভেবে দেখবার মতো, এই চিন্তা সৃষ্টি করেছে।'

'ক্রিটিক' (সমালোচক)-নামক একটি সাময়িক পত্রিকার সংবাদদাতা বিশ্বধর্মসভার কার্যকলাপের সামগ্রিক বিবরণ দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিশেষ-

ভাবে উল্লেখ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা। তিনি লেখেন: 'আমেরিকাবাসীদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্যটি উদ্‌ঘাটন ক'রে গিয়েছেন যে, প্রাচীন ধর্মাদর্শের পশ্চাতে যে দর্শন নিহিত রয়েছে, তাতে আধুনিকদের চোখেও সুন্দর ব'লে প্রতিভাত হবার মতো বস্তু রয়েছে এবং একবার এই সত্যটি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই প্রবক্তাদের সম্পর্কে আমাদের আগ্রহও ত্বরিত হয়ে ওঠে, আমরা ব্যাকুল হয়ে জ্ঞানের সন্ধানে বার হয়ে পড়ি। অন্য কথায় বলা যায়, পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের জ্ঞান এভাবে বেড়ে যাওয়ায় এবং পরস্পরকে উপলব্ধি করতে পারায় পরস্পরের দেশ দর্শন এবং জীবন-প্রণালী জানবার আগ্রহও আমাদের বেড়ে যায়। স্বামীজী নিজেই একবার বলেছিলেন—সম্ভবতঃ কিছুটা রসিকতা ক'রে, কিন্তু কিছুটা গুরুত্ব দিয়েই—তিনি আমেরিকাবাসীদের কাছে এই কথাটাই প্রমাণ করতে চাইছেন যে, হিন্দুরা বর্বর বা অসভ্য নয়।'

*   *   *

ধর্মসভা আরম্ভ হওয়ার আগে যে সকল আমেরিকান মনে করতেন, ভারতীয়েরা বর্বর—এই ধরনের কিছু লোক ছিল বৈকি—তাঁরা এবং অন্য যে কেউ এই সকল ধর্মসভায় যোগদান করেছিলেন বা যাঁরা সংবাদপত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ পাঠ করেছিলেন, তাঁদের কারুরই আর এ রকম ধারণা রইল না। যে আড়াই সপ্তাহকাল ধর্মসভার অধিবেশন চলেছিল, তার মধ্যে ক্রমেই বেশি-সংখ্যক আমেরিকান প্রকৃত ভারতের রূপ উপলব্ধি করলেন, যা এর আগে আর কখনও সম্ভব হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দকে এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

ধর্মসভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামীজী আরও দু-বছর আমেরিকায় ছিলেন। এই সময়ে তিনি ঐ দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে তাঁর মহৎ কার্য সাধনে ব্যস্ত ছিলেন। ডিট্রয়েটে জনৈক খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে একদিন ধর্মোপদেশ শিক্ষা দেওয়ার সময় ঐ উপদেশ-বাণীটির যথাযোগ্য নামকরণ করেছিলেন: 'প্রাচ্য-অভিমুখী দ্বার খুলে যাচ্ছে'। সংবাদ-পত্রের রিপোর্টে জানা যায় যে, স্বামীজী স্বয়ং ঐ ধর্মসভায় উপস্থিত থেকে আলোচনাকালে ঘন ঘন অনুমোদনসূচক মাথা নাড়ছিলেন। খ্রীষ্টীয় যাজক যখন জোর দিয়ে বলছিলেন যে, মিশনরীরা পাশ্চাত্য দেশ থেকে প্রাচ্য দেশে যাওয়ার সময়ই হোক বা প্রাচ্যভূমি থেকে পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণের সময়ই হোক, এক দেশের উৎকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে অন্য দেশের অপকৃষ্ট বস্তুর তুলনা যেন না করেন, এবং প্রত্যেকটি সভ্যতার মধ্যে ভাল কি আছে, তা তাঁদের অন্বেষণ করতে হবে; আর সেই ভালটুকুকে সাধারণ সম্পত্তি ক'রে তুলতে হবে নিঃসন্দেহে স্বামীজী তখনও অনুমোদন-সূচক মাথা নেড়েছিলেন। তিনি আরও বলেন: প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতাকে পাশ্চাত্যের বাস্তব যুক্তিবাদের মধ্যে স্থাপন করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম আমেরিকা সফরের দু-বছরের মধ্যে যেমন প্রশংসার পাত্র হয়েছিলেন, তেমনি সমালোচনার পাত্রও হয়েছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র প্রকৃত ধর্ম ব'লে বহু গোঁড়া খৃষ্টানদের যে বিশ্বাস ছিল, রামকৃষ্ণের কাছ থেকে পাওয়া বিবেকানন্দের ধর্মমত সেই বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছে ব'লে তাঁরা বিবেচনা করলেন। তাঁরা অসংখ্য ধর্মোপদেশ

প্রচার করলেন এবং বিবেকানন্দ মিথ্যা ধর্মের পক্ষে ওকালতি করছেন ব'লে আক্রমণাত্মক চিঠিপত্রাদি সংবাদপত্রে লিখতে লাগলেন।

তবে যেমন তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছিল, তেমনি তাঁর স্বপক্ষে বলাও হয়েছে অনেক কিছু। যে খ্রীষ্টান ভদ্রমহিলার গৃহে স্বামীজী প্রায়ই থাকতেন, তিনি লিখেছেন: স্বামীজী আমেরিকায় এসে আমাদের মনে উচ্চতর জীবনবোধ জাগিয়েছেন। ডিট্রয়েট একটি পুরানো রক্ষণশীল শহর। এখানে সকল ক্লাবে তাঁর প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তা আর কারও প্রতি কখনও করা হয়নি। খ্রীষ্টানদের কাছে অনেক সত্য তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন। ধর্মোপদেষ্টা-রূপে তাঁর সমকক্ষ আর কাউকে আমি জানি না। তাঁর সঙ্গে একগৃহে বাস করলে এবং তাঁকে জানতে পারলে প্রত্যেকটি মানুষের উন্নতি সাধিত হবে। আমি চাই প্রত্যেকটি আমেরিকাবাসী বিবেকানন্দকে জানুক এবং এই রকম আরও কেউ যদি ভারতে থাকেন, তাঁদেরও আমেরিকায় প্রেরণ করা উচিত।'

স্বামীজী স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম ও অন্য সকল ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন: 'আমি সকল ধর্মমতে বিশ্বাসী। আমি মনে করি—আমার ধর্মের মধ্যে সত্য আছে, তোমার ধর্মের মধ্যেও সত্য আছে। সকল ধর্মের মধ্যে একই সত্য বিবিধ পথের মধ্য দিয়ে একই লক্ষ্য অভিমুখে বিকশিত হচ্ছে।'

ধর্ম তাঁর বিশেষ ক্ষেত্র ও প্রধান বিষয় হলেও তাঁর প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর একটি বক্তৃতার যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, 'স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করেছেন যে, সমুদ্রের অপর পারে আমাদের যে প্রতিবেশীরা রয়েছে, তারা সকলে—এমন কি দূরতম প্রান্তে অবস্থিত প্রতিবেশীরাও—আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পার্থক্য শুধুমাত্র বর্ণ ভাষা রীতিনীতি ও ধর্মের। তাঁর একটি বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বিশ্বে ভারতের দান'। বহু আমেরিকান যাঁরা এই বক্তৃতা শুনেছিলেন বা পাঠ করেছিলেন, তাঁরা সবিস্ময়ে অবগত হলেন যে, যে-দেশকে তাঁরা এতদিন পৌত্তলিকদের বাসভূমি ব'লে জেনে এসেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অংশটুকু এসেছিল এই দেশ থেকেই।'

তাঁর সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচয়িতা জনৈক মার্কিন গ্রন্থকার লিখেছিলেন, মাত্র বছরখানেক সময়ের মধ্যে স্বামীজী তাঁর দেশের বিরুদ্ধে বহু দশক যাবৎ আমেরিকায় যে একটা বিরুদ্ধ মনোভাবের তীব্র স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, তার গতি স্থায়িভাবে রুদ্ধ ক'রে দেন। প্রচারের কোন কৌশল অবলম্বন না করেই তিনি এ কাজ করতে পেরেছিলেন, ভারতের সত্য জীবনের কিছু কিছু বর্ণনা ক'রে এবং তার আন্তর পরিচয় দিয়ে তিনি গোটা হিন্দু সংস্কৃতির মূল চরিত্র ও তাৎপর্য লোকসমক্ষে উদ্‌ঘাটন করেন।

এমন চমৎকার ফলপ্রদভাবে ভারতের দর্শনকে তিনি পরিবেশন করেছিলেন যে, আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হারভার্ডের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রাচ্য দর্শন অধ্যাপনার জন্য প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়। তিনি অবশ্য অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমেরিকায় তাঁর কার্যকারিতার বোধ হয় এর চেয়েও বড় প্রমাণ হচ্ছে, তাঁর ভাষণ এবং শিক্ষাদানের ফলেই সেখানে উত্তরকালে গড়ে ওঠে বেদান্ত

সোসাইটি। রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ যে দর্শন শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সেই শিক্ষানুসারেই একদল একনিষ্ঠ মার্কিন নরনারী এইসব সোসাইটির মধ্যে থেকে নিজেদের জীবনযাত্রা ও কার্যকলাপ পরিচালনা করছেন। আজ আমেরিকায় ১০টি বেদান্ত সেণ্টার আছে, একটি মঠ আছে এবং একটি কনভেণ্ট আছে। এ সবই পরিচালিত হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক-অনুসরণকারী রামকৃষ্ণ-সংঘের স্বামীদের নির্দেশে।

স্বামীজীর আমেরিকা পরিদর্শনের কার্যকারিতার এই বাহ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদিও খুবই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু যে পরোক্ষ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে এই দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সদ্‌ভাব ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠবার মধ্য দিয়ে, সেটা তার চেয়েও চিত্তাকর্ষক। কারণ—তিনিই প্রথম আপনাদের ও আমার দেশের মধ্যে সদ্‌ভাবের সিংহদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, যা আমি আগে একবার ডিট্রয়েটের ধর্মযাজকটির উপদেশ প্রসঙ্গে বলেছি। এর পর থেকে আরও বহু ব্যক্তি—যাঁদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে—এই সদ্‌ভাব আরও বাড়িয়ে তুলেছেন, আপনাদের দেশ সম্বন্ধে আরও বেশী জ্ঞান আমার দেশে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আমার দেশ সম্বন্ধেও বেশী জ্ঞান এ দেশে নিয়ে এসেছেন। এই সেদিন আমাদের নূতন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ঘোষণা করেছেন: 'বর্ণ ধর্ম ও জাতিগত উৎপত্তির কারণে যতদিন মানুষ একে অপরকে ভয় করবে বা অবিশ্বাস করবে, যতদিন অপরকে বুঝবার মতো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিবর্তে অযৌক্তিক উগ্র অন্ধতা বিরাজ করবে, ততদিন আমাদের রাষ্ট্র পূর্ণ শক্তি ও মহত্ত্বের অধিকারী হ'তে পারবে না।'

* * *

কী অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে এই গ্রামটির উপরে। এই গ্রামেই একদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল একটি শিশু, যে এর আকাশে বাতাসে প্রাণস্পন্দন পেয়ে অপরকে বুঝবার মতো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জীবন্ত নিদর্শন হয়ে উঠেছিল। তাঁরই মহান্ শিষ্যদের একজন আমার দেশে অপরকে বুঝবার সেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এমন এক কর্ম-পরম্পরার প্রাথমিক উদ্বোধন ক'রে গিয়েছিলেন, যা আজও আপনাদের ও আমার দেশকে সেই সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে তাদের যথাসাধ্য পরিপূর্ণ শক্তি ও মহত্ত্ব অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

Asia produces giants in spirituality, just as the Occident produces giants in politics, giants in science.

—*Vivekananda*

সমালোচনা

মানুষ কি ক'রে মানুষ হ'ল : চণ্ডী লাহিড়ী রচিত ও চিত্রিত, প্রকাশক : জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ; ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩; পৃষ্ঠা ১১২ (ডিমাই); মূল্য দুই টাকা।

মানুষের কাছে সব চেয়ে অজানা হ'ল মানুষ। অনাদিকালের পরিপ্রেক্ষিতে অনন্ত জীব-জগতের পরিবেশে মানুষকে দেখতে না পারলে মানুষের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আমাদের হয় না; ইতিহাস পড়েও হয় না, শারীর বিজ্ঞান পড়েও হয় না, শুধু নৃতত্ত্ব পড়েও হয় না। লেখক তাই তাঁর আলোচিত বিষয়বস্তুর নাম দিয়েছেন "মানুষ কি ক'রে মানুষ হ'ল"—এর ব্যাবহারিক নাম 'কালচারাল এনথ্রোপলজি'—মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে বিভিন্ন উপাদানের ওপর ভিত্তি ক'রে বিষয়টি গড়ে উঠেছে।

মানুষ হওয়ার মূল মন্ত্র পারস্পরিক সহযোগিতা। কিভাবে সেই শিকারের যুগ থেকে গুহাজীবনের মধ্য দিয়ে—রূপকথার রাজ্য অতিক্রম ক'রে মানুষ গৃহ, গ্রাম, নগর, সমাজ, সভ্যতা সৃষ্টি ক'রল—তার একটা প্রামাণ্য চিত্র আঁকবার সার্থক চেষ্টা লেখক করেছেন। ছোটদের লক্ষ্য ক'রে লেখা হলেও বড়-রা এ বই পড়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করবেন। অধিকাংশ চিত্র প্রামাণ্য, কয়েকখানি কল্পিত চিত্র বিষয়বস্তু বোঝাতে সাহায্য করে। একটি বিষয়-সূচী ও একটি চিত্রসূচী থাকলে ভাল হ'ত।

The Message of Ramakrishna : Published by President, Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Himalayas. Calcutta Office : Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta-14. Pp. 44 ; price 30 nP.

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম, যোগ, ঈশ্বরতত্ত্ব, ত্যাগ, তপস্যা প্রভৃতি বিষয়ক কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বাণী সঙ্কলন করিয়া পকেট সাইজ এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুমুদ্রিত, সর্বদা কাছে রাখিবার মতো বইটি ভক্তগণের নিকট আদরণীয় হইবে। বইটিতে বিষয়-বিভাগের অভাব রহিয়াছে, আশা করি পরবর্তী সংস্করণে তাহা দূরীভূত হইবে।

বিদ্যাপীঠ : ছাত্রদের বার্ষিকী (১৯৫৮-৫৯) —প্রকাশক : স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ও পুরুলিয়া। পৃষ্ঠা ৯১।

দেওঘর ও পুরুলিয়া উভয় বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও শিক্ষকদের রচনায় সমৃদ্ধ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এবারের বার্ষিকী। প্রচ্ছদপটে এবং কয়েকটি লেখায় নূতনত্ব আছে। Swami Vivekananda on internationalism and civilisation প্রবন্ধটি জ্ঞানগর্ভ। ছাত্রদের লেখার মধ্যে 'ধান্দু দা', 'কেন পড়তে ভাল লাগে না?', 'স্বামীজী ও স্বদেশপ্রেম', 'পুরুলিয়া ক্যাম্প', 'বিসর্জন', 'আমার কাশ্মীর ভ্রমণ', 'বর্ষার দিনে' আমাদের ভাল লেগেছে। সচিত্র আশ্রম-সংবাদে বিদ্যাপীঠের বিস্তৃতি ও ক্রমোন্নতি ফুটে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ৫ই ফাল্গুন (১৭.২.৬১) শুক্রবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১২৬ তম শুভ জন্মতিথি উৎসব বিপুল আনন্দপূর্ণ ও শুচিসুন্দর অনুষ্ঠান-সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হইলে একে একে উপনিষদ্ আবৃত্তি, চণ্ডীপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা ও হোম এবং দশাবতারের পূজা, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে ভক্তহৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামাধুরী, সিঞ্চিত হইতে থাকে। প্রায় ১০,০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান।

অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় স্বামী গম্ভীরানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

সকাল হইতে বহু নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসেন। ভক্তবৃন্দ বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া পবিত্র ভাবধারায় বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোমের পর রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ১৬ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ১০ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার সাধারণ উৎসব উপলক্ষে মন্দিরের পূর্বদিকে প্রাঙ্গণে নির্মিত মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ তৈলচিত্র ও তাঁহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখা হয়। মণ্ডপে ও মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন কীর্তনের দল ভজন দ্বারা উৎসব ক্ষেত্র মুখরিত রাখেন। সারাদিন প্রধান মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিভিন্ন কার্যে বহু স্বেচ্ছা-সেবক নিযুক্ত থাকেন। সন্ধ্যারতির পর বাজি পোড়ানো হইলে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। মঠের প্রাঙ্গণে ও রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দোকানপাটের মেলা বসে। অগণিত নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই দিন প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

উৎসব

করিমগঞ্জঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৫শে হইতে ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৬ তম শুভ আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে জন-সভা, কথকতা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি হয়। কলিকাতার বেতার-কথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী চারিটি আসরে সঙ্গীত-সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য কথকতা করেন; সমাগত তিনচারি সহস্র নরনারী প্রভূত আনন্দ লাভ করেন। এ অঞ্চলে এইরূপ কথকতা-অনুষ্ঠান এই প্রথম।

শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমেও সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগমে একটি কথকতা-অধিবেশন হয়।

রামবাগান (কলিকাতা)ঃ বিবেকানন্দ সমাজসেবা কেন্দ্রের বাৎসরিক উৎসব গত ১০ই

হইতে ১৩ই জানুআরি অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই স্বামী ওঁকারানন্দ মহারাজ স্বামীজীর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যপ্রদান করেন ও প্রদীপ জ্বালাইয়া দেন। অতঃপর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ও কেন্দ্রের কর্মীরা পাড়ার অধিবাসীদের সহিত বস্তি পরিষ্কার করে। বৈকালে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সন্ধ্যার পর ছাত্রেরা 'ডাকঘর' অভিনয় করে।

১১ই সকালে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়, ৫০ জন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। বৈকালে স্বামী অসীমানন্দ ও স্বামী নির্বাণানন্দ মহারাজ স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইহার পর শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বক্তৃতা করেন। রাত্রে সারদামণি নৈশ বিদ্যালয়ের বয়স্ক ছাত্রগণ কর্তৃক 'বঙ্গে বর্গী' অভিনীত হয়।

১২ই সকালে সানাই-প্রতিযোগিতায় আটটি দল অংশ গ্রহণ করে। বৈকালে শিশুদের পুরস্কার দেওয়া হয়। রাত্রে 'বাঘা যতীন' চলচ্চিত্র দর্শন করিতে প্রচুর লোক-সমাগম হইয়াছিল।

১৩ই রাত্রে 'দেবলাদেবী' অভিনীত হয়। ১৪ই প্রায় ২,০০০ লোক এক সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পায়। বৈকালে পুতুলনাচ ও রাত্রে বিচিত্রানুষ্ঠান হয়।

ঢাকা: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব গত ৫ই হইতে ১০ই ফাল্গুন পর্যন্ত সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তিথিপূজা, বৈদিক স্তোত্রাদি পাঠ, হোম, জীবনচরিত পাঠ ও আলোচনা, ভজন, রামায়ণ-গান, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা উৎসব পালন করা হয় এবং শেষ দিবসে (১০ই ফাল্গুন) একটি ধর্মসমন্বয়-সভার অনুষ্ঠান করিয়া উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

ধর্মসভার সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ মাহ্‌মুদ হোসেন তাঁহার ভাষণে বলেন যে, এই দুই মহামানব ধর্মজগতে এক নূতন আলোর সন্ধান দিয়াছেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন, এই মিশনের মহৎ কার্য আজ সারা জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সর্বশ্রেণীর মানুষকে প্রেরণা দান করিতেছে।

বৌদ্ধ কৃষ্টিপ্রচার-সংঘের সভাপতি ভিক্ষু বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণীর সামঞ্জস্য দেখাইয়া বলেন, মানুষ সেবা ও কর্মের দ্বারাই বুদ্ধত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। শ্রীচারু চৌধুরী শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

শিক্ষাপ্রদর্শনী

রহড়া (২৪ পরগনা)**:** রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে ২২শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে একটি শিক্ষা ও কুটীরশিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বালকাশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের নানা রকম হাতের কাজ ব্যতীত বাহিরের বহু প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনী ও উৎসবে যোগদান করে। ছাত্রদের হাতের কাজের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় রেলগাড়ী, এরোপ্লেন, জাহাজ, বিভিন্ন রকম খেলনা, নানারকম চিত্র ও চার্টের মাধ্যমে ভারতের লোক-গণনা, ভারতের কোথায় কি ফসল পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক কি রকম ঘর-বাড়ীতে কিভাবে বাস

করে এবং আদি-মানুষ কিভাবে ক্রমশঃ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে ইত্যাদি বিষয় বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। প্রদর্শনীতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নানা রকম আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা ছিল; পুতুলনাচ, শারীরিক ব্যায়াম, চলচ্চিত্র, যাত্রা, ভজন-সঙ্গীত, কীর্তন, রামায়ণ-গান, মহাভারত, ভাগবত ও গীতাপাঠ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উৎসবের প্রথম দিন বিশেষ পূজা, হোম অনুষ্ঠিত হয় এবং বহু সাধু ও ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন। বিরাট সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলের মধ্যে আনন্দানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সাত দিন যাবৎ হাজার হাজার নরনারী এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এই এই প্রদর্শনী ও উৎসবে যোগদান করে। রবিবার দিন সন্ধ্যায় প্রায় ৫০,০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল; এই দিন সকাল হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্যন্ত বহু নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা

নরেন্দ্রপুর: পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় গত ১৮ই হইতে ২৬শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ-শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধীয় প্রদর্শনীতে বহু শিক্ষণীয় বিষয় দেখানো হয়। মেলায় অনেক দোকানপাট বসে।

আনন্দদায়ক কর্মসূচীর মধ্যে যাত্রা, গাদিখেলা, বাজিপোড়ানো উল্লেখযোগ্য। উৎসবের শেষ দিন কৃষক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গ্রাম হইতে কৃষক-প্রতিনিধিগণ আসিয়া কৃষি-সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন।

পুরস্কার-বিতরণোৎসব

বেলুড় বিদ্যামন্দির: গত ২৬শে ফেব্রুআরি রবিবার বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডক্টর ত্রিগুণা সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাগৃহে অভিভাবক, অধ্যাপক, গণ্যমান্য অতিথি এবং রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যামন্দিরের কতিপয় ছাত্র তাহাদের আবৃত্তি ও সঙ্গীত দ্বারা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

তদনন্তর কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন এবং ঐ প্রসঙ্গে বিদ্যামন্দিরের শিক্ষাদর্শ ও বিভিন্ন পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। তিনি বলেন, বিদ্যামন্দির বর্তমানে (বি. এ. ও বি. এস-সি) ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হইয়াছে, এবং শীঘ্রই বিদ্যামন্দির সহ আরও কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—যথা শিক্ষণ-মন্দির (বি. টি. কলেজ), শিল্পমন্দির (লাইসেন-সিয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ), সমাজসেবা শিক্ষণ কলেজ (S.E.O.T.C.), তত্ত্বমন্দির (উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র) প্রভৃতি লইয়া প্রস্তাবিত 'বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সভাপতি ডক্টর ত্রিগুণা সেন বিদ্যামন্দিরের অধ্যয়নানুকূল শান্ত পরিবেশ, ছাত্র ও শিক্ষক-গণের প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শৃঙ্খলাবিধান ও ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে নৈতিক ছাত্র-গঠনমূলক যুগোপযোগী শিক্ষাদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বিদ্যামন্দির শিক্ষার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল আদর্শ সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর।

আমেরিকায় বেদান্ত

হলিউড: বেদান্ত সোসাইটি: কেন্দ্রাধ্যক্ষ: স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ ও স্বামী ঋতজানন্দ। রবিবাসরীয় বক্তৃতা:

আগস্ট: কর্মযোগ; ধর্ম ও বিশ্বাস; ভক্তিযোগ; ঈশ্বরানুভূতির লক্ষণ।

সেপ্টেম্বর: আত্মাকে জানিবার উপায়; ধ্যান ও আনন্দ; প্রার্থনা কাহাকে বলে? মুক্তির পথ।

অক্টোবর: ঈশ্বরের মাতৃভাব; তত্ত্বমসি; আধ্যাত্মিক অনুভূতি কি? রাজযোগ; ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে প্রেম।

নভেম্বর: পুরুষকার ও শরণাগতি; মৌনাভ্যাস; সদাচার।

ডিসেম্বর: শ্রীশ্রীমা; যোগ কি সাধ্যায়ত্ত? অবতার-বাদ; খৃষ্ট বলিতে কি বুঝি?

এতদ্ব্যতীত আগস্ট মাস ছাড়া প্রতি মঙ্গলবারে ভাগবত এবং বৃহস্পতিবারে কঠোপনিষদের ক্লাস হয়।

সান্টা বারবারা শাখাকেন্দ্রে রবিবারের বক্তৃতা:

আগস্ট: গীতার অধ্যাত্ম উপদেশ; দৈবী লীলা; অনন্তের সন্ধানে; শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক জীবন।

সেপ্টেম্বর: মনোনিবেশ ও সুখ; বিশ্বাস ও যুক্তি; মুক্তির উপায়; অধ্যাত্ম জীবনে আদর্শ।

অক্টোবর: বিশ্বজননী; বাসনা ও তাহার পরিপূর্তি; তুমিই ব্রহ্ম, ধ্যানের প্রণালী; যোগ-বিজ্ঞান।

নভেম্বর: সেবায় আনন্দ; বিধিলিপি ও ঈশ্বর; নীরবতা।

ডিসেম্বর: আধ্যাত্মিক রূপান্তর; শ্রীশ্রীমা; মানবতা ও ঈশ্বরত্ব; খৃষ্টবাণী।

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলবারে গীতা ক্লাস হয়।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বারাসত: গত ১৭ই হইতে ১৯শে ফেব্রুআরি বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, ভজন, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও রামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠ, বক্তৃতা ও প্রসাদবিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামী সংশুদ্ধানন্দ ও স্বামী জীবানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী', এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ও শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল 'শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বাবুগঞ্জ (হুগলি): হুগলি জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৭ই হইতে ১৯শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত হুগলি বাবুগঞ্জ-স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্কে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দিবসে শত শত ভক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, আরতি, মহাভারত পাঠ, রামায়ণগান, কালীকীর্তন, চণ্ডীগান, লীলাকীর্তন, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৮ই ফেব্রুআরি স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ বিশ্লেষণ করেন। ১৯শে ফেব্রুআরি ৫,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আজমীর: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৫ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারতি, প্রার্থনা, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, প্রসাদ-বিতরণ এবং ধর্মসভা হয়। ৭ই ফাল্গুন রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মোহন সিংহ মেহতার সভাপতিত্বে স্থানীয় টাউন হলে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। মঞ্চোপরি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদিতে সুশোভিত করা হইয়াছিল। স্বামী শিবস্বরূপানন্দ, পণ্ডিত কিষনলাল ত্রিবেদী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত আরও তিন চারি দিন আজমীর, কিষণগড় ও জয়পুরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবেদ আলোচিত হয়।

রৌরকেলা: ১৭ই ফেব্রুআরি তিথিপূজা হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে ফেব্রুআরি সকাল হইতেই ধর্মমূলক নানা কর্মসূচী পালিত হয়। সন্ধ্যা ৬টায় রৌরকেলা ইস্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসাম্বশিবম্ (S. Sambasivam)-এর পৌরোহিত্যে একটি সভায় কয়েক সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। সভারম্ভের পর বহু সভ্যের ইচ্ছানুযায়ী উক্ত সভাতেই নির্দিষ্ট বিষয়ে (আণবিক যুগে ধর্মের কোন প্রয়োজন আছে কি না ?) স্বামী মহানন্দ এক স্বতঃস্ফূর্ত ইংরেজী ভাষণ দেন। শ্রীভেঙ্গুস্বামী (S. Venguswamy, Finance Officer) শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বাণী ইংরেজীতে আলোচনা করেন। সভাশেষে জেনারেল ম্যানেজার মনোজ্ঞ ইংরেজী ভাষায় সভার বক্তব্যাদি বিশ্লেষণ করেন। সভায় বহু দক্ষিণ-ভারতবাসী, উৎকলবাসী, শিখ, বাঙালী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

পরের দিন সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় বাঙালীদের আগ্রহে স্বামী মহানন্দ তাঁহাদের প্রশ্নোত্তরে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বোঝান। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব এখানে এই প্রথম।

কৃষ্ণনগর: স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৪ঠা ও ৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ ও শঙ্কর মিশনের মহাবীরচৈতন্য 'স্বামীজী' সম্বন্ধে বলেন। দ্বিতীয় দিন প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর বিশেষ পূজা হয় এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণের পর অপরাহ্নে সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে বলেন স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী, স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর পরেশনাথ ভট্টাচার্য (সভাপতি)। আরাত্রিক ভজনের পর রাত্রে কালীকীর্তন হয়।

কলাইঘাটা: গত ১৫ই ফাল্গুন রবিবার রানাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে কলাই-ঘাটায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব নানা পবিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। বহু ভক্ত নরনারী ও বালকবালিকার সমাগমে উৎসব-প্রাঙ্গণ সারাদিন আনন্দমুখরিত হইয়া উঠে। প্রাতে পূজা, হোম, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদির পর দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ স্থানের অন্যতম আকর্ষণীয় বস্তু বিশাল বটবৃক্ষ-তলে বসিয়া কয়েক সহস্র ভক্তের প্রসাদ-গ্রহণ। উৎসব-প্রাঙ্গণে সরকার কর্তৃক একটি নলকূপ

স্থাপিত হওয়ায় পানীয় জলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ধর্মসভায় স্থানীয় কয়েকজন ভক্ত কিছু বলিবার পর স্বামী নিবৃত্তানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন বিশদভাবে আলোচনা করেন।

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের উদ্বোধন

গত ১০ই মার্চ দক্ষিণ দমদমের নয়াপট্টি রোডে রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের পরিচালনায় মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি আবাসিক কলেজের উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ। বিদ্যায়তনটির নাম 'বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন' রাখা হইয়াছে। আগামী জুলাই মাস হইতে এই আবাসিক বিদ্যায়তনে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স চালু করা হইবে।

কলিকাতার কাছেই যশোহর রোডের ধারে মনোরম পল্লী-পরিবেশের মধ্যে ৩৩ বিঘা জমির উপর এই সম্পত্তিটি রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনকে দান করেন দমদমের বদান্য নাগরিক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

নির্মীয়মাণ বিদ্যায়তনটির আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিচয় দিয়া রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বলেন যে, এই বিদ্যায়তনটিতে প্রাচীন গুরুকুল প্রথার আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্তমান কালোপযোগী শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হইবে। মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানটির জন্য সম্পাদিকা যথাযোগ্য সরকারী আনুকূল্যের আবেদন জানান। প্রধান অতিথি রাজ্য সরকারের শিক্ষাসচিব তাঁহার ভাষণে রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের এই মহতী প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোক-কুমার সরকার তাঁহার ভাষণে বলেন যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির একটি বড় দুর্বলতা, তাহার মধ্যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার কোন স্থান নাই। স্বামীজী-প্রবর্তিত শিক্ষাদর্শই আজ প্রয়োজন। ডঃ রমা চৌধুরী বলেন যে, এই বিদ্যামঠ যেন একাধারে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মূর্ত প্রতীক হইয়া উঠে।

স্বামী মাধবানন্দজী রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের উৎপত্তির ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলেন, রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন আইনতঃ রামকৃষ্ণ মিশন হইতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হইলেও একেবারে পৃথক্ নয়, আদর্শের দিক দিয়া ইহা রামকৃষ্ণ মিশনেরই পরিপূরক। নারীজাতির সমস্যার সমাধান নারীরাই করিবে—স্বামী বিবেকানন্দের এই ইচ্ছাকে রূপায়িত করিবার জন্য গত বৎসর সারদা মঠের সন্ন্যাসিনীগণ রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন গঠন করেন। এখানে তাঁহারা রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পতাকাতলে ত্যাগ ও সেবাদর্শে নারীজাতি ও শিশুদিগের কল্যাণোদ্দেশ্যে কার্যসূচী অনুসরণ করিবেন। তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা যে ঈশ্বরেচ্ছার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, তাহার একটি নিদর্শন—এই মিশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই দমদমের দানশীল অধিবাসী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এই সুবিস্তৃত জমি ও বাড়ী মহৎ উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন।

ত্রিশরণ-মন্ত্র

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি॥
সংঘং সরণং গচ্ছামি॥।

আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করি।
আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করি।
আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করি।

ভিক্ষুরা এই ত্রিশরণ-মন্ত্রেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিতেন :

আমি বুদ্ধের শরণ লইতেছি; তিনি পূর্ণতা-প্রাপ্ত, পবিত্র ও সর্বপ্রধান। বুদ্ধের নিকট আমরা উপদেশ ও জ্ঞান পাই। তিনি পুণ্যাত্মা, তিনি সত্তার স্বরূপ জানেন, তিনি ভূমণ্ডলের অধীশ্বর,...তিনি দেব ও মনুষ্যের শিক্ষক, আদর্শ পুরুষ বুদ্ধ। আ   সবিশ্বাসে বুদ্ধে আস্থা স্থাপন করি।

অ. ম ধর্মের শর লইতেছি; মহাপুরুষের প্রচারিত ধর্ম সুফল প্রসব করিয়াছে; মনুষ্যের নিকট ইহা প্রকাশিত, ইহা দেশ ও কালের অতীত। ইহা প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, দেখিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য ইহা সকলকে আহ্বান করে। ইহা মঙ্গলজনক; জ্ঞানিগণ স্বীয় অন্তরে ইহা উপলব্ধি করেন। আমি সবিশ্বাসে ধর্মে আস্থা স্থাপন করি।

আমি সংঘের শরণ লইতেছি; বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায় আমাদিগকে ন্যায়মার্গ প্রদর্শন করেন। বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায় আমাদিগকে সাধু ও ন্যায়পরায়ণ হইতে শিক্ষা দেন, বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায় আমাদিগকে সত্যপালনে শিক্ষা দেন, ঐ সম্প্রদায় পরোপকারে নিরত। **আমি সবিশ্বাসে ঐ সম্প্রদায়ে আস্থা স্থাপন করি।**

কথাপ্রসঙ্গে

একটি 'আধ্যাত্মিক' ধর্মের সন্ধানে

[প্রস্তাবনা]

পৃথিবীতে যে ধর্মের অভাব আছে, এ কথা কেহ বলিবে না; বরং ধর্মের বাহুল্যই নানাবিধ অশান্তির কারণ, এই কথাই অনেকে বলিয়া থাকেন; অনেকে তাই 'ধর্ম'কে বাতিল করিয়াই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টাশীল।

তবে এমন লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা মনে করেন, বর্তমান যুগের সর্ববিধ দুঃখের কারণ ধর্মভাবহীনতা; অর্থাৎ ধর্ম-সম্প্রদায়ের অভাব না থাকিলেও ধর্ম আচরণের অভাব যথেষ্ট আছে, এবং সর্বত্র মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস শিথিল হইতেছে। যদি এইভাবে চলিতে থাকে, তবে ধর্মের—তথা মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এই উভয়বিধ কথা শুনিতে শুনিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি; তথাপি মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রকৃত সত্য কোন্‌টি? গোলমাল শুরু হইয়াছে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ লইয়া। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষ 'ধর্ম' বলিতে ঠিক একই বস্তু বুঝে না, একই দেশে বিভিন্ন সময়ে 'ধর্মে'র অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে। ধর্মের পরিবর্তনশীল রূপের পশ্চাতে তাহার চিরন্তন রূপটি ধরিতে হইবে। সেইটিই ধর্মের 'আধ্যাত্মিক' রূপ; তাহারই সন্ধানে আমরা চলিয়াছি।

তৎপূর্বে ধর্মের বিরোধিতার কারণগুলি অর্থাৎ শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ মানব কেন ধর্মের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে, তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

ধর্মের বিরোধিতা একটা নূতন কিছু নয়। ধর্ম যতদিনের, ধর্মের বিরোধিতাও ততদিনের; মানব-প্রকৃতিতেই দেহবাদ এবং অতীন্দ্রিয়বাদ—দুই বিরোধী ভাব রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে। দেহবাদীর ধর্ম জড়বাদ (materialism), অতীন্দ্রিয়বাদীর ধর্ম আধ্যাত্মিকতা বা চৈতন্যবাদ। তবে দ্বিতীয়টিকেই আমরা 'ধর্ম' নামে অভিহিত করিয়া থাকি।

কখন কখন দেখা যায়—শুধু অসৎ ব্যক্তিরাই ধর্মের বিরোধিতা করিতেছে, সৎ ব্যক্তিরা সেই বিরোধিতা দূরীভূত করিয়া ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কোন কোন যুগে দেখা যায় বুদ্ধিমান্ এবং সৎ-রূপে পরিচিত ব্যক্তিরাও ধর্মের বিরোধিতা করিতেছেন—যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া ধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন কবিতেছেন। তখনই ব্যাপারটি সমস্যার আকারে দেখা দেয়। বর্তমানে এইরূপই হইয়াছে।

এরূপ হইবার প্রধান কারণ—যাঁহারা বিভিন্ন ধর্মের নামাঙ্কিত পতাকা বহন করেন, তাঁহারা সেই সেই ধর্মের প্রচারিত আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করেন না; তাঁহারা ভুলিয়া যান—ধর্ম শুধু প্রচারের জিনিস নয়, আচরণের জিনিসও বটে—'আচারপ্রভবো ধর্মঃ'।

ধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ধর্ম সম্বন্ধে পৌরাণিক (mythological) এবং শাস্ত্রীয় (classical) বিশ্বাস—ইহা ঈশ্বরাদিষ্ট (Inspired) বা ঈশ্বর-প্রকাশিত (Revealed)।

পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকগণ (anthropologist) মানবমনের ক্রমবিকাশের পথেই ধর্মভাবের আবির্ভাব লক্ষ্য করেন। প্রত্নতত্ত্ব, পুরাকালের সাহিত্য এবং আদিম বা তথাকথিত অসভ্য জাতিদের জীবনযাপন-

কথাপ্রসঙ্গে

একটি 'আধ্যাত্মিক' ধর্মের সন্ধানে

[প্রস্তাবনা]

পৃথিবীতে যে ধর্মের অভাব আছে, এ কথা কেহ বলিবে না; বরং ধর্মের বাহুল্যই নানাবিধ অশান্তির কারণ, এই কথাই অনেকে বলিয়া থাকেন; অনেকে তাই 'ধর্ম'কে বাতিল করিয়াই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টাশীল।

তবে এমন লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা মনে করেন, বর্তমান যুগের সর্ববিধ দুঃখের কারণ ধর্মভাবহীনতা; অর্থাৎ ধর্ম-সম্প্রদায়ের অভাব না থাকিলেও ধর্ম আচরণের অভাব যথেষ্ট আছে, এবং সর্বত্র মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস শিথিল হইতেছে। যদি এইভাবে চলিতে থাকে, তবে ধর্মের—তথা মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এই উভয়বিধ কথা শুনিতে শুনিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি; তথাপি মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রকৃত সত্য কোন্‌টি? গোলমাল শুরু হইয়াছে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ লইয়া। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষ 'ধর্ম' বলিতে ঠিক একই বস্তু বুঝে না, একই দেশে বিভিন্ন সময়ে 'ধর্মে'র অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে। ধর্মের পরিবর্তনশীল রূপের পশ্চাতে তাহার চিরন্তন রূপটি ধরিতে হইবে। সেইটিই ধর্মের 'আধ্যাত্মিক' রূপ; তাহারই সন্ধানে আমরা চলিয়াছি।

তৎপূর্বে ধর্মের বিরোধিতার কারণগুলি অর্থাৎ শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ মানব কেন ধর্মের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে, তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

ধর্মের বিরোধিতা একটা নূতন কিছু নয়। ধর্ম যতদিনের, ধর্মের বিরোধিতাও ততদিনের; মানব-প্রকৃতিতেই দেহবাদ এবং অতীন্দ্রিয়বাদ—দুই বিরোধী ভাব রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে। দেহবাদীর ধর্ম জড়বাদ (materialism), অতীন্দ্রিয়বাদীর ধর্ম আধ্যাত্মিকতা বা চৈতন্যবাদ। তবে দ্বিতীয়টিকেই আমরা 'ধর্ম' নামে অভিহিত করিয়া থাকি।

কখন কখন দেখা যায়—শুধু অসৎ ব্যক্তিরাই ধর্মের বিরোধিতা করিতেছে, সৎ ব্যক্তিরা সেই বিরোধিতা দূরীভূত করিয়া ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কোন কোন যুগে দেখা যায় বুদ্ধিমান্ এবং সৎ-রূপে পরিচিত ব্যক্তিরাও ধর্মের বিরোধিতা করিতেছেন—যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া ধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিতেছেন। তখনই ব্যাপারটি সমস্যার আকারে দেখা দেয়। বর্তমানে এইরূপই হইয়াছে।

এরূপ হইবার প্রধান কারণ—যাঁহারা বিভিন্ন ধর্মের নামাঙ্কিত পতাকা বহন করেন, তাঁহারা সেই সেই ধর্মের প্রচারিত আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করেন না; তাঁহারা ভুলিয়া যান—ধর্ম শুধু প্রচারের জিনিস নয়, আচরণের জিনিসও বটে—'আচারপ্রভবো ধর্মঃ'।

ধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ধর্ম সম্বন্ধে পৌরাণিক (mythological) এবং শাস্ত্রীয় (classical) বিশ্বাস—ইহা ঈশ্বরাদিষ্ট (Inspired) বা ঈশ্বর-প্রকাশিত (Revealed)।

পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকগণ (anthropologist) মানবমনের ক্রমবিকাশের পথেই ধর্মভাবের আবির্ভাব লক্ষ্য করেন। প্রত্নতত্ত্ব, পুরাকালের সাহিত্য এবং আদিম বা তথাকথিত অসভ্য জাতিদের জীবনযাপন

ধর্মগুরু-কর্তৃক আরব্ধ হইয়া, দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, কতকগুলি এখনও ক্রমবর্ধমান। প্রচারশীল ও প্রসারশীল ধর্মের মধ্যে খৃষ্টান ও ইসলামই প্রধান।

দেখা যায়, ধর্মমাত্রেই আচরণ অপেক্ষা আচারই বড় কথা, কতগুলি রীতি-নীতি পালন করাই প্রধান; প্রচারশীল ধর্মগুলির মধ্যে আবার বিশ্বাসই প্রথম ও শেষ কথা—একটি ধর্মগুরু ও একটি ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস; সেইজন্য এই ধর্মগুলি Faith (বা বিশ্বাস) নামে অভিহিত।

হিন্দুধর্ম সাধারণতঃ প্রচারশীল নয়। আর্যেরা অবশ্য অপরকে আর্যকৃষ্টিতে দীক্ষিত করিতেন। ইহুদী ধর্ম প্রথমে প্রচারশীল ছিল, পরে ইহা হিন্দুর মতো জন্মগত হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম প্রচারশীল বটে, তবে তাহার পদ্ধতি বুদ্ধির পথে—বোধির পথে, ধীর মন্থর গতিতে। খৃষ্টান- ও ইসলাম-ধর্ম প্রচারে অত্যন্ত উৎসাহী; ইহাদের প্রত্যেকের ধারণা, একদিন সমগ্র পৃথিবী তাহার ধর্মে ধর্মান্তরিত হইবে, তাহাতেই পৃথিবীর শান্তি ও মানুষের কল্যাণ। পরিতাপের বিষয়—এই স্বতোবিরুদ্ধ চিন্তার মধ্যেই সংঘর্ষ ও অশান্তির বীজ নিহিত রহিয়াছে, ইহা তাহারা বুঝিযাও বোঝে না।

পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, শান্তভাবে প্রচারিত বৌদ্ধের সংখ্যা আজও খৃষ্টান অপেক্ষা অধিক। অসিমুখে প্রচারিত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা নিরীহ হিন্দু অপেক্ষা আজও কম। একটা সাম্রাজ্যবাদী জিগীষু মনোভাবই ঐ প্রচারশীল ধর্মগুলিকে পাইয়া বসিয়াছে।

আজ যখন সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ নিন্দিত ও ধিকৃকৃত হইয়া বর্জিত হইতেছে, তখন প্রতিযোগিতামূলক ধর্মপ্রচার সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের মনকে প্রভাবিত করিতে পারিতেছে না। তাহাদের মনে ধর্মের প্রযোজনীয়তা সম্বন্ধেই নানা প্রশ্ন উঠিতেছে, শুধু বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্ম আধুনিক যুক্তিবাদী মনের পিপাসা মিটাইতে অক্ষম।

ধর্মে ধর্মে বিরোধই আজ মানুষের মনকে ধর্মবিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের নামে, মানুষের কল্যাণের নামে যাহারা গালাগালি কাটাকাটি রেষারেষি করে, তাহারা ধর্মাচরণ করিতেছে, না অন্য কিছু করিতেছে, আজ এ কথা ভাবিবার সময় আসিয়াছে; এ কথা ভাবিবার অধিকার মানুষ-মাত্রেরই আছে, এবং আছে বলিয়াই আজিকার মানুষ মনে করে—ঐ ধর্ম জিনিসটা বাদ দিলেই ধর্মসংক্রান্ত সকল বিরোধও অন্তর্হিত হইবে।

ধর্মের অপব্যবহার হইতে বা ধর্ম-আচরণে অক্ষমতা হইতে—ধর্মের মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়াতেই এই অবস্থার ও মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন আমাদের দেখিতে হইবে, ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য কি। স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আমরা বুঝিয়াছি, অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বিকশিত করাই ধর্ম। সংকীর্ণ সীমার বন্ধন হইতে অসীম মুক্তভাব অনুভব করাই ধর্ম।

বর্তমান মানবের ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি, ধর্মধ্বজীদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও বিদ্বেষ-পূর্ণ ব্যবহারই উহার প্রধান কারণ। যাঁহারা ধর্মের পতাকা বহন করেন, তাঁহাদের কথায় বার্তায় আচরণে উদার ভাব একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারা যে-ঈশ্বরের কথা বলেন ও প্রচার করেন, সেই ঈশ্বর যেমন অনন্তভাবময়, তাঁহার বিষয়ে কথাবার্তাও সেইরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ নিজমনের সংকীর্ণতা

স্বার্থপরতা মলিনতা দিয়া ঈশ্বরের যে ছবি আঁকিয়াছে, তাহাকেই একমাত্র সত্য মনে করিয়া বলে : ঈশ্বর শুধু একটি বিশেষ গণ্ডীর পরিত্রাতা, তিনি একটি বিশেষ বিশ্বাস-সম্পন্ন গোষ্ঠীর জন্য, আমরাই তাঁহার সেই চিহ্নিত স্বজন, ঈশ্বরের রহস্য আমাদেরই কাছে উদ্‌ঘাটিত। আজিকার যুক্তিবাদী মন এ কথা স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।

যে কেহ আমার ধর্মে, ধর্মশাস্ত্রে বা ধর্মগুরুতে বিশ্বাস করিবে না, সে অনন্ত নরকে যাইবে—এ কথা শুনিয়া বিংশ শতাব্দীর একটি বালকও হাসিয়া উঠিবে! ব্যাপার তখনই গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়, যখন এই ভ্রান্তনীতির উপর বিশ্বাস করিয়া মানুষ অপরকে ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করে; এবং স্বর্গের লোভে বা নরকের ভয়ে ও ধর্মান্তরগ্রহণে যে রাজী হইল না, সে ইহলোকে বাঁচিয়া থাকার অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইল। এ যুগের মানবতাবাদী মন এইরূপ হিংসাভিত্তিক বিশ্বাসকে কখনই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। তাই আজিকার মানুষ প্রচারশীল ধর্মের এই সাম্প্রদায়িক রূপ দেখিয়া ধর্মের উপরই বিরক্ত। তবু দেশে দেশে মুষ্টিমেয় মনীষী আজ ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধানে প্রাচীন এবং লুপ্ত ধর্মগুলিকেও নূতন করিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন, খুঁজিতেছেন, কোন্ ধ্বংসস্তূপে কি মহামূল্য মণিরত্ন অবহেলায় পড়িয়া রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশে ধর্মের উপর অনাস্থার আরও একটি কারণ, ইওরোপের নবজাগরণের যুগে অপ্রত্যক্ষ ধর্মবিশ্বাস প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের বিরোধিতা করিয়াছিল, এবং ধর্মনেতাগণ একাধিক বৈজ্ঞানিককে নির্যাতিত করিয়াছে। সৌরজগতের তথ্য-আবিষ্কর্তা ব্রুনোকে তাহারা জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছে, গ্যালিলিওকে কারারুদ্ধ করিয়াছে, কোপার্নিকাসের পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। ধর্মনেতাদের এই সকল কুকীর্তি পরবর্তীকালের মানুষ ক্ষমা করে নাই। বৈজ্ঞানিক মন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতই প্রকৃতির রহস্য-যবনিকা অপসারিত হইয়াছে, ততই মানুষ ধর্মপুস্তকে লিখিত কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি অস্বীকার করিয়া যুক্তি ও প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানকেই জীবনের নির্ভরযোগ্য নির্দেশদাতারূপে গ্রহণ করিয়াছে। জীবন-ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাস আজ আর বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

বিজ্ঞানের অপ্রতিহত উন্নতির পর মানুষের যুক্তি আজ ক্লান্ত।, দিশাহারা জড়বিজ্ঞান নিজেই আজ চরম প্রশ্নের সম্মুখীন : ততঃ কিম্? জড় সত্য, না চৈতন্য সত্য? জীবনের নিয়ামক যুক্তি, না বিশ্বাস?—বিজ্ঞান, না ধর্ম? বিজ্ঞানকে ধর্মে রূপান্তরিত করা কি সম্ভব? না ধর্মের কোন বৈজ্ঞানিক রূপ আছে? ··· এই প্রশ্নগুলির উত্তরের উপরই নির্ভর করিতেছে আগামী যুগের মানুষের সুখ ও শান্তি।

In every exact science there is a basis which is common to all humanity, so that we can at once see the truth or the fallacy of the conclusions drawn therefrom. Now the question is, has religion any such basis or not?

Introductory Chapter, Raja Yoga—Swami Vivekananda

চলার পথে

'যাত্রী'

তপস্বী বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত ঊষর বুকে, ভারতে আমরা দুটি মরূদ্যান দেখতে পাই; একটি ধর্মের, আর একটি সাহিত্যের। প্রথমটি ভগবান বুদ্ধ, আর দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথ।

ধর্মের গ্লানিতে জর্জরিত পৃথিবীকে মুক্ত করতে এলেন শ্রীবুদ্ধ—তাঁর আগমনে ঊষর কর্মকাণ্ডে এল জ্ঞান ও প্রেমের সবুজ স্বীকৃতি। লোকে বুঝল, ধর্ম কি, সত্য কি; আর বুঝল, মহানন্দের আস্বাদন ও সেই নির্বাণের আত্মিক আকর্ষণ কি?

বাংলা সাহিত্যের ক্ষীণধারা যখন মুমূর্ষু, যখন তাতে অসাহিত্যের গ্লানি নানান শৈবালদলের অসংখ্য বাধা দিয়ে সাহিত্যের সহজ প্রবাহটিকে নিরুদ্ধ করতে চেয়েছিল, তখন বাংলা সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তাঁর আগমনে সাহিত্যের মজা-নদীতে এল প্লাবন, এল জোয়ার। সাহিত্যের মরা-খাতে জাগলো ভরা-ভাদরের উচ্ছ্বসিত তটপ্লাবী স্রোতসহস্রী। বাংলা সাহিত্যের এই সুরধুনীর নব ভগীরথ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কণ্ঠে আবার আমরা শুনলাম মানুষের মর্ম-বাণী—ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী। বেদান্তের অভীমন্ত্রে—ঋক্-মন্ত্রের মৃত্যুতরণ-তীর্থে স্নান করেই তিনি শোনালেন—'মরণকে তুই পর করেছিস ভাই, জীবন যে তোর তুচ্ছ হ'ল তাই।' ভারতাত্মার মহিমময় রূপটিকেও ঐ সঙ্গে তিনি বাঙ্ময় ক'রে তুললেন, গাইলেন—'আলয় গড়িতে সবে চায়, যবে হায়, প্রাণপণ করে তাহা সমাপন, খেলারি মতন ভেঙে যায়।' কঠোপনিষদের সেই সাবধানী বাণী—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ'—শুনেও মানুষ যুগে যুগে সেই দুর্গম পথেই অধরাকে ধরার জন্য অভিযান চালিয়ে গেছে; সেই মরণজয়ী অভিযানের মূল সুরই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উদ্ঘোষিত—'উড়াবো ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথমাঝে।' আবার বলেছেন—'দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।'

কিন্তু এই সন্ধানী আলোর নির্দেশ আমরা মানি কই? আর মানি না বলেই তো সংসারে জড়িয়ে পড়ি। সংসারের 'সং' ও 'সার' এই দুই-এর মাঝে 'সং' সেজেই জীবনটাকে কাটিয়ে দিই—'সার' আর লাভ করা হয় না। শেষের সেই দিনে তাই অনুশোচনা জাগে। তখন কিন্তু জীবনের সেই অকেজো দিনগুলোকে আবার কাজের মাঝে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা থাকে না। শুধু এক মর্মন্তুদ হাহাকার মার্লোর 'ডাঃ ফাউস্টস্'-এর মতোই ক্রন্দনাতুর হয়ে বলতে চায়—'...for the vain pleasure of twenty years hath Faustus lost eternal joy and felicity.' জীবনের এই অযথা ফুরিয়ে-যাওয়া, মরচে-পড়ে-যাওয়া জীবনটাকে তখন কেমন যেন বিস্বাদ ও নিঃসঙ্গ ব'লে মনে হয়; মনে হয়—'How dull it is to pause, to make an end, to rust unvarnished, not to shine in use! As though to breathe were life.'

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আধুনিক ভাষায়—'কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত? উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা। প্রাক্-পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত, বিগত সবাই, তুমি অসহায়

একা !' জীবনের এই অসহায় 'একা' অবস্থার স্বষ্টিকর্তা আমি নিজেই। তাইতো রবীন্দ্রনাথ বললেন—'আমি গাঁথি আপনার চারিদিক ঘিরে সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন ; মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে, দেখি না এ জগতের প্রকাশ্য জীবন।' সেই প্রকাশ্য জীবন দেখতে হ'লে আমার আমিত্বকে বৃহত্তর জীবন-চৈতন্যে বিছিয়ে দিতে হবে। একটা প্রীতিস্নিগ্ধ সহানুভূতি দিয়ে সকলকে আপন মিত্র বলে কাছে টানতে হবে ; গাইতে হবে যজুর্বেদের ভাষায়ঃ 'দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে, মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।'—হে মহাবীর, জরা-জর্জরিত আমার শরীরকে দৃঢ় কর ; সর্বজীব যেন আমাকে বন্ধুর চোখে দেখে ; আমিও যেন সর্বভূতকে মিত্রের চোখে দেখি ; সকলে আমার প্রিয় হোক, দ্রোহহীন শান্তিতে আমার জীবন প্রবাহিত হোক—(৩৬।১৮)। এই ভাবে সকলকে আপনার বোধ করবার পূর্বেই আমার সত্যকারের আমিত্বকে চিনতে হবে। দেহসর্বস্ব 'আমি'কে চিনলে হবে না। কারণ দেহটা তো আকাশের রামধনুর মতোই সুন্দর, আবার রামধনুর মতোই একদিন তা মিলিয়ে যাবে। তাই দেহাতীত 'আমাকে' চিনতে হবে। বলতে হবে শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—'I shall not die. Although this body, when the spirit tires, Of its cramped residence, shall feed the fires, My house consumes, not I'.

এই বিশ্বানুভূতির কথা স্মরণ করেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'আমায় তুমি ফুলে ফুলে ফুটিয়ে তুলে দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে ; আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে ; আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে নূতন ক'রে পেলে।' এইখানেই সীমিত জগতের সঙ্গে উদার পৃথিবীর সংযোগ। দেহবৃন্তের 'আমির' সঙ্গে অন্তরাত্মার পরিস্ফুটন।

আমাদের অতীতের মধুর স্মৃতির বৃথা রোমন্থনে ডুবে থাকবার অধিকার নেই। আমাদের চলতে হবে—'চরৈবেতি' আমাদের আদর্শ। কবির ভাষায় আমরা ব'লব : 'তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে, তাকাস্‌নে ফিরে ; সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি মহাস্রোতে, পশ্চাতের কোলাহল হোতে অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।'

এই 'অকূল আলোতে'—এই নবজীবনের প্রতিশ্রুতির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ আবার শ্রীবুদ্ধের মহাদানকে বহুভাবে স্বীকার করেছেন। তাইতো তাঁর কাব্যে, তাঁর লেখায় বুদ্ধের এত প্রশস্তি, এত জয়গান। তাঁকে স্মরণ ক'রে কত কবিতা—কত কথিকাই না রবীন্দ্র-রচনায় রূপ পেল। বুদ্ধের মহান্ ধর্মের প্রতি কবির একটা গভীর অনুরাগ ছিল ; একটা সত্যশরণ বিশ্বাস-বলেই তিনি আনন্দে অভিষিক্ত নূতন জীবন-চৈতন্যে উদ্ভাসিত হয়ে ক্ষমাসুন্দর তথাগতের উদ্দেশে বলতে পেরেছিলেন : 'শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য, করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।'

বৈশাখের কবি-মনের বস্তুরূপ আবার তাই বৈশাখের তথাগতের ভাবরূপের অসামান্য শিল্পায়নে প্রগাঢ় ও প্রসন্ন হয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে রেখেছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন ছেড়ে বিশ্বকেন্দ্রিক জীবনের পথে তাই তারা পাল তুলেছে কি এক আলোক-বার্তার আহ্বানে—সেই মহাজাগৃতির ছন্দোময় সুষমায়, যেখানে বিশ্বাত্মার সঙ্গে ব্যক্তি-সাধনার নিয়মহীন আত্মস্ফূর্তি স্বচ্ছন্দে বিকশিত হয়ে আছে এক অপূর্ব মৈত্রীতে।

বৈশাখের এই রুক্ষ মূর্তির পরিবেশ থেকে, তোমার স্বপ্নিল মনের ঘুম থেকে উঠে এগিয়ে চল পথিক, সেই যোগ-সাধনার পথে—সেই সহজ মিলনের পথে, যেখানে দূরের ঐ দিগন্তে পৃথিবীর মাটিকে আকাশের নীল আলিঙ্গন ক'রে রেখেছে। মনে রেখ, পৃথিবীর পরিচিত পথ ধরেই তো তোমাকে অপরিচিতের সন্ধানে যেতে হবে। বাইরের সৌন্দর্যের মাঝেও আন্তর সৌন্দর্যের দিব্যদ্যুতিতে নিজেকে ভরিয়ে দিয়ে অফুরন্ত রহস্য আস্বাদন করতে হবে। তাই বলি, দৃশ্যমান জগতের ছবি ধ'রে অদৃশ্য সত্তার রসাত্মক মাধুর্যে অবগাহন করবে চল। চল, চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

বৈশাখে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার বসন্ত এলো বনে বনান্তরে।
পুরাতন ধরণীর নাড়ীর ভিতরে
কল্লোলিয়া আসে নব প্রাণের জোয়ার।
খুলে যায় জীবনের তোরণ-দুয়ার
দিকে দিকে। পুরানোর আবরণ চিরে
জয়ধ্বজা উড়াইয়া আসিল বাহিরে
নবীনের বার্তাবহ পথিকের দল!
জীর্ণপত্র ঝরাইছে বাতাস চঞ্চল।

তোমার কৃপায় বায়ু—বহিবে না সে কি?
আমার অন্তরে মন্ত—মৃত আর মেকী
জড়ো হয়ে আছে আজও, যাবে না ঝরিয়া?
শ্যামল পল্লবে দিলে অরণ্য ভরিয়া;
প্রাণের ঐশ্বর্যে মোরে করিবে না ধনী—
চরণের স্পর্শ দিয়ে হে পরশমণি?

বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস

স্বামী ধীরেশানন্দ

'কঠ'-শ্রুতি যথার্থই বলিয়াছেন, 'পরাঞ্চি খানি' (২।১।১)—অর্থাৎ মানবের ইন্দ্রিয়সমূহ স্বভাবতই বহির্মুখ। জন্মাবধি মানব ইন্দ্রিয়সহায়ে রূপরসাদি বিষয়ভোগের জন্যই লালায়িত। সুখ মানুষের কাম্য। বিষয়প্রাপ্তি ও তাহার ভোগে মানুষ সুখ অনুভব করে, তাই সকলেই বিষয়কে এত ভালবাসে।

কিন্তু কোন পার্থিব বিষয়ই তো দীর্ঘস্থায়ী নহে। স্ত্রী-পুত্র-বিত্ত-গৃহ, অন্নপানাদি সবই যে কোন্ অদৃশ্য নিয়মের বিধানে কালের কবাল কবলে নিমেষে কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়! আবার বিষয় হস্তগত থাকিলেও রোগাদি নানা প্রতিবন্ধবশতঃ ভোগসামর্থ্য বিলুপ্ত হইলে মানুষ ব্যর্থতার চরম সীমায় উপনীত হইয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কারপূর্বক দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। ইহাই মনুষ্যজীবনের যথার্থ চিত্র।

বিষয়ভোগে তাৎকালিক তৃপ্তি হইলেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ—মানুষ তাহাতে কখনই পায় না। জীবনের শত আশা প্রতিহত ও আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে কোন কোন ভাগ্যবানের চিত্তে তখন এই চিন্তা জাগ্রত হয়: দুঃখবিরহিত যথার্থ সুখ কোথায়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের কী উপায়?

যদি নিরবচ্ছিন্ন সুখ, নিত্য সুখ বলিয়া কিছু না থাকিত, তবে মানুষের প্রাণে উহা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে কেন? কই একান্ত 'অসৎ' বন্ধ্যাপুত্রজাতীয় কোন বস্তু লাভের কামনা তো কাহারও হয় না? সুতরাং এমন বস্তু—দুঃখসংস্পর্শবিরহিত শাশ্বত সুখ—নিশ্চয়ই আছে, যাহা পাইবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া মানব-মনে আকুল আগ্রহ। এই নিত্য সুখ বা অমৃতত্ব লাভের কথাই পূর্বোক্ত শ্রুতি (কঠ ২।১।১) পুনরায় বলিতেছেন:

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।

—বিষয়বিমুখ চিত্তে কোন কোন অমৃতত্বাভিলাষী পুরুষ প্রত্যগাত্মজ্ঞান লাভকরত সেই নিত্য সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। মুমুক্ষুর 'আবৃত্তচক্ষুঃ'—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়বিমুখতা বা বৈরাগ্যই এই আত্মজ্ঞানবিকাশের সর্বপ্রধান সাধন—ইহাই শ্রুতির নিজ-মুখের ঘোষণা। বিনা মূল্যে জগতে কোন বস্তুই লাভ হয় না। কিন্তু এই আত্মবস্তুটি লাভের জন্য শ্রুতি বড়ই কঠিন মূল্য নির্ধারণ করিলেন। যে চিত্ত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া বিষয়ের প্রতি নিরন্তর ধাবমান, তাহাকে বিষয়বিমুখকরত অন্তর্মুখ করিতে হইবে। এ যেন সাগরাভিমুখে প্রধাবিতা নদীকে তাহার উৎসমুখে ফিরাইয়া লইবার সুকঠিন প্রয়াস। সুতরাং মুমুক্ষুর বৈরাগ্য-সাধনার জীবন আরামের জীবন নহে।

অন্তরে আনন্দস্বরূপ আত্মদেবের নিত্য অধিষ্ঠান, তাঁহাকে জানিতে হইবে; তবেই দুঃখের চিরনিবৃত্তি; 'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ' (শ্বেঃ ৫।১৩) — আত্মজ্ঞানেই সর্ববন্ধননিবৃত্তি।

'তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্' (শ্বেঃ ৬।১২)—অদ্বিতীয় আত্মাকে যাঁহারা স্ববুদ্ধিস্থরূপে সাক্ষাৎ অবগত হন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্যের নহে।

এই প্রকার অসংখ্য শ্রুতিবাক্যও এ বিষয়ে প্রমাণ। আলোক ও অন্ধকারের সহাবস্থানের ন্যায় চিত্তের বাহ্যবিষয়প্রবণতা ও আত্মমুখীনতা একই কালে হওয়া অসম্ভব। বিষয়বিমুখ না হইলে চিত্ত অন্তর্মুখ হইতে পারে না। সুতরাং নিত্য আত্মসুখলাভের পথে বৈরাগ্যই মূলমন্ত্র। ইহাতেই অধ্যাত্মজ্ঞান-সাধনার প্রারম্ভ বা সূত্রপাত এবং ইহাই শেষ পর্যন্ত সাধকের নিত্য সহচর বা অঙ্গভূষণ।

বৈরাগ্যের স্বরূপ, উহার প্রকারভেদ, তৎসাধনের উপায় এবং উহার স্বাভাবিক পরিণতি সন্ন্যাস—ইত্যাদি বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন, তাহা যথাযোগ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহায়ে আলোচনা করা হইতেছে।

বৈরাগ্য

'রঞ্জ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় প্রয়োগ-দ্বারা 'রাগ' শব্দ নিষ্পন্ন। অর্থ—ঈপ্সিত বস্তুতে রতি বা প্রীতি। বি + রাগ = বিরাগ, অর্থ—বিষয়ে প্রীতিরাহিত্য।

বিরাগ + ষ্ণ্য = বৈরাগ্য, অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট ভোগ্যবিষয়ে দোষদর্শনাভ্যাসবশতঃ বিতৃষ্ণা।

বৈরাগ্য বা বিষয়-বিতৃষ্ণাই মোক্ষমার্গের প্রথম সোপান। বৈরাগ্য দুই প্রকার—অপর বৈরাগ্য ও পর বৈরাগ্য।

অপর বৈরাগ্য

অপর বৈরাগ্য নামভেদে চারি প্রকার হইয়া থাকে, যথা: (১) যতমান, (২) ব্যতিরেক, (৩) একেন্দ্রিয় ও (৪) বশীকার।

(১) সংসারে সার বস্তু কি ও অসার বস্তুই বা কি, ইহা গুরু ও শাস্ত্র সহায়ে জানিব—এই প্রকার উদ্যোগের নাম 'যতমান বৈরাগ্য'।

(২) চিত্তগত রাগদ্বেষাদির মধ্যে বিবেক সহায়ে এতগুলি দোষ আমার নিবৃত্ত হইয়াছে এবং এতগুলি এখনও বিদ্যমান, চিকিৎসকের ন্যায় এই প্রকার বিচার-করত বিদ্যমান দোষ-সমূহের নিবৃত্তির জন্য যে প্রচেষ্টা, তাহাকে 'ব্যতিরেক বৈরাগ্য' বলে।

(৩) ঔৎসুক্যবশতঃ মনে বিষয়তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দুঃখাত্মকবোধে সর্ব-ভোগ্যবিষয় হইতে বহিরিন্দ্রিয়প্রবৃত্তি নিরোধের যে প্রযত্ন, উহা 'একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য' নামে প্রসিদ্ধ।

(ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্য পদার্থে তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিবেক-তারতম্য-বশতই পূর্বোক্ত 'যতমানা'দি ত্রিবিধ ভেদ)।

(৪) ইহ ও পরলোকের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি সর্বথা যে বিতৃষ্ণা, জ্ঞানপ্রসাদরূপ সেই চিত্তবৃত্তির নাম 'বশীকার বৈরাগ্য'।

এই 'বশীকার বৈরাগ্য' সম্বন্ধেই ভগবান্ শ্রীপতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্যম্' (যোগ সূত্র ১।১৫)। এই বৈরাগ্য সংপ্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ ও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধন। (গীতা, মধুঃ টীকা ৬।৩৫ দ্রঃ)

পূর্বোক্ত চারি প্রকার 'অপর বৈরাগ্যে'র শেষোক্ত 'বশীকার' নামক বৈরাগ্যও মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যথা:

(১) স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি প্রিয় পদার্থের নাশে সংসারে তাৎকালিক ধিক্কার বুদ্ধিপূর্বক ঐ বিষয়-সমূহের যে ত্যাগেচ্ছা—তাহা 'মন্দ বৈরাগ্য'।

(২) বর্তমান জন্মে স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি আমার অভিলষিত নহে, এই প্রকার স্থির বুদ্ধিপূর্বক বিষয়ত্যাগের ইচ্ছাকে 'তীব্র বৈরাগ্য' বলে।

(৩) পুনরাবৃত্তিযুক্ত ব্রহ্মলোকপর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ভোগ-ত্যাগেচ্ছা 'তীব্রতর বৈরাগ্য' নামে অভিহিত।

সন্ন্যাস

'মন্দ বৈরাগ্য'-বান্ পুরুষের কোন প্রকার সন্ন্যাসেই অধিকার নাই। শ্রুতি বলিতেছেন :

যদা মনসি বৈরাগ্যং জায়তে সর্ববস্তুষু।
তদৈব সংন্যসেদ্ বিদ্বান্ অন্যথা পতিতো ভবেৎ॥
(মৈত্রেঃ উপঃ ২।১৯)

—অর্থাৎ সর্ববিষয়ের প্রতি যথার্থ বৈরাগ্য চিত্তে জাগ্রত হইলে তখনই বিবেকী পুরুষ সর্বকর্মসন্ন্যাস করিবেন, বৈরাগ্য বিনা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি ভ্রষ্ট বা পতিত হইবেন।

বৈরাগ্যের তারতম্যবশতঃ সন্ন্যাস চারি প্রকার হইয়া থাকে। যথা : (১) কুটীচক, (২) বহূদক, (৩) হংস ও (৪) পরমহংস।

মন্দ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির কোন প্রকার সন্ন্যাসেই অধিকার নাই, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে।

তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষের জন্য 'কুটীচক' ও 'বহূদক'—এই দুই প্রকার সন্ন্যাস বিহিত। যে তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষের শরীর তীর্থ-যাত্রাদি করিতে অসমর্থ, তাঁহার 'কুটীচক' সন্ন্যাসে অধিকার; যাঁহার সেরূপ সামর্থ্য আছে, তিনি 'বহূদক' সন্ন্যাসের অধিকারী।

'কুটীচক' সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডী ও স্বপুত্রগৃহে ভিক্ষাগ্রহণকারী।

'বহূদক' সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ড-, শিক্য- (সিকে), জলপবিত্র- (জল ছাঁকিবার বস্ত্র) কৌপীন- ও কাষায়বেশ-ধারী। ইঁহারা তীর্থাটন, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করেন ও আত্মোপাসনায় রত থাকেন।

তীব্রতর বৈরাগ্যযুক্ত হইলে পুরুষ 'হংস' সন্ন্যাসের অধিকারী হইয়া থাকেন। 'হংস' সন্ন্যাসী একদণ্ডী, শিখারহিত, যজ্ঞোপবীত-ধারী, শিক্য- ও কমণ্ডলু-হস্ত, গ্রামে একরাত্রি-নিবাসী এবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি-অনুষ্ঠানতৎপর।

পূর্বোক্ত ত্রিবিধসন্ন্যাস-প্রাপক তীব্র ও তীব্রতর বৈরাগ্যই 'বোধসার'-গ্রন্থে আচার্য নরহরি কর্তৃক 'জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য' নামে কথিত হইয়াছে। যথা :

আধিব্যাধিভয়োদ্বেগপারতন্ত্র্যাদিপীড়িতাঃ।
যে জীবা মোক্ষমিচ্ছন্তি জিহাসামুখ্যতা তু সা॥

—যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, ভয়, উদ্বেগ ও পরাধীনতা প্রভৃতি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া মোক্ষলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বৈরাগ্য 'জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য' নামে অভিহিত হয়।

তীব্রাৎ সংসারবৈরাগ্যাদ্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসনং যদি।
বৈরাগ্যং পুণ্যজীবানাং জিহাসামুখ্যমেব তৎ॥

—তীব্র সংসারবৈরাগ্যহেতু পুণ্যবান্ পুরুষের চিত্তে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উদিত হয়, 'জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য'ই উহার কারণ।

এই বৈরাগ্যে বিষয়ত্যাগেচ্ছাই প্রধান, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে মাত্র।

পরবৈরাগ্য

এখন পূর্বকথিত 'পরবৈরাগ্য' বর্ণিত হইতেছে। এই 'পরবৈরাগ্য' পূর্বোক্ত সর্ব-প্রকার বৈরাগ্য হইতে উৎকৃষ্ট।

ভগবান্ শ্রীপতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'তৎপরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্' (যোগ সূত্র ১।১৬)। —অর্থাৎ প্রত্যগাত্মজ্ঞানলাভে তিন গুণের পরিণামরূপ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ববিষয়ে তৃষ্ণারাহিত্যের নাম 'পরবৈরাগ্য'। এই পরবৈরাগ্যই নির্বিকল্প সমাধিনামা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন। ইহাও যোগসূত্রে কথিত হইয়াছে, যথা 'তীব্রবেগা-নামাসন্নঃ' (১।২১)—অর্থাৎ পরবৈরাগ্যবান্

পুরুষ শীঘ্রই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। এই 'পরবৈরাগ্য'ই 'বোধসার'-গ্রন্থে 'জিজ্ঞাসামুখ্যবৈরাগ্য' নামে অভিহিত হইয়াছে ; যথা :

মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্তং সচ্ছাস্ত্রৈঃ সংস্কৃতা মতিঃ।
যদি ন ব্রহ্মবিশ্রান্তিস্তদস্মাভিঃ কিমর্জিতম্॥
ইত্যেবং ব্যবসায়েন হ্যাকাশফলপাতবৎ।
জিজ্ঞাসয়ন্তি যে ধীরা জিজ্ঞাসামুখ্যতা তু সা॥

—দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, বেদান্তবাক্য শ্রবণদ্বারা বুদ্ধিকে মার্জিতও করিয়াছি, এখন যদি ব্রহ্মবিশ্রান্তি লাভ করিতে না পারি, তবে আমরা কি লাভ করিলাম? এই প্রকার নিশ্চয়করত বিবেকাদি-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আকাশ হইতে ফলপতনের ন্যায় অকস্মাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের এই বৈরাগ্যকে 'জিজ্ঞাসামুখ্যবৈরাগ্য' বলে।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া তাত তীব্রয়া যো বিধীয়তে।
বিরাগো দৃশ্যভাবেষু জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ॥

—তীব্র ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছাবশতঃ যাবতীয় দৃশ্য-পদার্থে যে বৈরাগ্য হয়, তাহার নাম 'জিজ্ঞাসা-মুখ্যবৈরাগ্য'। এই স্থলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই মুখ্য, বিষয়ত্যাগেচ্ছা তাহার অনুগামী। এই 'জিজ্ঞাসামুখ্যবৈরাগ্য'যুক্ত অর্থাৎ পরবৈরাগ্যবান্ পুরুষই 'পরমহংস' সন্ন্যাসের অধিকারী।

'পরমহংস'-সন্ন্যাস

'পরমহংস'-সন্ন্যাসী একদণ্ডধারী, মুণ্ডিত-মস্তক, শিখাযজ্ঞোপবীত-রহিত, সর্বকর্মপরি-ত্যাগী ও একমাত্র আত্মচিন্তনপরায়ণ।

পরমহংস-সন্ন্যাস—'বিবিদিষা' ও 'বিদ্বৎ' ভেদে দুই প্রকার। প্রত্যগাত্মাভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ বিবেকাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন পরবৈরাগ্যবান্ পুরুষ যে সর্বকর্ম সন্ন্যাস করিয়া থাকেন, তাহা 'বিবিদিষা সন্ন্যাস'। শ্রুতি বলিয়াছেন (বৃঃ ৪।৪।২২) :

'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি'

—বৈরাগ্যবান্ পুরুষের প্রাপ্য আত্মলোকের অভিলাষী হইয়া অধিকারী পুরুষ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন।

'ন কর্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' (মহাঃ নারাঃ ৮।১৪, কৈবল্যঃ ১।৩)—অর্থাৎ কর্মদ্বারা, তথা পুত্রপৌত্রাদি দ্বারা অথবা গো-সুবর্ণাদি ধনসহায়ে মোক্ষের চরম সাধন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। চিত্তবিক্ষেপের হেতু হওয়ায় ও 'ত্বম্'-পদার্থ-শোধনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ এবং উচ্চাবচ জন্ম-প্রাপ্তির হেতুভূত যে কর্ম, তাহা ত্যাগকরতই অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বনকরতই জ্ঞানমার্গের অধিকারী বৈরাগ্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পথে আরোহণ করেন।

'বিবিদিষা সন্ন্যাস'-আশ্রম বিষয়ক আরও শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে, যথা : 'এতদ্ বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণা ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যাং চরন্তি' (বৃঃ ৩।৫।১)। এই শ্রুতি আপাত-বেদনবিশিষ্ট পুরুষের বিবিদিষা-সন্ন্যাস বিধান করিতেছেন। পুনঃ

'দণ্ডম্ আচ্ছাদনং কৌপীনং পরিগৃহেৎ শেষং বিসৃজেৎ' (আরুঃ ১)—অর্থাৎ সন্ন্যাসী দণ্ড, শীতনিবারক কন্থা, পরিধানের কৌপীন ও কমণ্ডলু আদিমাত্র গ্রহণ করিবেন এবং তদ্ভিন্ন অন্য সর্ব দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন। পুনঃ শ্রুতি :

সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥
(নারঃ পঃ ৩।১৫)

—ব্রহ্মলোকপর্যন্ত সর্ব সংসার অসার জানিয়া সারতত্ত্ব পরমাত্মবস্তুদর্শনমানসে পর-

বৈরাগ্যবান্ পুরুষ বিবাহ না করিয়া 'বিবিদিষা সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ ভাষ্যকার 'কেন'-উপনিষদের ভাষ্য-প্রারম্ভে বলিয়াছেন, 'প্রত্যগাত্মব্রহ্মবিজ্ঞান-পূর্বকঃ সর্বৈষণাসন্ন্যাস এব কর্তব্যঃ'—ঐ স্থলের টীকাতে টীকাকার শ্রীমদ্ আনন্দগিরি বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মজ্ঞানস্যানুভবাবসানতাসিদ্ধয়ে পরোক্ষনিশ্চয়পূর্বকঃ সন্ন্যাসঃ কর্তব্যঃ। সিদ্ধে চানুভবাবসানে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে স্বভাবপ্রাপ্তঃ সন্ন্যাস ইতি দ্রষ্টব্যম্।'

—অর্থাৎ প্রত্যগাত্মবিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সর্বৈষণা পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস বিধেয়। অপরোক্ষ অনুভব-সিদ্ধির জন্য ঐ পরোক্ষ জ্ঞানপূর্বকই সন্ন্যাস কর্তব্য। ইহাই 'বিবিদিষা সন্ন্যাস'। অন্যাশ্রমীর অপরোক্ষ অনুভবের পর সন্ন্যাস স্বভাবপ্রাপ্ত। তাহার নাম 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস'।

ভগবান্ ভাষ্যকার 'মুণ্ডক'-উপনিষদের ভাষ্যপ্রারম্ভে বলিতেছেন, "জ্ঞানমাত্রে যদ্যপি সর্বাশ্রমিণামধিকারস্তথাপি সন্ন্যাসনিষ্ঠৈব ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষসাধনং ন কর্মসহিতেতি 'ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ' (মুঃ উপঃ ১।২।১১), 'সন্ন্যাসযোগাৎ (মুঃ উপঃ ৩।২।৬) ইতি ব্রুবন্ দর্শয়তি [শ্রুতিঃ]।"—

—অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যায় সর্বাশ্রমিদিগের অধিকার থাকিলেও সন্ন্যাসপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষের সাধন, কর্মসহিত ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের সাধন নহে, 'ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য ইহাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

'এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ··· ···ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যাং চরন্তি' (বৃঃ ৩।৫।১)—এই শ্রুতির ভাষ্যে আচার্য শংকর বলিতেছেন, 'আত্মানং স্বং তত্ত্বং বিদিত্বা জ্ঞাত্বা অয়মহমস্মীতি পরং ব্রহ্ম···ব্যুত্থায়··· দারসংগ্রহমকৃত্বা···ব্যুত্থায় কর্মভ্যঃ কর্মসাধনেভ্যশ্চ যজ্ঞোপবীতাদিভ্যঃ পরমহংসপারিব্রাজ্যং প্রতিপদ্য ভিক্ষাচর্যং চরন্তি।'

—অর্থাৎ আত্মবিষয়ক পরোক্ষ বা অদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের অনন্তর মুমুক্ষু যাবতীয় কর্ম ও তৎসাধন পরিত্যাগপূর্বক পরমহংস সন্ন্যাস গ্রহণকরত ভিক্ষাচর্যা অবলম্বন করিয়া থাকেন। —এই শ্রুতিটি সন্ন্যাস-বিধায়ক। পরোক্ষ জ্ঞানপূর্বকই সন্ন্যাস বিহিত। দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞানের অনন্তর যে সন্ন্যাস স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস'। তাহাতে বিধি হইতে পারে না, কারণ উহা বিদ্বানের অর্থাৎ জ্ঞানীর স্বভাবপ্রাপ্ত।

বিদ্বৎ-সন্ন্যাস

বিবিদিষা-সন্ন্যাস নিরূপণানন্তর এক্ষণে 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস' বিষয়ে বলা হইতেছে। পূর্ব-জন্মানুষ্ঠিত সাধনপ্রভাবে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থাশ্রমে অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ চিত্তবিক্ষেপের নিবৃত্তিরূপ জীবন্মুক্তিসুখ লাভার্থ যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন (অথবা যে সন্ন্যাস তাঁহার স্বতই উপস্থিত হইয়া থাকে), তাহার নাম 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাস'। ইহাও প্রমাণসিদ্ধ। জীবন্মুক্তি-সুখলাভই এই সন্ন্যাসের ফল। বিদ্বৎ-সন্ন্যাসীর কোন চিহ্ন নাই। তিনি অব্যক্তচিহ্ন, অব্যক্ত-আচার। এই কারণেই শ্রুতি-আদিতে কোথাও তাঁহার দণ্ডবস্ত্রাদি ধারণাভাব, কোথাও বা দণ্ডবস্ত্রাদি ধারণের কথা বর্ণিত আছে।

বিহিত কর্মের বিধিপূর্বক ত্যাগদ্বারা 'বিবিদিষা-সন্ন্যাস'ই আত্মজ্ঞান লাভের উপায়, ইহা পূর্বে শ্রুতিসহায়ে বলা হইয়াছে। এই স্থলে বক্তব্য এই যে সন্ন্যাসবিহীন কাহারও এই জন্মে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইলে বুঝিতে

হইবে যে, জন্মান্তরীয় 'বিবিদিষা-সন্ন্যাস'ই তাঁহার বর্তমান জন্মে আত্মজ্ঞানের হেতু। শ্রীসর্বজ্ঞাত্মমুনি স্বরচিত 'সংক্ষেপ-শারীরক' গ্রন্থে এই কথাই স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। যথা:

জন্মান্তরেষু যদি সাধনজাতমাসীৎ
সংন্যাসপূর্বকমিদং শ্রবণাদিরূপম্।
বিদ্যামবাপ্স্যতি জনঃ সকলোঽপি যত্র
তত্রাশ্রমাদিষু বসন্ন নিবারয়ামঃ॥ (৩।৩৬১)

—অর্থাৎ যদি অধিকারী পুরুষের জন্মান্তরে সন্ন্যাসপূর্বক শ্রবণাদি সাধন বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তিনি যে-কোন আশ্রমেই বিদ্যমান থাকুন না কেন, সেই জন্মান্তরীয় সাধনের বলেই তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়া থাকে, ইহা আমরা নিষেধ করি না, অর্থাৎ আমরা ইহা স্বীকার করিয়া থাকি।

এই প্রকারে 'পর' ও 'অপর'-ভেদে দুই প্রকার বৈরাগ্যের বিষয় এবং সেই প্রসঙ্গে বৈরাগ্যের তারতম্যবশতঃ সন্ন্যাসের বিবিধ ভেদ আলোচিত হইল। 'পরবৈরাগ্য'-সহকৃত বিবিদিষা-সন্ন্যাসই আত্মজ্ঞান উৎপাদনপূর্বক মুমুক্ষুর ব্রহ্মভাবাপত্তিরূপ মোক্ষের একমাত্র হেতু—ইহা সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। (ক্রমশঃ)

নারায়ণ-সেবা

শেখ সদরউদ্দীন

পথের দু-ধারে প'ড়ে সারা দিনরাত ধ'রে
ক্ষুধাতুর নয়নের নীরে;
তাহাদের পিছে ফেলি চলিয়াছ অবহেলি
দেবতার মন্দিরে মন্দিরে।

মন্ত্র-তন্ত্র শোন যত, ব্যর্থতায় পরিণত—
ধরমের কথা বোঝ নাই;
প্রাণহীন স্তব-গাথা, পাষাণে খুঁড়েছ মাথা,
জানো কোথা দেবতার ঠাঁই?

চেয়ে দেখ দেবতারে মানুষেরি দ্বারে দ্বারে
কেঁদে ফেরে ভিক্ষা-পাত্র হাতে
বুকে তারে ডেকে নাও, এক মুঠো খেতে দাও,
সেবা করো প্রদোষে প্রভাতে।

রবির আলোকে তিনটি নারীচরিত্র

শ্রীসংযুক্তা মিত্র

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'! আড়াই হাজারেরও অধিককালের ব্যবধান—দুস্তর পারাবার পার হ'য়ে কোন্ সুদূর হ'তে গম্ভীর মন্ত্রধ্বনি বাতাসে বাতাসে আজও যেন ভেসে আসে কানে। কত যুগ! কতদিন আগের সে কথা!! মানব-সভ্যতার ইতিহাসের চরণধ্বনির মহালগ্ন। তবু সে লগ্নেরই প্রভায় আলোকিত হ'ল, কত যুগ-যুগান্তরের সভ্যতার সাধনায় জ্বলে উঠল কত প্রদীপ! ইতিহাসের খোলা পথে কত জীবন ধন্য হ'ল,—নেমে এল কত উত্তাল হৃদয়ের বেলাভূমির উপর পরম করুণার অভয়স্পর্শ। সে 'মাভৈঃ' বাণীর স্বাক্ষর রইল কত কাব্যে—অশ্বঘোষ হ'তে রবীন্দ্রনাথে।

বুদ্ধজীবনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রকাব্যে তিনটি মহা বিস্ময়কর চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। তিনটি অপরূপ সৃষ্টি: বাসবদত্তা, প্রকৃতি ও শ্রীমতী। বিষম ধাতুতে গড়া তিনটি নারী-চরিত্র। কবির প্রতিভালোকের স্ফুরণে পাঠকচিত্তে তিনটি পরমরহস্যময় জিজ্ঞাসা।

'বাসবদত্তা' নটী, রূপোপজীবিনী, দেহের যৌবনই তার অর্ঘ্য। কামনার আগুনে রূপের দাহনে প্রদীপ্তা নারীজীবনের বসন্ত-ক্ষণকেই শাশ্বত মনে ক'রে সে মহাসুখী। যৌবনমদমত্তা জনপদবধূ তাই সুনীল আঁচল উড়িয়ে, নূপুরে রুমুঝুমু ঝঙ্কার তুলে, পথিকচিত্তে দোলা লাগিয়ে—রঙ জাগিয়ে পথ চলে। দুই চোখে তার শুধু স্বপ্নের নয়—মোহের কাজল। সে মায়া-কাজলের দৃষ্টিতে জগৎ বড় সুন্দর—জীবন বড় মধুময়। প্রেম?—সে তো চিরন্তন।

এমনই এক বসন্তদিনে যখন আমের মুকুলের মধুগন্ধে বাতাস মন্থর, যখন 'কোকিল কুহরি ওঠে বারবার'—তখন পথ চলেছে বাসবদত্তা। আর ঠিক তখনই সাক্ষাৎ হ'ল তার জীবনের চিরবাঞ্ছিতের সঙ্গে। যে বাঞ্ছিত তার জীবনে আকস্মিক, অনাহূত। একদিকে নটী, অন্যদিকে সন্ন্যাসী; বাসবদত্তা আর উপগুপ্ত; কামনা আর নিবৃত্তি; রূপ আর অপরূপ! প্রগল্ভা বাসবদত্তা সেদিন প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি, প্রদীপ তুলে দেখেছে শুধু তার 'নবীন গৌর কান্তি'। দেখেনি যে অমর্ত্য শান্তি ও ক্ষান্তি ঐ কমনীয় রূপের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে আছে। তাই তার কামনা-কুঞ্জে তাকে আমন্ত্রণ করতে বোধ করেনি সে কোন বাধা। প্রত্যাখ্যানে ভেবেছে কে এই সুন্দর? বোঝেনি এই সুন্দরই জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকে আহ্বান ক'রে নিতে—ভুল হ'তে, মোহ হ'তে। যে চেয়েছে তাকে, সে তো পাবেই। কিন্তু যে চায়নি তাকে? সেও পাবে। নইলে প্রভু বুদ্ধের অভয়বাণীই যে মিথ্যা হয়ে যায়! পঙ্ক হ'তে পঙ্কজিনী আহরণই তো এ ব্রতের প্রধান সাধন।

চরম আঘাতের মধ্যে বাসবদত্তা অন্তরের অন্তরে অনুভব ক'রল এই সত্য। জীবনের বসন্তদিনে ক্ষণিক উৎসবের মোহে মুগ্ধ হয়েছিল সে। উৎসব-শেষে উচ্ছিষ্ট পাত্রের মতোই তাকে পথের পাশে পরিত্যাগ ক'রে গেল—তারই স্তাবকের দল।

আবার সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমা! আবার সেই কোকিল-ডাকা, জ্যোৎস্নাভরা রাত।

আমের মুকুলের গন্ধভরা মন্থর দিন ফিরে এল। চরম অপমান ও ব্যাধির উৎকট যন্ত্রণার মধ্যে বাসবদত্তা আজ উপলব্ধি করেছে জীবনের ক্ষণিকতা। যে মুহূর্তে তার মূর্ছিত হৃদয় উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করেছে দুটি করুণকোমল পায়ের শব্দ, সেই মুহূর্তে সেই সন্ন্যাসীর কোমল করস্পর্শে বাসবদত্তা জেগে উঠল শুধু চেতনায় নয়, প্রজ্ঞার আশ্বাসে। একটি মহাজীবনের স্পর্শের ব্যাকুলতায় সত্যের কোলে ভ্রান্তির লয় হ'ল। একটি অপূর্ব চরম পরিণতির মাঝেই কবিতাটির সমাপ্তি—'আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা।'

একদিন চঞ্চল পদ-তাড়নায় সে যার ঘুম ভাঙিয়েছিল, আজ তারই পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ল একটি ঘুম-ভাঙা প্রাণ।

'প্রকৃতি'র চরিত্র-কল্পনা 'বাসবদত্তা'র সম্পূর্ণ বিপরীত। বহুজনসেব্যা সে নয়, সে বহুজন্ম অবমানিতা। সমাজের একটি কোণে অপাঙ্‌ক্তেয় ভাগ্যহত জীবনের বোঝা সে নীরবে বহন করে। প্রতিবাদ নয়, বিদ্রোহ নয়, কুণ্ঠিত দীনতায় দিন কাটে তার। পরিচয় তার নারীরূপে নয়—চণ্ডালকন্যারূপে। সামাজিক গৌরব সে জানে না। সে জানে না যে তার চরম আত্মগুপ্তির অন্তরালে একটি চরম বৈভব আছে সুপ্ত। সেটি তার মহা-সম্পদ্‌ময় অন্তর। সমস্ত অপমান ও দীনতার বহু ঊর্ধ্বে যার বিহার। যে শুধু পাবার অধিকারই রাখে না, রাখে দেবারও স্বাধিকার। তাই যেদিন পথশ্রান্ত ভিক্ষু আনন্দ পিপাসার শান্তি—'একটি গণ্ডুষ জল' প্রার্থনা করলেন তারই কুয়ার পাশে এসে, সেদিন সে মহাবিস্ময়ে প্রথম উপলব্ধি ক'রল যে সে শুধু চণ্ডালকন্যা নয়, সে নারী। পরিপূর্ণ নারীত্বের বঞ্চিত প্রসুপ্ত মহিমা সেদিন তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় জেগে উঠল অন্তরে। এই কাহিনীর আভাস কবির 'জলপাত্র' কবিতাতেও পাই। উদাসিনী কন্যার বিহ্বলতা, কাজ-ভোলা ব্যাকুলতা দর্শনে মায়ের বিস্ময়ের উত্তর দিচ্ছে প্রকৃতি:

'সেদিন রাজবাড়ীতে বাজল বেলা দুপুরের ঘণ্টা। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। পীত বসন তাঁর। বললেন—জল দাও।' (চণ্ডালিকা)

ঘটখানি নামাইয়া চরণে প্রণাম ক'রে
কহিলাম, 'অপরাধী করিও না মোরে'।
শুনিয়া আমার মুখে তুলিলে নয়ন বিশ্বজয়ী,
হাসিয়া কহিলে,—হে মৃন্ময়ী
পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা
শ্যামল কান্তিতে ভরা
সেইমত তুমি
লক্ষ্মীর আসন তাঁর কমলচরণ আছ চুমি।
সুন্দরের কোন জাত নাই,
মুক্ত সে সদাই। (জলপাত্র)

এতদিন সে একটি বিরাট অপ্রাপ্তির অতল অন্ধকারে ডুবে ছিল, শুধু 'না'-এর কণ্টকে ঘেরা ছিল তার জগৎখানি। সমাজে নয়, সংসারে নয়, সম্মানে নয়, বিনিময়ে নয়; প্রতিদানে তার দেবারও নয় কিছু। কিন্তু সব নিষেধের ক্ষুদ্র সীমানা ঐ ভিক্ষু আনন্দের জল প্রার্থনায় চুরমার হয়ে গেল। প্রকৃতির মনে হ'ল: 'কেবল একটি গণ্ডুষ জল নিলেন আমার হাত থেকে। অগাধ অসীম হ'ল সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল, সেই জলে ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।'

নতুন বেদনার মাঝে নবজন্ম হ'ল প্রকৃতির। চিত্তে ঘনিয়ে উঠল প্রাপ্তির দুরন্ত ব্যাকুলতা।

পেতে হবে তাকে, যে ঘটালো তার এই নবরূপ, তার রূপান্তর। পেতে হবে তাকে— দূর থেকে নয়, একান্ত প্রিয়তমরূপে। জানাতে হবে- প্রভু, আমি তোমারি।

ক্ষিপ্ত হযে উঠল প্রকৃতি, শত অনুনয়ে, অশ্রুর প্লাবনে, মায়ের সহস্র নিষেধ প'ড়ল ভেঙে। সম্মত হ'ল সে বশীকরণ-মন্ত্রের নাগপাশ পরিয়ে টেনে আনতে ভিক্ষুশ্রেষ্ঠকে।

কিন্তু আশ্চর্য এই, যখন প্রলয়-মন্ত্রের সম্মোহনে অসহায় আনন্দ দৈন্যের ও অপমানের ধূলার উপর দিয়ে প্রকৃতির দ্বারে আসছেন, তখন বিদ্যুতের ঝলকে ঝলকে প্রকৃতির হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার চরম আঘাতে আঘাতে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যেন সে বুঝতে চাইছে, বুঝতে পারছে যে এই অপমানিত হতজ্যোতি ভিক্ষু তার কাম্য প্রিয়জন নয়, এ যে তারই মতো ধুলোর মধ্যে মিশে মৃন্ময় রূপ পরিগ্রহ করছে। কোথায় তার সেই দিব্য চিন্ময় প্রভা ?

এই অনুভূতির চরম লগ্নেই প্রকৃত নবজন্ম হ'ল প্রকৃতির। সে বুঝতে পারলো—দৈহিক সান্নিধ্যে একান্ত পাওয়া প্রকৃত পাওয়া নয়। তার আগমনের রথের ধ্বনি মনের মধ্যে আত্ম-জাগরণের উষালগ্নে এসে দাঁড়াবে। তার দিব্যজ্যোতির উজ্জ্বল ছটায় সত্যকার মিলন হবে দু-জনার। জৈব কামনায় নয়, হৃদয়ের মণিকোঠার পদ্মবেদীতে পাততে হবে তাঁর আসন। প্রেয় লীন হবে শ্রেয়ে।

তাই আনন্দ যতই এগিয়ে আসছেন নিকট হ'তে নিকটে, ততই নবভাবে জাগ্রতা প্রকৃতি বলছে তার মায়ের ব্যাকুল আকুতির উত্তরে : 'অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়। আনছে আমার জন্মান্তর, মরণের সিংহদ্বার খুলছে, বজ্রের হাতুড়ি মেরে। ভাঙলো দরজা, ভাঙলো প্রাচীর, ভাঙলো আমার এ জন্মের সমস্ত মিথ্যে।...... মা, ভয় হচ্ছে। তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে—তার পরে? তার পরে কি? শুধু এই আমি? আর কিছু না।...... শুধু আমি? কিসের জন্য এত দীর্ঘ, এত দুর্গম পথ, শেষ কোথায় এর? শুধু এই আমাতে?'

এই আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মধিক্কারের মধ্যে প্রকৃতির চণ্ডাল-সংস্কারের যত অশুচিতা ও অপবিত্রতা দগ্ধ হয়ে- ভস্ম হয়ে গেল। সেই চিতাভস্মে যে উঠে দাঁড়ালো, সে প্রেমিকা নয়—সেবিকা। জৈবিক প্রয়োজনের ভস্মশেষে মহাজীবনের আশীর্বাদধন্যা কল্যাণী নারী। তাই আনন্দ যখন সত্যি তার দ্বারে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ল সে। একদিন পিপাসার শান্তি—একটি গণ্ডুষ জলমাত্র সে তাঁকে দান করেছিল, আজ তুলে ধ'রল তার ভক্তির অঞ্জলি—তার নব রূপান্তরের কুসুম-অর্ঘ্য। 'প্রভু, এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে। তাই এত দুঃখই পেলে—ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। অসীম গ্লানি পদাঘাতে দূর ক'রে দাও। টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে। নইলে কেমন ক'রে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকে। ওগো নির্মল, পায়ে তোমার ধুলো লেগেছে—সার্থক হবে সেই ধুলো লাগা। আমার মায়া-আবরণ পড়বে খসে তোমার পায়ে, ধুলো সব নেব মুছে। জয় হোক, জয় হোক, তোমার জয় হোক।'

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অন্য দুটি বুদ্ধ-ভক্ত নারীর সন্ধান পাওয়া যায়; তাদের নাম শ্রীমতী ও সুপ্রিয়া। অমলিন তাদের জীবনের শান্ত প্রবাহে প্রকৃতি বা বাসবদত্তার মতো বিপ্লবের আভাস নেই। একটি শান্ত, নম্র

অথচ সুদৃঢ় প্রাণশিখা অকম্পিত দ্যুতিতে বিকীর্ণ করেছে সমাজ সংসার।

দুঃখহরণ শঙ্কাতরণ প্রেমের বীর্যে চির অশঙ্কিতা শ্রীমতী। নীরব আত্মনিবেদনে সত্য ও ধর্মের বেদীমূলে উৎসর্গিত প্রাণ তার। প্রতিবাদে সে মুখর নয়, কলহে বিবাদেও সে প্রখর নয়, তবু তার মৌন অস্বীকার কি অচঞ্চল!—কি বজ্রকঠিন!

যেদিন পিতার আসন অধিকার ক'রে মদমত্ত গর্বিত অজাতশত্রুর সীমাহীন দম্ভ 'শোণিতের স্রোতে' রাজপুরী হ'তে পিতার অহিংসা-ধর্ম নিঃশেষে মুছে দিয়ে 'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া' অন্য কোন প্রতীকের উপাসনা মৃত্যুদণ্ডের শাসনে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল, সেদিন তাঁর নির্মম আদেশের বিরুদ্ধে একটি কণ্ঠও সোচ্চার হয়নি—হ'তে সাহস করেনি। যেদিন রাজমাতা, রাজবধূ, রাজকন্যা হ'তে প্রতিটি পুরবাসী সভয়ে বারবার শুধু শিহরিত হয়েছে, সেদিন নম্র পদক্ষেপে স্তূপপদমূলে শেষ আরতির শিখা জ্বালিয়ে শেষের প্রণাম-নৃত্যে চরম আত্মনিবেদনে যে এগিয়ে এসেছিল, তারই নাম শ্রীমতী; সত্যসঙ্কল্পিতা, আর তাই নির্ভীকা ও অজেয়া।

সুকঠোর রাজশাসন অবহেলাভরে উপেক্ষা ক'রে সেদিন 'শারদ স্বচ্ছনিশীথে' কে জ্বালায় ঐ স্তূপপদমূলে 'যেন সারে সারে প্রদীপমালার মত?' কার এই দুরন্ত সাহস?

'মুক্ত কৃপাণে পুর-রক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
শুধাল কে তুই, ওরে দুর্মতি?
মরিবার তরে করিস আরতি?'—

কিন্তু দুঃশাসনের বজ্রমুষ্টি কোন দিন সত্যের কণ্ঠরোধ করতে পেরেছে কি? অন্তত: কালজয়ী ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় এই রকম কোন নজীর পাওয়া যায় না। তাই শাণিত অস্ত্রের নীচে হাসিমুখে মাথা পেতে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে শ্রীমতী ঘোষণা করেছে তার আত্ম-পরিচয়। দ্বিধাহীন, দ্বন্দ্বহীন স্বরে—

'শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাসী।'

মৃত্যু-ভ্রূকুটির মুখে এই চরম ঔদাস্যভরা নির্বিকার আত্মঘোষণা ঘন অন্ধকারে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতই চমকপ্রদ ও মহা-বিস্ময়কর। মর্মমূলে কোন্ সে জ্যোতির করুণা-ঘন অভয় আশ্বাসে শ্রীমতীর এই আত্মবলিদান?

* * *

অনাথপিণ্ডদসুতা সুপ্রিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত শ্রাবস্তী নগরীর ক্ষুধিতের অন্নদানসেবার ভার-গ্রহণের মূলেও এই গৌরবেরই পরিচয়। বিশাল জনতার ক্ষুধা মেটাবার ভারগ্রহণে, যেদিন ভগবান বুদ্ধের জিজ্ঞাসার সামনে, শ্রেষ্ঠীরাও আপন অক্ষমতার দীনতা জানিয়েছে, সেদিন 'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া' সেই ভার হাসিমুখে মাথায় তুলে নিয়েছিল—কোন্ অধিকারে? কিসের সাহসে?

সে কি আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে প্রতিদানে বিশ্বকে আপন ক'রে পাবার মন্ত্র-গুপ্তিতে নয়?

অপরূপ এই জীবনবেদের উদ্গাতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—রাজনটী বাসবদত্তা আর চণ্ডালিকা প্রকৃতি, দেবদাসী শ্রীমতী আর ভিক্ষুণীসুতা সুপ্রিয়া যাঁর ধ্যান-মানসে অমর্ত্য, অরূপ রূপের প্রভায় বিচ্ছুরিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অজস্র দানের উপযুক্ত পরিমাপ আজ প্রয়োজন। কবিতা, গান, ছবি ও নাচের সমারোহে বাংলার চিন্তাজগতের এই অধিনায়ক যতটা রসোদ্বেলরূপে পরিচিত, তাঁর স্থিতধী মনীষার পরিচয়—প্রায় ততটা অবহেলিত। পুনরুক্তি হলেও একথা 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী'তে স্মরণীয়। শোনা যায়, শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের পাণিনি-ব্যাকরণ পড়ানোর আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উদ্দেশ্য ছিল, ভাষা ও চিন্তার পাকা বনিয়াদ গড়ে তোলা। বাংলাদেশের সংস্কৃতিচর্চার এই অভাবের দিকটি তাঁর কবিদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, প্রবন্ধ আর সাহিত্য এক জিনিস নয়। সাহিত্যগুণান্বিত প্রবন্ধেরও প্রকারভেদ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন যে বিষয়ে লিখেছেন, তাই সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে। বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে তাঁর মননশীলতার প্রকাশস্বরূপ প্রবন্ধসাহিত্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর এক বিরাট অংশ। আশ্চর্যের বিষয়, আজ অবধি রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই দিকটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সব চেয়ে কম।

তবু এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, এ বিষয়ে যোগ্য আলোচনাকারী বাংলাদেশে নেই। যে কোন কারণেই হোক, আজকের মনীষীরা তাঁদের একটি প্রধান কর্তব্য ভুলে আছেন। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' পড়তে গিয়ে উপরি-উক্ত কথাগুলি মনে পড়েছিল।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধ-সাহিত্যে—এমন কি বাংলা-সাহিত্যের প্রবন্ধ-বিভাগে—'পঞ্চভূত' আপন স্বকীয়তায় অনন্য। তার কারণ, এ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশন-ভঙ্গী। সাধারণ প্রবন্ধের মতো তথ্য ও যুক্তির সমাবেশে সিদ্ধান্তসাধন করার মতো প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ বিশেষ লেখেননি। নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের চেয়ে তাঁর বেশী লক্ষ্য ছিল পাঠকচিত্তে অনুভূতি ও মননশীলতা জাগিয়ে দেওয়া। তাই রবীন্দ্র-প্রবন্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের মিলিত-সম্বন্ধ।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'বাংলা-সাহিত্যের একদিক' বইটিতে 'প্রবন্ধ' ও 'রচনা'র পার্থক্য বিশ্লেষণ ক'রে ব্যক্তিত্বের স্পর্শসমুজ্জ্বল প্রবন্ধকে 'রচনা' নামে অভিহিত করেছেন।[১] ইংরেজী সাহিত্যে চার্লস্ ল্যাম্বের 'এসেস্ অব্ ইলিয়া' এবং বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' এই রচনা সাহিত্যের উদাহরণ।

এই রচনা-সাহিত্যের সৃষ্টি বাংলাসাহিত্যে খুব কম দিনের ইতিহাস। জীবন, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সব কিছু সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বক্তব্য রয়েছে। সে বক্তব্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংযোগ

---

১ আমরা রচনার ভিতর শুধু কতগুলি 'সর্বজনীন ও সর্বকালীন কথা শুনিতে চাই না,—এখানে আমরা পাইতে চাই একটি বিশেষ সময়ের একটি বিশেষ মানুষকে। তাঁহাকে যে খুব বড় হইয়াই দেখা দিতে হইবে আমাদের দাবী সেরূপ নয়, আমাদের দাবী তাঁহাকে অকৃত্রিমরূপে দেখা দিতে হইবে—তাঁহাকে তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া আমাদের 'আপনার লোক' হইতে হইবে।

—বাংলা সাহিত্যের একদিক ; (৩য় সং—পৃঃ ২২)

থাকাটা জ্ঞানের বিষয় নয়, অনুভবের বিষয়। অথচ এই ব্যক্তিত্বই তথ্যের সঙ্গে প্রাণের যোগসাধন করে। জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানার যে পার্থক্য—প্রবন্ধ ও রচনার সেই পার্থক্য। অনুভবে জানাই সাহিত্যের মর্মকথা।

সাম্প্রতিক কালে 'রম্যরচনা' নামে যে শ্রেণীর রচনা personal essay বা রচনা-সাহিত্যের স্থান গ্রহণে উদ্যত, তাদের সম্বন্ধে পাঠকের একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এই শ্রেণীর রচনার বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষণিকপ্রেরণাজাত, ক্ষণিক চিত্তবিনোদনেই এদের তৃপ্তি। এই স্ফুলিঙ্গধর্মী রম্যরচনার সঙ্গে রচনা-সাহিত্যের পার্থক্য অনেকখানি। রচনাসাহিত্য অনেকটা ধূপের মতো। ধূপের দহন ও সুবাস যেমন একত্র জড়ানো, তেমনি রচনার মনন ও রসানুভূতি একত্র মেশানো।

'পঞ্চভূত' অবশ্যই রচনা-সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত। তবে পঞ্চভূতের গঠনভঙ্গীতে প্রবন্ধ, রচনা ও আলোচনা—এই তিনটি পদ্ধতি এসে মিলেছে। প্রবন্ধের তথ্যসন্নিবেশ, যুক্তিপরম্পরা, সিদ্ধান্তপ্রচেষ্টার সঙ্গে রচনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অনুভূতি-বিস্তার এবং আলোচনার বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গী—এই সব ক'টি লক্ষণে মিলে 'পঞ্চভূত'-প্রবন্ধমালা গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-পূর্বযুগে বাংলাপ্রবন্ধসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পার্থক্য সহৃদয়তায়। পূর্বসূরী ও সমসাময়িকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই সহমর্মীর মতো আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে কোথাও ভুলতে পারেননি। তিনি যে একাধারে স্রষ্টা ও শিক্ষক, কর্মী ও বিচারক—এই কথাটি তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে সর্বত্র সুস্পষ্ট।

প্রবন্ধের যে বিভাগটিকে আমরা 'রচনা-সাহিত্য' নামে অভিহিত করেছি, বিশেষভাবে সেই বিভাগের স্রষ্টাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি গভীর জীবনানুভূতি। এই অনুভূতি-সঞ্জাত দৃষ্টির ফলেই সৃষ্টি-রহস্য মানসলোকে ধরা দেয়। অপরূপ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য শুদ্ধমাত্র জীবনানুভূতির অভাবে ব্যর্থ হয়—বাংলা সাহিত্যে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এই জীবনবোধ বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবিত করে। বিচারবুদ্ধিও অনুভবকে সংযমের সীমা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীতে আমরা যুক্তি ও বুদ্ধির যে শাণিত প্রখরতা অনুভব করি, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তার পরিবর্তে রয়েছে গভীর উপলব্ধিময় জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শনের পটভূমিতেই তিনি সাহিত্য, সৌন্দর্য, সমাজ, রাজনীতি, অধ্যাত্মবোধ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ফলে, ব্যক্তিবোধের সীমানা রবীন্দ্র-প্রবন্ধ-সাহিত্যে সহজেই চোখে পড়ে। যেখানে তাঁর অনুভূতি ও কল্পনা বিস্তৃত, সেখানে তিনি নিঃসংশয়ে বিজয়ী। যেখানে অনুভবের সীমা সঙ্কীর্ণ, সেখানে তাঁর অপূর্ণতা সহজেই চোখে পড়ে। বিস্তৃত ও বহুমুখী চিন্তার পারস্পরিক সংঘাত ও সমৃদ্ধি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে সাধারণতঃ অনুপস্থিত। এক 'পঞ্চভূতে'ই তিনি আলোচনার বিষয়গুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখতে গেলে পঞ্চভূতের বিভিন্ন চরিত্র শেষ অবধি রবীন্দ্রসত্তার বিপুল প্রভাবে সমাচ্ছন্ন। বিভিন্ন দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যজনিত সজ্ঞাত অতি অল্পক্ষেত্রেই সুরক্ষিত।

যুক্তিপ্রধান মন স্বভাবতই আলোচনাকে নৈর্ব্যক্তিক ক'রে তোলে। অনুভূতিপ্রধান মন

ব্যক্তিসত্তার প্রবল প্রকাশ। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যেও এই ব্যক্তিসত্তার প্রবল উপস্থিতি দেখা যায়। ফলে, অধিকাংশ প্রবন্ধে ব্যক্তিপ্রকৃতি, মানসভঙ্গী, এমন কি ভাবালুতাও দেখা দেয়। প্রবন্ধ-রচনাকালেও রবীন্দ্রনাথের শব্দচয়ন কবিজনোচিত, উপমাপ্রয়োগ কবিকল্পনার উপযোগী। এই কারণেই তাঁর প্রবন্ধে আমরা সাহিত্যগুণ বেশী অনুভব করি।

পঞ্চভূত পাঁচজন বন্ধু, বান্ধবী এবং বন্ধুসভার সভাপতি শ্রীভূতনাথবাবুর মিলিত আলোচনার ডায়েরী বা দিনপঞ্জী। বলা বাহুল্য নাম কয়টি রচনার সুবিধার জন্য দেওয়া। ক্ষিতি, অপ্ (স্রোতস্বিনী), তেজ (দীপ্তি), মরুৎ (সমীর), ব্যোম্—এই পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে ক্ষিতি বাস্তবতাবাদী, স্রোতস্বিনী অনুভূতিবাদী, সমীর সৌন্দর্যবাদী, দীপ্তি যুক্তিবাদী এবং ব্যোম্ অধ্যাত্মবাদী। কিন্তু এদের মতামত সম্বন্ধে এত সহজেই কোন 'ism' বা মতবাদ ব্যবহার না করাই ভালো। স্বাভাবিক মানুষের মতো এদেরও মনোজগতে নানা মতের মিশ্রণ ঘটেছে। কেবল পরিচিতির সুবিধার জন্য মতবাদগুলিকে উল্লেখ করা হ'ল।

এই পাঞ্চভৌতিক সভার স্বতোনির্বাচিত সভাপতি ভূতনাথবাবু বন্ধুসভার আলোচনাগুলি একটি দিনপঞ্জীতে সাজিয়ে রাখেন। ভূতনাথবাবু বিভিন্ন মতবাদের সত্য অংশটুকু সংগ্রহ ক'রে একটা সর্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেন। তিনি একই সঙ্গে বিচারক ও স্রষ্টার ভূমিকা নিতে চেয়েছেন। কিন্তু বিচারকের নিরপেক্ষতার চেয়ে কবির অনুরাগই তাঁর দৃষ্টি-নিয়ামক। ফলে বেশ বোঝা যায়, 'স্রোতস্বিনী' কবিরই মানসী কল্পনা। উপমা দিয়ে স্রোতস্বিনী একটি গভীর সত্য প্রকাশ করেই লজ্জিত হয়ে পড়ে, ভূতনাথবাবু সেই উপমাকে কিছুটা যুক্তি এবং অনেকটা অনুভব দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। এই উপমা ও ব্যাখ্যায় মিলেই ভূতনাথবাবু তথা রবীন্দ্রনাথের আলোচনা এবং প্রবন্ধসাহিত্য গড়ে উঠেছে।

কিন্তু একটি জিনিস রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনায় নেই, যা 'পঞ্চভূতে' রয়েছে। পঞ্চভূতের গঠনশিল্প শুধু গঠনের অভিনবত্ব নয়, এই গঠনের উপরেই এর প্রাণ-সাফল্য নির্ভর করে। কোন বিষয়-সম্বন্ধেই আমাদের মন একটি মাত্র নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে এসে ক্ষান্ত হয় না। চিন্তাধর্মী মন প্রত্যেকটি বিষয়কে নানা দিক থেকে বিচার ক'রে একটি সামগ্রিক উপলব্ধিতে এসে পৌঁছাতে চায়। 'পঞ্চভূতে'র পাঁচটি দৃষ্টিকোণ মূলতঃ একই মনের বিভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু এই রচনাবলীতে কোথাও স্থির সিদ্ধান্তের প্রচেষ্টা নেই। ভূতনাথবাবুর ভাষায় এই সভার আলোচনাগুলি সাহিত্যিক স্বাস্থ্যান্বেষণের প্রচেষ্টা। 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধে এই কথাটিই আর একভাবে বলা হয়েছে :

'গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না, তবুও অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচজনের গড়ের মাঠ, এখানে সত্যের শস্যলাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দ লাভ করিতে মিলি। সেইজন্য এ সভায় কোনো কথার পুরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ পাইলেও চলে।'[২]　　(ক্রমশঃ)

---

২ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে।

বৌদ্ধ কর্মবাদ

শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী

জগতের দিকে আমরা যখনই দৃষ্টি ফিরাই, তখনই আমাদের চোখে পড়ে মানুষের ভেদ-বৈষম্য। যতই বড় বড় বুলি আওড়াই না কেন, এ বৈষম্য মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। জগতে আমরা দেখি—কেউ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কেউ নির্বোধ; কেউ স্বাস্থ্যবান্‌, কেউ স্বাস্থ্যহীন; কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত; কেউ ভাগ্যবান্‌, কেউ ভাগ্যহত; কেউ ক্ষমতাসম্পন্ন, কেউ ক্ষমতাহীন। এ ভাবে মানুষের মধ্যে ভেদের অনন্ত রেখা টেনে চলেছে জগৎ। স্বতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—জগতে এত ভেদ, এত বৈষম্য কেন?

এর উত্তরে বৌদ্ধ ধর্ম সহজ কথায় বলে: মানুষের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্মই এ ভেদ সৃষ্টি করে। ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপন করলে তার ফল হয়, তেমনি কর্ম অনুষ্ঠিত হ'লে তার ফল অবশ্যম্ভাবী। বলা বাহুল্য সু-কর্মের ফল সুখপ্রদ এবং দুষ্কর্মের ফল দুঃখপ্রদ।

কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখতে পাই—কেউ কুকর্মে লিপ্ত হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটায়, আবার কেউ সৎ কর্ম সম্পাদন করেও বহু দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করে। তখন কর্মের ফল সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মন সংশয়াচ্ছন্ন হয়। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে—যদি কর্মের ফল থাকে, তবে সৎ ব্যক্তি কষ্ট পায় কেন এবং অসাধু ব্যক্তি সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হয় কেন?

এর উত্তরে বলা হয়: সদ্যদুগ্ধ যেমন দধিতে পরিণত হয় না, তেমনি কৃতকর্মও সঙ্গে সঙ্গে ফল দান করে না। আজ যাকে আমরা সৎ দেখছি, সে যে গত জীবনে কুকর্ম করেনি তা কে বলবে? সেই কুকর্মের ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। যে আজ অসৎ কর্মে লিপ্ত, সেও যে অতীত জন্মে সৎ কর্ম করেনি, তা নয়। সেই সৎকর্মের ফল তার লভ্য। ইহ জন্মেই মানুষের জীবনে কত পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি—অসাধু ব্যক্তি অনুকূল পরিবেশের মধ্যে সৎ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, আবার অসৎসঙ্গে সৎ ব্যক্তিরও নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে। সুতরাং জন্ম-জন্মান্তরের দীর্ঘকালের মধ্যে মানুষের পরিবর্তন বিচিত্র নয়। গত জীবনের সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফলে মানুষ যেভাবে থাকুক না কেন, ইহ জীবনে তার অনুষ্ঠিত কর্ম বিফল হবে না, যথা সময়ে ফল দান করবেই।

'কর্ম' বলতে বুদ্ধের কথায় 'চেতনা'কেই নির্দেশ করা হয়। সচেতন চেষ্টা ছাড়া কর্মের অনুষ্ঠান হয় না। কাউকে আঘাত করার চেতনা যদি না থাকে অর্থাৎ হঠাৎ কারু গায়ে আঘাত লাগে, তাতে আঘাত-জনিত পাপ আঘাতকারীকে স্পর্শ করে না। তেমনি উপকারের অভিপ্রায় না থাকলে ঘটনাক্রমে পরের উপকার করা হয়ে গেলে তা পরোপকারের পুণ্য বহন করে না। অতএব প্রতিকর্মের মূলে রয়েছে কর্ম-সম্পাদনের চেতনা।

কর্ম প্রধানতঃ তিন প্রকার: যথা—কুশল কর্ম, অকুশল কর্ম ও অব্যাকৃত বা অনির্ণীত কর্ম। যে কর্মের অনুষ্ঠানে মন হিংসালোভাদিতে আবিল থাকে, সেই কর্মকে বলা হয় অকুশল বা পাপকর্ম। প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, ইত্যাদি তার অন্তর্গত। যে কর্ম সম্পাদনে মন

ভাবে-ভক্তিতে প্রেমে-পবিত্রতায় পরিপূর্ণ থাকে, সেই কর্মকে কুশল বা পুণ্যকর্ম বলা হয়। দান, পূজা, শীলাচার ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো ছাড়া এমন কর্মও আছে, যার অনুষ্ঠানে পাপও নেই, পুণ্যও নেই। তা অব্যাকৃত কর্ম ব'লে পরিগণিত।

ক্রিয়াভেদে কর্ম চারি প্রকার: যথা— জনক, সহায়ক, উপপীড়ক, উপঘাতক। কর্ম যদিও জীবকে জন্ম-জন্মান্তরের পথে নিয়ে চলে, তবুও সব কর্মের ক্রিয়াই 'জন্মের' কারণ নয়। যে কর্ম জন্মের কারণ তাকে বলা হয় 'জনক-কর্ম'। কিন্তু জন্মদানের ক্রিয়া-সম্পাদনে তার পরিসমাপ্তি নয়। অন্য কর্ম দ্বারা যদি ব্যাহত না হয়, আমরণ তার ফল চলতে থাকে। যে কর্ম তার অনুকূল হয়ে সহায়তা করে, সে কর্মকে 'সহায়ক কর্ম' বলে। শুভজনক কর্মের প্রভাবে মানুষ যখন সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, তখন সহায়ক কর্ম তার সুখ-সৌভাগ্যকে বড় ক'রে তোলে। তেমনি তা অশুভজনক কর্মের প্রভাবগ্রস্ত ব্যক্তির দুঃখ-দুর্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। 'উপপীডক কর্ম' জনক কর্মের ফলকে নিপীড়িত ক'রে বাধা দেয়। এর ফলে শুভজনক কর্মের ক্ষেত্রে সুখ-সৌভাগ্য অন্তর্হিত হয়ে দুঃখ-দৈন্যের উৎস খুলে যায়, আবার অশুভজনক কর্মপ্রসূত দুঃখ-দুর্ভাগ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে সৌভাগ্যের জোয়ার আসে। 'উপঘাতক কর্ম' জীবের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায়; জনক কর্মের ফলকে ছিন্ন ক'রে দেয়, এজন্য একে উপঘাতক কর্ম বলা হয়। এ কর্ম জীবনের উপর আকস্মিক ভাবে যবনিকা পাত করে ব'লে জনক কর্ম আপনার ফলদানের সুযোগ পায় না।

কর্মের যেমন ক্রিয়াভেদ আছে, তেমনি তার ফলভেদও রয়েছে। সকল কর্ম একভাবে ফল দান করে না, তার গুরুত্ব লঘুত্বের উপর ফল-দান নির্ভর করে। ফলদান-ভেদেও কর্ম চারি প্রকার: যথা—গুরু, আসন্ন, অভ্যস্ত, কৃত। কর্মসমূহের মধ্যে যার গুরুত্ব অধিক, তাকে 'গুরু কর্ম' বলে। পুণ্যের ক্ষেত্রে ধ্যান সমাপত্তি এবং পাপের ক্ষেত্রে পিতৃহত্যা, মাতৃ-হত্যা ইত্যাদি মহাপাতক 'গুরু কর্ম' ব'লে অভিহিত। এ কর্মকে অন্য কোন কর্ম ঠেকাতে পারে না। শক্তিশালী পুরুষ যেমন দুর্বল জনগণকে পশ্চাতে ফেলে অগ্রগামী হয়, তেমনি গুরু কর্ম আপনার প্রচণ্ড শক্তির প্রভাবে সকল কর্মকে অভিভূত ক'রে প্রথমেই ফলপ্রসূ হয়। এজন্য তা 'অনন্তর ভবে' বা অব্যবহিত জন্মে ফল দান করে। তাই তাকে 'আনন্তর কর্ম'ও বলা হয়। মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে যে কর্ম সম্পন্ন হয়, তাকে 'আসন্ন কর্ম' বলে। এ কর্ম সদ্য অনুষ্ঠিত ব'লে মৃত্যুপথযাত্রীর মনে স্বতই প্রতিফলিত হয়। তাই গুরু কর্ম না থাকলে তা পরবর্তী জন্মেই ফল দান করে। যে কর্ম বার বার করা হয় এবং যার চিন্তা প্রায় মনকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে, তা অভ্যাসগত হওয়ায় 'অভ্যস্ত কর্ম' নামে অভিহিত। গুরু কর্ম ও আসন্ন কর্মের অভাবে তা ফল দান করে।

কর্মের অনুষ্ঠান ছাড়া কেউ জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। স্বভাবতই জীব কর্মসম্পাদনে রত হয়। যে কর্ম 'গুরু', 'আসন্ন' বা 'অভ্যস্ত' কর্মের পর্যায়ে পড়ে না, তাকে বলা হয় 'কৃত কর্ম'। অন্য তিনটির তুলনায় এর ফলন শক্তি দুর্বল ব'লে অন্য তিনটি না থাকলে এ কর্ম ফল দান করে।

কর্মের ফলদানের কালও বিভিন্ন। কাল-ভেদে কর্মকে বলা হয়: প্রত্যক্ষ-বেদ্য, উপপদ্য-বেদ্য, অপরাপর্য-বেদ্য ও ভূতপূর্ব। যে কর্ম

আপনার গুরুত্বের জন্য ইহজন্মেই ফল দান করে, তাকে বলে 'প্রত্যক্ষ-বেদ্য' বা প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ। যে কর্মের ফল অব্যবহিত পরজন্মে দেখা দেয়, তা 'উপপদ্য-বেদ্য' নামে অভিহিত। জন্মান্তরের অনন্ত বিস্তারে জীবের জীবনে যে কোন সময়ে যে কর্মের ফল উৎপন্ন হয়, তাকে বলে 'অপরাপর্য-বেদ্য কর্ম'। প্রত্যক্ষ-বেদ্য ও উপপদ্য-বেদ্য কর্ম যখন অন্য কর্মের প্রভাবে আপন আপন ফলদানের কাল-সীমা অতিক্রম করে, তখন সেগুলো ফলদানের সুযোগ হারিয়ে 'ভূতপূর্ব কর্ম' হয়ে যায় এবং পরম আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভে জন্ম ক্ষয় হ'লে 'অপরাপর্যবেদ্য কর্ম'ও ফলদানের সুবিধা না পেয়ে ভূতপূর্ব কর্মে পরিণত হয়। এক কথায় ফলদানের সুযোগ না পেয়ে যে কর্ম শুধু কর্মমাত্রে পর্যবসিত হয়, তাকেই বলে 'ভূতপূর্ব কর্ম', যার ফল ভোগ করতে হয় না।

কর্মবাদের কথা বললেই জন্মান্তরবাদের প্রশ্ন ওঠে। বীজের সঙ্গে বৃক্ষের যে সম্বন্ধ—কর্মের সঙ্গে জন্মান্তরের সম্বন্ধও ঠিক তাই। এজন্য কর্মকে 'ভববীজ' বলা হয়। জন্মান্তরবাদ জীবের অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব সূচনা করে। বৌদ্ধধর্মে জীবের অস্তিত্বকে ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে 'ধর্ম' বলতে যা প্রাকৃতিক নিয়মে ধারণ করছে, তাকেই বুঝায় এবং সংস্কার বলতে প্রত্যয়সমূহের সংযুক্ত ক্রিয়াকেই নির্দেশ করা হয়। অবিদ্যা-তৃষ্ণাবাহিত কর্মই এ প্রবাহের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে একে চালিত করে, যার ফলে জন্ম-মৃত্যুর বা উৎপত্তি-লয়ের তালে তালে কালের অনন্ত বিস্তারে চলে জীবত্বের লীলাভিনয়। সাগরের বুকে যেমন একটি ঢেউ ওঠে, ভেঙে যায় এবং আবার আর একটি ঢেউ ওঠে —এ ভাবে ঢেউএর ওঠা-নামা চলতে থাকে, তেমনি ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহে জন্ম-মৃত্যুর ঢেউ বইতে থাকে—জন্মের পর মৃত্যু আসে এবং মৃত্যুর পর আবার জন্মান্তরলাভ হয়। এ ভাবে কর্মবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদ সংশ্লিষ্ট এবং কর্মের আবর্তনে সংসারে জীবের সুখ-দুঃখের দাবাখেলা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বলা হয়েছে: কম্মং সত্তে বিভাজতি যদিদং হীনপ্পণীত ভাব।

There is no other way to vindicate the glory and the liberty of the human soul and reconcile the inequalities and the horrors of this world, than by placing the whole burden upon the legitimate cause—our own independent actions or Karma.

—'*Reincarnation*', *Swami Vivekananda*

লঙ্কাদ্বীপ-পরিক্রমা

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রানী ও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত প্রসিদ্ধ লঙ্কা-দ্বীপ ; প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অনেকে সেখানে যাবার বিবরণাদি আমাদের কাছে (মাদ্রাজে) জানতে চান। যদিও ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের ব্যবধান মাত্র ২২ মাইল, এবং এক কালে ভারতের সহিত তার সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়, তথাপি এখন এটি একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, সুতরাং তা পরিদর্শনের আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন এখানেও প্রযোজ্য। অনেকে তা জানেন না ব'লে নানা অসুবিধা ও হয়রানির মধ্যে তাঁদের পড়তে হয়।

লঙ্কাদ্বীপের রাজধানী কলম্বো ; সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের সাদর আহ্বানে শিবরাত্রি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম ও বক্তৃতাদি করবার জন্য এবার কলম্বো গিয়েছিলাম। উৎসবান্তে তাঁর সাথে মোটরে সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ পরিক্রমা করি এবং ঐ দ্বীপের প্রধান প্রধান তীর্থ ও দ্রষ্টব্যস্থানগুলি পরিদর্শনান্তে কলম্বো হয়ে মাদ্রাজে ফিরি। আমাদের মোট ১,২৩৫ মাইল পথ মোটরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল।

লঙ্কাভ্রমণের এই সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা লঙ্কাদর্শনেচ্ছুদের কিছু সহায়ক হ'তে পারে মনে ক'রে এই প্রবন্ধ লিখছি।

লঙ্কায় যেতে হ'লে প্রথমে ভারত সরকারের কাছ থেকে পাসপোর্ট গ্রহণ করতে হয়, ফী পাঁচ টাকা। পাসপোর্ট পাওয়ার পর সিলোন সরকারের ভারত-স্থিত হাই-কমিশনারের কাছে ভিসার (Visa) জন্য দরখাস্ত দিতে হয়। মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই ও ত্রিচিনাপল্লীতে সিলোন হাই-কমিশনারের অফিস আছে এবং এগুলির যে-কোন একটি হ'তে ভিসা পাওয়া যায়, ভিসার ফী দুই টাকা। পাসপোর্ট ও ভিসার জন্য যথাক্রমে তিনখানি ও দুইখানি পাসপোর্ট সাইজের ফটো দরখাস্তের সঙ্গে সংলগ্ন করা প্রয়োজন। লঙ্কায় প্রবেশের দিন থেকে মাত্র ১৫ দিনের জন্য ভিসা দেওয়া হয়। চেষ্টা করলে এবং বিশেষ প্রয়োজন হ'লে ঐ ভিসার মেয়াদ কলম্বোতে বর্ধিত করা যায়। যাত্রার অন্ততঃ ৭।৮ দিন পূর্বে মিউনিসিপাল অফিস বা সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে কলেরা ইঞ্জেকশন ও বসন্তের টিকার সার্টিফিকেট নিতে হয়। কলম্বো পর্যন্ত টিকিট ছাড়া ভারত সরকার মাত্র ৭৫৲ টাকা প্রত্যেক যাত্রীকে নিতে অনুমতি দেন। এরোপ্লেনে গেলে অবশ্য রিটার্ন টিকিট কেটে যাওয়া যায়। যাঁরা ট্রেনে যান, তাঁদের পক্ষে লঙ্কাদ্বীপের সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখে ভারতবর্ষে ফিরে আসা বেশ কষ্টকর। যাঁরা উত্তর ভারত বা পশ্চিম ভারত হ'তে আসবেন এবং ট্রেনে যাবেন, তাঁরা স্বস্থানে ফিরবার জন্য ধনুষ্কোটীতে সরকার-অনুমোদিত আমানত (deposit)-গ্রহণকারীর নিকট টাকা জমা রেখে তাঁর কাছ থেকে রসিদ নিতে পারেন। লঙ্কা দর্শনের পর ধনুষ্কোটীতে ফিরে এসে রসিদ দেখিয়ে ঐ টাকা ফেরত নিতে পারা যায়।

কলম্বোতে যাওয়ার উপায় দুই প্রকার। মাদ্রাজ বা ত্রিচিনাপল্লী থেকে এরোপ্লেনে যাওয়া যায়, ভাড়া যথাক্রমে ১২০৲ টাকা ও ৯০৲ টাকা। মাদ্রাজ থেকে রোজ দুপুরে

'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্'এর ভাইকাউণ্ট বিমান ছাড়ে এবং ১০০ মিনিটের মধ্যে কলম্বো এরোড্রোমে পৌঁছায়। ত্রিচিনাপল্লী থেকে 'এয়ার সিলোন' সপ্তাহে তিন দিন ছাড়ে এবং সওয়া ঘণ্টা আন্দাজ লাগে, দূরত্ব যথাক্রমে প্রায় ৩৪০ ও ২৮০ মাইল।

দ্বিতীয় উপায় ট্রেনে যাওয়া। মাদ্রাজ এগমোর স্টেশন থেকে ধনুষ্কোটী বোট মেল সন্ধ্যায় ছাড়ে ও পরদিন বিকাল চারটায় ধনুষ্কোটী পৌঁছায়। ওখান থেকে ষ্টীমারে ২২ মাইল পক্-প্রণালী অতিক্রম ক'রে সিলোনের তালামান্নারে পৌঁছাতে হয়। বিকাল ৫॥ টায় ষ্টীমার ছাড়ে ও সন্ধ্যা ৮ টায় পৌঁছায়। তালামান্নারে সন্ধ্যা ৮॥ টায় সিলোন গভর্নমেণ্ট রেলে উঠে পরদিন সকাল ৭ টায় কলম্বো ফোর্ট স্টেশনে পৌঁছানো যায়। মাদ্রাজ বা ভারতের যে-কোন বড় স্টেশন থেকে কলম্বো ফোর্ট পর্যন্ত রেলের টিকিট পাওয়া যেতে পারে। তালামান্নার থেকে কলম্বো শহরের দূরত্ব ১৫০ মাইল। মাদ্রাজ থেকে কলম্বো ফোর্টের সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়া প্রায় ৫৫৲ টাকা এবং থার্ড ক্লাস ভাড়া প্রায় ২৭৲ টাকা। মণ্ডপ ক্যাম্প ও তালামান্নারে উভয় সরকারের কাস্টমস্ অফিসাররা যাত্রীদের পাসপোর্ট, ভিসা ও মালপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন; প্রথমে ১ম ও ২য় শ্রেণীর যাত্রীদের। যাত্রী বেশী হ'লে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কোয়ারাণ্টাইনে একদিন অপেক্ষা করতে হয়। কলম্বোতে পৌঁছিয়ে ঐদিনই সিলোন সরকারের কোয়ারাণ্টাইন অফিসে যাত্রীদের নিজে অতি অবশ্যই উপস্থিত হ'য়ে টিকা ও ইঞ্জেকশন্-এর সার্টিফিকেট-আদি দেখাতে হয়। ভিসার মেয়াদ বাড়াতে হ'লে কলম্বোতে 'কন্‌ট্রোলার অব্‌ ইমিগ্রেশান' অফিসে গিয়ে চেষ্টা করা প্রয়োজন। যেদিন ভিসার মেয়াদ শেষ হবে, ঐদিনই অতি অবশ্য লঙ্কাদ্বীপ ছাড়তে হবে। লঙ্কাদ্বীপ পরিভ্রমণ-কালে পাসপোর্ট, ভিসা ও টিকার সার্টিফিকেট সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখাই নিরাপদ নতুবা বিপদে পড়ার সম্ভাবনা।

এখানে লঙ্কার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দে রাজা বিজয় সিংহ সাতশত অনুগামী সহ লঙ্কাদ্বীপে অবতরণপূর্বক তথায় বসবাস আরম্ভ করেন। নানা প্রমাণাদি দেখে মনে হয় বিজয় সিংহ বাংলা দেশ থেকেই লঙ্কায় গিয়েছিলেন। 'সিংহ' থেকে 'সিংহল' হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সিংহলীদের ও বাঙালীদের চেহারার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। সিংহলীরাও খুব মৎস্যপ্রিয় এবং সিংহলী ভাষার অনেক শব্দ হুবহু বাংলা; যথা 'হাত', 'ভাত', 'গাঁ' (গ্রাম) ইত্যাদি। আমি মাত্র কয়েকদিন ছিলাম, কাজেই ওদেশের ভাষার সঙ্গে বেশী পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। সিংহলীরা বাঙালীদের খুব পছন্দ করে। একটি বুদ্ধমন্দিরে যখন দর্শন করছিলাম, তখন আমরা বাঙালী শুনে অনেকে বেশ প্রীতি ও সম্ভ্রমের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ করার চেষ্টা করেছিল। খৃঃ পূঃ ৫৪৪ থেকে খৃষ্টাব্দ ১৮১৫ পর্যন্ত ১৮০ জন সিংহলী রাজা এই দ্বীপে রাজত্ব করেন। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজা অশোকের পুত্র ও কন্যা—মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা এই দ্বীপে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এই প্রথম। সিংহলীদের প্রতি ভারতীয়দের প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ এবং দুই দেশের বন্ধুত্ব স্থায়ী করার জন্য বুদ্ধগয়ার বিখ্যাত ও পবিত্র বোধিদ্রুমের একটি শাখা

সঙ্ঘমিত্রা অনুরাধাপুরে সিংহলী রাজাকে উপহার দেন। ঐ শাখাটি মহাসমারোহে অনুরাধাপুরে রোপণ করা হয় এবং কথিত আছে, উহাই বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন বৃক্ষ। বুদ্ধগয়ায় আদি বোধিদ্রুমটির মৃত্যু হ'লে অনুরাধাপুর থেকে ঐ বৃক্ষের একটি চারা এনে তথায় রোপণ করা হয়। কয়েক বৎসরপূর্বে অনুরাধাপুর থেকে ঐ বৃক্ষের আর একটি চারা এনে মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীধর্মপাল বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে রোপণ করেন। মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার প্রচারের ফলে সিংহলের রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে সিংহলীরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হন। অনুরাধাপুরই সিংহলের প্রথম রাজধানী।

লঙ্কাদ্বীপের অতীব মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এর অমূল্য ধন ও পশুসম্পদ্, সর্বোপরি এই দ্বীপের রত্নপুরীর—মহামূল্য মণিমাণিক্যের—প্রতি ক্রমশঃ প'ড়ল বিদেশীদের লোলুপ দৃষ্টি; প্রথমে দক্ষিণ ভারতের তামিল রাজারা কয়েকবার আক্রমণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত শক্তিশালী রাজা এলালা খৃঃ পূঃ ১৬১ পর্যন্ত অনুরাধাপুর নিজের দখলে রাখেন। পরে চোল ও পাণ্ড্য রাজারাও বৌদ্ধ সিংহলী রাজাকে পরাজিত করেন। সিংহলী রাজারা অনুরাধাপুর হ'তে পোলানারুয়া ও তার পরে দাইগিরিয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন। হিন্দু রাজকন্যাদের সঙ্গে বৌদ্ধ সিংহলী রাজাদের বিবাহাদিও হয়েছিল। পোলানারুয়াতে প্রাসাদের মধ্যে হিন্দু রানীর জন্য শিব, গণেশ ও কার্তিকের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কোন কোন মন্দির এখনও রয়েছে এবং পূজাদিও চলছে। ক্রমশঃ ১৫০৫ খৃঃ পর্তুগীজরা এবং ১৬৪০ খৃঃ ওলন্দাজরা লঙ্কাদ্বীপের উত্তরাংশ আক্রমণ ক'রে কিছু কিছু স্থান অধিকার করে। অতঃপর ১৭৭৬ খৃঃ বৃটিশরা ওলন্দাজদের পরাজিত ক'রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এবং ১৮১৫ খৃঃ শেষ স্বাধীন বৌদ্ধ সিংহলী নরপতি বিক্রমরাজা সিংহকে তাহাদের শেষ রাজধানী ক্যাণ্ডিতে পরাজিত করেন ও রাজাকে মাদ্রাজের ভেলোরে নির্বাসিত করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ খৃঃ লঙ্কাদ্বীপ স্বাধীনতা লাভ করে এবং এখন সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এই দ্বীপ প্রায় ৩০০ মাইল ও ১৫০ মাইল এবং জনসংখ্যা নব্বই লক্ষ। এই নব্বই লক্ষের মধ্যে পঁয়ষট্টি লক্ষ সিংহলী, দশ লক্ষ হিন্দু (এদের 'সিলোন তামিল' বলা হয়)। চা, কফি ও রবার বাগানের শ্রমিক দশ লক্ষ, এদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন দক্ষিণভারতীয় হিন্দু এবং বাকী অন্যান্য সম্প্রদায়। লঙ্কাদ্বীপের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে জাফনা, ত্রিঙ্কোমালী ও বাটিকালো জেলায় সিলোন-তামিলরা পুরুষানুক্রমে বসবাস করছে। সম্প্রতি সিংহলীকে সমগ্র দ্বীপের রাষ্ট্রভাষা করায় সিলোন-তামিলদের মধ্যে খুব বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং ধর্মঘট প্রভৃতি চলেছে। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যস্থলে কয়েকটি জেলায় প্রচুর পরিমাণে চা, কফি, কোকো ও রবার উৎপন্ন হয়। এখনও অধিকাংশ বাগানের মালিক ইংরেজ এবং শ্রমিক দক্ষিণভারতীয়। নারিকেল গাছ দ্বীপের মধ্যস্থল ছাড়া সর্বত্র; লক্ষ লক্ষ নারিকেল গাছ এবং ফলনও বেশ ভাল। লঙ্কার কিং-কোকোনাট (King-cocoanut) খুব বিখ্যাত, রং হলদে এবং প্রচুর জল।

এই দ্বীপের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলির নাম: কলম্বো শহর, গল বন্দর, কাতারাগামায় বিখ্যাত সুব্রহ্মণ্য-মন্দির, প্রসিদ্ধ শৈলবিহার

নিউরেলিয়া (Newra Eliya), সুবিখ্যাত ও সুন্দর ক্যাণ্ডি (Kandy) শহর, তথায় বুদ্ধের 'টুথ টেম্পল', বোটানিক গার্ডেন ও ইউনিভার্সিটি, ডাম্বোলার সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গুহা-মন্দির, সাইগিরিয়ার মনোহর ফ্রেস্কো পেন্টিং, পোলানারুয়ার বৌদ্ধ রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ, ত্রিঙ্কোমালীর স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও তথাকার বিখ্যাত কোণেশ্বর শিব এবং অনুরাধাপুরের সুবৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপ, বোধিদ্রুম ও বৌদ্ধ রাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ প্রভৃতি।

এই দ্বীপের সর্বত্রই পিচের রাস্তা, মধ্যে মধ্যে অতিথিশালা (Guest House) আছে; তথায় পর্যটকরা খরচ দিয়ে থাকতে পারেন। কাতারাগামা, ডাম্বোলা, সাইগিরিয়া ও পোলানারুয়া ছাড়া সর্বত্র ট্রেনে যাওয়া যায়; বাসেও যাওয়া যায়! লঙ্কাদ্বীপের সর্বত্র সরকার-পরিচালিত বাস। খাওয়ার খরচ ভারতবর্ষ থেকে কিছু বেশী। কলম্বো শহরে সিলোন গভর্নমেণ্টের 'টুরিস্ট ইনফরমেশন বুরো'তে গেলে প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখার ও থাকার সব খবরই পাওয়া যেতে পারে।

শীতের সময় কেবল ক্যাণ্ডি শহরে একটু শীত অনুভূত হয়। অন্য কোন স্থানে শীত নেই, কাজেই শীতবস্ত্র লওয়ার প্রয়োজন হয় না।

ট্রেনের ভাড়া আমাদের দেশের ট্রেন-ভাড়ার প্রায় সমান। বাসের ভাড়া ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া চেয়েও কম! খুব মিত-ব্যয়িতার সহিত চললে ৭৫৲ টাকায় সমগ্র দ্বীপ মোটামুটি পরিভ্রমণ করা যায়।

কলম্বো শহরটি বেশ সুন্দর, অবশ্য পাশ্চাত্য প্রভাব খুব বেশী। এখানকার চিড়িয়াখানা সত্যই দেখবার। রোজ বিকালে সেখানে ৫।৬টি হাতীর—নৃত্য, ঘণ্টা বাজানো, মানুষকে মুখে নিয়ে ঘোরা সত্যই উপভোগ্য। শহরে মোটরগাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। ভারতবর্ষের কোন শহরে এত মোটরগাড়ী দেখিনি।

রামকৃষ্ণ মিশন এই দ্বীপে প্রায় গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য ক'রে আসছেন। কলম্বোর ওয়েলওয়াটা অঞ্চলে রামকৃষ্ণ রোডের উপর রামকৃষ্ণ মিশন অবস্থিত। সমুদ্র থেকে দূরত্ব মাত্র এক ফার্লং। সমুদ্রের খুব কাছেই প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি আন্তর্জাতিক কৃষ্টিভবন ও ছাত্রাবাস—বিশেষ ক'রে ভারত সরকারের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হচ্ছে। মিশন একটি পুস্তাকাগার ও পাঠাগার পরিচালনা করেন। এই আশ্রমটিই সমগ্র দ্বীপে রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত কার্যাবলীর মুখ্য কেন্দ্র। দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে মিশন প্রায় ২৬টি স্কুল ও ৪।৫টি ছাত্রাবাস পরিচালনা করছিলেন—নয় হাজারের অধিক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন ক'রত। গত ডিসেম্বর থেকে সিলোন সরকার দ্বীপের সমস্ত স্কুলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটি প্রধান কার্য বিখ্যাত তীর্থ কাতারাগামায় একটি যাত্রী-নিবাস পরিচালনা করা। এতে প্রায় এক হাজার যাত্রীকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেটি নির্মিত হয়েছে। সমস্ত বছরই যাত্রী-সমাগম হয় এবং দৈনিক কমপক্ষে যাত্রীর সংখ্যা অন্ততঃ ১০০ জন। সকল যাত্রীকে দুপুরে ও সন্ধ্যায় খাওয়ানো হয় এবং তার জন্য কোন কিছু চাওয়া হয় না। উৎসবাদির সময় দৈনিক ৫।৬ হাজার লোককে খাওয়ানো হয়। ওখানে রোজ যেন উৎসব লেগেই আছে। আধুনিক সুখ-সুবিধা ও ইলেকট্রিক লাইট ও জলের কল-সমন্বিত এই যাত্রী-ভবনটি জাতিধর্ম-

নির্বিশেষে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সেবা করছে। মন্দিরের পাশেই মিশনের যাত্রী-ভবন; নাম 'রামকৃষ্ণ মডম্' (Madam)। একজন সন্ন্যাসী ওখানে সব সময় থাকেন, এবং যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। প্রতি বৎসর আগস্ট মাসে ওখানে বিরাট উৎসব হয় এবং লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। দক্ষিণ ভারত থেকেও বহুলোক প্রতি বছর ওখানে গমন করেন। যদিও হিন্দুমন্দির, কিন্তু শতকরা ৭০ ভাগ যাত্রীই সিংহলী বৌদ্ধ। অনেক খৃষ্টান এবং মুসলমানও ওখানে যান। মন্দির খুব ছোট, কিন্তু মাহাত্ম্য সুদূরপ্রসারী। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মন্দিরের মধ্যে কি আছে তা একমাত্র পুরোহিত ছাড়া আর কেউ জানে না এবং জানার সম্ভাবনাও নেই। হিন্দুমন্দির হলেও পূজারী সিংহলী। গর্ভমন্দিরের দরজা সব সময় ৪৫টি পর্দা দিয়ে বন্ধ থাকে; পর্দার ওপরে ময়ূরের উপর আসীন কার্তিকের ছবি অঙ্কিত। মন্দিরে দেবতাকে না দেখতে পেলেও যাত্রীদের মনে কোন দুঃখ নেই এবং জানবার আগ্রহও নেই। নাটমন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে প্রণাম ও প্রার্থনা করলেই তাদের শান্তি। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! ভোগাদি সব গর্ভমন্দিরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে নিবেদন করা হয় এবং পরে ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়।

কলম্বো আশ্রমে আমরা শিবরাত্রিতে শিবের পূজা করলাম। রাত ৯টায় প্রথম প্রহরের পূজা আরম্ভ হয়েছিল এবং ভোর ৬টায় চতুর্থ প্রহরের পূজা ও হোমাদি শেষ হয়। সমস্ত রাত অন্ততঃ ২৫০ ভক্ত পূজাদি দর্শন করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভজনও চলেছিল। এর তিন দিন পরে মহাসমারোহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৬ তম জন্মতিথি-পূজাও ভাব-গাম্ভীর্যের সহিত সুসম্পন্ন হ'ল। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পূর্বে এক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বহু ভক্ত ও বন্ধু এতে যোগদান করেন। ওদেশেও শ্রীরামকৃষ্ণের এত অনুরাগী ভক্ত আছেন দেখে খুব আনন্দ হ'ল। এর প্রধান কারণ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার পাশ্চাত্য-বিজয়াভিযানের পর প্রথম কলম্বোতে জাহাজ থেকে নামেন এবং কলম্বোতে বক্তৃতাদির পর ক্যাণ্ডি ও অনুরাধাপুর দর্শনপূর্বক সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে জাফনা রওনা হন। অনু-রাধাপুর থেকে জাফনার দূরত্ব ১৮০ মাইল। পথে ঘোড়ার গাড়ী ভেঙে যাওয়ায় স্বামীজীকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। জাফনায় স্বামীজী খুব মূল্যবান্ ও সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এর কিছুকাল পরে স্বামীজীর নির্দেশে তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দ মহারাজ কলম্বোতে চেটিয়ারদের ধর্মশালায় ৭।৮ মাস থেকে তথায় ধর্মপ্রচার করেন। হারবারের নিকট রিক্লামেশান স্ট্রীটে অবস্থিত এই প্রশস্ত ধর্মশালাটিতে ভারত থেকে আগত হিন্দু যাত্রীদের বিনাখরচে থাকতে দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার পরদিন দুপুরে একটা মোটরগাড়ীতে রওনা হ'য়ে আমরা ১৮০ মাইল পথ অতিক্রমপূর্বক সন্ধ্যা ৭॥ টায় কাতারাগামাতে পৌঁছাই। একেবারে সমুদ্রের কিনারা দিয়ে সুন্দর পিচের রাস্তা। একপাশে দিগন্ত-বিস্তৃত ভারত মহাসাগর, আর অন্যদিকে সারিবদ্ধ অফুরন্ত অসংখ্য নারিকেল গাছ। দৃশ্য অতীব নয়নাভিরাম। ৭২ মাইল যাওয়ার পর আমরা গল (Galle) বন্দরে উপস্থিত হলাম। স্বাভাবিক এই বন্দরটির সৌন্দর্যের তুলনা নেই।

এর পর মাতারা শহর। কলম্বো হ'তে প্রায় ১০০ মাইল দূর মাতারা শহর পর্যন্ত রেল লাইন এসেছে। কাতারাগামাতে সুব্রহ্মণ্যের মন্দিরের একপাশে গণেশ ও অন্য পাশে তাঁর প্রথমা স্ত্রী দেবযানীর মন্দির এবং কিছু দূরে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী বল্লীর মন্দির। গণেশ ও দেবযানীর মন্দির ভারতীয়দের এবং পূজারীও ভারতীয়। সুব্রহ্মণ্য-মন্দির হ'তে দু-ফার্লং দূরে খুব পুরাতন একটি সুবৃহৎ বুদ্ধ-স্তূপ। সম্প্রতি সিলোন সরকার এই স্তূপটির পুনর্নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করেছেন এবং আমরা কাতরাগামা যাওয়ার দুইদিন পরে লঙ্কাদ্বীপের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী শ্রীমা বন্দরনায়ক ঐ নির্মাণকার্যের ভিত্তিস্থাপন করেন। সুব্রহ্মণ্য-মন্দির এত বিখ্যাত এবং বছরে ৩।৪ লক্ষ টাকা আয় থাকা সত্ত্বেও অতি অপরিষ্কার ও অবহেলিত অবস্থায় মন্দিরটি রাখা হয়েছে। ভোর ৪॥ টায়, পূর্বাহ্ণ ১০॥টায় ও সন্ধ্যা ৬॥টায় পূজা ও আরতি হয় এবং যাত্রীরা দর্শন করতে যান। যাত্রীরা সাধারণতঃ নারিকেল, ফল, বিভূতি ও লাল কাগজের ফুলের মালা দেবতাকে নিবেদন করার জন্য পুরোহিতকে দেন। কমপক্ষে এক টাকা দক্ষিণা না দিলে ঐ পূজা মন্দিরের ভেতরে লওয়া হয় না। ঐ টাকা পূজারীর প্রাপ্য। দৈনিক কমপক্ষে ঐরূপ ১০০ পূজা দেওয়া হয়। আমরা পরদিন প্রাতে মন্দির-সংলগ্ন পবিত্র মাণিক-গঙ্গায় স্নানাদি সমাপন-পূর্বক পূজার দ্রব্যাদি নিয়ে গেলাম। পূজারী সাগ্রহে আমাদের পূজার দ্রব্যাদি গ্রহণ ক'রে নিবেদন করলেন। এই মন্দিরে যাত্রীদের কারও কারও প্রায়ই ভাব হয়। আমরা দুজন মহিলাযাত্রীর ও একজন পুরুষের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম; ওঁরা কিন্তু বৌদ্ধ। তৃতীয় দিনে ভোরে রওনা হয়ে ১১৫ দূরস্থিত লঙ্কাদ্বীপের একমাত্র শৈলাবাস নিউরেলিয়া (Newra Eliya) শহরে উপস্থিত হলাম; সমুদ্রবক্ষ থেকে উচ্চতা ৭,০০০ ফিট। শহরে প্রবেশের দু-মাইল আগে বিখ্যাত 'হাক্‌গালা' চূড়ায় একটি বোটানিক গার্ডেন আছে, তাও দেখলাম। এরই এক স্থানে কয়েকটি খুব পুরাতন বৃহদাকার বৃক্ষ রয়েছে—ঐ স্থানটিকে 'অশোকবন' বলা হয়। উহার কিছু দূরে প্রধান রাস্তার পাশে সীতাদেবীর ছোট্ট একটি মন্দির। কেহ কেহ বলেন, সীতাদেবীকে রাবণ-রাজা এখানে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু সমস্ত লঙ্কাদ্বীপ ঘুরেও রাবণ-রাজার বা তাঁর প্রাসাদের কোনও হদিস পেলাম না। নিউরেলিয়া শহরেও সুন্দর বোটানিক গার্ডেন আছে। নানা রকম ফুলের বাহারে বাগানটি সুসজ্জিত। এখানে মধ্যাহ্নভোজন-সমাপনান্তে পাহাড়ের নীচে নামতে আরম্ভ করলাম।

পথের চারদিক কেবল চা, রবার, কোকো, দারুচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতির গাছ ও লতায় পূর্ণ। পূর্বেই বলেছি, প্রায় দশ লক্ষ দক্ষিণ-ভারতীয় তামিলভাষী শ্রমিক এই সব চা-বাগানে ও রবার-বাগানে কাজ করে। একটি চা-এর ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কি ক'রে চা তৈরী হয়, দেখলাম। এক পাউণ্ড চা করতে প্রায় দেড় টাকা খরচ পড়ে, শুনলাম। ৫০ মাইল পথ গভীর ঘন-সন্নিবিষ্ট জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যায় সুন্দর ক্যাণ্ডি শহরে এসে পৌঁছুলাম। সমুদ্রবক্ষ হ'তে এর উচ্চতা প্রায় ২,০০০ ফিট। লঙ্কাদ্বীপের বৃহত্তম নদী মহাবলী-গঙ্গা শহরের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ক্যাণ্ডিতেই লর্ড ম্যাউণ্টব্যাটেন 'সাউথ ইস্ট এশিয়া কম্যাণ্ড'র হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেছিলেন।

শহর থেকে তিন মাইল দূরে পেরিডেনিয়া নামক স্থানে যে বোটানিকাল গার্ডেন আছে, তা নাকি এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানে রুদ্রাক্ষ ও কমণ্ডলুর গাছ দেখে খুব আনন্দ হ'ল; তালগাছের মতো দেখতে—অদ্ভুত জোড়া-নারকেলের গাছ কয়েকটি দেখা গেল। এরই এক পাশে অতি মনোহর ও নীরব পরিবেশের মধ্যে ইউনিভার্সিটি। সমগ্র দ্বীপে একটি মাত্র ইউনিভার্সিটি—এর কলা-বিভাগ এখানে অবস্থিত এবং বিজ্ঞান-বিভাগ কলম্বোতে। এটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় ১,০০০ ছাত্র-ছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করে। লঙ্কাদ্বীপে সর্বপ্রকার শিক্ষাই অবৈতনিক—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত।

দর্শন-বিভাগের রীডার ডক্টর সরকার, ইনিই একমাত্র বাঙালী অধ্যাপক। আমাদের চা-পানে আপ্যায়িত করলেন। অতি অমায়িক সজ্জন ভদ্রলোক। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই উচ্চ-শিক্ষিত। আমাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পেয়ে ওঁদের খুব আনন্দ হ'ল। ডঃ সরকার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। ছতলাবিশিষ্ট সুবৃহৎ লাইব্রেরিটি দেখবার মতো। এখানে স্বামীজীর জীবনী, রচনাবলী প্রভৃতি রয়েছে দেখে আনন্দ হ'ল।

সন্ধ্যায় আমরা সুবিখ্যাত 'টুথ টেম্পল' দর্শন করলাম। এখানে বুদ্ধদেবের একটি দাঁত আছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এখানে পূজাদি করেন। বৌদ্ধদের ইহা একটি প্রধান তীর্থস্থান। দাঁত অবশ্য দেখা যায় না। জুলাই-এর শেষে উৎসবের সময় ১০০ সুসজ্জিত হাতীর শোভাযাত্রা হয় এবং ঐ সময় একটি স্বর্ণাধারে দাঁতটিকে রেখে হাতীর পিঠে ক'রে ঘোরানো হয়। আলোকমালায় সজ্জিত ক্যাণ্ডিকে পাহাড়ের উপর থেকে পরীর দেশ ব'লে মনে হয়। এখান থেকে রওনা হয়ে পথে ডাম্বোলায় বিখ্যাত গুহা-মন্দির (Cave temple) দর্শন ক'রে সাইগিরিয়ার ফ্রেস্কো পেন্টিং ও পোনালারুয়ায় বৌদ্ধ রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে ১৬০ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যায় আমরা দ্বীপের পূর্বাংশে বাটি-কালো শহরে রামকৃষ্ণ মিশন শিবানন্দ বিদ্যালয়ে পৌঁছলাম। ডাম্বোলাতে গুহার মধ্যে ৪২' লম্বা শায়িত পাথরের বুদ্ধ-মূর্তি সত্যই দেখবার মতো। গুহাটি প্রায় ১৫০ ফিট লম্বা ও ৭৫ ফিট চওড়া। গুহার মধ্যে অনেক মূর্তি রয়েছে। প্রায় ৩০০ সিঁড়ি ভেঙে গুহাতে যেতে হয়। সাইগিরিয়াতে মাত্র ৫।৬টি ফ্রেস্কো পেন্টিং আছে—খুব পুরাতন। অজন্তাতে যে সময় গুহাচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, এখানেও মনে হয় সেই একই সময়ে একই গোষ্ঠীর শিল্পী এগুলি এঁকেছিলেন।

বাটিকালোতে ও তার নিকটবর্তী রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত অনেকগুলি স্কুল ও অনাথালয় পরিদর্শনান্তে আমরা পরদিন ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে প্রসিদ্ধ বন্দর ত্রিঙ্কোমালীতে পৌঁছাই। এখানে রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু কলেজে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়। অধ্যক্ষ ও তাঁর স্ত্রী মঠের ভক্ত। গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে এখানে একটি বক্তৃতা দিতে হয়। শহরের অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানকার বিখ্যাত কোণেশ্বর শিবমন্দির দর্শনান্তে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত গরম জলের সপ্তকুণ্ড দেখা হয়। বহু লোক এখানে প্রত্যহ স্নান করেন। জল স্পর্শ ক'রে দেখলাম অসহ্য গরম নয়। এখানে এক রাত থেকে পরদিন ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে দ্বীপের শেষে উত্তর সীমায় অবস্থিত দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর জাফনাতে উপস্থিত হই। জাফনার লোকসংখ্যা প্রায়

এক লক্ষ। শতকরা ৯৫ জন তামিল ভাষা-ভাষী ও শতকরা ৭৫ জন হিন্দু। এখানে রামকৃষ্ণ মিশন বৈদ্যেশ্বরন্ কলেজেও ছাত্র-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হয়। জাফনার সুবিখ্যাত সুব্রহ্মণ্য-মন্দির দর্শন করি—মন্দিরের মধ্যে কার্তিকের একটি তীরের পূজা হয়—সোনার নির্মিত ঐ তীর। খালিগায়ে মন্দিরে যেতে হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের বহু অনুরাগী ভক্ত ও বন্ধু এখানে আছেন, এখানে একটি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্য বহু লোকে অনুরোধ জানান। স্বামী বিবেকানন্দ যে বাড়ীটিতে ছিলেন এবং হিন্দু-কলেজের যে হলে তিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তা দর্শন ক'রে খুব আনন্দ লাভ করি। জাফনার উত্তরে ও পূর্বে ৪।৫টি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। ওগুলিও সিলোন সরকারের শাসনাধীন। পরদিন প্রাতে জাফনা থেকে ১৮০ মাইল দূরে বৌদ্ধদের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র অনুরাধাপুরে আসি। এখানে প্রসিদ্ধ বোধিদ্রুম, সিংহলী রাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, বৃহদাকার গগনচুম্বী বৌদ্ধ স্তূপ, সুবৃহৎ জলাশয়সমূহ দর্শনান্তে সন্ধ্যায় কলম্বো আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করি। অনুরাধাপুর থেকে কলম্বো ৭২ মাইল।

আশ্রমে একদিন অবস্থানের পর সিংহলের অতি মধুর স্মৃতি নিয়ে পথে ৺রামেশ্বর দর্শনান্তে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করি। লঙ্কাদ্বীপে মাত্র ১৫ দিন ছিলাম এবং ৮ দিনে ১,২৩৫ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে সমগ্র দ্বীপটি পরিদর্শন করি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা দেখেছি তা স্মরণ করলে মুহুর্মুহুঃ আনন্দ হয়।

সূর্য-স্নান

শ্রীতারক ঘোষ

এ পৃথিবী সূর্য-স্নান করে।
পবিত্র রোদের ধারা নেমে আসে
প্রপাতের মতো।
প্রতপ্ত জ্যোতির স্পর্শে জীর্ণ হয় ক্লেদ,—
সব গ্লানি নিষ্কাশিত হয়ে যায়
দেহ থেকে ;
মনের আড়ালে
মুমূর্ষু আবিল আবর্জনা
দগ্ধ হয়ে যায়।

এ পৃথিবী সূর্য-স্নান করে।
বাইরে তাপের দাহ,
রুক্ষ মাটি,
ক্ষুব্ধ কামনার হাহাকার ;
সূর্যতপা ভিতরে ভিতরে
অমৃতের সত্য-তৃষ্ণা
তিল তিল ক'রে
সঞ্চয় করেই চলে।
বাইরে অকালে যদি তৃষ্ণা মেটে,
অন্তরে পিপাসা ঘুচে যাবে।
সূর্য-স্নানে ধৌত হয় আবিল বাসনা
অন্তর্লীন গূঢ় তৃষ্ণা শুচি হয়ে ওঠে।

এ পৃথিবী সূর্য-স্নান করে।
প্রতীক্ষার সাধনা এ
স্নিগ্ধতম অমৃত-লাভের।
রোদের ছোঁয়ায়
বুকে ফোটে পিপাসার অলক্ষ্য কমল।
বাইরে আবিল আবর্জনা
পুড়ে যায়—
উড়ে যায় কালবৈশাখীর ঝড়ে।
তখন অমৃত ঝরে
বর্ষার অঝোর ধারা,
বুক ভরে, তৃপ্ত হয় প্রাণের পিপাসা।

রবীন্দ্রনাথে ব্রহ্মবাদ

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

শাশ্বত ব্রহ্মবাদ

সকল উপাসনা-আরাধনা সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয় বেদান্তের বেদিতে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—'নচিলে সমস্তই কুসংস্কার'। 'উপনিষৎ বা বেদান্ত ব্রহ্মবিদ্যার দম্পতি'—ইহা রবীন্দ্রনাথের উক্তি। বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। উপনিষদেই আছে—চিন্ময় ও অদ্বিতীয়, অখণ্ড ও অশরীরী ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা উপাসকগণের সাধনার নিমিত্ত। কবির ভাষায়—ব্রহ্মই ভারতের জাগ্রত দেবতা।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন কালে মানুষ যে-দেবতারই ভক্ত হউক না কেন, সে জানিয়াছে, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' —সদ্‌বস্তু এক, বিদ্বান্‌গণ নানা নামে তাঁহাকে অভিহিত করেন। কিন্তু যে-নাম বা যে-রূপে অর্চনা করা হউক না কেন, সাধকের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা: মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ্ অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। —ব্রহ্মকে আমি যেন পরিহার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে পরিহার না করেন। এই অনিরাকরণ বা স্বীকৃতি যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে, আমি যেন সতত অনিরাকৃত থাকি। ভারতের আস্তিক প্রাণ যুগে যুগে এই প্রার্থনা করিয়াছে। বৃহদারণ্যকে আছে: যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা এতস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ—সেই অক্ষর অবিনাশী তত্ত্বকে না জানিয়া সংসার হইতে যে বিদায় লয়, সে কৃপণ—কৃপার পাত্র; কারণ মানবজীবনের পরম সার্থকতা ও বিশিষ্টতম অধিকারে সে বঞ্চিত। উপনিষদের উদাত্ত বাণী ইহাই—অল্পে বা ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখ নাই, ভূমাই আনন্দ। ভূমাই জিজ্ঞাসার বস্তু। 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।'

দর্শনের চরম তত্ত্ব

এ দেশের দার্শনিক চিন্তা তিনটি তত্ত্ব বিচারে স্থির করিয়াছে—পরমাত্মা, জীব ও জগৎ। ইহাদের মধ্যে শেষ দুইটি বস্তুত: 'সৎ' কি না অর্থাৎ পরমার্থতঃ আছে কি না—ইহা লইয়া নানা মতবাদ, কিন্তু প্রথমটি নির্বিবাদ। জড় ও জীব, চর ও অচর, স্থাবর ও জঙ্গম—ইহারা কি ভাবে বর্তমান, শুধু ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক হিসাবে সত্য কিনা, এবং পরম বস্তু বা চরম তত্ত্বের সহিত উহাদের কি সম্বন্ধ—এই বিষয়ে নানা মতবাদ—দ্বৈত, শুদ্ধ ও বিশিষ্ট অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রভৃতি। এই সকল প্রসিদ্ধ (সাম্প্রদায়িক) সিদ্ধান্ত দার্শনিক চিন্তায় সম্ভব সকল বিকল্পকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া বহু শতাব্দী যাবৎ ভারতের মানস-আকাশ অধিকার করিয়া আছে। তত্ত্ববিদ্যার এই গগন-মানচিত্রে রবীন্দ্রনাথের মনন কোন্ তারাপুঞ্জ-খচিত রাশিতে অবস্থিত?—এই প্রশ্ন স্বতই কৌতূহল জাগায়। নিজ ধর্মমতকে একান্তভাবে স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত বলিলেও এ দেশে পূর্বসূরিগণের চিন্তার ব্যাপক জাল সম্পূর্ণ পরিহার করিতে তিনি পারেন নাই। জ্ঞাতসারে বা যুক্তি-পথের স্বাভাবিক নিয়তি-বশে উহার কোন কোনটির সহিত মিল তাঁহাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

নিখিলে মানবের স্থান ও স্রষ্টার সহিত তাহার সম্বন্ধ লইয়া চিন্তা নিত্যনূতন ও নিরন্তর

হইলেও—পুরাতনের সাদৃশ্য তাহাতে মুছিয়া যায় না।

ভূমার সীমা

'ব্রহ্ম' শব্দ বলিতে বুঝায়—যিনি ভূমা, যিনি সকলের বড়। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, সীমাতীত বৃহত্ত্বের চরম তিনি; তাই অনন্ত। বৃহৎ এবং বিশাল, তাই তিনি ব্রহ্ম। 'বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।' উপনিষদ্ বলেন—'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ। যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।' যাঁহার পর অর্থাৎ যাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অন্য কিছু নাই। যাঁহা হইতে অণু বা সূক্ষ্মতর, যাঁহা হইতে বৃহত্তর কেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ব্রহ্মবিদের আনন্দ—এই অসীমকে প্রকাশ করা। এই অনন্তের সুরে মিলিয়ে নেওয়া ব্রহ্মচর্য।' শান্তিনিকেতনের ভাষণে আছে, 'জ্ঞানে প্রেমে কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা—ইহাই লক্ষ্য।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন: ব্রাহ্মধর্মের ভাবাত্মক লক্ষণ—অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। ব্রহ্মকে স্বভাবে দেখার অর্থ—সর্বত্র দেখা। তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।—সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে ধীর ব্যক্তিরা যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। 'জীবে জীবে আত্মার যে ঐক্য, সে পরম ঐক্যকে খোঁজে।' কবির মতে ইহা সম্পূর্ণতার সন্ধান। আবার উপনিষৎ পরমাত্মাকে 'একপ্রত্যয়সারং' বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি ক'রব, আত্মার এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। 'ইহাই বিশ্ববীণার ঝঙ্কার—ইহাই একতান মহাসঙ্গীত।' পরমাত্মা যে শুধু বিশ্বাতিগ নন, তিনি যে বিশ্বময়—ইহার সমর্থন উপনিষদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রে—'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।' ইহাতেই তাঁহাকে বিশ্বব্যাপী বুঝায়। তথাপি ছোট ক'রে আবার 'য ওষধিষু যো বনস্পতিষু' বলায় তিনি অতি সত্য, নিকট প্রত্যক্ষ, ইহাই বুঝানো হইয়াছে।

এই ভাবেই ঋষিগণ আশ্রমের লতা-পল্লব-পাদপে তাঁহার স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলেন।

কবির প্রতিপাদ্য

উপনিষদের নানা বাক্যের উদ্ধৃতি দ্বারা কবি বলিয়াছেন: 'ব্রহ্ম সেই পরম সত্য—যেখানে সমস্ত বিপরীতের সমন্বয়।' 'তাঁহাতে ভেদ ও অভেদের অবিরুদ্ধ ঐক্য।' 'দুয়ের মধ্যে এককে লাভ আমাদের প্রয়াস।' 'পূর্ণতার অবধি তিনি, সেই জন্য ব্রহ্মের কোন শরিককে মানি না।' এই তাৎপর্যেই বলা হইয়াছে—'একমেবাদ্বিতীয়ং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। কবি বলেন, 'প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক—একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত'—দুইটি পরস্পরের পরমাত্মীয়, পরম সহায়, মানুষ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে, কর্ণ ও অর্জুনের মতো তাদের পরম শত্রু ক'রে তোলে।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসার—দুয়ের সমাধানে আত্মার স্থিতি। এই পূর্ণতার স্বীকার—ওঁ।' কবির উপলব্ধি, 'ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম। নির্জনে ধ্যান, সজনে সেবা—এই দুই লইয়া তাঁহার উপাসনা।'

দুরূহ প্রত্যয়

ব্রহ্ম-পদার্থের এই যে ব্যাপকতর ধারণা—ইহা উপলব্ধি করা, ইহা অঙ্গীকার করা সহজ বা সাধারণ নহে, ইহা বোধ করিয়া কবি লিখিয়াছেন: বিমুখচিত্ত ও বিরুদ্ধ বাক্যও শোনা যায় যে, এ 'অনন্ত শুধু তত্ত্বকথা।' কিন্তু ইহা অসাড় চিত্তের পরিচায়ক। 'প্রাণ জাগিয়ে নিয়ে যখন উপলব্ধি করিনে, তখন

তর্ক।' উপনিষদ্ বলেন: প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈ বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতি-বাদী।—এই যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন এঁকে যিনি জানেন, তিনি এঁকে অতিক্রম ক'রে আর কোন কথা বলেন না। তিনি ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোন কথা বলতে চান না—তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান।

সগুণ ও সবিশেষ

ব্রহ্মপদার্থের স্বরূপ কি? উহা কি সদর্থক (positive) না নঙর্থক (negative)? সবিশেষ বা নির্বিশেষ? সগুণ না নির্গুণ? কবির মতে —'সমস্ত পদার্থের মধ্যে অনন্তের স্বরূপ—ইহাই পরমার্থ।' কিন্তু তিনি যে মতবাদেরই পরিপোষক হউন না কেন, অন্য মতের মধ্যে যে সারতত্ত্ব—যে মহত্ত্ব, তাহাও তিনি অসঙ্কোচে স্বীকার ও প্রকাশ করেন। ইহা পূর্বেই পরিস্ফুট হইয়াছে। এই জন্যই বৈষ্ণবতার মর্মকথা ও শাশ্বত ভারতের বাণী অপর্যাপ্তভাবে তাঁহার রচনাবলীতে প্রকাশ পাইয়াছে।

বৈষ্ণব আচার্যগণ প্রায়শঃ সগুণ ব্রহ্মই প্রতি-পাদন করিয়াছেন এবং জগতের অস্তিত্ব মায়া-কল্পিত বা ভ্রান্তি-বিলাস বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্ম সগুণ, কল্যাণ-গুণরাশির তিনি পারাবার, দিব্যমঙ্গল তাঁহার বিগ্রহ; চিৎ ও অচিৎ তাঁহার নিত্য স্বপ্রকাশ; জগৎ সৎ, এবং তাঁহার আধিভৌতিক রূপ, তাঁহার পরমৈশ্বর্যের অভিব্যক্তি—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্যগণ এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন।

কবি লিখিয়াছেন, 'দ্বৈতশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের উপর সগুণ ভগবানকে ঘোষণা করে।' কবি কিন্তু সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বেই অভিভূত। ইহার কারণ—তাঁহার 'শেষ সপ্তকে'—দার্শনিক অনুভবগুলির গদ্যকাব্যরূপে প্রকাশের মাঝে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'সৃষ্টির শাশ্বত বাণী ভালবাসি। ...আমি সৃষ্টিকর্তা পিতামহের রহস্যসখা। আমি পৃথিবীর কবি।' রবীন্দ্র সাহিত্যের ইহাই মর্মকথা, প্রাণরহস্য এবং কবির ব্রহ্মবাদের সহিত ইহা ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত।

চরম অদ্বৈতের মহত্ত্ব

কিন্তু শান্তিনিকেতনের একটি ভাষণে ইহাও তিনি বলিয়াছেন, 'মনের মধ্যে এক শ্মশানবাসী বসে আছে—সে কেবল জানে, একমেবা-দ্বিতীয়ম্।' তিনি আরও বলিয়াছেন, 'অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ—মানুষকে একটা বৃহৎ সম্পদ্ দান করিয়াছে। নির্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে।' 'অদ্বৈতরস-সমুদ্রে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল স্থিতিলাভকে আমি নমস্কার করি। যিনি এখানে উপনীত—আমি তাঁর সঙ্গে কোন কথা নিয়ে বাদ প্রতি-বাদ করতে চাই না।'

মায়ার স্বরূপ

তথাপি নির্বিশেষ ব্রহ্মের যে চরম ঐকান্তিক স্বরূপ অদ্বৈত-শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার মতবাদ বহুলাংশে ভিন্ন। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য হইলে জগৎ মায়িক ও মিথ্যা হইয়া পড়ে। অদ্বৈত মতে ইহাই উদ্‌ঘোষিত: ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—সেই এক বস্তুই সৎ, ইহ সংসারে নানা বা পৃথক্ কিছু নাই। তবু যে দৃশ্যমান বিশ্ব নানারূপ, অনন্ত বৈচিত্র্যময় প্রতিভাত হয়, অদ্বৈত মতে তাহা অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়ার কাজ—ভ্রান্তিমাত্র। সে মায়া বা অবিদ্যা কোথা হইতে উদ্ভূত হইল? উহার আশ্রয় কি ব্রহ্ম? তাহা হইলে সেই সচ্চিদানন্দ তত্ত্বে মায়ার স্পর্শ ঘটে। এবং তাহা না

হইলে মায়া ব্রহ্মের অতিরিক্ত বা বহির্ভূত সত্তায় দাঁড়ায়। কবি লিখিয়াছেন, 'ব্রহ্ম ছাড়া কোন শক্তি বাইরে থেকে জোর ক'রে এই মায়াকে আরোপ করেছে, সে ত মনেও করতে পারি না।' তাহা হইলে মায়া কি ব্রহ্মেরই শক্তি?

বৈষ্ণব দর্শনে মায়া সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় আবির্ভূত শক্তিবিশেষ—ইহার দ্বারাই তিনি জগৎপ্রপঞ্চে বিবর্তিত হন। ভাগবতের মতে মায়া ত্রিগুণময়ী। প্রলয় ও সৃষ্টির পূর্বাবস্থা ত্রিগুণের নিথর সমতা। ইহাতে বিক্ষেপ বা বৈষম্য উদ্ভূত হয় পুরুষোত্তমের ইচ্ছায়। মধ্ব-মতে মহাবিষ্ণুর সৃষ্টিবৈচিত্র্য-রচনার শক্তিই লক্ষ্মী—তিনি তাঁহারই ন্যায় নিত্য, অজড় ও সর্বব্যাপিনী।

বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ

তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শনের বিচার-বিতর্কে যে ভাবেই উহা উদ্ভূত হউক না কেন, মানুষের প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যে প্রভূত মায়ার খেলা রহিয়াছে - ইহা বিজ্ঞানেও স্বীকৃত। 'বিশ্বপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ এই বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তু-স্বরূপ যে প্রকৃতই অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অগন্ধ এবং জীবের ইন্দ্রিয়ের বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুসারে এই সকল গুণ উহাতে অনুভূত হয় এবং উহাতেই নিহিত বলিয়া মনে হয়—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। 'শান্তিনিকেতন' ভাষণে কবি বলেন, 'মায়াবাদ! শুনলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন?' অন্যত্র তাঁহার উক্তি, 'মায়া—জগৎ বলিয়া জানিতেছ।' 'আত্মবোধ' শীর্ষক ভাষণে তিনি বলিয়াছেন, 'আদিকারণের মহাসমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান যতই এক এক পা এগোচ্ছে, ততই বস্তুত্বের কূলকিনারা কোন্ দিগন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত আকার-আয়তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে উঠছে। বিশ্বজগৎ বলতেও তাই, স্বরূপতঃ তার একটি বালুকণাও যে কী, তা আমরা ধারণা করতে পারিনে—কিন্তু সম্বন্ধতঃ সে বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন।' প্রাবীণ্যের সীমায় পৌছাইয়া তাঁহার মন এই বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে অভিভূত হয়।

সংসার—অক্ষরের বাতায়ন

প্রত্যক্ষের এই প্রহেলিকার মাঝে তত্ত্ব-লাভের আকুলতা সাধনার প্রেরণা জাগায়। কবি বলিতেছেন, 'ইন্দ্রিয়গোচর যে কোন বস্তু আপনাকেই চরম বলিয়া, স্বতন্ত্র বলিয়া ভান করিতেছে। সাধক তাহার এই ভানের আবরণ ভেদ করিয়া পরম পদার্থকে দেখিতে চায়। ভেদ করিতেই পারিত না, যদি এই সমস্ত নামরূপের আবরণ চিরন্তন হইত। কিন্তু সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই, সারি সারি দাঁড়াইয়া পথরোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অখণ্ড সত্যের, অক্ষয় পুরুষের সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া, সেই পুরুষের কাছেই আপনার সমস্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধন। সুতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোন মতে উজান পথে চলিতে পারে না।' তিনি আরও বলেন, 'কিন্তু চলছে বলেই মিথ্যা—এটা উল্টা কথা। প্রাণময় সত্য কেবল নিজেকে ডিঙিয়ে চলছে। স্থিরত্বই বিনাশ। অপ্রাণের দ্বারা সৃষ্টির পরিচয় নয়।' আর এক স্থলে তিনি বলেন, 'ধর্মের বিশেষত্ব আপনার খোঁজ—ভিতরে, বাইরে, নানা বিচ্ছেদ-বিক্ষিপ্ততা মিটাতে আত্মবোধের সাধনা।' এই দুইটি উক্তির তাৎপর্য—নিরন্তর চঞ্চলই নিত্য-

অচঞ্চলের দিকে মনকে লইয়া যায়, ও উহাকে আবৃত না করিয়া প্রকাশ করে। এই দৃষ্টিতে অধ্রুব বস্তু ধ্রুব বস্তু লাভের অন্তরায় নহে, উহার সহায়।

মায়াতীতে শ্রদ্ধা

ভারতীয় দর্শন—বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদ—কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেঃ (১) আমাদের প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়গম্য বস্তু সৎও নহে, অসৎও নহে—অর্থাৎ তাহা অনির্বাচ্য, (২) একমাত্র ব্রহ্মই সৎ এবং (৩) জগতের সত্তা অধ্যাস বা আরোপ মাত্র। সুতরাং বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা-পরীক্ষা দ্বারাই হোক বা দার্শনিক অনুমান বা যুক্তিতর্ক-বলেই হোক—মায়ার উচ্ছেদ নাই, উহার জালে জীব বদ্ধ হইয়াই আছে। চিন্তাশীল মানবের নিকট ইহা সুস্পষ্ট। কিন্তু এই মায়ার জাল ছিন্ন করিয়া একমাত্র বস্তুকে যিনি অবলম্বন করিয়াছেন, চিন্তা ও চর্যায় সেই একান্ত অদ্বৈতীর সঙ্গে কবির বিরোধ নাই। বরং জ্ঞানলোকের এই উত্তুঙ্গ হিমশিখরের প্রতি তাঁহার অন্তরের আকর্ষণ উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধার ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে (নৈবেদ্যে):

চিত্ত বাতায়ন মম
সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রি দিন
রাখিব উন্মুক্ত করি হে অন্তবিহীন।
তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস।
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই—নাই নাই বাণী।

খণ্ডের সহিত অখণ্ডের জ্ঞান

তথাপি নির্বিশেষ—সকল উপাধিমুক্ত ব্রহ্ম-বস্তুর ধারণাই যে একমাত্র বা যথার্থ বা সমগ্র ধারণা, ইহা তাঁহার অভিমত নহে। তিনি বলিয়াছেন: ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়া ধারণা করার অর্থ তাঁহাকে ধারণার অতীত করা। তিনি তাহা হইলে অবাঙ্মনোগোচর হইয়া রহেন। 'সুতরাং ইহাই দাঁড়ায় অনন্ত তত্ত্ব কথামাত্র। ব্রহ্মের সীমা নাই—সুতরাং তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা বিড়ম্বনা।' ব্রহ্ম ভূমা বা বৃহত্তম বলিয়াই সাকল্যে বোধের অতীত। ব্যাখ্যা-স্বরূপে তিনি বলেন, 'আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই যে, সত্যকে আমরা এক মুহূর্তে সমগ্র ক'রে দেখতে পাইনে। ইহাই পরিপ্রেক্ষণ-তত্ত্ব। যুগপৎ সব দেখলে হয় ঝাপসা—খণ্ড লোপ হ'লে হয় শূন্যতা। যখন অন্তহীন ব্যাপ্তির গম্যহীন পথে চলি, তখন প্রত্যেক পদক্ষেপ নিরর্থক হয়ে কষ্ট দেয়। আবার সমগ্রকে লক্ষ্য ক'রে মানুষ খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত ক'রে দেখে, তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।'

উপনিষদে দ্বৈতাদ্বৈত

ব্রহ্মের ধারণা রবীন্দ্রনাথের লেখায় চরম সমগ্রতায় পরিণতি। ইহা সকল খণ্ডতা ও অস্বীকারের প্রতিবাদ। তিনি এক স্থলে বলিতেছেন, 'বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক-পোকার মত পুচ্ছের আলোকের বাইরে সব অস্বীকার করে।' তাঁহার উক্তি: 'উপনিষদের বাণীতে কোন সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই!' ইহাকে তিনি সার্বভৌমিক ধর্মবোধ বলিয়াছেন। উপনিষদ্-বাক্যে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ, সবিশেষ ও নির্বিশেষ এই উভয়বিধ স্বরূপ বর্ণিত আছে।

'সামঞ্জস্য' শীর্ষক ভাষণে কবির উক্তি: 'তাঁর স্বরূপে সামঞ্জস্যের লীলা—শান্তং শিবম্-দ্বৈতম্।' এষ সেতুর্বিধরণো লোকানাম-সম্ভেদায়—লোকসমূহের ভেদ-নিরাসের জন্য বিধৃতির ইনি সেতু। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'দ্বৈতে অদ্বৈতে বিবাদ মত নিয়ে, সত্য নিয়ে নয়।'

পরম পূর্ণতার স্বীকার

দ্বৈতবাদে প্রকৃতি ও পুরুষ। 'শক্তিমান্‌কে শক্তি ও তার ক্রিয়া থেকে সরিয়ে বড় পদ দিয়ে —ব্রহ্ম হন পরাস্ত, ছোট।' মুক্তির মধ্যে সগুণ নির্গুণ দুইই। উপনিষদ্‌ ও গীতায় পূর্ণতার সাধনা, বৌদ্ধ মতে নির্বাণের সাধনা। উপনিষদের 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন' এই উক্তির উল্লেখ করিয়া কবি বলেন: ব্রহ্মকে হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়। তিনি 'ওঁ' অর্থে 'হাঁ'। নঙর্থক নয়, সদর্থক। 'ওঁ' অর্থে পূর্ণতার স্বীকার। উপনিষৎ সত্যের একদিকেই ঝোঁক দিয়ে অন্য দিক নির্মূল ক'রে দেননি। ব্রহ্মর্ষি তাঁকে স্পষ্ট করেই সক্রিয় বলেছেন। যেখানে 'আছেন' সেখানে ক্লীবলিঙ্গ—যেখানে 'করছেন' সেখানে পুংলিঙ্গ। 'স পর্যগাৎ'—ঈশোপনিষদের এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রে আছে—নিত্যকাল থেকে তিনি বিধান করছেন। 'আমাদের স্বভাবেও ভাব ও কর্ম—দুই বাচ্য। একটিতে প্রকাশ—আরটিতে ক্রিয়া।' 'সমস্ত পদার্থের মধ্যে অনন্তের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাই ব্রহ্মসাধনা'—ব্রহ্মাববোধ। শুধু অসীম ও অব্যক্তের মধ্যে নয়, সীমা এবং ব্যক্তের মধ্যেও। 'নিখিলময় সত্যে প্রকাশের প্রার্থনা। এই ক্রন্দনে পূর্ণ ব'লে অন্তরীক্ষের 'রোদসী' বা 'ক্রন্দসী' এই নাম।' 'আবিরাবীর্ম এধি—হে প্রকাশস্বরূপ আমার সমক্ষে আবির্ভূত হও, ইহাই সেই প্রার্থনা।' কবির ভাষায়: 'সীমা অসীমের প্রকাশ। অব্যক্তের চেয়ে ব্যক্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। অব্যক্ত হ'তে ব্যক্ত হবার চেষ্টা—মুক্তি। পর ব্রহ্ম ও জীব—উভয়ের সম্পর্কে ইহা সত্য। 'তিনি কেবল মুক্ত হ'লে নিষ্ক্রিয় হতেন। প্রকাশ পান বন্ধনের রূপে। এই জন্য দ্বৈতশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের উপর সগুণ ভগবানকে ঘোষণা করে।' উপনিষদ্‌ বলেন: 'পরাস্য শক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।—অর্থাৎ এঁর পরমা শক্তি এবং এঁর বিবিধা শক্তি এবং এঁর জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বাভাবিকী। এই বাক্যে ব্রহ্ম যে গুণসমৃদ্ধ—তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কবির দৃষ্টি

ধ্যানমৌন, কর্মশূন্য, আত্মবিলোপী সাধনা কবির বিচিত্র চেতনা ও সর্বতোমুখী অনুভূতির সহিত সঙ্গতিলাভ করিতে পারে না। সেই নিস্তরঙ্গ অস্তিত্ব—যাহাতে প্রাণের চাঞ্চল্য নাই, রসের আস্বাদ নাই, প্রত্যক্ষের বৈচিত্র্য নাই, হৃদয়ের আবেগ নাই—কবির সৃজনী ক্রিয়ার তাহাতে অবসান। চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগের সম্পদ্‌, অধ্যাত্ম-প্রেরণার উৎস হইতে পারে, কিন্তু পার্থিব সম্বেদনাকে উহা জাগ্রত করে না। অথচ এই সম্বেদনাতেই কবির জগৎ রচিত। উহা প্রকাশের জগৎ, অপ্রকাশের নয়। কবি লিখিয়াছেন, 'ব্রহ্ম কি অব্যক্ত স্বরূপেই আনন্দিত? প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।' 'সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতে ফুরোতে চাচ্ছে না।' উপনিষৎ বলিয়াছেন: আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। 'সেই প্রকাশকে সর্বত্র, সর্ববৃত্তিতে দেখা, চোখে চরম দেখাশুনা আত্ম-কল্যাণের বাধা নয়।' কবি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।' নিখিলে এই কল্যাণতম রূপের প্রকাশ—ইহা সেই পুরাণ কবির মহাকাব্য। তিনি বলেন, 'বিশ্বকবির বিরাট কাব্যের চিহ্ন লোপ করতে পারি—মনে করার কোন হেতু নেই।, জগৎ বাস্তব এবং জগৎ নিত্য, ইহা 'নাই' বলিলেই লোপ পায় না। সংসারকে অলীক মিথ্যা মরীচিকা

ব'লে ছেড়ে দেওয়া বিজ্ঞতা মাত্র—সংসার তো মিথ্যা নয়।'

এইখানে রবীন্দ্র-দর্শনের মর্মকেন্দ্র, এবং ইহা তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—গীতে, ছন্দে, রূপকে, জল্পনায়। তিনি বলিতেছেন, 'আমি সেই মূঢ়, যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না।' আরও বলিয়াছেন, 'এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি। সেই জন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টি ভূতের আড্ডা নয়। এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।' কিন্তু 'সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে, যা অনুরাগকেই বীর্যবান্ ও বিশুদ্ধ করে। কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা।'

এই দৃষ্টিকোণ হইতেই কবি মুক্তির সংজ্ঞা ও লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন।

কর্মে মুক্তি

'কর্ম কখন বন্ধন হয়? যখন তার মূল আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়।' আনন্দোদ্বুদ্ধ কর্মবাদ জীবনের বাণী—ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য। ঈশোপনিষদে আছে : অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ইহার তাৎপর্য কবি এইভাবে গ্রহণ করিয়াছেন—'যারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত, তারা অন্ধকারে পড়ে। যারা বিদ্যায়* অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত, তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।' 'ব্রহ্মজ্ঞানহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্মজ্ঞান ততোধিক শূন্যতা, তাকে নাস্তিকতা বললেও হয়।' কবি বলিতেছেন : 'যার ধর্ম যেটা, সেটা তার বন্ধন নয়, আনন্দ।' সুতরাং আত্মার অসীম সম্ভাব্যতার বিকাশ—বাস্তবে পরিণতি, শৃঙ্খল নয়। উত্তরোত্তর স্বভাবের স্ফূর্তি। ইহাতে মুক্তির আনন্দ আছে। দ্বিজশাবকের স্বাভাবিক ধর্মই অনন্ত আকাশে ওড়া। এদিকে সংসার নীড়ে আছে আশ্বাসের আনন্দ।' 'বড়ো হইবার ইচ্ছা মানবের সত্য ইচ্ছা। ভূমাতে মনের সায়—দুঃখনিবৃত্তিতে নয়।' ইহার দৃষ্টান্ত—ভূমার সন্ধানে মানুষের অশেষ ক্লেশবরণ—নিজেকে অতিক্রম করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুস্বীকার।

জ্ঞানে মুক্তি

আনন্দের দুই দিক্ জ্ঞান ও প্রেম। এ দুয়েই আমাদের অন্তরের বিস্ফার—এই বিস্ফারই কাম্য—ইহাতেই ভূমাত্মতা। নিজেকে জানা ও পাওয়ার অভিযানে শেষ নাই—কারণ 'মানুষ সমাপ্ত নয়, না হওয়াই তার অনন্ত।' শ্রুতিতে যে তাহাকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—এই অসীম সম্ভাব্যতাই উহার অর্থ। 'ইহাই তাহার পক্ষে পিতৃসত্য।' এই সম্ভাব্যতা—সত্য হওয়া, বাস্তব হওয়া—ব্রহ্মাপ্তির দিকে অগ্রসর হওয়া। কবি লিখিয়াছেন, 'ব্রহ্মকে পাব—এত বড় স্পর্ধার কথা বলতে পারিনে—অসঙ্কোচে ব'লব ব্রহ্ম হব—হয়ে উঠছি।' 'জ্ঞানে ও প্রেমে এই আমিত্বের প্রসার। কত শত জাগার মধ্য দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি। জগৎ জীবনের দ্বারে অহরহ বলে জাগো—অনন্তের মধ্যে জাগরণ, দেহে জাগা, মনুষ্যত্বে জাগা।' আরও বলিয়াছেন, 'আমরা দেখি—সেটা দেখার কুঁড়ি মাত্র। বিরাট জগতে চোখ মেলে চাওয়ার

---

* আচার্যেরা এখানে 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'দেবতাবিষয়ক জ্ঞান'। উঃ সঃ

চরম সুযোগ—চর্ম-চক্ষু দিয়ে চরম দেখা। পরিপূর্ণ চৈতন্য-যোগে ব্রহ্মকে সর্বত্র দেখা—স্বভাবে দেখা।' 'সমস্তই তাঁর দ্বারা আবৃত দেখবে—ইহাই উপনিষদের উপদেশ। পথও রমণীয়, পদে পদে অনন্ত, তাই সংসার ছাড়তে চাই না। নেতি নেতি নয়—অন্তহীন ইতি' —কবির মতে ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব।

প্রেমে মুক্তি

জ্ঞানে ও প্রেমে আমিত্বের প্রসার—ইহা তাঁহার কথা। এই প্রসারের দুই প্রান্ত। 'বৈরাগ্য'শীর্ষক ভাষণে আছে:' পুত্র মিত্র নানা লোককে আপন ক'রে জেনে ছোটো-আত্মা থাকে না—বড়-আমির কাছে এগোয়—এ সবে মুগ্ধ আসক্তি চলে যায়।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, 'মানুষ সৃষ্টির শেষ সন্তান—ইতিহাসের সকল ধারা তাতে মিলেছে। উদার ঐক্যের দ্বারা ইহার সার্থকতা।' আরও বলিযাছেন, 'সমাজে প্রত্যেকের স্বার্থ সকলের স্বার্থ হয়ে উঠছে। বৃহৎ আমি—সামাজিক, স্বাদেশিক, মানবিক আমি—বৃহতের প্রেমে সমস্ত তুচ্ছ করে।' এই ভাবেই তাঁহার ভাষায় বলা যায়, 'প্রেমের শতদল অহঙ্কারের বৃন্ত আশ্রয় ক'রে বিশ্বাত্মা পর্যন্ত পাপড়ি খুলে বিকাশ-লীলার সমাধান করে।' এইরূপে মুক্তি ও বিশ্বমানবতা কবির চিন্তায় এক স্থানে আসিয়া মিলিয়াছে।

অহং ও আত্মা

মুক্তির এই ধারণার সহিত অহং এবং আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ সম্বন্ধে বিশ্বকবির উক্তিগুলি স্বতই চিত্ত আকর্ষণ করে। অহং এবং আত্মা নিবিড় বন্ধনে জড়িত এবং সকল দর্শন ও সাধনতত্ত্বে এ দুটি বহু আলোচনার বিষয় হইয়াছে। কবির ভাষায়: 'অহং প্রদীপ—আত্মা আলোক।' 'দ্রষ্টা—ইহাই নিজের নিত্য স্বরূপ।' 'অহংই আত্মার সীমা, আত্মার রূপ, কুল যেমন নদীর গতি ও রূপ দেয়।' 'আত্মা ন জায়তে ন ম্রিয়তে—অহং জন্ম-মরণের মধ্য দিয়ে চলেছে।' 'দেশ-কাল-জাত অহং, কূলের দ্বারাই সে গতির সাহায্য করে।' 'অহং আত্মাকে কেবল বাঁধছে ও ছাড়ছে—এতে আত্মার মুক্ত স্বভাব প্রকাশ পাচ্ছে।' 'যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে, তাকে যখন ছাড়ি তখন মৃত্যু ঘটে। এই ভাবে এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি।' 'আমি'টিকে আর সকল হ'তে স্বতন্ত্র ক'রে অনাদি কাল থেকে (জীব) বহন ক'রে আনছে।' আর এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন, "ছোট ছোট জন্ম-মৃত্যুর সীমানায় নানা 'রবীন্দ্র-নাথে'র একখানা মালা।"

এই সকল লেখায় জন্মান্তরবাদ ও জীবদেহের বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ—দুয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বিবর্তনের আরম্ভ হইতে জীবাণুরূপে আবির্ভাব পর্যন্ত এই পৃথগ্‌ভাব চলিয়া আসিতেছে এবং উহার চরম বিকাশ মানবচেতনায়। ইহাকে 'বৈজ্ঞানিক জন্মান্তরবাদ' বলা যাইতে পারে। মৃত্যুপরম্পরার ভিতর দিয়া এই যে অমরতার অনুসরণ—অনুবৃত্তি বা অনুস্মৃতির এই যে ধারা—ইহাই অহং-তত্ত্বের সূত্র। সকল পরিবর্তনের ভিতর এই যে অপরিবর্তনের প্রত্যয়, সকল বিকারের ও বিনাশের মধ্যে যে অবিকারী ও অবিনাশী বস্তুর আস্বাদ—ইহা মানবতার বৈশিষ্ট্য। এই বস্তুর রহস্য ও মহত্ত্বে মানুষ বিমুগ্ধ, ইহার স্বরূপ-নির্ণয়ে চকিত ও বিভোর। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, উহা সাক্ষী। সুখদুঃখের ভোক্তা নয়—জ্ঞাতা, ইহা বেদান্তের প্রাচীন নির্ণয়। কবি লিখিয়াছেন, 'সুপ্তিতে ও নিদ্রাভিভূত

দেহ-নাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য—ইহা প্রত্যক্ষ হয় শুধু তাহার।' উপনিষদেও সেই প্রশ্ন—জাগ্রৎ স্বপ্নের সকল অনুভূতি বিলীন হইলে, সুষুপ্তির নিস্তরঙ্গ সত্তায় মিলাইলে, কোন্ আলোক থাকে অবশেষ?' রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র অতল অন্তর—নিজ নিত্যস্বরূপ নিশ্চয় জেনে।'

মুক্তিতে ভেদ ও অভেদ

মুক্তি-কামনার সহিত অনুস্যূত রহিয়াছে মানুষের আত্মজ্ঞান বা নিজ-স্বরূপের বোধ। আত্মতত্ত্বের বিবৃতিই উপনিষদের প্রধান কথা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'মানবজীবনের চরম লক্ষ্য আত্মাকে পূর্ণ ক'রে, সত্য ক'রে জানা।' তিনি বলিয়াছেন: 'আধ্যাত্মিকতা আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অন্যথা ভ্রূণের মতো বা ডিমের মধ্যে জন্ম থেকে যায়। জন্মেও অজাত থেকে যায় মানুষ।' 'ভ্রূণের মতো জগতের মধ্যে আবদ্ধ, জগৎ দেখতে পাই না।' 'তাই প্রার্থনা—আমাকে এই বিচ্ছেদ—এই অচৈতন্য—ঔদাসীন্যের সমুদ্র উত্তীর্ণ ক'রে দাও।' দর্শনের বিচারে শুধু নয়, সাধনার পথেও অহংজ্ঞানের বিশিষ্টতা মানুষের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীকে পৃথক্ করিয়া দেয়—ইহা ইতিহাসের কথা। অহংটি কল্পনা বা ভ্রান্তি মাত্র—পরমতত্ত্বের জ্ঞান উদ্ভাসিত হইলে সূর্যোদয়ে কুহেলিকার মতো ইহা মিলাইয়া যায়—অদ্বৈতসিদ্ধান্ত এইরূপ। দ্বৈতমতে জীবের স্বাতন্ত্র্য নিত্যসিদ্ধ—ইহা বিলীন হইবার নহে এবং বিলীন হওয়াও আত্মার পক্ষে শ্রেয়ঃ নহে। কবির লেখায় দুই ভাবেরই প্রকাশ চোখে পড়ে।

বিশ্বহীন নামহীন আনন্দ
দিক আমাকে নিরহঙ্কার মুক্তি
সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।
মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দ-ধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোন কিছু নেই—
অহঙ্কারের প্রাচীরে ঘেরা।

আর একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন, 'তবে কি আত্মবিলয়ের জন্য মানুষ কাঁদছে? পারে যাওয়া যদি লুপ্ত হওয়া হয়, তাহা হইলে এপারে দুঃখ, ওপারে ফাঁকি।'

কৈবল্য বা নির্বাণ কবির মুক্তিবাদে স্থান পায় নাই। অহমিকা-বিসর্জনে ভূমার উপলব্ধি ও উহাতে জীবনের পর্যবসান—তাঁহার লেখায় মহনীয় হইয়াছে। দুঃখনিবৃত্তি নয়—ভূমা স্বীকার—ইহাই লক্ষ্য। তিনি লিখিয়াছেন:

আদি যার শূন্যময়, অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃতরূপে।
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
অমৃতের আমি অধিকারী।

ত্যাগে নয়, দানে অমৃতত্ব

অহং-বিলোপ এই অমৃতলাভের সোপান—কিন্তু লক্ষ্য ভূমাত্মতা। কবি লিখিয়াছেন: 'তাঁহারাই মহাত্মা—যাঁহাদের অহং চোখে পড়ে না, আত্মা-কেই দেখি—তাঁহাকে বলি মহাত্মা। আত্মার কামনা ভূমার পরিণতি।' 'বৈরাগ্যস্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় করিয়ে দেয়।' কবি বলিয়াছেন: 'সংসারে কেবল সরা—কিছু পাওয়া নয়।' 'সংসার তো মিথ্যা নয়। সংসার দানের ক্ষেত্র। ত্যাগে নয়, দানে ঐশ্বর্য—অহং

দানের সামগ্রী। অহং উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আনে—প্রথমে দানের সামগ্রী আমার ক'রে নেবার জন্য অহং-এর দরকার। অহংটা বিসর্জন শেষে। আত্মা ও পরমাত্মা—নিয়ে নয়, দিয়েই খুশী। ইহাই স্বভাব। ঈশো-উপনিষদে যে 'তেন ত্যক্তেন—' আছে, উহাতে বুঝিতে হইবে—তিনি ত্যাগ করিয়াছেন—তাই জীবনের উৎস চারিদিকে প্রবাহিত।

'সোনার তরী'তে দেখানো হইয়াছে—সংসারের এই চির-যাত্রী নৌকায় সকল সম্পদ বিনা আপত্তিতে বোঝাই হইতে পারে। কেবল অহং-এর স্থান নাই; তখন 'ছোট এ তরী'। ইতিহাসের অরুণোদয় হইতে মানুষের কৃতিত্বে সংসার-তরী নিরন্তর পূর্ণ হইতেছে—সমৃদ্ধ হইতেছে। কিন্তু কৃতীদের অস্তিত্ব—নাম পর্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছে। এমনি ভাবে অহমিকা বাদ দিয়া সমাজকে সেবা করা মানবজীবনের পূর্ণতা ও পরিণতি। 'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব'—ইহার অর্থ তিনি বলেন—'সমাজসাধনা তপঃ।' তাঁহার কথা: 'দেবার ধর্ম—আনন্দের ধর্ম।' 'মানুষের অহঙ্কার বিসর্জনের জন্য। আত্মা দানের দ্বারা মুক্ত হয়।' আরও বলিয়াছেন: কে অনন্ত সত্য বন্দী করবে? আমরা বিশ্বযাত্রী—পান্থশালায় আবদ্ধ নহি। অহং-পরিহার ও আমিত্বের অন্তহীন প্রসার—লক্ষ্য ইহাই। 'নমস্তেঽস্তু নম আয়তে নমঃ পরায়তে'—ইহা উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিতেছেন, 'বিরাট প্রাণ-সমুদ্রই তুমি—এই বোধ যাঁদের ছিল—তাঁদের পদধূলিতে ভারত পবিত্র।' 'নৈবেদ্যে' আছে:

> তোমারে বলেছে যারা পুত্র হ'তে প্রিয়
> বিত্ত হ'তে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়
> সব হ'তে প্রিয়তম, নিখিল ভুবনে
> আত্মার অন্তরতর, তাদের চরণে
> পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।

ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মবিহার

'এই ভূমায় পরিণতি—অহং যাহাতে মহান্ আত্মায় পরিণত হয়, ইহাই আত্মার কামনা। আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি ক'রব—এই আত্মার আকাঙ্ক্ষা। ইহাই জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা।' কবি লিখিয়াছেন: 'বৌদ্ধ ধর্মের চরম নির্বাণ—শূন্য নয়, প্রেমের ভাবে আদান-হীন প্রদানের ভাবে পূর্ণ হওয়া।' 'শীল—মোহমুক্তির জন্য, মৈত্রীভাবনা আত্মাকে ব্যাপ্ত করার পথ।' 'প্রেমকে জাগান মুক্তি—বুদ্ধ মঙ্গল-সাধনায় মুক্তি বলতেন।' সমাজ-সাধনার পরমোৎকর্ষ—এই আমিত্বের প্রসারে সর্বোচ্চ স্তর, বৌদ্ধ ধর্মের পরিভাষায় 'ব্রহ্মবিহার'। ইহার প্রথম সূচনা যজুর্বেদের সুপ্রাচীন মন্ত্রে: মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। এই বিশ্বজনীন মৈত্রীভাবনা ও মৈত্রীপ্রার্থনা রবীন্দ্রনাথে ব্রহ্মবাদের পরিণতি।

অদ্বৈতবাদে সর্বভূতে সমদৃষ্টি প্রকৃষ্ট নীতি। গীতায় সর্বভূতহিতে রতি—মুখ্য উপদেশ। ইহার মূলে সর্বজীবে একত্ববুদ্ধি—সকলই ব্রহ্মময় এই উপলব্ধি। কবি বলিয়াছেন, সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ ব্যক্ত ইচ্ছা—অব্যক্ত ইচ্ছা মঙ্গল ইচ্ছা—ব্রহ্মের ইচ্ছা—দেশকালের বাইরের দিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা। প্রেমের, যোগের, প্রকাশের মুক্তি—ইহাকেই রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-সূত্র বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহারের মূলে দার্শনিক তত্ত্বরূপে সর্বজীবের ঐক্য না থাকিলেও চিত্তের সরসতায় উহা অভিষিক্ত। কবি বলিয়াছেন, 'জগৎ-প্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজ-প্রকৃতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ—এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী।' উপনিষদের ব্রহ্মবাদ—বৌদ্ধ 'মেত্তভাবনা'র সহিত মিলিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের লেখায় মানবতাবাদে নিলীন হইয়াছে,—ফলে সৃষ্ট হইয়াছে এক বিশাল সঙ্গমতীর্থ। অধ্যাত্মচিন্তার ক্রমবিকাশে উহার প্রেরণা অপরিমেয়।

অগ্নিগর্ভ বাণী

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

"এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে নরনারী যে কেউ জন্মগ্রহণ করে, তারই দেহধারণ 'ধর্মকোষস্ত গুপ্তয়ে'—অর্থাৎ ধর্মকোষ রক্ষার নিমিত্ত। অতএব আমাদের জীবনের সমস্ত ব্যাপারকেই সেই মূল উদ্দেশ্যের অনুগামী ক'রে চলতে হবে। * * * এ কথা নিশ্চিত জেনো, যদি আধ্যাত্মিকতা বিসর্জন দিয়ে তোমরা পাশ্চাত্যের ভোগৈকপরম জড়বাদী সভ্যতার পেছনে ছুটে চলো, তার ফল দাঁড়াবে এই যে, তিন পুরুষ যেতে না যেতেই তোমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে; কারণ আধ্যাত্মিকতার বর্জনে জাতির মেরুদণ্ডই ভেঙে যাবে, যে ভিত্তির উপরে জাতীয় জীবনের সুবিশাল সৌধ গড়ে উঠেছে, সেই ভিত্তিই বিনষ্ট হবে, এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—সর্বতোমুখী ধ্বংস।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

পাশ্চাত্য জগতে হিন্দুধর্মের বিজয়-নিশান ওড়াবার পর স্বামীজী কলম্বো ও জাফনা হয়ে পাম্বানে সর্বপ্রথম ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেন। ৺রামেশ্বর মহাদেব দর্শনান্তে তাঁর প্রিয় শিষ্য রামনাদের রাজা সেতুপতি ভাস্করের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি যান রামনাদে। পাম্বানে জনসাধারণের সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি যে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন, তাতে ভারতের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে যৎসামান্য উল্লেখ ছিল বটে, কিন্তু রামনাদবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় যে বক্তৃতা তিনি করেন (২৫শে জানুআরি, ১৮৯৭), —বস্তুতঃ তাকেই বলা যেতে পারে, সুপ্ত ভারতকে জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে স্বদেশে তাঁর সর্বপ্রথম তূর্যনিনাদ। বক্তৃতার প্রারম্ভেই কি বিপুল আশা ও উৎসাহের বাণী, কি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র তিনি আমাদের কানে ঢেলে দিচ্ছেন:

দীর্ঘতম রজনীর যেন অবসান দেখা যাচ্ছে,—সর্বাপেক্ষা বেদনানায়ক যে দুঃখ, অবশেষে তাও যেন দূরীভূত হ'তে চলেছে; এতকাল যা নিষ্প্রাণ শবদেহ ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছিল, তা যেন মহানিদ্রা ভেঙে জেগে উঠছে। একটি কণ্ঠস্বর আমাদের কানে এসে পৌঁছুচ্ছে; এমন সুদূর অতীত থেকে স্বরটি আসছে যে, সেখানে ইতিহাস দূরের কথা, কিংবদন্তী পর্যন্ত তার ঘনান্ধকার গুহায় কোনরূপ আলোক-সম্পাতে অক্ষম। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মরূপী বিরাট্ হিমালয়ের শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই স্বর আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে, উহা মৃদু অথচ সুস্পষ্ট এবং গুরুগম্ভীর, এর ভাষাকে কিছুতেই ভুল বুঝবার জো নেই; দিনের পর দিন সেই স্বর ক্রমশঃ অধিক জোরালো হয়ে উঠছে। আর ঐ তাকিয়ে দেখ, আমাদের জননী জন্মভূমি নিদ্রা ত্যাগ ক'রে জেগে উঠেছেন! এই জাগরণ হিমালয়াগত মৃদুপবনহিল্লোলের ন্যায় আমাদের মৃতপ্রায় অস্থিপেশীতে জীবন সঞ্চার করছে, আমাদের সমস্ত জড়িমা দূর ক'রে দিচ্ছে। যারা অন্ধ এবং বিকৃতবুদ্ধি, তারাই শুধু দেখতে পাচ্ছে না যে,

যুগযুগান্তব্যাপী দীর্ঘনিদ্রার অন্তে মা আমাদের সত্যি জেগে উঠেছেন। আর কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারবে না; আর কখনও তিনি নিদ্রায় অভিভূত হবেন না, বাইরের কোন শক্তিই আর তাঁকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না; কারণ, অনন্তশক্তিরূপিণী সত্যি উঠে দাঁড়িয়েছেন।

স্বামীজী বলেছিলেন, বাইরের কোন শক্তিই আর ভারতকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু এই আশঙ্কা তাঁর মনে ছিল যে. আমরা নিজেরা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হই এবং দ্রুত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে না পারি, তবে ভিতরের গলদ আমাদিগকে দাবিযে রাখতে ও আমাদের সর্বনাশ টেনে আনতে পারে। তাই রামনাদের বক্তৃতারই শেষের দিকে একটি সতর্কবাণী খুব স্পষ্ট এবং জোরালো ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন। সেই সতর্কবাণীই বর্তমান প্রবন্ধের শিরোভাগে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

স্বামীজীর মতে—প্রত্যেক জাতিরই একটা স্বকীয় ভাব আছে, সেই ভাব জগতের কাজে লাগছে এবং সংসারের স্থিতির জন্য এর বিকাশ অত্যাবশ্যক। জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে ভারতের নিজস্ব কিছু দেবার আছে এবং সেই জন্যেই আমরা বেঁচে আছি। যদি তা দিতে পারি, তবেই আমাদের বাঁচা সার্থক। আর যদি দেবার চেষ্টাই না করি, তবে আমাদের বাঁচা অর্থহীন, এবং অচিরে আমাদের বিনাশ নিশ্চিত।

ভারতের স্বকীয় ভাব কি? ভাব—মোক্ষ-লাভেচ্ছা। সুখদুঃখ দুই-ই বন্ধন; দুয়েরই পারে যেতে হবে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকের প্রারম্ভেই স্বামীজী এ কথা তাঁর বিশিষ্ট ভাষায় ও ভঙ্গীতে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। ভারতের সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা। ভারতীয় জ্ঞানীদের মতে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'; পরমাত্মাই জগতের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য—পরমাত্মার সাক্ষাৎকার। আত্মাই শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য। আত্মজ্ঞানই সত্যিকার জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানেই মুক্তি। পরমজ্ঞান-লাভের পর আর কিছুই জ্ঞাতব্য বা কোন কর্তব্য থাকে না। জীবন্মুক্ত হবার পর জ্ঞানী ব্যক্তি যেটুকু কর্ম করেন, তা শুধু লোকসংগ্রহের নিমিত্ত।

জ্ঞানলাভের দুটি পথ—এক প্রবৃত্তিমার্গ, অপর নিবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গ স্বল্পসংখ্যক সাত্ত্বিকস্বভাব লোকের নিমিত্ত, আর প্রবৃত্তিমার্গ অপর সকলের নিমিত্ত। একেবারে শেষপ্রান্তে প্রবৃত্তিমার্গ নিবৃত্তিমার্গের সহিত মিলে গিয়েছে, কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত আলাদা—মহাজনেরা এ-কথাই বলেন। যে নিবৃত্তিমার্গ অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই উপযোগী, সেই মার্গকে অধিকারী অনধিকারী বিচার না ক'রে সর্বসাধারণের জন্যে ব্যবস্থা করাতেই বৌদ্ধধর্ম পরিণামে দেশের ও সমাজের সর্বনাশ টেনে এনেছিল। দৈনন্দিন কাজকর্মের ভিতর দিয়ে স্বধর্ম পালনের দ্বারা যদি সমস্ত মনোবৃত্তিকে পরমার্থের অভিমুখী করা যায়, তাতেও পরিণামে মোক্ষলাভই হয়ে থাকে, হিন্দুশাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই উপদেশ। হাত-পা গুটিযে অন্নবস্ত্রের অভাব ভোগ করা, পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করতে না পারা, অন্যায় অবিচার নীরবে সহ্য করা—অলস, নিশ্চেষ্ট জীবন যাপন করা,—এ সমস্তই অনার্যোচিত, গর্হিত, নিন্দার্হ। 'স্বধর্মপালন' বলতে কিছু 'করা' বুঝায়, নিষ্ক্রিয়তা বুঝায় না। কিন্তু সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে 'করা' উপলক্ষ্য মাত্র, 'হওয়া' হচ্ছে লক্ষ্য। ভাব শুদ্ধ রাখতে পারলে 'করা'র ভিতর দিয়েই

আমরা ক্রমশঃ উন্নত ও পরিশেষে মুক্ত 'হই'। যখন করাটাই চরম হয়ে ওঠে, হওয়ার দিকে আর লক্ষ্য থাকে না, তখন 'করা'টা হয় বন্ধন ও অধঃপতনের কারণ। যারা অতিশয় উগ্রকর্মা, তারা হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর অভিশাপ।

অধ্যাত্মবাদ কিংবা জড়বাদ—কোনটাই এক বিশেষ ভূখণ্ডের বা সমাজের একার সম্পত্তি নয়। তবে প্রত্যেক সমাজই কোন একটি বিশেষ আদর্শ অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছে। সেই আদর্শের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে,—তার সমস্ত অতীত ইতিহাস, তার গতি-প্রকৃতি তাকে সেই দিকেই ঠেলে নিয়ে যায়; আর আদর্শ যদি মন্দ আদর্শ না হয়, তবে তার অনুসরণের দ্বারা সে একদিকে নিজের চরম উৎকর্ষ লাভ করে, এবং অপরদিকে সমস্ত মানবসমাজকে সমৃদ্ধ করে। ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল থেকেই আধ্যাত্মিকতার আদর্শ প্রশংসিত; কখনও অল্প, কখনও অধিক-মাত্রায় তা অনুসৃত হয়ে এসেছে। সংসারের অনিত্যতার কথা, ত্যাগবৈরাগ্যের কথা, ভগবদ্ভক্তির কথা, শরণাগতির কথা, সর্বজীবে প্রেমের কথা—আপামর সাধারণ সকলের মুখেই শোনা যায়। আদর্শ ঠিকভাবে উপলব্ধ কিংবা অনুসৃত না হলেও, অন্ততঃ আদর্শের একটা আবছা-রকমের ধারণা এবং আদর্শের প্রতি একটা শ্রদ্ধালু ভাব এদেশের জনগণের চিত্তে সদা বিরাজমান।

আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রাধান্য বলতে সামাজিক জীবনে পার্থিব অভ্যুদয়ের প্রতি অবজ্ঞা কিংবা অবহেলা বুঝায় না। প্রাচীন হিন্দুসমাজের জীবন একদিকে যেমন ছিল আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত, তেমনই অপর-দিকে ছিল জাগতিক সকল বিষয়ে উন্নত এবং সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রথমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এবং তার পর প্রায় এক হাজার বৎসর ক্রমাগত বিদেশীর ও বিধর্মীর আক্রমণ ও শাসনের ফলে হিন্দুসমাজে একটা নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট ভাব এবং চালাকি ও ভণ্ডামির প্রবৃত্তি বহুল পরিমাণে প্রবেশ লাভ করেছে। অকর্মণ্যতা ও অজ্ঞানকেই অর্থাৎ ঘোর তামসিকতাকেই আমরা সত্ত্বগুণের প্রকাশ ব'লে ভাবতে ও চালিয়ে দিতে অভ্যস্ত হয়েছি; মর্কট বৈরাগ্যকে আমরা প্রকৃত বৈরাগ্যের আসনে বসিয়েছি। আমাদের এই দুর্দশা—স্বামীজী আমাদিগকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন এবং জড়তা পরিত্যাগপূর্বক কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেশের যুবসমাজকে পুনঃপুনঃ আহ্বান জানিয়েছেন। যারা এই আহ্বানে সাড়া দেবে, তারা প্রকৃত কর্মযোগীর ন্যায় কর্ম করবে—এই ছিল তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তা যদি নাও পারে, তথাপি আলস্যের চেয়ে কর্মিষ্ঠতা সর্বদাই প্রশংসনীয়। স্বামীজী বলেছেন, 'সত্ত্বগুণীর যে নৈষ্কর্ম্য, তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। সত্ত্বপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্ত-ভাব মহাবীর্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মতো হাত-পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়।' সেই অবস্থায় না পৌঁছে শুধু ভালমানুষটি সেজে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা কোন রকমেই বাঞ্ছনীয় নয়। স্বামীজীর কথায়—'অবশ্য কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, ভালমন্দমিশ্র কর্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে

চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।'

সাধারণ মানুষের পক্ষে কর্ম ভিন্ন গতি নাই। আর কর্মের পথে পা বাড়ালে ধর্মের কথা আপনি আসে। হিন্দুর জীবনে আছে চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্ম* সব কিছুর মূলে। স্বামীজীর ভাষায় 'হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, ধর্মের চেয়ে মোক্ষটা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।' আগে ধর্মকাম, পরে মুক্তিকাম। ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী মানবজীবনের লক্ষ্য মোক্ষলাভ; আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপায়— ধর্মপালনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি। তাই স্বামীজী বলেছেন, ধর্মেতেই ভারতের প্রাণপাখী—'এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম।'

হিন্দুর জন্য শাস্ত্রের অনুশাসন—স্বধর্মপালন। সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য আছে। ভাব শুদ্ধ রেখে যথাযথভাবে সেই কর্তব্যানুষ্ঠানের নাম স্বধর্মপালন। জীবন আহুতি দিয়েও স্বধর্ম পালন করতে হবে,—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'। রাজার প্রজার, অধ্যাপকের ছাত্রের, জমিদারের কৃষকের, মালিকের শ্রমিকের—প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ স্বধর্ম আছে। সর্বাবস্থায় এই স্বধর্ম পালনীয়।

সমস্ত সভ্য-সমাজেই স্বধর্মাচরণের আদর্শ কোন না কোন আকারে বিদ্যমান, এবং এর গুণগানের ছড়াছড়ি। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাস্কিনের 'Roots of Honour' প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে, —পাশ্চাত্যে 'Duty for duty's sake' (অর্থাৎ কোনরূপ পুরস্কারের প্রত্যাশা না ক'রে কর্তব্যপালন) উচ্চতম আদর্শ ব'লে পরিগণিত; কারণ তদ্দ্বারাই সমাজ বিধৃত ও উন্নত হয়। ভারতীয় চিন্তাধারায়ও স্বধর্মপালনকে ব্যক্তির ও সমাজের অভ্যুদয়ের কারণ ব'লে গণ্য করা হয়েছে, কিন্তু এখানেই শেষ নয়, পরমার্থলাভের সঙ্গে একে যুক্ত করা হয়েছে। স্বধর্মপালন কর্মের ভিতর দিয়ে হয়, আর শাস্ত্রানুযায়ী সকল নিষ্কাম কর্মের লক্ষ্য 'জ্ঞান',—সাধারণ জ্ঞান নয়, যে জ্ঞান মোক্ষলাভ করায় এ সেই জ্ঞান। 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।' পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় জ্ঞানের উদ্দেশ্য শক্তিলাভ, আধিপত্যলাভ—(Knowledge is power); ভারতীয় চিন্তাধারায় সত্যিকার জ্ঞানের উদ্দেশ্য সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ, মোক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগের কথা নানাভাবে বুঝিয়েছেন। ভয়বশতঃ কিংবা অপ্রীতিকর অবস্থা এড়াবার জন্যে স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক মর্কট বৈরাগ্য অবলম্বন—বীরের কাজ নয়, কাপুরুষের কাজ। এতে ঐহিক ও পারত্রিক দু-রকমেরই অকল্যাণ হয়। 'স্বধর্ম' আজকাল জন্মগত নয়; নিজ নিজ বৃত্তি ও সামাজিক কর্তব্য আমরা নিজেরাই বেছে নিই, কিংবা বাইরের অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করি। ভারতীয় আদর্শের মূল কথা এই যে, 'স্বধর্ম' জন্মগতই হউক, কিংবা স্বেচ্ছাবৃতই হউক, স্বধর্মকে যথাযথ ও নিষ্কপটভাবে পালন করতে হবে এবং স্বধর্মপালনের দ্বারাই পরমার্থলাভের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই আদর্শ স্পষ্ট ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন যে, বেদান্তই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মূলসূত্র হওয়া চাই— উপনিষদুক্ত

---

* এখানে 'ধর্ম' অর্থে পাপপুণ্য-বোধ, ন্যায়-অন্যায় বিচার, এবং তদনুযায়ী কর্তব্যপালন। যেহেতু এই বিচার এবং কর্তব্যনিষ্ঠার ফলে মনুষ্যসমাজ বিধৃত হয় অতএব এর নাম 'ধর্ম'। ধর্ম অর্থে Religion নয়, কিংবা মোক্ষও নয়।

আত্মতত্ত্বে আমাদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। তিনি বলেছেন:

বেদ যাঁর দ্বারা নিঃশ্বসিত, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 'গীতা'তে বেদের একমাত্র প্রামাণ্য টীকা একেবারে চিরকালের নিমিত্ত ক'রে রেখেছেন। যার যে প্রকার জীবিকাই হোক না কেন, 'গীতা' প্রত্যেকেরই উপযোগী এবং প্রত্যেকেরই জন্য উপদিষ্ট। বেদান্তের তত্ত্বসমূহ শুধু যে নিভৃত অরণ্যে কিংবা গুহাবাসে সাধনার বস্তু হয়ে থাকবে তা নয়; বাইরের কর্মজগতে তাদের প্রযোগ নিতান্ত প্রয়োজন। উকীলের সেরেস্তায়, বিচারকের বিচারাসনে, ধর্মপ্রচারকের বক্তৃতামঞ্চে, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, —এমন কি, যেখানে জেলে মাছ ধরছে, ছাত্র পড়া মুখস্থ করছে—সর্বত্র বেদান্তের তত্ত্বসমূহকে কাজে লাগাতে হবে। স্ত্রী কিংবা পুরুষ, বালক কিংবা বৃদ্ধ—যে যেখানে থাকুক, বেদান্ত সবারই কাজে লাগতে পারে, বেদান্ত সবাইকে সাহায্য করতে সক্ষম। বেদান্তের নামেতেই ভয় পাবার কি আছে! প্রশ্ন উঠবে যে, এমন কি উপায় আছে, যাতে জেলেমালা প্রভৃতি নানা-শ্রেণীর লোক উপনিষদের আদর্শ নিজ নিজ জীবনে কার্যে পরিণত করতে পারে? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এ-সম্পর্কে নূতন ক'রে পথ দেখাতে হবে না, পথের নির্দেশ (শাস্ত্রে এবং দৃষ্টান্তে) রয়েছেই। এই পথ এরূপ অনন্তবিস্তার এবং এই (বৈদান্তিক) ধর্ম এতই ব্যাপক যে, এর বাইরে কারও যাবার জো নেই। (বেদান্তের মতে) আন্তরিকতার সহিত, মনমুখ এক ক'রে যা কিছু তুমি কর, তাতেই তোমার কল্যাণ। ক্ষুদ্রতম কাজও যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়, তাতেই অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া যায়; অতএব প্রত্যেকে যে যতটুকু পারে সে ততটুকুই করুক।—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' একজন জেলের মনে যদি বিশ্বাস জন্মে যে—সে 'আত্মা', তাহলে সে আরও ভাল জেলে হবে; একজন ছাত্রের যদি ধারণা জন্মে যে—সে আত্মা, তবে সে আরও ভাল ছাত্র হবে; একজন উকীল যদি মনে করেন যে—তিনি আত্মা, তবে তিনি আরও ভাল উকীল হবেন।

এই আদর্শই ভারতের চিরন্তন আদর্শ, এই দৃষ্টিভঙ্গীই ভারতের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। ব্যষ্টির এবং সমষ্টির জীবনে এই আদর্শকে অম্লান রাখা, জগদ্বাসীর নিকট এই আদর্শ প্রচার করাই হচ্ছে মানবসভ্যতার পূর্ণতাসাধনে ভারতবর্ষের বিশেষ দান এবং বিশেষ কর্তব্য, এই আদর্শ ও এই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হ'লে আমরা নিজেরা অধঃপতিত হই, জগদ্বাসীকেও বঞ্চিত করি। এই অধঃপতন মৃত্যুরই সামিল।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ স্বামীজী-ব্যাখ্যাত এই জীবনাদর্শকেই ভারতবর্ষের যথার্থ আদর্শ ব'লে গ্রহণ ও প্রচার ক'রে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধে এবং কবিতায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দের যে সমস্ত প্রবন্ধ 'The Foundations of Indian Culture'-নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে, বিশেষতঃ রাষ্ট্রগঠনে ভারতীয় আদর্শকে অনুসরণ সম্পর্কে বিশদ এবং সুসম্বদ্ধ আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এই আলোচনা অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন এবং অলোকসামান্য প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত। সমস্ত গ্রন্থখানিকে স্বামীজী-প্রচারিত আদর্শের একটি অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা ব'লে গণ্য করা যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের চোখের সামনে যা ঘটছে, তার সম্ভাবনা অনুমান ক'রে তিনিও অনেক আগেই সতর্কবাণী উচ্চারণ

ক'রে গিয়েছেন। তার যৎসামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

The danger is that the pressure of dominant European ideas and motives, the temptations of the political needs of the hour, the velocity of rapid, inevitable change will leave no time for the growth of sound thought and spiritual reflection, and may strain to bursting point the old Indian cultural and social system, and shatter this ancient civilization before India has had time to re-adjust her mental stand and outlook, or to reject, remould or replace the forms that can no longer meet her environmental national necessities, create new characteristic powers and figures, and find a firm basis for a swift evolution in the sense of her own spirit and ideals. In that event a rationalised and westernised India, a brown ape of Europe, might emerge from the chaos, keeping some elements only of her ancient thought to modify but no longer to shape and govern her total existence. Like other countries she would have passed into the mould of occidental modernism ; ancient India would have perished.

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, স্বাধীনতা-লাভের পর যে উৎকট পরানুকরণ ও পরানুচিকীর্ষার মোহ আমাদের পেয়ে বসেছে, তার ফলে আমাদের পিতৃপিতামহের সাধনা-দিয়ে-গড়া এবং আমাদের ধ্যানের ভারতবর্ষ আজ মহাবিপদের সম্মুখীন। যে ভারতীয় সংবিধানকে আমরা নূতন 'সংহিতা' ব'লে গ্রহণ করেছি, তার পশ্চাতে যে ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রেরণা নেই,—তা বিদেশী পর্যবেক্ষকেরও দৃষ্টি এড়ায় না।*

স্বামীজীর একটি উক্তি উদ্ধৃত ক'রে প্রবন্ধ শেষ করা যাক: 'ভারতবর্ষে ধর্মই হচ্ছে জাতীয় জীবনের মর্মস্থল। আধ্যাত্মিকতাই মূল সুর—যাকে অবলম্বন ক'রে জাতির সমগ্র জীবনসঙ্গীত মুখরিত। বহু শতাব্দী যাবৎ যে পথে চলে এসেছে— সেই গতিপথ থেকে বিচ্যুত ক'রে যদি কোন জাতি তার প্রাণপ্রবাহকে ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে চায়, এবং সেই চেষ্টা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে সেই জাতির মৃত্যু ঘটে। অতএব যদি তোমরা ধর্মকে দূরে নিক্ষেপ করতে সমর্থ হও, এবং ধর্মের জায়গায় রাজনীতি, সমাজনীতি অথবা অপর কোন বস্তুকে জাতীয় জীবনের মর্মস্থলে প্রাণকেন্দ্ররূপে স্থাপিত কর, তার ফল হবে এই যে তোমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বজায় থাকবে না।'

---

* Theodore L. Shay—The Legacy of the Lokamanya.

'ভারত-ভাস্করম্'

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

[রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবি-জীবনী অবলম্বনে বিরচিত সর্বপ্রথম সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা—ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী অনূদিত]

নান্দী

প্রণমামি বিশ্বালোক-ভারত-ভাস্করং
কবীন্দ্রকুলপ্রতিভা-সমুচ্চয়-রূপম্ ।
বিশ্বশান্তিনীড়-বিশ্বভারতী স্থাপকং
সাধনাবিগ্রহধরং রবীন্দ্রসুন্দরম্ ॥

যিনি বিশ্বালোক ও ভারত-ভাস্কর স্বরূপ,
যিনি কবিকুল-প্রতিভার সাররূপ,
যিনি বিশ্বশান্তিনীড় বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা,
যিনি সাধনার মূর্ত প্রতীক—সেই রবীন্দ্র-সুন্দরকে প্রণাম।

সূত্রধার—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাকে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের কর্তৃপক্ষ আদেশ করেছেন, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-বিরচিত সংস্কৃত নাটক 'ভারত-ভাস্করম্' মঞ্চস্থ করতে। সর্বকর্মনিপুণা নটী এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন।

সৌভাগ্যবশতঃ তিনি নিজেই এদিকে আসছেন। দেবি! নাটকারম্ভের যা যা প্রয়োজন, তা সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছে তো?

নটী—নিশ্চয়। কিন্তু, আর্য! বিশ্বকবির জীবনী অবলম্বনে বিরচিত এই নাটকটিকে মঞ্চস্থ করতে অত্যন্ত ভয় পাচ্ছি। প্রথমতঃ এটিই হ'ল রবীন্দ্র-জীবনী অবলম্বনে সর্বপ্রথম নাটকাভিনয়। দ্বিতীয়তঃ—তাও আবার সংস্কৃতে!

সূত্রধার—দেবি! তাই তো আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ, দুঃসাধ্য বিষয় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করতে পারলেই তো চিত্তের শান্তি হয়। ভোজন-শয়নাদির ন্যায় ক্ষুদ্র কর্ম ক্ষুদ্র মানবও অনায়াসে সম্পাদন করতে পারে। পিতৃপিতামহকে পিণ্ডদানে কে না সক্ষম? কিন্তু গৌরীশৃঙ্গারোহণকারী ব্যক্তি অতি বিরল।

পুনরায়—দেবি! রবীন্দ্রনাথের জীবন অবিমিশ্র সুধাক্ষরণকারী, তার সর্বত্রই আনন্দরস প্রবাহিত হচ্ছে। আমার আশা এই যে, তাতেই সহৃদয় শ্রোতৃবর্গ স্বতই পরিতৃপ্ত হবেন।

নটী—আর্য! তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমাদের নাটকটি সংস্কৃত, এবং সংস্কৃত অতি কঠিন।

সূত্রধার—না, না, দেবি! সংস্কৃত ভাষা কঠিন নয়। উপরন্তু এটিই হ'ল নিঃসন্দেহে জগতের পবিত্রতম মধুরতম সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। পুনরায় ভারত-সভ্যতার শাশ্বত ধারক ও পোষক এই দেবভাষা ঋষি-কবির প্রাণ-স্বরূপ ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, নয় বৎসর বয়সে উপনয়নকালে যখন তিনি গায়ত্রীমন্ত্র জপ করছিলেন, তখন তাঁর দুই চক্ষু থেকে অকারণে অজস্র জল নির্গত হয়ে ধরণীতল সিক্ত ক'রে দিয়েছিল। সেই থেকে গায়ত্রী-সাবিত্রীই যেন তাঁর জীবন অধিকার করেছিল, তাঁকে রক্ষা করেছিল। ফলতঃ উপনিষদ্‌ই ছিল তাঁর জীবন।

নটী—আহা! কি সুন্দর এই সব কথা!

সূত্রধার—পুনরায়, শুনুন! জীবনের শেষভাগে বিশ্বকবি একবার শান্তিনিকেতনে বলেছিলেন : ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, তার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষা। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রব, শিক্ষার এই লক্ষ্য আমার মনে দৃঢ় ছিল। ইংরাজীর ভেতর দিয়ে আমরা নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে। তার মধ্যে আছে একটা গভীর বাণী, বিশ্ব-প্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে

নটী—আহা! কি অপূর্ব এই ঋষি-বাণী!

সূত্রধার—কল্যাণি! সেজন্য কবির জীবনচরিতাবলম্বনে রচিত এই সর্বপ্রথম নাটকটি যে সংস্কৃতেই বিরচিত হয়েছে, তা তো সুষ্ঠুই হয়েছে। আমাদেরও সৌভাগ্য যে, আমরা এতে অংশ গ্রহণ করছি।

নটী—আমি এই বিষয়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করছি। কিন্তু সিদ্ধি তো নির্ভর করে ভগবানের কৃপার উপর। আমাদের জন্মভূমি কর্মভূমি, ভোগভূমি নয়। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে মাহেন্দ্রক্ষণে জন্মপরিগ্রহ করেছিলেন। এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য যে, সেই সময়ে তাঁর পরিবার সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক ছিলেন। যাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ, স্বভাবতই তাঁর সৌভাগ্যের অন্ত নেই। অমৃতবৃক্ষের ফল তো রসপূর্ণ হবেই।

সূত্রধার—কিন্তু সুচরিতে! এরূপ পরিবারও যে বিপন্ন হবেন, সে এক অদ্ভুত কথা—লক্ষ্মীদেবীকে সকলেই নির্দয়া ও চঞ্চলা বলেন কি অকারণে? নতুবা মহর্ষিও বিপদ্‌গ্রস্ত হবেন কেন? এ অতি অদ্ভুত ব্যাপার! কিন্তু এই যে পরীক্ষা, তা তো নিজেই গৌরব-বিমণ্ডিত হ'ল, যেহেতু, ক্ষুরধার ন্যায়ের পথ সুধী-রা কোন দিন বর্জন করেন না।

নটী—নিশ্চয়।

সূত্রধার—মঙ্গলময়ি সুব্রতে! দেখুন—সত্যনিষ্ঠ মহাপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথ প্রবেশ করছেন—

[প্রস্থান]

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

নারায়ণগঞ্জ ঃ গত ১০ই হইতে ১৪ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক, বৈদিক স্তোত্র-পাঠ, ভজন, বিশেষ ও নিত্য পূজা, হোম এবং শাস্ত্রাদি পাঠ হয়। প্রথম দিন বৈকালে স্বামী শর্বানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠ করেন এবং ১০ই, ১১ই ও ১৩ই ফাল্গুন সন্ধ্যারাত্রিকের পর ছায়াচিত্রযোগে যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন। প্রথম তিন দিন রাত্রিতে স্থানীয় বীণাপাণি অপেরা পার্টি 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা' গান করেন। ১৩ই রাত্রে শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

১১ই মহিলা কবি বেগম সুফিয়া কামাল সাহেবার সভানেত্রীত্বে এক মহিলা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই বৈকালে এড্‌ভোকেট ডক্টর আলীম আল্‌রাজী সাহেবের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মোজাহারউদ্দিন আহাম্মদ 'ইস্‌লাম ধর্ম', ঢাকা হোলি ক্রস্ চার্চের ফাদার রেভারেণ্ড পিটার দেশাই ও ব্যাপটিস্ট ইউনিয়ন অব পাকিস্তানের সভাপতি মিঃ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 'খৃষ্টধর্ম', ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীপ্রাণেশ সমাদ্দার 'ব্রাহ্মধর্ম', পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী 'বৌদ্ধধর্ম' এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সহাধ্যক্ষ শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু মহাশয় 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপরে সভাপতি সাহেব তাঁহার অভিভাষণে আলোচিত ধর্মসমূহের মূলনীতির ব্যাখ্যা দ্বারা বিশ্বমৈত্রীর আহ্বান জানাইয়া পাঁচ সহস্রাধিক শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন।

১৩ই ফাল্গুন শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় শ্রীমান্ নিখিলচন্দ্র হালদার ও তপনকুমার দে স্বামীজী-রচিত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' ও 'সন্ন্যাসীর গীতি' আবৃত্তি করে।

১৪ই রবিবার সারাদিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান ও প্রায় পাঁচ হাজার দরিদ্রনারায়ণের সেবার পর উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

কাটিহার ঃ গত ১৭ই হইতে ২৬শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত শান্ত এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে স্থানীয় আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

১৭ই পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, 'কথামৃত'পাঠ ও ভজন হয়। রাত্রে সন্ধ্যারতির পর স্থানীয় সম্প্রদায় কর্তৃক 'মাথুর' পালা কীর্তন হয়। ১৮ই পূর্বাহ্নে রামকৃষ্ণ বিদ্যা-মন্দিরের ছাত্রবৃন্দের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যায় পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ বাংলায় এবং পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীউপাধ্যায় হিন্দীতে প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ও স্বামী পরশিবানন্দ। ২২শে হইতে ২৪শে পর্যন্ত কলিকাতার রামায়ণ গায়ক শ্রীনন্দলাল দে ভক্তিরত্ন কর্তৃক রামায়ণ গীত হয়। ২৬শে রবিবার প্রায় ২,৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন।

শিলচর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নিম্নলিখিত কার্যক্রমানুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২রা মার্চ মঙ্গলবার কলিকাতার বেতার-কথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী-পূজা' কথকতা করেন।

৪ঠা মার্চ শনিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী সভায় জি. সি. কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরায়, অধ্যাপিকা অপরাজিতা চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান-বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৫ই মার্চ রবিবার পূজা, পাঠ, আলোচনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি এবং পদাবলী-কীর্তনাদির মাধ্যমে সমস্তদিনব্যাপী আনন্দোৎসবে প্রায় ৮,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

টাকী ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২১শে হইতে ২৩শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে প্রভাতফেরী, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন প্রভৃতির পর ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী জীবানন্দ।

ধর্মসভায় স্বামী মহানন্দ বক্তৃতা করেন। রাত্রে ভারতীসংসদ কর্তৃক 'ভিখারী শংকর' যাত্রাভিনয় হয়।

২২শে রাত্রে শ্রীবিপত্তারণ চট্টোপাধ্যায় কথকতার রামায়ণের 'লবকুশযুদ্ধ' পালাগান করেন। ২৩শে রাত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ-কর্তৃক 'কর্ণার্জুন' অভিনীত হয়। শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল প্রতিদিন 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলা' কীর্তন করেন।

মনসাদ্বীপ ঃ গত ৬ই ও ৭ই মার্চ, মনসাদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়।

৬ই মার্চ মিশন হাই স্কুলের নূতন সুসজ্জিত 'বিবেকানন্দ বিজ্ঞান-ভবনের' দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিলে পর কলিকাতার চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রীশম্ভুনাথ বসাক এবং শ্রীশ্যামানন্দ সাহা বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

৭ই মার্চ প্রাতে বিশেষ পূজা ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের শোভাযাত্রা ও অপরাহ্নে ধর্ম-সভা অনুষ্ঠিত হয়। দূর গ্রাম হইতেও ছাত্র, শিক্ষক ও জনসাধারণ যোগদান করেন।

বিভিন্ন বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা করিলে পর সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ বলেন : ঠাকুর-স্বামীজীর বাণী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে আলোকপাত ক'রে তাকে সর্ববিধ উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁদের জীবনের বড় শিক্ষা হ'ল, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—আমাদের কাজ করতে হবে, আর জীব-মাত্রকেই শিব-জ্ঞানে সেবা ক'রে সমাজে সুস্থ, সবল, পবিত্র ও সাবলীল গতিছন্দ আনয়ন করতে হবে।

রাত্রে ছাত্রদের দ্বারা 'বিজয় সিংহ' নাটক মঞ্চস্থ হয়। দুই দিনই সবাক্ ছায়াচিত্র দেখানো হয়।

শেষদিন সভার পর প্রায় ৩,০০০ ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করেন। তৎপর প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা 'বন্দীর ছেলে' অভিনীত হয়।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠা

গড়বেতা (মেদিনীপুর): শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গত ১৮ই এবং ১৯শে মার্চ দুইদিনব্যাপী মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার প্রাতে মঙ্গলারতির পর ঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা সহকারে নাম সংকীর্তন করিয়া নগর পরিক্রমা করা হয়। বেলা ৮ ঘটিকায় স্বামী পরমেশ্বরানন্দ, স্বামী মহেশ্বরানন্দ ও স্বামী শৈলানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ মন্দিরে প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। পরে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১২টায় স্বামী মহেশ্বরানন্দ কথামৃত পাঠ ও আলোচনা করেন। বেলা ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ৮,০০০ নরনারায়ণ বসিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন ও ভজন হয়।

রবিবার অপরাহ্নে স্বামী মহেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি মহতী ধর্ম-সভায় স্বামী মহানন্দ প্রধান বক্তা ছিলেন।

কার্যবিবরণী

সেবাপ্রতিষ্ঠান (কলিকাতা): রামকৃষ্ণ মিশন 'সেবা-প্রতিষ্ঠানে'র ১৯৫৯-৬০ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ১৯৩২ খৃঃ জুলাই মাসে 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান' নামে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৭ খৃঃ কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া নাম পরিবর্তিত হয়। দক্ষিণ কলিকাতার ৯৯, শরৎ বসু রোডের পার্শ্বে প্রায় ৫ বিঘা জমির উপর সেবাপ্রতিষ্ঠানের এই বিভাগগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে: স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুদিগের জন্য সাধারণ হাসপাতাল, প্রসূতি-সদন, পরিষেবা ও ধাত্রীবিদ্যা কেন্দ্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত লেবরেটরি, এক্স-রে প্ল্যাণ্ট, বৈদ্যুতিক লন্ড্রি, সার্জিক্যাল ইউনিট প্রভৃতি এখানে আছে। সেবাপ্রতিষ্ঠানের মোট শয্যাসংখ্যা ২১০ (৭০টি ফ্রি); আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে ৫,৭১৮ রোগী ভর্তি হয়, তাহার মধ্যে ৪৭% ফ্রি চিকিৎসিত হয়। বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৮,৭০৪ (নূতন ১৫,৫০৭)। আলোচ্য বর্ষে পরিষেবা (nursing) ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ৯১; ১৫ জন ধাত্রীপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিযুক্ত হইয়াছে।

আসানসোল: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কর্মধারা প্রধানতঃ শিক্ষাধর্মসংস্কৃতি ও সেবাকে কেন্দ্র করিয়া।

১৯৫৮ ও '৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রম কর্তৃক শিল্প-বিজ্ঞান-কলা-বিভাগ সমন্বিত একটি বহুমুখী বিদ্যালয় ও একটি জুনিয়র বেসিক স্কুল পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রসংখ্যা ৭৩০ ও ৮৫০। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রতি বর্ষেই প্রশংসনীয়; '৫৮ খৃঃ ১০০% উত্তীর্ণ।

আশ্রম-ছাত্রাবাসে ১৬জন ছাত্র ছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে অপর একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হইতেছে, এখানে ৫ম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণীর ৩৫জন ছাত্র থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

আশ্রমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বাধীনতা-দিবস, নেতাজী-দিবস রবীন্দ্রজয়ন্তী প্রভৃতিও ছাত্রেরা সভাসমিতির মাধ্যমে মহা উৎসাহে উদ্‌যাপন করে।

১৯৫৯ খৃঃ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বর্ধমানের বিভিন্ন গ্রামে রিলিফ করা হয়। ঘূর্ণিবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে পুনর্বাসনে সাহায্য দেওয়া হয়। আশ্রম রিলিফ কমিটি ১৫.১২.৫৯ পর্যন্ত ১২৭টি গ্রামে দুঃস্থদিগকে সাহায্য বাবদ ৪৫,৮৬৭ টাকা ব্যয় করিয়াছে এবং ১১,০০০ টাকার জিনিসপত্র বিতরণ করিয়াছে।

ভুবনেশ্বর : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৫৭—'৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ১৯১৯ খৃঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কর্তৃক এই পুণ্যতীর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয়। তদবধি নিয়মিত পূজা, পাঠ, ধর্মালোচনা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। জনসাধারণের সেবাকল্পে মিশনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ খৃঃ। দাতব্য চিকিৎসালয়ে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষগুলিতে মোট ৬৫,২৮৫ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। ১৯৫৯ খৃঃ ফ্রি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫১ জন ছাত্র এবং ৬৪ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে। ১৯৫৮ খৃঃ কপিলেশ্বরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১৭৯ পরিবারকে বস্ত্র, চাল ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করা হয়।

ভুবনেশ্বর ওড়িয়্যার নূতন রাজধানী, এখানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। মিশন-কর্তৃপক্ষের এখানে একটি আদর্শ বিদ্যার্থি-ভবন স্থাপনের পরিকল্পনা আছে, যাহাতে স্থানীয় ছাত্রবৃন্দ অধ্যয়নানুকূল পরিবেশে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনে সুস্থ সবল হইয়া উঠিতে পারে।

গ্রন্থাগার-উদ্বোধন

গত ৩রা এপ্রিল ৫নং ডিহি ইণ্টালি-স্থিত কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রমের নবনির্মিত ভবনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের উদ্বোধন করেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব ডক্টর ডি. এম. সেন। এই গ্রন্থাগারে সংস্কৃতি-বিষয়ক সুনির্বাচিত গ্রন্থ রাখা হইতেছে।

অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন : বিনা চাঁদায় স্থানীয় জনসাধারণ এই পাঠাগারে পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থাদি অধ্যয়নের সুযোগ পাইবেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র

কেন্দ্রাধ্যক্ষ : স্বামী নিখিলানন্দ ; সহকারী : স্বামী বুধানন্দ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং রাজযোগের ক্লাসও যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসেম্বর, '৬০ : হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার দুইটি প্রধান প্রবাহ ; পরিবেশের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করা যায় ; শ্রীশ্রীমা ; দেবমানব খৃষ্ট।

জানুআরি, '৬১ : হিন্দু বলিতে কি বুঝায় ? সরল বিশ্বাসই জয়লাভ করে ; স্বামী বিবেকানন্দের অনুশীলিত ও প্রচারিত হিন্দুধর্ম ; ব্যক্তিগত দোষ কিরূপে দূর করা যায় ? ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা ; ভগবানের নামের শক্তি ; হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ও তাহার অদৃষ্ট ; আধ্যাত্মিক জীবনে সময়ের মূল্য ; হিন্দুর জীবন-চিত্র।

ফেব্রুআরি : দুঃখেরও ফল আহরণ কর ; হিন্দুবিবাহের আদর্শ ; ক্ষুদ্র বিষয় ও অধ্যাত্ম জীবন ; হিন্দুর ত্যাগাদর্শ ; ভগবদ্গীতা ; ধ্যানের প্রণালী ; শ্রীরামকৃষ্ণ কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

পাণ্ডু ঃ বিগত ১১ই ও ১২ই মার্চ পাণ্ডুতে বিবেকানন্দ পাঠচক্র-প্রাঙ্গণে পাণ্ডু শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব-সমিতির উদ্যোগে ডেপুটী চীফ্ ইঞ্জিনিযার শ্রীবিজনকুমার মিত্রের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। প্রভাতফেরী, মঙ্গলারাত্রিক ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীতে উৎসবের শুভারম্ভ হয়। সরল ভাষায় গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ। দ্বিপ্রহরে ছাত্রদের প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। বৈকালিক একটি সভার অনুষ্ঠানে শ্রীবি. ডি. গৌর রেলওয়ে অফিসার ও কর্মচারী সমেত প্রায় সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। সভায় ইংরেজীতে স্বামী ভব্যানন্দ, হিন্দীতে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ এবং বাংলায় স্বামী মহানন্দ বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিনে স্বামী চণ্ডিকানন্দ-রচিত সারদা-লীলাগীতি সকলকে মুগ্ধ করে। পালাকীর্তন ও বরগীতে সারাদিন উৎসব আনন্দ-মুখরিত থাকে। প্রায় ১৫,০০০ লোককে প্রসাদ দেওযা হয়। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

হীরাকুদ (সম্বলপুর)**ঃ** শ্রীরামকৃষ্ণ-সমিতি কর্তৃক ১৯শে ও ২১শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে মার্চ সারাদিনব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানে উৎসব-স্থান মুখরিত থাকে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, রামলীলা-কীর্তন হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ২,৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে শ্রীপ্রফুল্লকুমার ত্রিপাঠীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীঅচ্যুতানন্দ পুরোহিত ওড়িয়া ভাষার মাধ্যমে বক্তৃতা দিলে পর স্বামী আপ্তকামানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিশেষত্ব' সম্বন্ধে ভাষণ দেন

আরারিয়া (পূর্ণিয়া)**ঃ** শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুআরি এবং ১১ই ও ১২ই মার্চ পূজা-পাঠ, কীর্তন-ভজন, নারায়ণসেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী অনুপমানন্দ, স্বামী পরশিবানন্দ এবং শ্রীহরিলাল ঝা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

ছাপরা (বিহার)**ঃ** স্থানীয় কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ২৩শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের অধ্যক্ষতায় সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হয়। সভায় বাঙালী বিহারী প্রায় ২০০ শত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ভজন গান হয়। গীতা এবং উপনিষদ্ পাঠের পর ডাঃ শ্রীশিবদাস সুর হিন্দীতে ঠাকুরের সারগর্ভ বাণী আলোচনা করেন। বক্তৃতাশেষে ভজন, আরতি ও সর্বশেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ইছাপুর ঃ হরিসভার সভ্যবৃন্দ কর্তৃক গত ১৮ই ও ১৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রভাতফেরী, পূজা, হোম, কালীকীর্তন ও 'মানুষের ঠাকুর' অভিনয় হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম দিন অপরাহ্ণে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীবিজয়গোপাল বিশ্বাস।

কদমতলা (হাওড়া)**ঃ** শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন সঙ্ঘ কর্তৃক গত ১৭ই হইতে ১৯শে ফেব্রুআরি দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, শোভাযাত্রা, অভিনয় প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় স্বামী সুশান্তানন্দ সভাপতিত্ব করেন।

রাজারহাট-বিষ্ণুপুর : গত ১০ই হইতে ১২ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের ৯৮তম শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে তদীয় পুণ্য জন্মস্থান রাজারহাট-বিষ্ণুপুরস্থিত আশ্রমে অষ্টম বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-মাহাত্ম্য' কীর্তন, কালীকীর্তন, ভজন, গীতাপাঠ, সঙ্গীত সহযোগে 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ এবং কলিকাতার বহু ভক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত জনসভায় স্বামী জীবানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের তাৎপর্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌধুরী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-তত্ত্ব' বিশ্লেষণ করেন।

গ্রন্থাগার-ভবনের উদ্বোধন

বহরকুলি (বর্ধমান) **:** গত ১২ই ফেব্রুআরি এক মনোরম পরিবেশের মধ্যে শ্রীগদাধর গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী অভজানন্দ। ইহার পর আয়োজিত সভায় বর্ধমান জেলা সমাজ-শিক্ষাধিকারিক শ্রীগৌরাঙ্গকান্তি চট্টোপাধ্যায় ও কালনা মহকুমাশাসক শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার-আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সময়োচিত ভাষণ প্রদান করেন।

অপরূপ স্থাপত্য শৈলী

সম্প্রতি কর্ণসুবর্ণে একটি অপরূপ স্থাপত্য-কর্মের সন্ধান মিলেছে। চুন দিয়ে প্রস্তুত গুপ্ত-যুগের এক দেবময় মুখমণ্ডল।

কর্ণসুবর্ণের বর্তমান নাম রাঙামাটি। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহর থেকে মাইল ছয়েক দূরে।

সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং ভারতে অনেক বৌদ্ধ সংঘ দেখেছিলেন। এমনি একটি বিশিষ্ট সংঘ ছিল লো-তো-মো-চি বা রক্তমৃত্তিকায়। রক্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটি শুধু রাজা শশাঙ্কের শাসনকেন্দ্র নয়, সমগ্র গৌড়বাসীর অতি প্রিয় নগরী ছিল। এখান থেকেই গুপ্তযুগে সুদূর প্রাচ্যের পথে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে দুঃসাহসী নাবিকের দল।

আজ কত শত বছর পরে সেই কর্ণসুবর্ণেই স্থাপত্যকর্মের সুন্দর একটি নিদর্শন মিলেছে। লাবণ্যঘন মুখমণ্ডলটির নিম্বপত্রাকৃতি অর্ধ-নিমীলিত আঁখি, স্ফুরিত অধরোষ্ঠ ও ভূষণময় কর্ণ একদিকে যেমন গুপ্তযুগের শিল্পশৈলীর পরিচয় দেয়, তেমনি বাংলা দেশের কোমলতার ছাপও এতে সুস্পষ্ট।

বিশেষজ্ঞদের মতে অজন্তা গুহা-চিত্রের বোধিসত্ত্বের সহিত এই মুখমণ্ডলের বিশেষ মিল রয়েছে। বোধিসত্ত্বের মুখমণ্ডলে যে স্বর্গীয় প্রশান্তি ও মহত্ত্ব দৃষ্ট হয়, গুপ্তযুগের এই নবপ্রাপ্ত স্থাপত্যের মধ্যেও তা পূর্ণভাবে প্রকাশিত।

[আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে সংকলিত]

সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম

নিয়ত শান্তভাব অবলম্বন ও সাধুসংসর্গ অপেক্ষা গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম কিছুই নাই। পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধিলাভ, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, ঈর্ষাপরিত্যাগ, দান, ব্রাহ্মণের সৎকার, পরিষ্কৃত আবাসে অবস্থান, অভিমান ও কপটতা পরিত্যাগ, প্রিয়বাক্য-বিন্যাস, অতিথিসৎকারে অনুরাগ ও পরিজনদিগের ভোজনের পর ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথিদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, শয্যা, দীপ ও আশ্রয় প্রদান করেন, তিনি পরম ধার্মিক। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও আচমনপূর্বক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহাকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করা গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম। দিবারাত্রি ধর্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থের পরম ধর্মলাভ হয়। যে ধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম কহে। গৃহস্থগণ ঐ ধর্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী। ঐ ধর্মপ্রভাবে সকলেরই উপকার হইয়া থাকে; সাধ্যানুসারে দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুণ্যজনক কার্যের সাধন ও ধর্মপথ অবলম্বনপূর্বক অর্থ উপার্জন করা প্রবৃত্তিলক্ষণ-ধর্মাবলম্বী গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। ধর্মলব্ধ ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যত্নপূর্বক তাহার একাংশ দ্বারা ধর্মসঞ্চয়, এক অংশ উপভোগ ও এক অংশের বৃদ্ধিসাধন করা তাঁহার সর্বতোভাবে বিধেয়।

যে ধর্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ-ধর্ম কহে। এক রাত্রির অধিককাল এক গ্রামে বাস না করা এবং সমুদয় জীবের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও আশাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা নিবৃত্তি-ধর্মাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্তব্য। কমণ্ডলু, উদক, পরিধেয় বস্ত্র, আসন, ত্রিদণ্ড, শয্যা, অগ্নি ও গৃহে মমতা করা তাঁহাদের কদাপি কর্তব্য নহে। তাঁহারা বীতস্পৃহ, স্নেহাদিবন্ধন-বিমুক্ত ও সংযতচিত্ত হইয়া সর্বদা বৃক্ষমূল, শূন্যগৃহ ও নদীতীর প্রভৃতি নির্জন স্থানে অবস্থানপূর্বক পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবেন। সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনপূর্বক নিরাহার ও স্থাণুস্বরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া আত্মচিন্তা করিলে ঝটিতি মোক্ষলাভ হয়। এক গ্রামে বা এক নদীতীরে অনেকদিন অবস্থান করা সন্ন্যাসীর কদাপি কর্তব্য নহে। মোক্ষার্থী সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বেদোক্ত ধর্ম অতি সৎপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি এই পথে পদার্পণ করেন, তাঁহাকে কখনই সংসারসাগরে মগ্ন হইতে হয় না। মোক্ষধর্মাবলম্বীরা কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহাদের মধ্যে কুটীচক অপেক্ষা বহূদক, বহূদক অপেক্ষা হংস ও হংস অপেক্ষা পরমহংস শ্রেষ্ঠ। এই নিবৃত্তিধর্ম অপেক্ষা সুখ দুঃখ জরা মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছুই নাই।

[মহাভারত অনুশাসন পর্ব, ১৪১তম অধ্যায় হইতে]

একটি 'আধ্যাত্মিক' ধর্ম

ধর্মকে অস্বীকার করিলেও জীবনকে অস্বীকার করিয়া আমরা জীবনযাপন করিতে পারি না। জীবন কি ভাবে যাপন করিব? কেন এ জীবন?—এই সব প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানেই ধর্ম আবার ফিরিয়া আসে এবং জীবনের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা বলিয়া থাকি—জীবন গঠন করিতে হইবে, জীবনে উন্নতি করিতে হইবে; তখনই প্রশ্ন ওঠে—জীবন কি? কিভাবে জীবন গঠন করিব, কি করিলে জীবনে প্রকৃত উন্নতি হয়? আধুনিক চিন্তার বিচারে বলা যায়, জীবন একটি শিল্প,—বোধ হয় শ্রেষ্ঠ শিল্প, সূক্ষ্মতম শিল্প।

এখন একটি শিল্পকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে যেমন বাহিরের উপাদান প্রয়োজন, তেমনই সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রয়োজন, সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন শিল্পবিষয়ক জ্ঞান ও বিজ্ঞান—তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক (Theoretical and Practical) জ্ঞান।

জীবন-শিল্পের উপাদান প্রবহমান সময় বা কাল; প্রতিটি মুহূর্ত, দিন, বৎসর—ইহারাই এই সূক্ষ্মতম শিল্পের উপাদান। পরিকল্পনা নির্ভর করে ভবিষ্যৎ চিন্তার উপর। এই ভবিষ্যৎ লইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছে। তাহাই পরিশেষে ধর্মের আকার ধারণ করিয়াছে। ধর্ম লইয়া মতভেদ যতই থাকুক, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে বিস্তৃত মানুষের একটি সত্তা সকলেই স্বীকার করেন এবং ভবিষ্যৎকে বাদ দিয়া মানুষ জীবনগঠনের কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করিতে পারে না। ধর্মই সেই বিজ্ঞান, যাহার সহায়ে আমরা জীবন গঠন করি।

ধর্মকে বিজ্ঞান বলিয়া বুঝিবার পূর্বে অবশ্যই দেখিতে হইবে, ধর্মের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না? তৎপূর্বে আরও জানিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলিতেই বা আমরা কি বুঝি।

সাধারণত বিজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতির কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া কতকগুলি চিরন্তন নিয়ম আবিষ্কার করে; এবং ব্যাবহারিক বিজ্ঞান-সহায়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছামত প্রকৃতিকে সেই পথে চালিত করিয়া মানুষ নিজের দুঃখদুর্দশার লাঘব করিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম আছে বলিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত যে, প্রাকৃতিক ঘটনা-বলী পুনরাবর্তিত হইবে। ধর্ম সম্বন্ধেও এরূপ নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় কি? তাহার উত্তর: ধর্মকে যাঁহারা বিজ্ঞানরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—বহিঃপ্রকৃতির মতো অন্তঃপ্রকৃতিও একই পরিবেশে একই প্রকার ব্যবহার করিবে, তবে এ ক্ষেত্রে একই প্রকার পরিবেশ সৃষ্টি করা কঠিনতর। এই পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যই মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা ও বিশ্বাসপূর্বক ধর্মাচরণ।

একটি বৃহৎ শিল্প-ব্যাপারে প্রতিটি মজুর বা কেরানি জানে না সেই শিল্পের সূক্ষ্ম দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবলী, সে জানে—তাহাকে তাহার কর্তব্যটুকু করিয়া যাইতে হইবে, তাহাতেই তাহার নিজের উন্নতি, এবং সমষ্টিরও উন্নতি। বিশ্বাসমূলক ধর্মগুলির সার্থকতা এই দৃষ্টিতেই দেখিতে হইবে।

জীবন-পরিকল্পনায় ধর্ম বা কর্তব্য কর্মের স্থান সর্ব প্রথম, এখানে বিশ্বাসই বড় কথা, তবে বিশ্বাসই ধর্মের বা জীবন-বিজ্ঞানের শেষ কথা নয়। শিশুকে শিক্ষা দিবার সময় কল্যাণময়ী জননী তাহাকে বিধিনিষেধই শিক্ষা দিয়া থাকেন, বলেন: এইরূপ করিও, এই দ্রব্য খাইও, সুখ পাইবে; এইরূপ করিও না, এই দ্রব্য খাইও না, দুঃখ পাইবে! ইহাই ধর্মের আদি পর্ব। শিশুকে যদি প্রত্যক্ষভাবে সব কিছু বুঝিয়া করিতে হয়, তবে শৈশবেই একদিন তাহার জীবনের পূর্ণচ্ছেদ ঘটিবে।

লৌকিক কত ব্যাপারে আমরা কোন যুক্তিতর্ক না করিয়া শুধু বিশ্বাসবলেই চলিযাছি, পথিকের কথা শুনিযাই তো অল্প সময়ে অধিক পথ অতিক্রম করিয়া থাকি, ধর্মের ব্যাপারেই বা অন্যরূপ হইবে কেন? তবে একথা ঠিক নয় যে, ধর্মের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নাই। শিশু যেমন বড় হইযা বুঝিতে পারে, কেন তাহার মা তাহাকে কতগুলি কাজ করিতে বলিয়াছেন এবং কতগুলি নিষেধ করিয়াছিলেন, তেমনি মানুষ ধর্মজীবনে অগ্রসর হইয়া বিধিনিষেধের তাৎপর্য বুঝিতে পারে। বিধিনিষেধই ধর্ম নয়, ইহা সুস্থ জীবনের প্রস্তুতিমাত্র।

প্রতি ধর্মেই কতগুলি রীতিনীতির উপর জোর দেওয়া হয়। তাহার সাহায্যে শরীর, মন, পরিবার, সমাজ সুগঠিত হয়। এই রীতিনীতিগুলি আবার পুস্তক-কেন্দ্রিক, অর্থাৎ একটি ধর্মগ্রন্থকে সকলে স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী জীবন গঠন করে। আরও দেখা যায়, সেই ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে একটি আদর্শ পুরুষকেও সকলে মান্য করে এবং তাঁহার নির্দেশে জীবনপথে চলিয়া থাকে। সুসংগঠিত সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির ইহাই ভিত্তি।

সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবনের প্রথম ভাগে এই ধর্মগ্রন্থ ও আদর্শ পুরুষ একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও—এই পুস্তক-কেন্দ্রিক, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বা সাম্প্রদায়িক ভাবই ধর্মের শেষ কথা নয়। চারাগাছের জন্যই বেড়া প্রয়োজন, মহীরুহ বেড়া ভাঙিয়া আকাশে বিস্তৃত হয়; 'চার্চের মধ্যে জন্ম অবশ্যই ভাল, কিন্তু তাহার মধ্যে মৃত্যু কখনই কাম্য নয়।' সম্প্রদায়ের স্নেহক্রোড়ই প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত স্থান, কিন্তু সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা পরিণত মনীষাকে বা উন্নত সাধককে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

এইখানেই শুরু হয় ধর্মজীবনের দার্শনিক স্তর। পৃথিবীতে প্রচলিত ও প্রচারিত অধিকাংশ ধর্মই পুস্তক-কেন্দ্রিক ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। অনুভূতির উষ্ণতা কমিয়া গেলে ক্রমশঃ এগুলি আচারপ্রধান কঠিন আকার ধারণ করে; বিচারপ্রধান মন তখন বাহির হয় ধর্মের আর একটি ঊর্ধ্বতর বিকাশের সন্ধানে—যেখানে পুস্তক নাই, ব্যক্তি নাই, সম্প্রদায় নাই; আছে এক উদার গভীর অনুভূতি, যাহা বিশ্বজনীন, সার্বকালিক। ভারতের ধর্মসাহিত্যেই পাওয়া যায় এই ক্রমবিকাশের এক যুক্তিপূর্ণ ইতিহাস।

জীবন-পরিকল্পনায় চতুর্বর্গ ও চতুরাশ্রমের বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, 'ধর্ম'ভিত্তিক 'অর্থ-কাম' ভোগের পর 'মোক্ষে'র লক্ষ্যে অগ্রসর মানুষের জীবনে কর্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড—ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস আপনি আসিত। আজীবন বেদবিধি মানিয়া চলিবার পরই বেদান্ত-সাধকের অধিকার জন্মে বেদবিধি লংঘন করিবার। সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বেদ নিজেই বলিতেছেন, 'তত্র বেদা অবেদা ভবন্তি'।

ঊর্ধ্বস্তরের এই ধর্মকে যে কি বলা সঙ্গত, তাহা আমরা জানি না। সাধারণত ইহাকে

আমরা আধ্যাত্মিকতা (spirituality) বলিয়া বুঝি। শরীর-মনে অধিষ্ঠিত আত্মা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-সহায়ে নিজের স্বরূপ নিজে উপলব্ধি করেন, বেদান্ত এই সাধনারই নির্দেশ দিতেছেন। বেদান্তের এই সাধনা কোন দেশে কালে বা ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। যে কেহ শ্রদ্ধাপূর্বক এই সাধনায় অগ্রসর হইবে, সাধনার শেষে সেই অনুভব করিবে: আমি একটি শরীরমাত্রে আবদ্ধ নই, একটি মনের চিন্তায় বা কোন মতের মধ্যে বন্দী নই ; আমি মুক্ত, আমার আত্মা সকলের মধ্যে বিস্তৃত ; অথবা 'নানা' বা 'সকল' বলিয়া কিছু নাই, অদ্বিতীয় এক চৈতন্য সত্তাই নানাভাবে প্রতীয়মান—সমুদ্র যেমন তরঙ্গাকারে দেখা যায়।

অদ্বৈত বেদান্তের এই উচ্চতম শিখর হইতেই আমরা ধর্মের বিভিন্ন স্তরকে যথাস্থানে দেখিতে পাই এবং বুঝি মানবজীবনের ও মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের গতিপথে প্রত্যেকটিরই মূল্য আছে, তবে মূল্যমাত্রই আপেক্ষিক। অদ্বৈত বেদান্তের এই ব্যাপক দৃষ্টির বলেই আমরা সকল ধর্মের মর্ম বুঝিতে পারি। বেদান্তই সকল ধর্মের মধ্যে ঐক্যসূত্র উপলব্ধি করিয়াছে ; এবং যেহেতু বিজ্ঞানের লক্ষ্য ঐক্যানুভূতি, সেদিক দিয়া আমরা বেদান্তকে 'ধর্মের বিজ্ঞান' আখ্যা দিতে পারি। বেদান্তই ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, বেদান্তই ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা। ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান—মনের এই ত্রিধারা বেদান্ত-প্রয়াগে মিলিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে মানবতার সাগর-সঙ্গমে। বেদান্তই ধর্মের শুদ্ধ আধ্যাত্মিক রূপ, যাহা দেশ-কাল ব্যক্তি-পুস্তক—সব কিছু স্বীকার করিয়াও সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে।

এই বেদান্তের সাহায্যেই আমরা সকল ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি, বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণ কেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলিয়াছেন ; বুঝি, তাঁহাদের লক্ষ্য এক—সে লক্ষ্য মানুষের বন্ধনমুক্তি—দেহমনের বন্ধনমুক্তি, স্বার্থসীমার বন্ধনমুক্তি ! বেদান্ত-সহায়েই আমরা বুঝিতে পারি—'শেষে সব শেয়ালের এক রা'। অনুভূতির চরম শিখরে সকল সাধকই এক কথা বলিয়াছেন, তখন ভাষার বিচিত্রতা থাকিলেও ভাবের বিভিন্নতা নাই।

দেশকাল-নিরপেক্ষ এই বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal Eternal Religion) সহসা কোন দিন কাহারও দ্বারা প্রবর্তিত হয় নাই। ইহা কোন ঐতিহাসিক ধর্ম (Historical religion) নয়, তা বলিয়া ইহা প্রাকৃতিক বা আদিম ধর্মও (Primitive natural religion) নয়, ইহা কঠোর সাধনসাপেক্ষ। প্রতিপদে অন্তর্বহিঃ-প্রকৃতিকে জয় করিয়া এ পথে অগ্রসর হইতে হয়।

মহাপুরুষের আদেশ ও গ্রন্থের নির্দেশ অবলম্বন করিলেও ইহা কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা গ্রন্থকেন্দ্রিক ধর্ম (Person- or Book-centred) নয়। এই ধর্ম সংঘবদ্ধ ভাবে প্রচার করিয়া সকলের উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় না, ইহা Organized religion নয়, অথচ মানব-মনের ক্রমবিকাশের ফলে সকলকেই শেষে ইহার দেহলী অতিক্রম করিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে হইবে।

বেদান্তই সেই আধ্যাত্মিক ধর্ম (Spiritual Religion) যাহার সন্ধানে আমরা বাহির হইয়াছি। জীবনের বিজ্ঞান ধর্ম, ধর্মের বিজ্ঞান বেদান্ত (Science of religions). বেদান্তের দৃষ্টিতেই আমরা বুঝি—জীবন কি, জীবন কেন ; বুঝি—কি ভাবে জীবন গঠন করিতে হইবে, কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে।

২৫শে বৈশাখ

'চির নূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ' —এ ডাক শুধু শতবর্ষ পূর্বে একটি জীবনারম্ভের ঘোষণা নয়, এ ডাক রবির উদয়-লগ্নে জাগরণের আহ্বান, পতন-অভ্যুদয়ের পথে নবতম উদ্যমের আহ্বান; এ ডাক সীমা হইতে অসীমের অভিযানে, জানা হইতে অজানার সন্ধানে। এ ডাক চিত্তে চিত্তে সঞ্চারিত করিয়া যায় জাগরণের শিহরণ, নবজীবনের স্পন্দন! এ ডাক 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা দিয়া যায়, 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' আশা ধ্বনিয়া তোলে। এ ডাক দূর-দূরান্তরের মধ্যে, বিচ্ছিন্ন বিভেদের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করে। এই ডাকই আজ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর উৎসব-আয়োজনে।

উৎসবের আনন্দ-কোলাহলে আমরা যেন এ ডাকের অন্তর্নিহিত অর্থ ভুলিয়া না যাই। যুগে যুগে দেশে দেশে কত কবি জন্মগ্রহণ করিয়া সমসাময়িক জীবনের সুখদুঃখ ব্যথাবেদনা অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়া আপন প্রাণের একতারায় কত গান গাহিয়া যান, কিছুকাল প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহারা কোথায় মিলাইয়া যায়। দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি।

রবীন্দ্রনাথকে লইয়া অধিকতর গর্ব ও গৌরব করিবার অধিকার বাঙালীর স্বাভাবিক, সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মনে রাখিতে হইবে, রবীন্দ্র-ভাবধারার মূলপ্রবাহটি বহন করিয়া লইয়া যাইবার দায়িত্বও তাহার সমধিক। যে বিশ্বমানবতার উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথ, তাহার ভিত্তি রাজনীতিক আন্তর্জাতিকতা নয়, তাহা মানুষের আত্মার আত্মীয়তার বহিঃপ্রকাশ।

আজকাল যখন চারিদিকে মুখে আন্তর্জাতিকতার বক্তৃতা, মনে প্রাদেশিকতার চিন্তা; মুখে স্বদেশীয় ঐতিহ্যের গৌরব-গবেষণা, মনে বিদেশীয় সভ্যতার মোহমদিরা, তখন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ-ভাবে অনুভূত হয়।

রবীন্দ্র-জীবন অনুধ্যান করিয়া আমরা বুঝিতে পারি, তাঁহার জীবনের প্রথম ও প্রধান আবেদন আধ্যাত্মিক, তাহারই আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার জীবন-শতদল। জীবনের কোন কিছুকে অস্বীকার করিয়া নয়, সুখদুঃখ-আনন্দবেদনাময় সমগ্র জীবনকে গ্রহণ করিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে কবির হৃদয়ের গভীর বাণী।

এক আধ্যাত্মিক চেতনাকে কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হইয়াছে তাঁহার মানবিক বেদনা, তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার জাতীয় জাগরণের উদ্দীপনা, জাতীয়তাবোধের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াই তিনি গাহিয়াছেন বিশ্বমানবের জয়গান।

সঙ্গীত, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ধর্মোপদেশ—রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্তরে স্তরে সজ্জিত; সেগুলিকে অবহেলা করিয়া শুধু নৃত্যনাট্যের মায়াজালে আমরা যেন প্রকৃত কবিকে হারাইয়া না ফেলি। কুসুমকোমল কবি-চিত্তের অভ্যন্তরে যে বজ্রকঠিন ধাতু রহিয়াছে, ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিপৎকালে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া আমরা যেন বিপদ অতিক্রম করিতে সক্ষম হই, রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি যেন আমাদিগকে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার প্রেরণা জোগায়।

বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

[জাতির শিক্ষাদর্শ-রূপায়ণে বেলুড়ে একটি অভিনব পরিকল্পনা]

শিক্ষার যথার্থ ভিত্তি কি, তাহা নির্ধারণ করিতে গিয়া আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: অধ্যাত্মশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা এই দুইটির নিয়ন্ত্রিত সমবায়েই প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি গড়িয়া উঠে। ভারতের প্রাচীন চিন্তাসম্পদকে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে পুনঃসংস্থাপিত করিবার জন্য তিনি এমন একটি শিক্ষার রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, যাহা একদিকে যেমন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির অভিনব গুণগুলিকে গ্রহণ করিবে, তেমনি শ্রদ্ধা জ্ঞানানুশীলন ও নীতিধর্ম প্রভৃতি ভারতীয় জীবনের সনাতন আদর্শগুলিকে সবার ঊর্ধ্বে সন্নিবিষ্ট করিয়া ব্যক্তি-জীবনের প্রতিটি কেন্দ্রকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করিবে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন: জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে সুসম্বদ্ধ করিতে হইলে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সাফল্যসমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা-পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যাকে সংযোজিত করা হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বহু ঈপ্সিত বিশ্ববিদ্যালয়কে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া উহারই আংশিক বাস্তব রূপায়ণ হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ ১৯৪১ খৃঃ বেলুড় বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিক্ষায়তনটি এতদিন অভাবনীয় সফলতার সহিত আবাসিক মাধ্যমিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান কলেজ হিসাবে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে এবং উহার পরিবিস্তৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় হওয়ায় ১৯৬০ জুলাই হইতে ইহাকে ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। বর্তমানে ইহার কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বি. এ. ও বি. এস-সি. বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং সুদক্ষ অধ্যাপকগণের সাহায্যে এখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে:

ইংরেজী	(পাস ও অনার্স)	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	(পাস)
বাংলা	(আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক, পাস)	দর্শন	(পাস)
সংস্কৃত	(পাস ও অনার্স)	গণিত	(পাস ও অনার্স)
ইতিহাস	(,,)	পদার্থবিদ্যা	(,,)
অর্থনীতি	(,,)	রসায়নবিদ্যা	(,,)

এই ত্রৈবার্ষিক কলেজটির সহিত একটি সুবৃহৎ পাঠাগার, সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, সুন্দর ছাত্রবাস প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও যুক্ত করা হইয়াছে।

আগামী ১৯৬৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষজয়ন্তীর স্মারক হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ 'বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে'র উদ্বোধন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

[উপরি-উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিয়াছেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজী। রামকৃষ্ণ মিশনের অপরাপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মতো প্রস্তাবিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও সফল হইয়া জাতির শিক্ষার প্রগতিকে আরও অগ্রগামী করিবে সেবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এইরূপ মহতী প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। উঃ সঃ]

চলার পথে

'যাত্রী'

'আঘাতের বদলে আঘাত হানো'; এ কথা যে ব'লল, সে জীবমাত্র, সে মানুষ নয়; সে জীব-মানব, সে দেব-মানব নয়; সে মিথ্যা, সে সত্য নয়। তাই জড়বিজ্ঞান যখন ব'লল: প্রত্যেক কর্ম-প্রচেষ্টারই একটি সম-পরিমাণ ও বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া আছে (every action has an equal and opposite reaction), অর্থাৎ ঢিলটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হবে—তখন বুঝতে হবে, আমরা চৈতন্যময় হয়েও জড়বিজ্ঞানের নিষ্প্রাণ আইনে আটকে গেছি। দাঁতের বদলে দাঁত (tooth for a tooth), চোখের বদলে চোখ (eye for an eye)—এ সব কথা ঐ জীব-মানবই বলতে পারে। আর দেব-মানবের কণ্ঠে তখন জাগবে—আসিসীর সেণ্ট ফ্রান্সিসের ভাষায়: হে ভগবান, আমাকে তোমার শান্তির যন্ত্র ক'রে তোলো। যেখানে ঘৃণা সেখানে তা প্রেমে মুছে দিতে দাও; যেখানে আঘাত সেখানে আমায় ক্ষমাসুন্দর করো; যেখানে সন্দেহ সেখানে বিশ্বাস আনতে দাও; যেখানে হতাশা সেখানে যেন আশার আশ্বাস পৌঁছে দিই; যেখানে অন্ধকার সেখানে যেন আলোর বারতা আনি; যেখানে বিমর্ষতা সেখানে যেন আনন্দের আবাহন জাগিয়ে তুলি।

খুব খারাপ অবস্থাতেও খাঁটি মানুষ নীচ হ'তে পারে না—কর্পূরকে জ্বালালে সে কি তার সুবাস ছড়ায় না? ধূপকে পোড়ালে সে কি চৌদিকে গন্ধ ঢেলে দেয় না? দীপকে অগ্নিদগ্ধ করলেও সে কি আলোকের আনন্দে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত ক'রে তোলে না? তোলে। আর এই তোলে বলেই জড়ত্বের কুণ্ঠিত দীনতার আগল ভেঙে আমার আনন্দঘন প্রাণশিখাটি অবাধ ও অসীম হয়ে ওঠে।

গল্পে আছে: এক সাধু নদীতে স্নান করছেন, এমন সময় দেখলেন, একটি কাঁকড়াবিছা জলে ভেসে যাচ্ছে। সাধু তাকে জল থেকে তুলে ডাঙায় ছেড়ে দিলেন, সে কিন্তু ঐ সাধুর হাতে হুল ফোটালো। সাধুটি যন্ত্রণায় কাতর হলেন। বিছাটা আবার জলে পড়ে গেল, আবার তিনি তাকে তুলে দিলেন। এবারও বিছাটা তাঁকে কামড়ালো। আর একজন লোকও সেই সময়ে নদীতে স্নান করছিলেন। তিনি সাধুকে ঐ ভাবে যন্ত্রণা পেতে দেখে বললেন, 'কেন আপনি ওকে বাঁচাতে গেলেন? ও যে আপনাকে কামড়ে শেষ করছে?' উত্তরে সাধু বললেন, 'ও সামান্য জীব হয়েও ওর স্বভাবমত কাজ করছে, আর আমি বিবেকবান্ মানুষ হয়ে আমার স্বভাব ভুলে যাব?'

আমাদের 'স্বধর্মেই' এই নীতিবোধটিকে কিন্তু আমারা এই জড়বিজ্ঞানের যুগে হারাতে বসেছি, পরিবর্তে কেমন এক বিচার-বিশ্লেষণহীন স্থাবর আনন্দে আমরা বুঁদ হয়ে আছি—এতে ঝিমিয়ে পড়ার মাদকতা আছে, কিন্তু ছুটে চলার উদ্দীপনা নেই। অবশ্য এর কারণও আছে। আগে গ্রীষ্মকালে টানাপাখা দিয়ে যে বাতাস ক'রত—সে ছিল মানুষ। তাই তার প্রতি করুণা দেখিয়ে কখন কখন বলেছি, 'থাক্, তোমার কষ্ট হচ্ছে।' এখন আমাদের

মাথার ওপরে বিজলী-পাখা। সেটা জড়পদার্থ। তাই তাকে করুণা করার কথাই ওঠে না। এমন ক'রে আলো-বাতাস ও অন্যান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চারিদিকে যত বেশী জড়ের সমাবেশ বেড়ে উঠছে ততই আমাদের মনেরও পক্ষাঘাত বাড়ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, কাজলের ঘরে থাকলে যতই সাবধান হও, একটু আধটু কালি লাগবেই। তাই জড়ের ঘরে বাস ক'রে জড়ের ছোঁয়া আমরা এড়াব কি ক'রে? আমাদের চারিদিক ঘিরে যদি প্রাণসত্তা স্পন্দিত হ'ত, আমরাও প্রাণবান্ হতাম; সত্যকার 'বিজ্ঞান' আলোচনার অবকাশ পেলে সেই 'বিশেষ' জানার জন্য নিশ্চয়ই ব্যাকুল হতাম। কিন্তু এখন সে সবের অভাবেই কেমন এক নিষ্ক্রিয় প্রত্যাশায় স্থবির হয়ে আমরা ক্রমেই আনন্দের স্বর্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছি। এই কথা মনে করেই টি. এস্. এলিয়ট্ বলেছেন :

'Where is wisdom we have lost in knowledge ?
Where is the knowledge we have lost in information ?
The cycles of heaven in twenty centuries
Bring us farther from God and nearer to dust.'

আমাদের মাঝে সেই জ্ঞানসত্তা কোথায়? আমরা যে জড়বিজ্ঞানের কথায় ডুবে আছি। আর জড়বিজ্ঞানই বা কি বলছি, আমরা তো কেবলমাত্র সংবাদ-সংগ্রহেই মত্ত। এই বিংশ শতাব্দীর গতিচক্রে আমরা ক্রমে ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত হয়ে ধূলায় গিয়ে পড়ছি।

সত্যি, এ একটা অদ্ভুত অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি—যেখানে আমাদের tradition যাচ্ছে হারিয়ে; মনের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হচ্ছে। অথচ কেমন এক অমানবীয় সত্তার সংস্পর্শে, এক মিথ্যা জীবন-পিপাসার নেশায় আমরা ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক ভাব-ভিত্তি থেকে নীচে নেমে যাচ্ছি। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের ভাষায়—"this is a generation which knows how to doubt, but not how to admire, much less to believe'—এ যুগে আমরা সন্দেহ করতেই শিখেছি, প্রশংসা করতে শিখিনি, আর বিশ্বাস করা তো অনেক দূরের কথা। তাইতো অন্তরের আনন্দলোক থেকে আমাদের প্রণতি স্বতই উৎসারিত হয় না।

এর কারণ আমরা যথার্থ মনুষ্যধর্ম পালন করছি না। আমরা আজ ভুলতে বসেছি, 'যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ'—যা থেকে অভ্যুদয় অর্থাৎ এই জীবনের উন্নতি হয় এবং পরে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি লাভ করি, তাকেই ধর্ম বলে। এই উদার ধর্মের সাধনাই আজকে আমাদের করতে হবে; আমাদের সত্যকার মানুষ হ'তে হবে।

চল পথিক, এ যুগের জড়ধর্মী আওতা ছেড়ে তোমার 'স্বধর্মের' আলোকে চল। মোহের কাজল মুছে মহাজীবনের সার্থকতা ও উদ্দেশ্যের পথে চল। চল সত্যকার মানুষ হবার পথে।

শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস

স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিষয়বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্যই মুমুক্ষুর পরম সাধন। ইহা ব্যতীত অন্য যাবতীয় সাধন নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে। গোস্বামী শ্রীতুলসীদাসজী বলিয়াছেন, 'বাদি বিরতি বিনু ব্রহ্ম বিচারূ'—অর্থাৎ বৈরাগ্য বিনা ব্রহ্মবিষয়ক শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বিচারাদি সকলই বৃথা। বৈরাগ্যই সাধুর প্রধান ভূষণ। ইহার অভাবেই দূষিতচিত্ত হইয়া সন্ন্যাসিগণও অতি হীন দশা প্রাপ্ত হন। আচার্য শ্রীসুরেশ্বরও অতিশয় খেদের সহিত বলিয়াছেন :

প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ।
সংন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ॥

বৃহদারণ্যক-বার্তিক—১।৪।১৫৮৪

—দেখা যায়, চিত্তগত বিষয়-ভোগবাসনা-রূপ কলুষতাবশতই বহু সন্ন্যাসী তত্ত্ববিচার-রহিত, বহির্মুখ, খল, পরছিদ্রান্বেষী ও কলহপরায়ণ। দেবতাদির সম্যক্ আরাধনা না করাতেই তাহাদের চিত্ত ঐরূপ দূষিত।

বিষয়ে দোষদৃষ্টি ও বিচারসহায়ে বৈরাগ্যের চরমোৎকর্ষ-সাধনই আশু জ্ঞানলাভের মুখ্য উপায়।

বীভৎসং বিষয়ং দৃষ্ট্বা কো নাম ন বিরজ্যতে।
সতামুত্তমবৈরাগ্যং বিবেকাদেব জায়তে॥

যোগবাশিষ্ঠ—২।১১।২৩

—বীভৎস বিষয়দর্শনে সকলেরই মনে সাময়িক বৈরাগ্যোদয় হয়, কিন্তু বিচারসহায়েই পুরুষের অতি উত্তম বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

শ্মশানমাপদং দৈন্যং দৃষ্ট্বা কো ন বিরজ্যতে।
তদ্বৈরাগ্যং পরং শ্রেয়ঃ স্বতো যদভিজায়তে॥

ঐ—২৮

—শ্মশান, আপদ ও দৈন্য দর্শনে কাহার চিত্তে (সাময়িক) বৈরাগ্যের উদয় না হয়? কিন্তু সেই বৈরাগ্যই উৎকৃষ্ট ও পরমশ্রেয়োহেতু, যাহা (সর্ব ভোগ্য বস্তু বিদ্যমান সত্ত্বেও) পুরুষের চিত্তে স্বভাবতই আসিয়া উপস্থিত হয়।

অধ্যাত্মজীবনের প্রারম্ভ হইতে চরম সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত একমাত্র বৈরাগ্যই মুমুক্ষু সাধকের পরম হিতকারী বান্ধব।

বৈরাগ্যসাধনের মুখ্য উপায় : সর্বদা (১) মৃত্যুচিন্তন, (২) বিষয়ে দোষদর্শন, (৩) সাধুসঙ্গ ও (৪) ভগবদনুরক্তি।

মৃত্যুচিন্তন

আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকল বস্তুই সংসারে মৃত্যু-কবলিত। স্বকীয় অতিপ্রিয় দেহও প্রতি মুহূর্তে বিনাশ বা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে—এই চিন্তা চিত্তে সদা জাগ্রত রাখিতে পারিলে নশ্বর বিষয়ভোগের আকর্ষণ ক্ষীণ হইতে থাকে।

মস্তকস্থায়িনং মৃত্যুং যদি পশ্যেদয়ং জনঃ।
আহারোঽপি ন রোচেত কিমুতান্যা বিভূতয়ঃ॥

—শিরোপরি আসন্ন মৃত্যু বিদ্যমান, ইহা জানিলে আহারেও রুচি হইতে পারে না, অন্য ভোগৈশ্বর্যাদির তো কথাই নাই। বিষয়াসক্তির মূল স্বদেহে প্রীতি ও তাহাতে

সত্যত্ববুদ্ধি। অতএব নিয়ত দেহের বিনাশিত্ব-চিন্তন ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। তখনই মানুষ বুঝিতে পারে যে, এই সংসারে কিছুই নিত্য নহে, সবই বিনাশী। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়লাভের জন্য মানুষ সদা ব্যাকুল। বিষয় নিত্য ও পরম রমণীয়, এই বুদ্ধিতেই চিত্ত সেইদিকে আকৃষ্ট হয়। বিষয়ের স্বরূপ বিচার করিলে উহার নশ্বরতা চিত্তে দৃঢ় অঙ্কিত হয় ও বিষয়াসক্তি ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে।

বিষয়ে দোষদর্শন

যৎ প্রাতঃ সংস্কৃতং চান্নং সায়ং তচ্চ বিনশ্যতি
তদীয়রসসংপুষ্টে কায়ে কা নাম নিত্যতা॥

—প্রাতে প্রস্তুত অন্ন সায়ংকালেই বিকৃত ও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অন্নরসে পুষ্ট শরীরের নিত্যতা কখনই হইতে পারে না।

স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্।
বৈরাগ্যকারণং তস্য কিমন্যদ্ উপদিশ্যতে॥

মুক্তিকোপনিষৎ—২।৬৬

—অশুচি গন্ধপরিপূর্ণ স্বদেহে যে ব্যক্তির বিতৃষ্ণা হয় না, তাহাকে বৈরাগ্যজনক আর কি উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে?

মাংসাসৃক্‌পূয়বিন্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো ভবিতা নরকেঽপি সঃ॥

নারদ-পরিব্রাজক-উপনিষদ্—৩।৪৮

—মাংস, রুধির, পুঁজ, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা, অস্থি-আদি মলিন পদার্থের সমষ্টিরূপ এই দেহে যে ব্যক্তি আসক্ত হয়, সে মূর্খ নরকেও প্রীতিমান্ হইয়া থাকে।

যদি নামাস্য কায়স্য যদন্তস্তদ্ বহির্ভবেৎ।
দণ্ডমাদায় লোকোঽয়ং শুনঃ কাকাংশ্চ বারয়েৎ॥

—এই দেহের অভ্যন্তরে যে সমস্ত ঘৃণ্য বস্তু বিদ্যমান তাহা যদি বহির্দেশে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করা যায়, তবে কুকুর ও কাক প্রভৃতি হইতে ঐ সকল রক্ষা করিবার জন্য পুরুষকে দণ্ডহস্তে সদা সচেষ্ট হইতে হইবে।

সর্বদা পূর্বোক্তরূপে বিচার দেহাদি যাবতীয় বিষয়ে বৈরাগ্যের উৎপাদক। অতএব মুমুক্ষুর পূর্বোক্ত বিচার সদা কর্তব্য।

সাধুসঙ্গ

সৎসঙ্গ বিষয়ে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর সাধনপঞ্চকে বলিয়াছেন, 'সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢা ধীয়তাম্।'—মুমুক্ষু সদা সৎসঙ্গ করিবে ও শ্রীভগবানে দৃঢ় ভক্তি সহকারে চিত্ত নিবিষ্ট করিবে, কারণ—

মহানুভাবসম্পর্কঃ কস্য নোন্নতিকারণম্।
অশুচ্যপি পয়ঃ প্রাপ্য গঙ্গাং যাতি পবিত্রতাম্॥

—মহাপুরুষগণের সঙ্গ কাহার না উন্নতি বিধান করিয়া থাকে? অশুচি জলধারাও গঙ্গায় পতিত হইয়া শুদ্ধরূপতা প্রাপ্ত হয়।

সৎসঙ্গ ও ভগবন্নিষ্ঠা বৈরাগ্যের একান্ত সহায়ক। সৎসঙ্গে চিত্তে সারাসারবস্তুবিবেক সদা জাগ্রত হয়। সজ্জন-সমাগম অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়, তাঁহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে বিষয়বাসনা ক্ষীণ হয়। গোস্বামী তুলসীদাসজী বলিয়াছেন:

বিনু সতসঙ্গা বিবেক ন হোই।
রামকিরপা বিনু সুলভ ন সোই॥

—সৎসঙ্গ বিনা চিত্তে বিবেক অর্থাৎ সদসদ্-বিচার জাগ্রত হয় না। ঐ সৎসঙ্গও ভগবৎ-কৃপাতেই লাভ হইয়া থাকে। বিবেক হইতে বৈরাগ্যোদয় হয় এবং তখন শুদ্ধচিত্তে পরম তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

'বৈরাগ্যের' অর্থ—বিষয়ে বিরক্তি ও শ্রীভগবানে অনুরক্তি। ঈশ্বরানুরাগ না হইলে

কেবল বিষয়ে বিতৃষ্ণা অত্যন্ত শুষ্কতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে। 'বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ' (সাংখ্যকারিকা—৪৫) কেবল বৈরাগ্য-অভ্যাসে 'প্রকৃতিলয়' অবস্থা প্রাপ্তি হয়। ইহা একটি বদ্ধাবস্থা; দীর্ঘ সুষুপ্তিতুল্য অজ্ঞানাবস্থা।

সৎসঙ্গই বিষয়ে বিরাগ ও ঈশ্বরে প্রীতির প্রেরণা সম্পাদন করে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তকুলশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, 'মানুষ যতদিন না সশ্রদ্ধচিত্তে বিষয়ত্যাগী মহানুভবগণের পদধূলিতে পবিত্র হয়, ততদিন অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলেও তাহার বুদ্ধি শ্রীভগবানের চরণকমল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন :

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলামযাঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

(ভাঃ—১০।৪৮।৩১)

—জলময় স্থানবিশেষই একমাত্র তীর্থ নহে, অথবা মৃত্তিকা ও পাষাণনির্মিত মূর্তিবিশেষই একমাত্র দেবতা নহে; দীর্ঘকাল সেবিত হইয়া তাঁহারা পুরুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন, সাধুগণের দর্শন কিন্তু তৎকালেই শুদ্ধির হেতু হইয়া থাকে। অতএব তত্ত্বদর্শী সাধুগণই যথার্থ তীর্থ ও দেবতা। শাস্ত্রে সাধুদিগকে জঙ্গম তীর্থ ও শ্রীভগবানের চলবিগ্রহ বলা হইয়াছে।

তত্ত্ববেত্তা সাধুগণ সর্বদা উপদেশ না করিলেও তাঁহাদের সঙ্গ করা অবশ্য কর্তব্য, কারণ

সন্তঃ সদৈব গন্তব্যাঃ যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈরকথাস্তেষামুপদেশাঃ ভবন্তি তাঃ॥

—সাক্ষাৎ উপদেশ লাভ না হইলেও সাধুসঙ্গ সদা কর্তব্য। তাঁহাদের স্বাভাবিক কথাপ্রসঙ্গও মুমুক্ষুর পক্ষে উপদেশরূপই হইয়া থাকে। সমচিত্ত, প্রশান্তাত্মা, রাগদ্বেষাদি-রহিত, সদাচারী সাধুগণের সাধারণ বার্তালাপও এমন অনন্যসুন্দর অনাসক্ত ও মাধুর্যমণ্ডিত যে, তৎশ্রবণে যথার্থ মুমুক্ষুর চিত্ত তাঁহাদের অলৌকিক তত্ত্বানুভূতি সমুজ্জ্বল জীবনের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। ঐ দিব্য জীবনের প্রভাবে সাধকের চিত্তও তখন বিষয়বিমুখ হইয়া ভগবন্মুখী হয়।

সর্বদা সৎপুরুষ সঙ্গ না পাইলেও অসৎ-সঙ্গ কখনই করা উচিত নহে, কারণ

নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপাত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ॥

নিঃসঙ্গতাই সন্ন্যাসিগণের মুক্তি-প্রাপ্তির দ্বার। বিষয়াসক্ত বহির্মুখ ব্যক্তিগণের সঙ্গ ত্যাগের নামই যথার্থ নিঃসঙ্গতা। বিষয়াসক্ত পুরুষের সাহচর্যে কামাদি অশেষ দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সঙ্গ বিবেকী পুরুষকেও অধঃপাতিত করিয়া থাকে, সামান্য সাধকের তো কথাই নাই।

সন্ন্যাসীর সাধনা

এইরূপে সদা মৃত্যুচিন্তন, বিষয়ে দোষদর্শন ও সাধুসঙ্গাদিদ্বারা যথার্থ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেই পুরুষের চিত্তে সর্ববস্তু পরিত্যাগপূর্বক সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনা সমুদিত হয়। সন্ন্যাসী সদা অবহিতচিত্ত না হইলে অর্থাৎ চিত্ত আদর্শনিষ্ঠ করিয়া না রাখিলে কোন্ মুহূর্তে দুর্বলতা—বিষয়-বাসনা তাহাকে কবলিত করিয়া ফেলিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এইজন্য শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাসীদিগকে বেদান্ত শ্রবণ-মননাদি সহায়ে ব্যাপৃত থাকিতে আদেশ করেন। 'সংন্যস্য শ্রবণং কুর্যাৎ'—সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর মুমুক্ষু গুরুমুখে বেদান্ত শ্রবণ করিবেন। অখিল বেদান্ত-বাক্যসমূহ 'জীবাভিন্ন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম'-প্রতিপাদক, এইরূপ নিশ্চিত অবধারণের নামই 'শ্রবণ'।

ত্বং-পদার্থবিবেকায় সংন্যাসঃ সর্বকর্মণাম্।
শ্রুত্যাভিধীয়তে যস্মাত্তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ॥
(উপদেশসাহস্রী, ১৮।২২২)

—'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যগত 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থ অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপবিষয়ক বিচার করিবার জন্যই সর্ব সকাম কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস শ্রুতি বিধান করিয়াছেন। অতএব যে সন্ন্যাসী ঐরূপ করেন না, তিনি পতিত অর্থাৎ আদর্শভ্রষ্ট হইবেন।

আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্ বেদান্তচিন্তয়া।
দদ্যান্নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি॥

—প্রতিদিন নিদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুপর্যন্ত সন্ন্যাসী বেদান্তচিন্তায় কালাতিপাত করিবেন, যাহাতে কামাদি দোষ কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তে জাগ্রত হইবার অবকাশ না পায়।

আচার্য শ্রীসুরেশ্বরও তদ্‌রচিত 'সম্বন্ধ-বার্তিকে' বলিযাছেন যে, সর্বসকামকর্মত্যাগী সন্ন্যাসীরই বেদান্তবিচারে অধিকার। যথা—

ত্যক্তাশেষক্রিয়স্যৈব সংসারং প্রজিহাসতঃ।
জিজ্ঞাসোরেব চৈকাত্ম্যং ত্রয্যন্তেষ্বধিকারিতা॥

—সর্বকর্মপরিত্যাগী, সংসারবন্ধনমূলোচ্ছেদকামী এক আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুরই বেদান্ত-শ্রবণাদিতে মুখ্য অধিকার। অতএব বেদান্তোক্ত তত্ত্ব-চিন্তনই সন্ন্যাসের অনুকূল।

দর্শন, শ্রবণ, গমন, ভোজনাদিতেও সন্ন্যাসী কি প্রকার আচরণ করিবেন, তাহাও শাস্ত্র অতি সুন্দররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্তই তাহার বৈরাগ্যের সংরক্ষক ও মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক। নারদ-পরিব্রাজক-উপনিষদে আছে (৩।৬২—৬৮):

অজিহ্বঃ ষণ্ডকঃ পঙ্গুরন্ধো বধির এব চ।
মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড্‌ভিরেতৈর্ন সংশয়ঃ॥

—অজিহ্ব, ষণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির ও মূঢ়—এই ছয় প্রকার মানুষের বাহ্য আচরণ অভ্যাস করিয়া সন্ন্যাসী ক্রমে জীবন্মুক্তি-অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই ছয়টির ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে:

ইদমিষ্টমিদং নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতি।
হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে॥

—অন্নাদিভোজনকালে যিনি ইহা সুস্বাদু, ইহা স্বাদবিহীন, এইরূপ মনে করিয়া আসক্ত হন না; যিনি সদা হিতকারী, সত্য ও পরিমিতভাষী, তিনি 'অজিহ্ব' বলিয়া কথিত হন।

অদ্য-জাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শবার্ষিকীম্।
শতবর্ষাং চ যো দৃষ্ট্বা নির্বিকারঃ স ষণ্ডকঃ॥

—সদ্যোজাতা বলিকা বা শতবর্ষা স্ত্রী দর্শনে যেরূপ, ষোড়শী নারী দর্শনেও যাঁহার চিত্ত সেই একই রূপ অর্থাৎ নির্বিকার থাকে, তিনি 'ষণ্ডক' নামে অভিহিত হন।

ভিক্ষার্থমটনং যস্য বিণ্মূত্রকরণায় চ।
যোজনান্ন পরং যাতি সর্বথা পঙ্গুরেব সঃ॥

—যিনি কেবল ভিক্ষাদি গ্রহণ ও মলমূত্রাদি পরিত্যাগনিমিত্তই আসন ত্যাগ করত অন্যত্র গমন করেন, এবং তদুদ্দেশ্যেও যিনি কখনও এক যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করেন না, তিনিই 'পঙ্গু'।

তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষুর্ন দূরগম্।
চতুর্যুগাং ভুবং ত্যক্ত্বা পরিব্রাট্ সোঽন্ধ উচ্যতে॥

—কোথাও অবস্থান বা ভ্রমণকালে যে সন্ন্যাসীর চক্ষুর্দ্বয় সম্মুখে ষোড়শহস্ত পরিমিত স্থান হইতে দূরে নিপতিত হয় না, তিনি 'অন্ধ' নামে প্রসিদ্ধ।

হিতাহিতং মনোরমং বচঃ শোকাবহং চ যৎ।
শ্রুত্বাপি ন শৃণোতি যো বধিরঃ স প্রকীর্তিতঃ॥

—যিনি হর্ষোৎপাদক অনুকূল বচন অথবা দুঃখজনক প্রতিকূল বাক্য শ্রবণ করিয়াও

হর্ষ-বিষাদরূপ কোন প্রকার বিকার প্রাপ্ত হন না, তিনি 'বধির' নামে খ্যাত।

সান্নিধ্যে বিষয়াণাং চ সমর্থোঽবিকলেন্দ্রিয়ঃ।
সুপ্তবদ্ বর্ততে নিত্যং স ভিক্ষুর্মুগ্ধ উচ্যতে॥

—বিষয়ভোগোপযোগী সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও যিনি বিষয়সমূহের সান্নিধ্যে সুষুপ্ত পুরুষের ন্যায় নিত্য নির্বিকার থাকেন, সেই ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে 'মুগ্ধ' বলা হয়।

চিন্মাত্র-বাসনার অভ্যাস

পূর্বোক্ত অজিহ্বাদি ধর্মের আচরণ সহ 'চিন্মাত্রবাসনা'র অভ্যাসই সন্ন্যাসীর মুখ্য কর্তব্য। এই নামরূপাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ—এক অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ, চিন্মাত্রস্বরূপে কল্পিত ও স্বতঃ সত্তাস্ফুরণাদি-রহিত; অধিষ্ঠান-চৈতন্যের সত্তা ও স্ফুরণ দ্বারাই সর্ব জগৎ সত্তা ও প্রকাশ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ বিচারসহায়ে জগতের নাম ও রূপ—এই উভয় অংশের মিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্বক উহা উপেক্ষাকরত সর্বত্র পরিপূর্ণ 'অস্তি, ভাতি ও প্রিয়'-রূপ অধিষ্ঠান-চৈতন্যই আমি—এই প্রকার নিরন্তর ভাবনাকেই 'চিন্মাত্রবাসনা' বলে। নিরন্তর এই চিন্তাদ্বারা সর্ব মলিনবাসনা নিঃশেষে বিলীন হয়, কারণ

জন্মান্তরচিরাভ্যস্তা রাম সংসারসংস্থিতিঃ।
সা চিরাভ্যস্তযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে কচিৎ॥

—ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন, হে রাম! বহু জন্মের দীর্ঘ অভ্যাসপ্রসূত সংস্কার-বলেই এই মিথ্যা সংসার মানবচিত্তে সত্য বলিয়া বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, ঐ ভ্রান্তি দীর্ঘকালাভ্যস্ত, ব্রহ্মবিচার বিনা বিনাশ হইবার নহে। শুদ্ধচিত্তে বিমল আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইলে সাধক কৃতকৃত্য হন। আর তাঁহার করিবার বা জানিবার কিছুই অবশেষ থাকে না। তিনি পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইয়া প্রারব্ধচালিত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সাক্ষী-রূপে অবলোকন করিতে থাকেন। ইহাই জীবন্মুক্তি-অবস্থা।

জীবন্মুক্তের স্থিতি

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ।
গাঙ্গ্যং বারি সমস্তবারিনিচয়াঃ
পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো
বারাণসী মেদিনী।
সর্বৈব স্থিতিরস্য মুক্তিপদবী দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥

—পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারবান্ সেই পুরুষপ্রবরের নিকট সম্পূর্ণ জগৎ নন্দনকানন বলিয়া প্রতিভাত হয়। সর্ব বৃক্ষই তাঁহার দৃষ্টিতে কল্পবৃক্ষ, যাবতীয় জলপ্রবাহ তাঁহার নিকট গঙ্গাবারি-তুল্য শুদ্ধ, সমস্ত কর্মই পবিত্র, প্রাকৃত অথবা সংস্কৃত—সকল শব্দই তাঁহার কর্ণে বেদবাণীরূপে ধ্বনিত এবং সমগ্র পৃথিবীই তাঁহার নিকট বারাণসীতুল্য বলিয়া প্রতীত হয়। তখন যেরূপেই তিনি অবস্থান করুন না কেন, তিনি সদা মুক্ত।

প্রারব্ধ-ক্ষয়ান্তে এই দেহাদি জগৎ-প্রতিভাস নিবৃত্তির অনন্তর তিনি চিরতরে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন—অর্থাৎ তিনি 'বিদেহ-মুক্ত' হন। তাঁহাকে আর এই সংসারে জন্মমৃত্যুপ্রবাহে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তখনই এই সংসার-যাত্রার চিরনিবৃত্তি।

জীবত্বভ্রান্তি ও তন্নিবৃত্তি

জীবভাব অনাদি। কবে কিরূপে এই মিথ্যা জীবত্বের উদয় হইয়াছিল, তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য, কিন্তু জীব সেই স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার যাত্রার পথে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য নানা অভিজ্ঞতা জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চয়

করিতে থাকে এবং পুণ্যপুঞ্জ পরিপক্ব হইলে দৈবাৎ কোন জন্মে দেবজনদুর্লভ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়। ক্রমে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণকমলে শরণ লইয়া সন্ন্যাস-অবলম্বনে আত্মতত্ত্বানুশীলন সহায়ে পরমাত্ম-জ্ঞানোদয় হইলে ঐ জীবত্বভ্রান্তি সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পুরুষার্থের এখানেই পরিসমাপ্তি; সর্বসাধনার এইখানেই শেষ। মানব-জীবনের ইহাই চরম উদ্দেশ্য, ইহাই চরম কাম্য—'জীবাভিন্ন পরমাত্ম-জ্ঞান' সহায়ে অবিদ্যার চিরনিবৃত্তিপূর্বক জীবন্মুক্তি-অবস্থালাভ।

'বোধসার' গ্রন্থে আচার্য নরহরি বলিয়াছেন :

জীবন্মুক্তি-সুখপ্রাপ্ত্যৈ স্বীকৃতং জন্ম লীলয়া।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া॥

—জীবন্মুক্তি-সুখলাভার্থই নিত্যমুক্ত আত্মার স্বেচ্ছায় এই ভ্রান্তিসিদ্ধ জীবরূপে জন্ম স্বীকার, সংসারভোগের কামনাবশতঃ নহে।

এক নিত্যমুক্ত চিন্মাত্রস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মা সদা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মায়া-রচিত দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিসমূহ দ্বারা তিনিই ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতীয়মান। বিদ্যাসহায়ে ঐ ভ্রান্তি বিদূরিত হইলে তিনিই অনাদিসিদ্ধ নিত্যমুক্তস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন,—এইরূপ বলা হইয়া থাকে মাত্র। ভ্রান্তি একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্তিযোগ্য, অন্য কোন উপায়ে নহে; কারণ

ভ্রান্ত্যারোপিতঃ সংসারো বিবেকান্ন তু কর্মভিঃ।
ন রজ্জ্বারোপিতঃ সর্পো ঘণ্টাঘোষান্নিবর্ততে॥

—ভ্রান্তি দ্বারা আরোপিত এই সংসার একমাত্র বিচারপ্রসূত জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়, অন্য কোন ক্রিয়াদি দ্বারা নহে; কারণ রজ্জুতে কল্পিত যে সর্প তাহা কখনও ঘণ্টাবাদনাদিরূপ কোন কর্ম দ্বারাই অপসারিত হয় না। একমাত্র অধিষ্ঠান-রজ্জুবিষয়ক জ্ঞানই কল্পিত সর্প ও তজ্জ্ঞানের নিবর্তক।

প্রকাশ ও অন্ধকার পরস্পরবিরোধী। প্রকাশ যেরূপ অন্ধকার নিবৃত্ত করিয়া থাকে, একমাত্র জ্ঞানই তদ্রূপ বিরোধী অজ্ঞানের নিবর্তক। ইহাই বেদান্ত-শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত। 'জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নিবর্তকম্'—কেবল জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া থাকে—(পঞ্চপাদিকা)।

শুভ নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনাদি—চিত্তশুদ্ধির দ্বারা—ঐ জ্ঞানোৎপত্তির উপ-কারক, এবং বিষয়ে যথার্থ বৈরাগ্যই সাধনার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সাধকের অন্যতম সহায়ক, সুহৃদ্ ও পরিচালক।

এই বৈরাগ্যই 'বৈরাগ্যশতক'-গ্রন্থে বিশেষ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিষয়তৃষ্ণার অনর্থ-কারিতা, ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগের কঠিনতা, অর্থিত্বের ক্ষুদ্রতা, জাগতিক সর্বপদার্থের অস্থিরতা, সর্বসংহারী কালের বিচিত্র প্রভাব, নিত্যানিত্যবস্তুবিচার ও পরমবৈরাগ্যবান্ তত্ত্বচিন্তননিমগ্ন পুরুষপ্রবরের আচরণাদি কথন-প্রসঙ্গে বৈরাগ্যের অত্যুজ্জ্বল মহিমা রাজর্ষি শ্রীভর্তৃহরি এই গ্রন্থরচনাসহায়ে জগৎ সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিচার ও মনন যথার্থই বৈরাগ্যের উদ্দীপক।*

* গত বৎসর উদ্বোধনে আষাঢ় হইতে ছয় মাসে প্রকাশিত লেখকের 'বৈরাগ্যশতকম্' গ্রন্থের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

ত্রিশরণ-মহামন্ত্র

শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী

'ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্র রবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে
মরুপারে শৈলতটে সমুদ্রের কূলে উপকূলে
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে……।'

কবিগুরু যে ত্রিশরণ-মহামন্ত্রের প্রভাব আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তার ইতিবৃত্ত অতি বিচিত্র। স্বীকার করতেই হবে, বুদ্ধ এ ত্রিশরণ-মন্ত্রের প্রবর্তক নন; তাঁর ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন ক'রে এর প্রবর্তন হয়। সেই ব্যক্তিত্ব এত প্রকাণ্ড ছিল যে, তার প্রভাব এড়ানো সহজ ছিল না। এজন্য লোকে ব'লত, 'সমনো গোতমো আবট্টনীমায়ং জানাতি' অর্থাৎ শ্রমণ গোতম বশীকরণের যাদু মন্ত্র জানেন। এ যাদুমন্ত্র যে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তা বলাই বাহুল্য। এর সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয় তপস্সু ও ভাল্লিক নামক দুই বণিকের ওপর।

বুদ্ধত্বলাভের পর মগ্নভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে যে দিন বুদ্ধ আহারের প্রয়োজন অনুভব করেন, সেইদিন এই বণিকদ্বয় পণ্য-সম্ভার নিয়ে তাঁর অদূরবর্তী পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সেখানে হঠাৎ তাঁদের অগ্রগামী শকট থেমে যায়। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান অদূরে উপবিষ্ট বুদ্ধকে। অলৌকিক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের দর্শনেই তাঁরা অভিভূত হয়ে অন্তরের সহজ ভক্তিতে তাঁর চরণে প্রণত হয়ে বলেন, 'ভগবন্, তোমার শরণগত হলাম, ধর্মের শরণগত হলাম। এ আত্মনিবেদনের মূলে রয়েছে ঐকান্তিক নির্ভরতা ও পূর্ণ বিশ্বাস। বণিকদ্বয় তাঁকে দেখে সহজ জ্ঞানে উপলব্ধি করেন—এ মহামানব মানুষের পরম ভরসাস্থল, তাঁরা চরণাশ্রয়ে জীবনে মঙ্গল আসবে। তাই এঁরা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগেই তাঁর শরণাগত হন। এঁরা বৌদ্ধ সাহিত্যে 'দ্বিবাচিক উপাসক' নামে পরিচিত। তখনও সঙ্ঘের জন্ম হয়নি ব'লে এঁরা ত্রিশরণের পরিবর্তে দ্বিশরণ গ্রহণ করেন।

অতঃপর বুদ্ধ বারাণসীর মৃগদাবে (বর্তমান সারনাথ) গিয়ে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় কৌণ্ডিণ্য প্রমুখ পাঁচজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজককে প্রথম ধর্মোপদেশ দান করেন। তাঁর মুখে আর্যসত্যের অপূর্ব বর্ণনা শুনে কৌণ্ডিণ্য নির্মল ধর্মচক্ষু লাভে ধন্য হন। তিনি বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে উপসম্পদা বা ভিক্ষুত্ব প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁকে আহ্বান ক'রে বলেন, 'এসো ভিক্ষু, ধর্ম সুপ্রকাশিত, সকল দুঃখ-জালার নিরসনের জন্য ব্রহ্মচর্যব্রতে প্রতিষ্ঠিত হও।' এ বাণী হয় কৌণ্ডিণ্যের দীক্ষামন্ত্র। তিনিই সর্বপ্রথম ভিক্ষু হন। পরে অবশিষ্ট চারিজনকেও ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত ক'রে বুদ্ধ প্রথম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

দিন কয়েক পরে বারাণসীশ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র যশ ও তাঁর বন্ধুগণ বুদ্ধের *'এহি' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সঙ্ঘের কলেবর বৃদ্ধি করেন। যশ আসেন ভোগবিলাসের বেড়াজাল ছিন্ন ক'রে বাড়ী থেকে পালিয়ে। সেই নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে বারাণসীশ্রেষ্ঠী ঘুরতে ঘুরতে মৃগদাবের তপোবনে এসে উপস্থিত হন এবং শান্ত সুন্দর

---

* সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে বুদ্ধ 'এহি' অর্থাৎ এসো ব'লে প্রার্থীকে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিতেন। তখন সঙ্ঘ-প্রবেশের জন্য কোন মন্ত্র উচ্চারিত হ'ত না।

মহিমাদীপ্ত বুদ্ধকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে মনে মনে ভাবেন—ইনি মহাপুরুষ, ভূত-ভবিষ্যৎ এঁর অজ্ঞাত নয় ও ইনি নিশ্চয়ই আমার পলাতক পুত্রের সন্ধান দিতে পারেন। তিনি ভক্তিভরে বুদ্ধকে প্রণাম করেই জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার পুত্র কোথায়, আপনি বলতে পারেন কি?' উত্তরে প্রেমমধুর বাক্যে বুদ্ধ বলেন, 'হাঁ, আপনি বসুন, এখানেই তাকে দেখতে পাবেন।' শ্রেষ্ঠী উৎফুল্ল হয়ে একান্তে বসেন। বুদ্ধ তাঁকে উপদেশ দান করেন। সেই অভিনব বিচিত্র উপদেশ শুনতে শুনতে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান এবং ভাবাবেগে ব'লে ওঠেন, 'কি মধুর কথা! কি সুন্দর ভাব! আপনি সত্যকে আমার কাছে অনাবৃত করেছেন, আমাকে পথের সন্ধান দিয়েছেন, আলোকপাতে অন্ধকার দূর করেছেন, আমি আপনার শরণগত হলাম, ধর্মের শরণগত হলাম, সঙ্ঘের শরণগত হলাম, আজ থেকে আমি আপনার উপাসক।' বৌদ্ধ সাহিত্যে এ শ্রেষ্ঠীই 'ত্রৈবাচিক বা ত্রিশরণগত উপাসক' ব'লে অভিহিত।

এর পর থেকে যেখানে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ সত্য ও অহিংসার বাণী প্রচার করতে যান, সেখানেই মুগ্ধ জনতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'ত্রিশরণ' গ্রহণ করে। এভাবে অল্পকালের মধ্যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে ত্রিশরণ-মন্ত্রের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। তখন 'বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি'—এ অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে লোক নতুন প্রেরণা লাভ করে; তাদের অন্তরে নতুন ভাবের উদ্বোধন হয়। উদ্বুদ্ধ জনতার কর্মধারা নানাদিকে প্রসারিত হয়। অসংখ্য মঠ-মন্দির, বিদ্যায়তন, শিল্পক্ষেত্র, আরোগ্য-শালা, অনাথাশ্রম ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এ ভাবে জনসেবার এক বিরাট আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবতার স্ফুরণে ত্রিশরণ-মন্ত্র ভারতে এক অপূর্ব জাগরণ বয়ে আনে। সেই জাগরণ যুগযুগান্তর ধরে দেশকে সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন করে। তা শুধু ভারতের মধ্যে সীমিত হয়ে না থেকে ভারতের সীমা ডিঙিয়ে দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে, দুর্লঙ্ঘ্য গিরি অতিক্রম ক'রে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রেমে-প্রাণে আলোকে-পুলকে জনতাকে মাতিয়ে তোলে। তার প্রমাণ রয়েছে এশিয়া-ভূখণ্ডের নানা-স্থানের পর্বতগাত্রে গিরিগুহায় পাষাণফলকে ও অসংখ্য স্তূপ-সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষে। আজও ত্রিশরণ-মন্ত্রের নামে অর্ধজগৎ ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধায় নতশির।

মনে প্রশ্ন জাগে, ত্রিশরণের 'বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ' বলতে কি বোঝায়? এ সম্বন্ধে বুদ্ধ-যুগের যে উক্তি রয়েছে, তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি:

"ইতিমিসো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো
বিজ্জাচরণ সম্পন্নো সুগতো লোকবিদু অনুত্তরো
পুরিসদম্ম সারথি সত্থা দেবমনুস্সানং
বুদ্ধো ভগবা।"[১]

অর্থাৎ সেই ভগবান বুদ্ধ অর্হৎ (যিনি কাম-ক্রোধাদি অরি বা রিপুদল হনন করেছেন), সম্যক্ সম্বুদ্ধ (যিনি স্বয়ং সম্যক্‌ভাবে সমগ্র উপলব্ধি করেছেন), বিদ্যাচার-সম্পন্ন (যোগ-বিভূতিসম্পন্ন ও শুভাচারসমন্বিত), সুগত (যিনি সত্যের পথে সম্যক্‌ভাবে গমন করেছেন), তিনি লোকবিদ্, শ্রেষ্ঠ, পুরুষবিনায়ক এবং দেব-মানবের শাস্তা বা অনুশাসক।

"স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো সন্দিট্‌ঠিকো
অকালিকো এহি পস্সিকো ওপনয়িকো
পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহি।"[২]

অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ ধর্মকে উত্তমরূপে প্রকাশ

১, ২, বিসুদ্ধিমগ্‌গ।

করেছেন, তা প্রত্যক্ষ ফলদায়ক কালভেদহীন (যার অনুষ্ঠান ও ফলপ্রাপ্তিতে কালবিচার নেই), অনাবিল (অনাবিলতার জন্য 'এসো ছাখো' ব'লে সবাইকে আহ্বানের যোগ্য), ঔপনয়িক (যা নির্বাণে উপনীত করে) এবং বিজ্ঞগণের আত্মবেগু (জ্ঞানীদের উপলব্ধি-গোচর)।

"সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো
উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো
ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো
যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি
অট্ঠপুরিসপুগ্গলা,
এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো
আহুনেয্যো পাহুনেয্যো দক্খিণেয্যো
অঞ্জলিকরনীয়ো অনুত্তরং
পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্স।"[৩]

অর্থাৎ নির্বাণোপলব্ধির স্তরভেদে আট রকমের ব্যক্তিবিশিষ্ট বুদ্ধশিষ্যসঙ্ঘ সুপথগামী অকুটিল পথযাত্রী (ন্যায়পথযাত্রী) নির্বাণযাত্রী সমীচীন-পন্থানুসারী। ভগবানের এ শিষ্যসঙ্ঘ অভ্যর্থনার্হ, সম্মানার্হ, দক্ষিণার্হ, প্রণম্য এবং জগতের উত্তম পুণ্যক্ষেত্র।

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বুদ্ধ শরণাগতকে মোক্ষ দেবার ভার গ্রহণ করেননি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন:

"তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা
পটিপন্না পমোক্খন্তি ঝায়িনো মারবন্ধনা।"[৪]

অর্থাৎ তোমাদের প্রয়াস করতে হবে; তথাগত প্রচারক মাত্র। এ পথ অবলম্বনে ধ্যানরত ব্যক্তিগণই মারবন্ধন হ'তে মুক্ত হন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত উপদেশবাণীও উল্লেখযোগ্য:

"অত্তদীপা ভিক্খবে বিহরথ
অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা।
ধম্মদীপা ভিক্খবে বিহরথ
ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা॥"[৫]

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, অনন্যনির্ভর হয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠ আত্মনির্ভর হও, ধর্মপ্রতিষ্ঠ ধর্ম-নির্ভর হও।

উদ্ধৃত বচনসমূহ পাঠে স্বতই পাঠকের মনে প্রতিভাত হবে—জ্ঞান ও কর্মই বৌদ্ধধর্মের প্রাণ, তাতে শরণাগতির বা ভক্তিবাদের অবকাশ নেই। শুধু শরণাগতিতে বা ভক্তিতে নির্বাণোপলব্ধি হয়—একথা বৌদ্ধধর্মে স্বীকার করা হয়নি। তবুও ভক্তিকে কি বাদ দেওয়া চলে? এ প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করতেই হবে—ধর্মচেতনার উদ্গম ভক্তি থেকে। বুদ্ধও বলেছেন, "সদ্ধা বীজং তপো বুট্ঠি……"[৬]—অর্থাৎ নির্বাণোপলব্ধির ফসল ফলাতে হ'লে 'সদ্ধা' বা ভক্তির বীজ বপন করা চাই। পালি 'সদ্ধা' (শ্রদ্ধা) শব্দ ভক্তিধর্মদ্যোতক। এতে ভক্তিই বুঝায়। এক কথায় বলতে গেলে ভক্তিই মোক্ষসাধনার প্রথম সোপান।

শরণাগতের ভক্তিরসাপ্লুত ভাববিভোল মন ত্রিশরণের উদার স্পর্শে স্নিগ্ধ শান্ত হয়ে এক আলোকময় অনুভূতিতে যেন আপনাকে হারিয়ে ফেলে। যেখানে বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘ, সেখানেই তো সকল তন্হা বা প্রবৃত্তি-নিরোধের পরম আনন্দময় নির্বাণের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বুদ্ধ নির্বাণনির্দেশক, ধর্ম নির্বাণের পথ, সঙ্ঘ নির্বাণলাভী। সকল দুঃখ-জ্বালার অবসানের জন্য, অনন্ত শান্তির—অনন্ত আনন্দের গভীরে মগ্ন হবার জন্য শরণাগত ভক্তের অন্তরে নির্বাণোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা জাগে। তখন আলোকোন্মুখ কুসুমকলির মতো তাঁর মন নির্বাণোন্মুখ হয়ে ওঠে। এখানেই ত্রিশরণ-মন্ত্রের চরম পরিণতি।

---

৩ বিসুদ্ধিমগ্গ
৪ ধম্মপদ
৫ মহাপরিনিব্বাণসুত্ত, দীঘনিকায়
৬ সংযুত্তনিকায়

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

'পঞ্চভূতে'র রচনাপদ্ধতি-প্রসঙ্গে আমেরিকান সাহিত্যের বিখ্যাত 'The Autocrat of the Breakfast Table' (চায়ের টেবিলের স্বেচ্ছাচারী বক্তা) স্মরণীয়। এই বইটি দ্বারা যে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত এ কথা সত্য। অলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্‌স্ (Oliver Wendell Holmes) এ বইটি লিখতে শুরু করেন তদানীন্তন (১৮৫৭) 'The Atlantic Monthly' মাসিকপত্রে। উনিশ শতকের আমেরিকান সাহিত্যে এই বইটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার তাঁর বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়নে এ বইটি থেকে অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। ব্যক্তিগত পেশায় ডাক্তার হোম্‌স্ এ বইটিতে যে উদার আদর্শবাদ, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি এবং অপরূপ সহানুভূতিময় হাস্যরস পরিবেশন করেছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তার তুলনা বিরল। কোন বোর্ডিং-হাউসের চায়ের টেবিলে সমবেত অধিবাসীরা যখন প্রভাতী চা-চক্রে সম্মিলিত হন, তখন একটি স্বেচ্ছাচারী বক্তা অন্যদের বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে নিজেই নানাপ্রসঙ্গে নানা মন্তব্য ক'রে যান। বলা বাহুল্য সে বক্তাটি লেখক স্বয়ং—কিন্তু সে বক্তব্য কোথাও একঘেঁয়ে অন্তঃসারহীন মোড়লগিরি হয়ে দাঁড়ায় না। জীবন ও জগতের কত অন্তহীন বিস্ময় এই বক্তার দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে, সে কথাই পাঠককে অভিভূত করে।

অবশ্য 'পঞ্চভূতে' রবীন্দ্রনাথ ছ-জন বন্ধুর আলোচনাচক্রের খবর দিয়েছেন। তার ফলে একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। এই স্বাদবৈচিত্র্যই 'পঞ্চভূতে' অপূর্বতা এনে দিয়েছে। তবু আর একটু তলিয়ে দেখলে মনে হয়, আসলে ওই বিভিন্ন চরিত্রগুলি একেবারে পৃথক নয়—মূল একটি দৃষ্টিভঙ্গীরই নানান্ বর্ণবিন্যাস। সমীর, ক্ষিতি, ব্যোম্ বা দীপ্তি এরা আসলে সভাপতি ভূতনাথবাবুরই অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বের নানা দিক।

এবার 'পঞ্চভূতে'র প্রবন্ধাবলীর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত রূপরেখায় উপস্থাপিত করি। 'পরিচয়'-অংশে রবীন্দ্রনাথের ডায়েরী বা দিনপঞ্জী সম্বন্ধে বক্তব্য সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডায়েরী রাখার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের (ভূতনাথবাবুর মারফৎ) আপত্তি এই যে, জীবনের সব অংশকেই লেখায় প্রকাশ করতে গেলে জীবনের প্রকাশ ব্যাহত হয়। জীবন থেকে কিছু রেখে আর কিছু বর্জন করেই সামঞ্জস্য বজায় থাকে। "ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রত্যেক তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিয়া তুলি, এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি।"[১]

জীবন-সায়াহ্নে এসেও ডায়েরী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মত বদলায়নি। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে আছে—"আর দেখো ঐ ডায়েরী; সে আমার দ্বারা কোনো কালে লেখা হ'ল না; emotionএর একটি

---

১ পঞ্চভূত (১৩৫৫ সংস্করণ) : পৃঃ ১১

গোপনীয়তা আছে, তা হাটের মাঝখানে প্রকাশ্য নয়।"[২]

তাই ভূতনাথবাবু যে ডায়েরী লিখলেন, সেটি চিন্তাজগতের ডায়েরী। অস্ফুট চিন্তার কোন স্থান এ ডায়েরীতে নেই, ভাবনাকে একটি গতিশীল পূর্ণতা দিয়ে তবে এই অভিনব ডায়েরীতে গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চভূতের আলোচনা-চক্রের দ্বিতীয় বিষয় 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ'। আমাদের প্রত্যেকের কেন্দ্রবাসী আত্মা স্ব-স্বরূপে বিশ্বাত্মারই অংশ। এই আত্মা বহির্জগতের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, সেই সম্পর্ক-সূত্রই সৌন্দর্য। আমরা সকলেই যখন সেই বিশ্বাত্মারই বিচিত্র প্রকাশ, তখন মিলনই আমাদের স্বধর্ম। সেই কথাটি মনে করিয়ে দেবার জন্যই উৎসবের আয়োজন।

পুণ্যাহের দিনে প্রজারা নিজে থেকে জমিদারকে নজরানা দিয়ে যায়। তাই এই দিনটিতে উৎসবের বাঁশী বাজে। প্রযোজনকে মানুষ এমনি করেই সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে। "খাজনার টাকার সহিত রাগরাগিণীর কোন যোগ নাই, খাজাঞ্চিখানা নহবত বাজাইবার স্থান নহে; কিন্তু যেখানেই ভাবের সম্পর্ক আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি সেখানেই বাঁশি তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে প্রকাশ করে, সৌন্দর্য তাহার সহচর।"[৩]

ভারতীয় চিন্তাধারায় এই মনোভাবেরই প্রকাশ দেখি—চেতন-অচেতন সব বস্তুর সঙ্গে আত্মীয়তা-স্থাপনচেষ্টায়। আমরা যে নিখিল পৃথিবীর সঙ্গে এক আত্ম-সূত্রে গাঁথা—এ কথা ভারতবর্ষের অন্তরতম অনুভূতি। এইজন্য আমরা সৌন্দর্য-বিশ্লেষণে পটু নই। সৌন্দর্যকে বাইরে থেকে না দেখলে তার সঙ্গে আমাদের আত্মার মিলন সম্পূর্ণ হয় না। প্রতীচ্য ভাবুকদের—বিশেষতঃ ইংরেজ জাতির এ গুণটি আছে। তাই ইংরেজী সাহিত্যে প্রকৃতি-কবিতার (Nature-poems) এত সার্থকতা।

আমাদের দেশে অনেক সময় প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ভগবানের প্রকাশ হিসাবে ভক্তেরা দেখে থাকেন। কিন্তু কেবল সৌন্দর্য-উপলব্ধিতে তৃপ্ত না থেকে প্রকৃতিরূপী ভগবৎ-সত্তার কাছে ইহকালের ও পরকালের যাবতীয় প্রার্থনা ক'রে বসেন। তাঁরা এ কথা ভুলে যান যে, সেই পরমসুন্দরের সঙ্গে আমাদের ব্যাবহারিক প্রয়োজনের সম্বন্ধ নয়—আত্মিক আকুলতার সম্বন্ধ। আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কেবলমাত্র আনন্দের, তার কাছে আর কিছু দাবী করা চলে না।

তাই জাহ্নবীতীরে এসে কবি মুক্তি বা পুণ্য কামনা করেননি, বলেছেন, "ইহকালের সম্পদ এবং পরকালের পুণ্য, হে জাহ্নবি, আমি তোমার নিকট চাহি না, এবং চাহিলেও পাইব না। কিন্তু শৈশবকাল হইতে জীবনের কত দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে, কৃষ্ণপক্ষের অর্ধচন্দ্রালোকে, ঘনবর্ষার মেঘশ্যামল মধ্যাহ্নে আমার অন্তরাত্মাকে যে এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছ, সেই আমার দুর্লভ জীবনের আনন্দসঞ্চয়গুলি যেন জন্মজন্মান্তরে অক্ষয় হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিরুপম সৌন্দর্য চয়ন করিতে পারিয়াছি, যাইবার সময় যেন একখানি পূর্ণ শতদলের মতো সেটি হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারি, এবং যদি আমার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁহার

২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (২য় মুদ্রণ) : পৃঃ ২৫৯

৩ পঞ্চভূত : সৌন্দর্যের সম্বন্ধ. পৃঃ ১৮

করপল্লবে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটি বারের মানবজন্ম কৃতার্থ করিতে পারি।"[8]

'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ'-বিষয়ক আলোচনায় ভারতীয় সৌন্দর্যদৃষ্টি সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য আলোচনা রয়েছে। সৌন্দর্যকে ভারতীয় কবি ও শিল্পীরা সম্পূর্ণ অন্তর্জগতের বিষয়বস্তু ক'রে তুলেছেন। তার ফলে সৌন্দর্যচেতনা অনেক ক্ষেত্রেই ঐতিহ্যাশ্রয়ী। হরিণ, গজেন্দ্র, শতদল, হংস প্রভৃতির উপমা শতলক্ষবার ব্যবহার করেও সংস্কৃত সাহিত্য ক্লান্ত নয়। রূপবৈচিত্র্য ও রূপের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে গ্রীকরা অনেক বেশী সচেতন ছিলেন।

বহির্জগতের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যেমন, অন্তর্জগতের মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রেও তেমনি আমরা প্রচলিত ধারণাতেই সন্তুষ্ট। স্বামী বা গুরু কেবল পদাধিকারেই আমাদের ভক্তি দাবী করতে পারেন, সেজন্য যোগ্যতার প্রশ্ন অবান্তর। এইভাবে প্রচলিত মতানুবর্তনের দ্বারা আমাদের সৌন্দর্যচেতনা ও শ্রদ্ধাবোধ দুইই পীড়িত। সৌন্দর্যসম্বন্ধে অতিরিক্ত সন্তোষের ফলে বহির্জগৎ ও মনোজগতের আদর্শগত অবনতি ঘটে, সন্দেহ নেই। আধুনিক মনের অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে যথার্থ আদর্শবোধের অনুসন্ধান করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—তাঁর 'কৃষ্ণ-চরিত্র' বইটিতে। এ বইতে অলস অনুকরণের স্থান নিয়েছে জাগ্রত বিচারবুদ্ধি।[৫]

সাহিত্যসম্বন্ধে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের আলোচনা রয়েছে 'পঞ্চভূতে'। সর্বপ্রথম কবিতা-প্রসঙ্গ আলোচনাযোগ্য। 'গদ্য ও পদ্য' নিয়ে আলোচনায় 'কবিতা'-সম্বন্ধে কৃত্রিমতার চিরকালীন অভিযোগ উঠেছে। কবি-কল্পনা এবং কবিতার ছন্দ—এ দুটি জিনিসকেই অনেকে অবাস্তব ও কৃত্রিম মনে করেন। এর উত্তরে সমীর ও স্রোতস্বিনীর বক্তব্য এই যে, পৃথিবীতে অচেতন বা অর্ধচেতন পদার্থেরা সৃষ্টি করে না, একা মানুষেরই সৃষ্টির অধিকার। যা আছে, তাকে মানুষ আপন মনোমত ক'রে নিয়ে তবে তৃপ্তি পায়। সাধারণ কথাবার্তা একান্ত বাস্তব, কিন্তু এই বাস্তবকে অতিক্রম করেই কবিতার উত্তরণ।[৬]

ভূতনাথবাবু বিষয়টির আরো গভীরে আলোকপাত করেছেন: বিশ্বজগতের স্পন্দিত তরঙ্গমালা আলোরূপে, ধ্বনিরূপে আমাদের দেহমনকে আন্দোলিত করে। এই তরঙ্গমালা আমাদের মানসলোকে একেবারে অবারিত-ভাবে প্রবেশ করে। স্পন্দনেরই এ ক্ষমতা আছে। একটি স্পন্দন আর একটি স্পন্দনকে জাগিয়ে তোলে। সংগীত তেমনি একটি স্পন্দন। সে স্পন্দনের নিবিড় সংঘর্ষে আত্মার জাগরণ ঘটে। কবিতায় সংগীত দেখা দেয় ছন্দরূপে। মৌখিক ভাষার সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। সেই ভাষাকে ছন্দের সংগীতেই হৃদয়স্পর্শী ক'রে তোলে। ছন্দ ও ধ্বনিতে মিলে ব্যক্তিচেতনাকে বিশ্বচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে।[৭]

'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে পঞ্চভূতের আলোচনাচক্রে রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপ' (কচ-দেবযানী-সংবাদ) কাব্য-নাটিকাটির তাৎপর্য-বিশ্লেষণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিতে একই কাব্যের কত রকমের ব্যাখ্যা হ'তে পারে, তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ 'সোনার তরী' কবিতাটির ব্যাখ্যা-বহুলতা স্মরণীয়। তত্ত্ববিচারের হাটে সকলেই নিজবুদ্ধির নিকষে কবিতাকে যাচাই করতে

৪ তদেব পৃঃ ২৫
৫ তদেব পৃঃ ১২৭—১৩৪ 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ'
৬ তদেব পৃঃ ৮৪—৮৬ 'গদ্য ও পদ্য'
৭ তদেব পৃঃ ৮৯—৯১

চায়। অথচ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কবিতা প্রাণের একটি অনুভব-মুহূর্ত—আমাদের নিত্য-পরিচিত হাসিকান্না ভাবনা-বেদনাই তার অসীমসঞ্চারী হিল্লোলে কবিতা হয়ে ওঠে।[৮]

কিন্তু তাৎপর্য-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নয়। উদাহরণস্বরূপ 'বলাকা'র 'চঞ্চলা' কবিতাটির কথা বলা যায়। এ কবিতাটির তত্ত্বে ও অনুভবে যে অঙ্গাঙ্গী মিলন ঘটেছে, তাতে কাব্যের তাৎপর্য-বিশ্লেষণ খুব অপ্রয়োজনীয় বলা চলে না। কবি স্বয়ং কিন্তু এই তত্ত্ব-বিশ্লেষণকে বিশেষ মূল্য দিতে চাননি।

'কাব্যের তাৎপর্য'-আলোচনার পাশাপাশি সঙ্গতভাবেই 'প্রাঞ্জলতা'র প্রসঙ্গ এসেছে। সাহিত্যে প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গিমা এবং সরলতা—এ দুয়ের মধ্যে প্রথমটিই আগে মনোহরণ করে। ভূতনাথবাবুর দৃষ্টিতে—"কলাবিদ্যার সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। বর্বরতা সরলতা নহে। বর্বরতার আড়ম্বর আয়োজন অত্যন্ত বেশি। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলংকার।··· এক-আধটি ইংরাজি কথা মাপ করিতে হইবে। যেমন ভদ্রলোকের মধ্যে, তেমনি ভদ্রসাহিত্যেও ম্যানার আছে, কিন্তু 'ম্যানারিজ্‌ম্' নাই। ভালো সাহিত্যের বিশেষ একটি আকৃতিপ্রকৃতি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার এমন একটি পরিমিত সুষমা যে, আকৃতিপ্রকৃতির বিশেষত্বটাই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে না।"[৯]

প্রাচীন বাংলা ও মৈথিলী সাহিত্য থেকে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির উদাহরণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বিচার করা চলে। চণ্ডীদাসের সরলতা অসাধারণ তাৎপর্যময়; কিন্তু বিদ্যাপতিও কি প্রথম শ্রেণীর কবি নন? প্রকাশের বিচিত্র ঐশ্বর্য তো অনুভবের বিশাল বৈচিত্র্যেরই বাণীরূপ হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—"গ্রাক প্রস্তরমূর্তিতে রঙচঙ রকম-সকম নাই—তাহা প্রাঞ্জল এবং সর্বপ্রকার প্রয়াস-বিহীন। কিন্তু তাই বলিয়া সহজ নহে। সে কোন প্রকার তুচ্ছ বাহ্য-কৌশল অবলম্বন করে না বলিয়াই ভাবসম্পদ তাহার অধিক থাকা চাই।"[১০] এই গ্রীকমূর্তির সরলতাই আর্টের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ নয়। শিল্প-সাহিত্য কত বিচিত্র ও জটিল উপায়ে প্রকাশিত হয়েও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পায়। তবে এ কথাও স্বীকার্য, দুরূহতাই গভীরতা নয়।

'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'—রচনাদুটিতে কৌতুকের মাত্রার তারতম্যে কেমন ক'রে কমেডি ও ট্র্যাজেডির রূপান্তর হয়, সে কথা আলোচিত। কৌতুকের মূল কারণ অসঙ্গতি-বোধ! এই অসঙ্গতি যখন জীবনে অপরিমেয় শূন্যতার সৃষ্টি করে, তখনই ট্র্যাজেডির সূচনা। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'—প্রহসন ও ট্র্যাজেডির দুটি সীমান্ত।

সাহিত্যের বিষয়রূপে 'মনুষ্য' এবং 'নরনারী'—সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠকের চিরন্তন আগ্রহের বস্তু। মানুষের মধ্যে কোন্ 'শ্রেণী' বিশেষভাবে সাহিত্যে প্রকাশযোগ্য এ নিয়ে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা ছিল। প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যেই অনন্ত বিস্ময় রয়েছে। আধুনিক কালে তাই জাতি বা শ্রেণী হিসাবে মানুষের মূল্য দেওয়া হয় না। আধুনিক সাহিত্য সেইজন্যই মনুষ্য-নির্বিশেষে মানবাত্মার সৌন্দর্য অন্বেষণে রত। অজানিত অকথিত সকল অলক্ষ্য ভাবনা-বেদনার সঙ্গে আজ সাহিত্যের সহমর্মিতা।[১১]

৮ তদেব পৃঃ ৯৩—১০৩ 'কাব্যের তাৎপর্য'

৯, ১০ তদেব পৃঃ ১০৮—৯ 'প্রাঞ্জলতা'

১১ তদেব পৃঃ ৫২—৬৩ 'মনুষ্য'

'নর নারী' প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের নারীচরিত্রের প্রাধান্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এত কাল আমাদের জাতীয় জীবনে নারীর কর্মপরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। নারী তার গৃহাঙ্গণের পরিধির মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। এজন্য পরিবারের কেন্দ্র হিসাবে নারী তার সমস্ত মন ও কর্মশক্তি নিয়ে সর্বাপেক্ষা সজীব। জীবনের লাবণ্য-সঞ্চারের জন্য এই সজীবতাই পরিবার-সমন্বিত সমাজের আশ্রয়। সাহিত্যে এই সজীবতারই প্রতিফলন।[১২] 'মনসামঙ্গলের' বেহুলা, 'চণ্ডীমঙ্গলের' ফুল্লরা খুল্লনা, বৈষ্ণবপদাবলীর শ্রীরাধা থেকে আরম্ভ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে অবধি বাংলা সাহিত্যের নারী-চরিত্রগুলি এই কারণেই এত প্রাণচঞ্চল।

সাহিত্য ও শিল্পচেতনার গভীরে কোন্ অন্তঃপ্রেরণা সক্রিয়—এ নিয়ে কবি, দার্শনিক ও সমালোচকদের কৌতূহলের অন্ত নেই। 'অখণ্ডতা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ সেই উৎস-সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। ব্যোম্ সাহিত্যিকের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছে এইভাবে—"আহরণ করে মন, আর সৃজন করে আত্মা। যোগের সকল তথ্য জানি না; কিন্তু শুনা যায়, যোগবলে যোগীরা সৃষ্টি করিতে পারিতেন। প্রতিভার সৃষ্টিও সেইরূপ। কবিরা সহজ ক্ষমতা-বলে মনটাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া অর্ধ-অচেতনভাবে যেন একটা আত্মার আকর্ষণে ভাব রস দৃশ্য বর্ণ ধ্বনি কেমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া, পুঞ্জিত করিয়া জীবনে সুগঠনে মণ্ডিত করিয়া খাড়া করিয়া তুলেন।"[১৩]

বর্তমান যুগে সাহিত্যপাঠেই পাঠকেরা তুষ্ট নয়। সাহিত্যিকের জীবনের খুঁটিনাটি অন্বেষণ ও সাহিত্যবস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ভাবটি উদগ্র হয়ে উঠেছে। এর ফলে সাহিত্যের অঙ্গবিশ্লেষণ অনেকটা শারীরতত্ত্বের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়, এ দ্বারা সাহিত্যের অনুভব-জগতের কিছুমাত্র আলোকিত হয় না। 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল'-নামাঙ্কিত রচনাটিতে এই কৌতূহলের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তীব্র মন্তব্য করেছেন। মানবমন বা শিল্প-সাহিত্যকে কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম-পদ্ধতির শৃঙ্খলে বাঁধা যায় না—একথা বৈজ্ঞানিকেরা অনেক সময় ভুলে যান।[১৪]

'ভদ্রতার আদর্শ' ও 'অপূর্ব রামায়ণ' প্রবন্ধ দুটি ঠিক সাহিত্যালোচনার শ্রেণীতে পড়ে না। আমাদের দেশে অনেক সময়ই আলস্য ও অশালীনতা বৈরাগ্যের ছদ্মবেশে দেখা দেয়। যথার্থ বৈরাগ্যের যে মহিমা, তার মূল্য স্বীকার ক'রে নিয়েই একথা বলা যায় যে, আমাদের জাতীয় জীবনে বসনে-ভূষণে আচারে-ব্যবহারে নিশ্চেষ্ট তামসিকতার লক্ষণই বেশী। এই জড়ত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কর্মে ও জীবনে পরিচ্ছন্ন ভদ্রতার আদর্শ সঞ্চার করা আমাদের কর্তব্য।[১৫]

'প্রাচীন সাহিত্য'-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের আলোচনা-প্রসঙ্গে মানবপ্রাণের চিরন্তন বিরহ-বোধের ভাবসত্যটি প্রকাশ করেছেন। 'অপূর্ব রামায়ণ' রচনাটিতেও রামায়ণকাহিনীর এক নূতন ভাবময় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে—ক্ষিতির মারফৎ। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় ব্যাখ্যা সাধারণ অর্থে 'ব্যাখ্যা' নয়। প্রাচীন-কাব্যভাবনাকে অবলম্বন ক'রে নূতন কাব্যসৃষ্টি।

'পল্লীগ্রামে' ও 'মন'—আধুনিক রম্য-রচনার সার্থক উদাহরণ। 'পঞ্চভূতে'র অন্যান্য

১২ তদেব পৃঃ ২৬—৪১ 'নরনারী'
১৩ তদেব পৃঃ ৭৮ 'অখণ্ডতা'
১৪ তদেব পৃঃ ১৪৭—১৫২
১৫ তদেব পৃঃ ১৩৫—১৪১ 'ভদ্রতার আদর্শ'

প্রবন্ধ আলোচনা-সমষ্টি, কিন্তু এ দুটিতে লেখকের একাকী মানস-সঞ্চরণ !

সভ্য পৃথিবীর জনসংঘাত থেকে দূর পল্লী-গ্রামে প্রকৃতির প্রশান্ত ছায়ায় যুগযুগান্ত ধরে মানবজীবন-প্রবাহের একটি অলক্ষ্য ধারা বয়ে চলেছে। এই গ্রামের মানুষদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—এরা সরল। "সরলতাই মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাস্থ্য।···সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া স্বভাবের সহিত একীভূত করিয়া লওয়ার অবস্থাকেই বলে সরলতা, তাহাই মানসিক স্বাস্থ্য। বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র মতামতকে মনের স্বাস্থ্য বলে না।···যাহারা সকল বিশ্বাসকেই প্রশ্ন করে এবং নানা বিপরীত ভাবকে পরখ করিয়া দেখে, তাহাদের মুখে একটা বুদ্ধির তীব্রতা এবং সন্ধানপরতার পটুত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু ভাবের গভীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য হইতে সে অনেক তফাত।"[১৬]

কিন্তু এই সরলতার গণ্ডী বড় সঙ্কীর্ণ। গ্রাম্য পৃথিবীর ক্ষুদ্র দেনাপাওনার জগতের সঙ্গে নাগরিক জগতের সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষার জগতের বিশাল ব্যাপকতার তুলনা হয় না। সেই বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে যে ঐক্যের বাণী খুঁজে পায়, তার মহত্ব হয়তো আরো বেশী। সেই কথা মনে ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "ক্ষুদ্র পরিণামের মধ্যে পরি-সমাপ্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্টভাবে থাকার মধ্যে একটি শান্তি সৌন্দর্য ও নির্ভরতা আছে, সন্দেহ নাই—আর যাহারা মনুষ্যপ্রকৃতিকে ক্ষুদ্র ঐক্য হইতে মুক্তি দিয়া বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়া যায়, তাহারা অনেক অশান্তি—অনেক বিঘ্ন-বিপদ সহ্য করে; বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হয়; কিন্তু তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে বীর এবং তাহারা যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গলাভ করে। এই বীর্য এবং সৌন্দর্যের মিলনেই যথার্থ সম্পূর্ণতা।"[১৭]

'পঞ্চভূতে'র বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানেই শেষ করা যাক। এই স্বল্পপরিসর গ্রন্থটির প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি অনুচ্ছেদে কত অসংখ্য চিন্তাসম্পদ ছড়ানো রয়েছে! কিন্তু পাঠকের মনের উপর কোন মতামতই চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা নেই। এই সাহিত্যিক পাদ-চারণায় মনীষী রবীন্দ্রনাথ সর্ব শ্রেণীর পাঠককেই তাঁর সহযাত্রী করেছেন। তাঁর বিশাল প্রবন্ধ-সাহিত্যে মননশীলতার প্রচুর উপাদান রয়েছে, কিন্তু এমন আত্মীয়তার সঙ্গসুধা অন্যত্র দুর্লভ। তাই 'পঞ্চভূত' রবীন্দ্র-প্রতিভার আর একটি দিকের একটি অনন্য উদাহরণ।

১৬, ১৭ তদেব—পৃ: ৪৪, ৪৬, ৫১ 'পল্লীগ্রাম'

তুমি

শ্রীশান্তশীল দাশ

কত কথা দিয়ে বোঝাতে তোমারে চেয়েছে কত না জনে ;
পেরেছে কি কেউ, কেমন যে তুমি—বোঝাতে ? পারেনি কেহ।
কথা দিয়ে দিয়ে বোঝানো কি যায় ? শুধুই কথার মালা
গাঁথা হয় আর পড়ে থাকে পাশে, শুকনো ফুলের বোঝা।

যে বুঝেছে তার মুখে নেই ভাষা, কথা সরে নাক' আর ;
যে দেখেছে চোখ বুজে গেছে তার, কিছু আর দেখে না সে ;
যে শুনেছে কানে ও মধুর ধ্বনি, সব শোনা তার শেষ—
হারিয়ে সে গেছে, ডুবেছে, মজেছে রূপ রস আর গানে।

কথা দিয়ে তাকে বোঝানো যায় না, দেখানো যায় না চোখে ;
শোনানো যায় না তার বাঁশী যদি কান কভু নাহি শোনে।
সে আছে এধারে, সে আছে ওধারে, সে আছে সকল ঠাঁই—
দেখার মতন চোখ চাই শুধু, আর চাই মন প্রাণ।

সকল কথার আড়াল ভেঙে সে দেখা দেবে হাসিমুখে,
শোনাবে সে গান সমুখে দাঁড়িয়ে অপরূপ রূপ ধরে ;
চোখ কান মন—সব খুশি হবে, বইবে খুশির হাওয়া—
সব চাওয়া শেষ, সব পাওয়া শেষ, শেষ সব আনাগোনা।

দেখতে চাই কি তাকে ? প্রাণ কাঁদে ? সত্যি কি ভালবাসি ?
সবার আগে এ জবাবটি চাই—জবাব চোখের জলে।
বাকী সমাধান সহজ সরল ; সে নয় দূরের কেহ—
কাছে সে রয়েছে, পাশে সে রয়েছে ডাকার অপেক্ষায়।

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[দশম অধ্যায়ের অনুবাদের জন্য 'উদ্বোধন' ৬২তম বর্ষ পৃ: ১৮৫ ও ২৪৯ দ্রষ্টব্য। বন্ধনীস্থ সংখ্যাগুলি মূল জ্ঞানেশ্বরীর শ্লোকসংখ্যা]

এই একাদশ অধ্যায়ে দুইটি রসের কথা বলা হইয়াছে—এখানে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন হইবে; 'শান্ত' রসের ঘরে 'অদ্ভুত' রস আতিথ্য স্বীকার করিতে আসিয়াছে, এবং অপর রসগুলিও আসিয়া পঙ্‌ক্তিতে বসিবার সম্মান লাভ করিয়াছে; বর-বধূর মিলনে (বিবাহ-সময়ে) যেমন বরযাত্রী-গণও বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হয়, তেমনি দেশী (মারাঠী) ভাষার সুখাসনে সমস্ত রস আসিয়া সুশোভিত হইয়াছে। পরন্তু (তাহাদের মধ্যে) শান্ত ও অদ্ভুত রস এমন ভাবে শোভা পাইতেছে যে, মনে হয় চক্ষু যেন অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে, হরিহর যেন প্রেমভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, অথবা অমাবস্যার দিনে যেমন সূর্য ও চন্দ্রের বিম্ব একত্র মিলিয়া যায়, তেমনি এই অধ্যায়ে শান্ত ও অদ্ভুত রসের ঐক্য হইয়াছে; গঙ্গা-যমুনার প্রবাহ যেমন একত্র মিশিয়াছে, তেমনি এখানে দুইটি রসের প্রয়াগ হইয়াছে, এবং তাহাতে সারা জগৎ সুস্নাত (পবিত্র) হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গীতারূপ সরস্বতী নদী গুপ্ত হইয়া আছে। এইজন্য হে শ্রোতৃবৃন্দ, ইহাকে ত্রিবেণী সঙ্গমই বলা উচিত।

জ্ঞানদেব বলিতেছেন, আমার উদার জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেব (নিবৃত্তিনাথ)-ই শ্রবণ দ্বারা এই তীর্থে প্রবেশ করা সহজ করিয়াছেন। শ্রীনিবৃত্তিদেব ইহার (গীতার) সংস্কৃত ভাষারূপ গহন তীর ভাঙিয়া মারাঠী শব্দের সোপান প্রস্তুত করিতেছেন। এইজন্য এখানে যে কেহ স্নান করিয়া প্রযাগে বিরাটস্বরূপ মাধব-দর্শনের ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিতে' পারে এবং তদ্দ্বারা সংসারের (জন্ম-মরণের) তিলাঞ্জলি দিতে পারে। (১০)

আর অধিক কি বলিব? এই অধ্যায়ে রসভাব এমন মূর্তিমান্ হইয়া প্রকট হইয়াছে যে, ইহা যেন শ্রবণসুখের সাম্রাজ্য; এখানে 'শান্ত' ও 'অদ্ভুত' রস প্রকট হইয়াছে, আর অন্য রসেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহা অল্পই বলা হইল ;এখানে মোক্ষ-প্রাপ্তির পথই উন্মুক্ত হইয়াছে।

ইহাই একাদশ অধ্যায়, যাহা ভগবানের নিজের আবাসস্থান; পরন্তু ভাগ্যবান্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন এখানেও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আর শুধু অর্জুন কেন? যে এখানে আসিতে চায় তাহারই শুভদিন উপস্থিত, কারণ গীতার্থ (মারাঠী) ভাষায় প্রকট হইল; এইজন্য এখন আমার মিনতি শ্রবণ করুন, সজ্জন আপনারা, এখন এদিকে মনোযোগ দিন।

অহো, যদিও আপনাদের ন্যায় সন্তজনের সভায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের যোগ্যতা আমার নাই, তথাপি আপনারা আমাকে স্নেহে-প্রেমে সন্তানের মতো মানিয়া লউন। অহো, তোতাকে আপনারা বুলি শিখান, তাহার মুখে ঐ শিখানো বুলি শুনিয়া আপনারা কি মাথা দোলাইতে থাকেন না? কিংবা বালকের কৌতুকপূর্ণ ক্রিয়া দেখিয়া কি মাতা আনন্দিত হন না?

তেমনি আমি যাহা বলিতেছি, হে প্রভু, তাহা আপনারাই শিখাইয়াছেন, অতএব হে দেব, আপনারা আপনাদের নিজের কথাই শুনুন। ব্রহ্মবিদ্যার যে মধুর বৃক্ষ (চারা) আপনারা রোপণ করিয়াছেন, অবধানরূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়া এখন তাহাকে বাড়াইয়া তুলুন।

এই বৃক্ষ রসভার-স্বরূপ ফুলে ও নানা ফলভারে ভরিয়া উঠিয়া আপনাদের প্রসাদে জগতের উপকারী হইবে। (২০) এই কথায় সন্তগণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তুমি ভালই করিয়াছ, আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এখন অর্জুন কি বলিলেন, তাহাই বল।

তখন নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতে লাগিলেন: আমি সাধারণ মনুষ্য, 'কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ' কি বলিতে জানি ? পরন্তু আপনারাই আমাকে বলাইবেন। অহো, বনের পত্রভোজী বানরগণ কি লঙ্কেশ্বরকে পরাভূত করিয়াছিল ? একা অর্জুন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে পরাজিত করেন নাই। সমর্থ ব্যক্তি সাহায্যকারী হইলে চরাচরে কিনা হয় ? আপনারা সন্তজন সহায় হইয়া আমার দ্বারা এই গীতার্থ বলাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত গীতারই ভাবার্থ আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

এই গীতা-গ্রন্থের কি আশ্চর্য মাহাত্ম্য ! বেদপ্রতিপাদ্য দেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে গ্রন্থের বক্তা—যাহা শ্রীশম্ভুরও ধ্যানের অগম্য, তাহার গৌরব কিরূপে বর্ণনা করিব ? এখন মনে মনে তাহার বন্দনা করাই ভাল। বিশ্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া কিরীটী প্রথমে কি করিবার উপক্রম করিলেন, তাহাই শুনুন; সারা বিশ্বই ঈশ্বরের রূপ—অর্জুনের মনে এই প্রকার যে প্রতীতি (অনুভব)-গত দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহা বাহিরে নয়নগোচর হউক।

ইহাই তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, পরন্তু ভগবানকে এ সম্বন্ধে কিছু বলাও (অর্জুনের পক্ষে) সঙ্কটজনক, বিশ্বরূপ অতি গূঢ় রহস্য; তাহার সম্বন্ধে কেমন করিয়া প্রশ্ন করা যায় ? (৩০)

তিনি (মনে মনে) বলিলেন, 'যাহা পূর্বে কখন কোন প্রেমী ভক্ত জিজ্ঞাসা করে নাই, সহসা কেমন করিয়া বলি, তাহাই আমাকে দেখাইয়া দিন।' অর্জুন ভাবিতে লাগিলেন, 'যদিও আমি তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র, তথাপি আমি কি মাতার (লক্ষ্মীদেবী) হইতেও অধিক অন্তরঙ্গ ? তিনিও এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে ভয় পান। আমার প্রতি তিনি স্নেহ প্রকাশ করেন, পরন্তু তাহা কি গরুড়ের প্রতি স্নেহের ন্যায় ? গরুড়ও একথা বলিতে সমর্থ হয় নাই। আমি কি সনকাদি হইতেও ভগবানের নিকটতর ? পরন্তু তাঁহারাও এই প্রকার বাসনা পোষণ করেন নাই। আর আমি কি প্রেমে গোকুলবাসীদের অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তর ?

তাহাদেরও তিনি বালভাব দ্বারা মোহিত করিয়াছেন, ভক্তের জন্য গর্ভবাসও সহ্য করিয়াছেন—পরন্তু বিশ্বরূপ গুপ্তই থাকিল, তাহা কাহাকেও দেখান নাই। যে গূঢ় রহস্য ইনি আজ পর্যন্ত আপনার অন্তরঙ্গের কাছেও গোপন রাখিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে আমি সোজাসুজি কি করিয়া প্রশ্ন করি ? আর যদি প্রশ্ন না করাই স্থির করি, তবে অন্তঃকরণে সুখ হইবে না, তখন আর জীবিত থাকিয়া কি করিব ? অতএব এখন অল্প স্বল্প কিছু জিজ্ঞাসা করিব, ভাগ্যে যাহাই থাকুক। এই ভাবে পার্থ ভীত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। পরন্তু এমন প্রেমের সহিত বলিলেন যে, দু-একটি প্রশ্নোত্তরের পরেই ভগবান আপনার সমগ্র বিশ্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া

দেখাইলেন, বৎসকে চোখে দেখিয়াই গাভী যেমন প্রেমবশতঃ চট্‌পট্ উঠিয়া দাঁড়ায়, বৎস স্তনে মুখ দিলে কি গাভী দুগ্ধ ধরিয়া রাখে? (৪০) তেমনি পাণ্ডবের নামেই যে শ্রীকৃষ্ণ বনের মধ্যে (তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য) দৌড়াইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে অর্জুন প্রশ্ন করিলে তিনি কি চুপ করিয়া থাকিবেন? তিনি স্বভাবতই স্নেহস্বরূপ, আর অর্জুন স্নেহপিপাসু—এ মিলনে যে ভিন্নতা থাকিবে, ইহাই আশ্চর্য। অতএব অর্জুন বলিতেই ভগবান আপনিই বিশ্বরূপ হইয়া যাইবেন—ইহাই প্রথম প্রসঙ্গ, আপনারা শ্রবণ করুন। অর্জুন উবাচ—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

পার্থ ভগবানকে বলিলেন, হে কৃপানিধি, আপনি আমার জন্যই যাহা অবর্ণনীয় তাহাও প্রকট করিয়া বলিয়াছেন। যখন (পঞ্চ) মহাভূত ব্রহ্মে লীন হয় আর জীব ও মহদাদি লয়প্রাপ্ত হয়, তখন পরব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান করেন—তাহাই তাঁহার বিশ্রামস্থল; যে স্বরূপ আপনি কৃপণের ন্যায় হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, যাহা আপনি বেদের কাছেও গোপন করিয়াছেন, তাহা আপনি আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন; যে অধ্যাত্ম-বস্তুর জন্য শঙ্কর সমস্ত ঐশ্বর্য (আরতি করিয়া) পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বস্তু (জ্ঞান) হে স্বামিন্, আপনি আমাকে দান করিয়াছেন—একথা বলিলে আমি আপনার স্বরূপ দেখিব কিরূপে?

পরন্তু মোহের মহা বন্যায় আমাকে মস্তক পর্যন্ত ডুবিতে দেখিয়া হে শ্রীহরি, আপনি নিজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সত্যই আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন; এক আপনি ভিন্ন এই বিশ্বে দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, পরন্তু আমার কর্ম দেখুন—'আমি আমি' এই প্রকার কথাও আমি বলিতেছি। (৫০)

'আমি অর্জুন' এই দেহাভিমান পোষণ করিয়া কৌরবগণকে আমার স্বজন মনে করিতেছিলাম; শুধু ইহাই নহে, ইহাদের বধ করিয়া 'আমি কি পাপে লিপ্ত হইব?'—এই দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলাম—আপনি আমাকে জাগ্রত করিয়াছেন। হে দেব, হে লক্ষ্মীপতি, নিজের নিত্য বসতি ত্যাগ করিয়া আমি অলীক গন্ধর্বনগরীতে গিয়াছিলাম, জলপান করিবার ইচ্ছায় আমি মৃগজল পান করিতে ছুটিয়াছিলাম; বস্ত্রনির্মিত (মিথ্যা) সর্পের দংশনে আমি সত্যই বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলাম—এই বৃথা মরণ হইতে আমাকে বাঁচাইয়া আপনি শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি করাইয়াছেন। আপন প্রতিবিম্ব না বুঝিয়া কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িতে গেলে যেমন অপর কেহ ধরিয়া ফেলে, তেমনি আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন; নতুবা শুনুন, আমার এতটা নিশ্চয়তা হইয়াছিল যে, সপ্ত সমুদ্রও যদি একত্র মিলিয়া যায়, যুগক্ষয়ে প্রলয় হইয়া সমস্ত জগতের অস্ত হয়, অথবা আকাশ ভাঙিয়া পড়ে, তথাপি আমার গোত্রজগণের সহিত আমি যুদ্ধ করিব না। এইরূপ অহংকারের আধিক্যে আমি ডুবিতেছিলাম। ভাগ্যে আপনি নিকটে ছিলেন, নতুবা কে আমাকে উঠাইত?

আমি মিথ্যাই আমার অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছিলাম। আর যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার নাম গোত্র আখ্যা দিয়াছিলাম, এইভাবে ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, পরন্তু আপনিই রক্ষা

করিয়াছেন ; পূর্বে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড (লাক্ষানির্মিত জতুগৃহ) হইতে বাঁচাইয়াছেন। তাহাতে শুধু দেহেরই ভয় ছিল, এখন এই ভয়রূপ দ্বিতীয় অগ্নিকুণ্ডে মনের সঙ্কট হইয়াছিল। (৬০)

দুরাগ্রহরূপ হিরণ্যাক্ষ আমার বুদ্ধিরূপ বসুন্ধরাকে কুক্ষিতলে লইয়া মোহরূপ সমুদ্রের তলদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সেখানে আপনারই সামর্থ্যে পুনরায় আমার বুদ্ধি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল. আমার বুদ্ধি-উদ্ধারের জন্য আপনাকে যেন দ্বিতীয়বার বরাহ হইতে হইল, আপনার কৃতিত্ব এমনই অপার যে, একমুখে আমি তাহার কি বর্ণনা করিব ? পরন্তু আপনি আমার জন্য আপনার পঞ্চ প্রাণই সমর্পণ করিয়াছেন, ইহার কিছুই বৃথা যাইবে না। হে দেব, আপনি আমার মায়ার আদ্যন্ত (সমূল) নিরসন করিয়াছেন। ইহাতে আপনার উত্তম যশঃপ্রাপ্তি হইল।

হে প্রভু, আনন্দ-সরোবরে কমলের ন্যায় আপনার নেত্র ! যাহার উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার কি আর মোহ উৎপন্ন হয় ? ইহা অতি হীন কল্পনা ! মৃগজলের বৃষ্টি বড়বানলের কি করিবে ? আর আমার কথা ধরিলে হে কৃপানিধি, আমি আপনার কৃপার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মরসের আস্বাদন করিতেছি। তাহা দ্বারা যে আমার মোহ চলিয়া যাইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ? আপনার চরণস্পর্শে আমার উদ্ধার হইয়া গেল।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

হে কমলনেত্র, হে কোটিসূর্যপ্রভ মহেশ্বর, আজ আপনার নিকট শুনিলাম, এই ভূতগ্রাম কোথা হইতে উৎপন্ন হয় এবং লয়প্রাপ্ত হইয়া কোথায় যায়। হে দেব, সেই প্রকৃতির বর্ণনা আপনি আমার কাছে করিয়াছেন। (৭০) আর প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া সেই পরমপুরুষের মূল স্থান দেখাইয়াছেন, যাঁহার মহিমারূপ আচ্ছাদনে বেদ সবস্ত্র হইয়াছে : শব্দরাশি (বেদ) যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবিত আছে অথবা ধর্মরূপ রত্ন প্রসব করিতেছে—ইহা তাঁহারই চরণ সেবা করিতেছে বলিয়া সম্ভব।

এইভাবে যিনি সকল সাধনমার্গের একমাত্র ধ্যেয়, যাঁহার স্বরূপ শুধু আত্মানুভব দ্বারাই আস্বাদন করা যায়, সেই পরব্রহ্মের অগাধ মাহাত্ম্য আপনি আমাকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন , আকাশ মেঘনির্মুক্ত হইলে যেমন দৃষ্টি সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, কিংবা হস্তদ্বারা শৈবাল সরাইয়া ফেলিলে যেমন জল দেখা যায়, অথবা সর্পের বেষ্টনী দূরীভূত হইলে যেমন চন্দন-বৃক্ষকে আলিঙ্গন করা যায়, অথবা যক্ষ পলায়ন করিলে যেমন ধনভাণ্ডার হস্তগত হয়—তেমনি প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা দূরে সরাইয়া আপনি আমার বুদ্ধিকে পরতত্ত্বের শয্যায় শয়ন করাইয়াছেন। এইজন্য হে দেব, আমার অন্তঃকরণে এ-বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে। পরন্তু হে দেব, আর একটি ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে ; সঙ্কোচ করিয়া যদি বলি, 'থাক্' (অর্থাৎ জিজ্ঞাসা না করি), তবে আর কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব ? আপনি ভিন্ন কি আর অন্য কোন আশ্রয় আছে ? জলচর যদি জলে আশ্রয় লইতে সঙ্কোচ করে, বালক যদি স্তনপান করিতে না চায়, তবে তাহার বাঁচিবার আর কি উপায় আছে ? সুতরাং সঙ্কোচ করিব না, যাহা ইচ্ছা হয়

আপনাকে প্রশ্ন করিব। তখন ভগবান বলিলেন, 'বেশ, তোমার যাহা জানিতে ইচ্ছা হয়, বল'।(৮০)

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

তখন কিরীটী বলিলেন: আপনি যে উপদেশ দিলেন তাহাতে আমার অন্তভবের দৃষ্টি শান্ত হইয়াছে; এখন—যাহার সঙ্কল্পে এই লোক-পরম্পরার আরোপ হয়, যাহাকে আপনি স্বয়ং 'আমি' বলিতেছেন, আপনার সেই মূলস্বরূপ, যাহা হইতে আপনি সুরগণের কার্যের নিমিত্ত দ্বিভুজ চতুর্ভুজরূপে বারংবার অবতার-গ্রহণ করিয়া থাকেন, শেষ-শয়ন শ্রীবিষ্ণুর রূপ ঢাকিয়া মৎস্যকূর্মাদিরূপে লীলা সমাপ্ত হইলে যেখানে আপনি এই সব সগুণরূপ সংবরণ করিয়া রক্ষা করেন, উপনিষদ্ যাঁহার মহিমা কীর্তন করে, যোগিগণ হৃদয়ের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিয়া (অন্তর্মুখী হইয়া) যাঁহার দর্শন পান, যাঁহাকে সনকাদি ঋষিগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন, এইরূপ অগাধ যে আপনার বিশ্বরূপ, যাহার কথা আমি কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা দেখিবার জন্য আমার চিত্ত উতলা হইয়াছে। আমার সঙ্কট দূর করিবার প্রেমবশতঃ যখন আমার মনের ইচ্ছা জানিতে চাহিয়াছেন, তখন বলিলাম, ইহাই আমার মনের বৃহৎ কামনা। আপনার সমগ্র বিশ্বরূপ আমার দৃষ্টিগোচর হউক। মনে এইরূপ এই বৃহৎ আশাই জাগিতেছে।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

পরন্তু আর একটা কথা আছে—আপনার বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য আমার যোগ্যতা আছে কিনা, আমি জানি না। রোগী কি রোগের নিদান জানে? (৯০)

আর্তির উৎকণ্ঠা প্রবল হইলে আর্ত আপনার যোগ্যতা ভুলিয়া যায়, যেমন তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তি বলে—সমুদ্রেও আমার তৃষ্ণা মিটিবে না, তেমনি প্রবল আকাঙ্ক্ষার মোহে আমি নিজেকে সামলাইতে পারিতেছি না। মাতা যেমন শিশুর যোগ্যতা জানেন, তেমনি হে জনার্দন, আপনিই আমার যোগ্যতা বিচার করুন, আর বিশ্বরূপ দেখাইবার উপক্রম করুন; তবে এমনিভাবে কৃপা করুন (কৃপা করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করান); নতুবা বলুন, তাহা হইবে না; দেখুন, বধিরের সম্মুখে পঞ্চমস্বরের আলাপ বৃথা, তাহা তাহাকে কি করিয়া সুখ দিতে পারে?

এক চাতকের তৃষ্ণা উপলক্ষ করিয়া মেঘ কি সারা জগতের জন্য বর্ষণ করে না? পরন্তু বৃষ্টি হইলেও পাহাড়ের উপর তাহা ব্যর্থ হয়; চকোর চন্দ্রামৃত প্রাপ্ত হয়—অপরকে কি শপথ দিয়া উহা পান করিতে নিষেধ করা হয়? পরন্তু চক্ষু বিনা (চন্দ্রের) প্রকাশ বৃথাই যায়।

অতএব আপনি সহসা (অবিলম্বে) বিশ্বরূপ দেখাইবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কারণ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে আপনি নিত্য নূতন (আপনার স্বরূপ অদ্ভুত অলৌকিক), আমি জানি আপনার ঔদার্য স্বতন্ত্র, দিবার সময় আপনি পাত্রাপাত্র বিচার করেন না, কৈবল্যের ন্যায় পবিত্র বস্তু কি আপনি শত্রুকেও দেন নাই? মোক্ষ সত্যই দুষ্প্রাপ্য, পরন্তু তাহাও আপনার চরণ সেবা করে—সেইজন্য আপনি তাহাকে যেখানে প্রেরণ করেন, ভৃত্যের ন্যায় সে

সেখানেই যায় ; পুতনা—যে আপনাকে বিষাক্ত স্তন পান করাইতে আসিয়াছিল, তাহাকেও আপনি সাযুজ্য মুক্তি দান করিয়াছেন। (১০৬)

রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত ত্রিভুবনের সভাসদ্গণের সম্মুখে শত দুর্বাক্য দ্বারা যে আপনার অপমান করিয়াছিল, সেই শিশুপালকে কি আপনি আপনার পদ (স্বরূপ) প্রদান করেন নাই? আর উত্তানপাদের পুত্রের কি ধ্রুবপদে আকাঙ্ক্ষা ছিল? সে পিতার অঙ্কে বসিবে বলিয়াই বনে আসিয়াছিল, পরন্তু সে আজ সূর্যাদির ন্যায় পূজ্য হইয়াছে। এইভাবে হে প্রিয়, আপনি কত আশ্চর্য দান করিয়া আর্ত ভক্তেরও বশ্য হইয়াছেন! পুত্রকে দেখিতে দেখিতে অজামিল ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে (ভৃগুঋষি) আপনার বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিল, হে প্রভু, আপনি তাহার (চরণ-) চিহ্ন ধারণ করিতেছেন—এখন পর্যন্ত আপনি আপনার বৈরীর (শঙ্খাসুরের) কলেবর (শঙ্খ) ভুলিতে পারেন নাই। এইভাবে আপনি অপকারীর উপকার করেন, অপাত্রের প্রতিও আপনি উদার ; আপনাকে সর্বস্ব দান করিয়াছে বলিয়া আপনি বলি-রাজার দ্বারপাল হইয়াছেন ; যে গণিকা কখনও আপনার আরাধনার কথা শ্রবণ করে নাই, সে কৌতুকে শুকপক্ষীকে রাম-নাম উচ্চারণ করাইত বলিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠের সুখভোগের সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার নানা অছিলায় আপনি স্বেচ্ছায় আপন পদ (মুক্তি) প্রদান করিয়া থাকেন,—আমার জন্য কি আপনি অন্য কিছু করিবেন? আপন দুগ্ধের আধিক্যে যে জগতের অভাব দূর করে, সেই কামধেনুর বৎসই কি ক্ষুধার্ত থাকিবে? অতএব হে দেব, আমি যাহা আপনার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তাহা যে আপনি দেখাইবেন না, ইহা হইতেই পারে না—পরন্তু আমার দেখিবার যোগ্যতা আছে কিনা বিচার করুন। (১১০) হে গোপাল, আপনার বিশ্বরূপ দেখিতে পাই, এইরূপ করুন ; হে দেব, আমার ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

সুভদ্রাপতি যখন এই প্রকার বারংবার মিনতি করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, তখন ষড়্গুণৈশ্বর্যের আধার শ্রীকৃষ্ণ আর থাকিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কৃপামৃতপূর্ণ সজল মেঘ, আর অর্জুন সমাগত বর্ষাকাল ; অথবা শ্রীকৃষ্ণ কোকিল, অর্জুন বসন্ত ; এই জন্য পূর্ণচন্দ্রবিম্ব দেখিয়া যেমন ক্ষীর সমুদ্র উছলিয়া উঠে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে দ্বিগুণ উল্লসিত হইলেন, এবং সেই প্রসন্নতার আবেশে কৃপাপরবশ হইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'হে পার্থ, দেখ, আমার অপরিমেয় অসংখ্য স্বরূপ দেখ। অর্জুনের একটি বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ সমস্তই বিশ্বরূপময় করিলেন। ভগবানের উদারতা অপরিমিত, তিনি সর্বদা যাচকের ইচ্ছা পূর্ণ করেন, তাহার ইচ্ছার সহস্রগুণ স্বেচ্ছায় দান করিয়া থাকেন। অহো, শেষনাগের (সহস্র) চক্ষুও যাহা হইতে বঞ্চিত, যে গুহ্য রহস্য শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতেও ভগবান গোপন রাখিয়াছেন। পার্থের অশেষ সৌভাগ্য যে, সেই রহস্য অনেকভাবে প্রকট করিয়া ভগবান এখন বিশ্বরূপ-প্রদর্শনের একটি জলপ্রপাত সৃষ্টি করিলেন।

জাগ্রত (মানুষ) স্বপ্নাবস্থায় গিয়া যেমন নিজেই স্বপ্নে দৃষ্ট সমস্ত বস্তুই হইয়া যায়, তেমনি তিনি নিজেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হইয়া গেলেন। (১২০) সহসা মনুষ্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনের স্থূলদৃষ্টির যবনিকা সরাইয়া দিলেন ; কিংবহুনা, আপনার যোগনিধি প্রকট করিয়া দেখাইলেন ;

পরন্তু অর্জুন ইহা দেখিতে সমর্থ হইবেন কি না, তাহা তাঁহার স্মরণেও ছিল না—একেবারে স্নেহাতুর হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'দেখ, দেখ'। শ্রীভগবানুবাচ—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

হে অর্জুন, তুমি একটি বিশ্বরূপ দেখাইতে বলিয়াছিলে, শুধু তাহা দেখাইলে কি আর দেখানো হইত? এখন দেখ, সারা বিশ্বই আমার রূপে ভরিয়া গিয়াছে। একটি সূক্ষ্ম একটি স্থূল, একটি হ্রস্ব একটি বিশাল, কোনটি সসীম কোনটি বা অসীম, কোনটি অনিয়ন্ত্রিত, কোনটি প্রাঞ্জল; কেহ সচল কেহ নিশ্চল, কেহ উদাসীন, কেহ প্রেমময়; কেহ বা তীব্র, কেহ বিচলিত; কেহ সুলভ কেহ গম্ভীর; কেহ উদার, কেহ কৃপণ; কেহ ক্রোধী, কেহ শান্ত; কেহ সদা মদোন্মত্ত, কেহ শুদ্ধ; কেহ আনন্দিত, কেহ গর্জনশীল: কেহ নিঃশব্দ, কেহ সৌম্য; কেহ সকাম, কেহ বিরক্ত; কেহ জাগ্রত, কেহ নিদ্রিত; কেহ পরিতুষ্ট, কেহ আর্ত; কেহ প্রসন্ন, কেহ সুপূজিত; কেহ শাস্ত্রজ্ঞ, কেহ অসঙ্গ; কেহ স্বতন্ত্র (নিঃশব্দ) কেহ উগ্র, কেহ বা অতিমিত্র; কেহ সমাধিস্থ; কেহ জননলীলা-বিলাসী, কেহ বা স্নেহে পালনশীল, কেহ ক্রোধে সংহারকর্তা, কেহ বা সাক্ষী ভূত। (১৩০)

এইভাবে নানাবিধ, অনেকানেক, দিব্যতেজ-প্রকাশযুক্ত রূপ আছে—ইহাদের মধ্যে একটি অপর কোনটির সঙ্গে বর্ণে একপ্রকার নহে। কেহ তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, কেহ ঘোর কপিলবর্ণ, কেহ যেন সিন্দূরমণ্ডিত আকাশের ন্যায় রক্তবর্ণ। কেহ স্বভাবতঃ সুন্দর, যেন রত্নমাণিক্যখচিত ব্রহ্মাণ্ড, কেহ বা অরুণোদয়ের ন্যায় কুসুমবর্ণ, কেহ নির্মল স্ফটিকের ন্যায় সহজভাবে উজ্জ্বল, কেহ ইন্দ্রনীলের ন্যায় সুনীলবর্ণ, কেহ কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কেহ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় পীতবর্ণ, কেহ নবজলদশ্যামল, কেহ সুবর্ণ চম্পকের ন্যায় নির্মল গৌরবর্ণ, কেহ বা হরিদ্বর্ণ, কেহ তপ্ত তাম্রের ন্যায় রক্তবর্ণ, কেহ শ্বেত চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র (নির্মল)—এইরূপ আমার নানা বর্ণের রূপ দর্শন কর। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, তেমনি প্রকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের—কাহারও এমন সুন্দর রূপ যে কন্দর্পও লজ্জিত হইয়া শরণ লয়। কেহ আকারে লাবণ্যভূষিত, কেহ দেখিতে অতি মনোহর—যেন সৌন্দর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে। কেহ মাংসল ও পুষ্ট অবয়বযুক্ত, কেহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অতি করাল, কেহ দীর্ঘবপু, স্বচ্ছকান্তি, কেহ বা বিকট (কুরূপ)।

হে সুভদ্রাপতি, এইরূপ নানাবিধ আকৃতি আছে, তাহাদের সংখ্যার সীমা নাই—ইহাদের এক এক অঙ্গের প্রান্তে সারা জগৎ দেখিতে পাইবে। (১৪০)

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥৬॥

আমার দৃষ্টির উন্মীলন হইলেই আদিত্যাদির সৃষ্টি হয়। পুনর্বার নিমীলন হইলেই তাহারা লয়প্রাপ্ত হয়; (আমার) মুখের বাষ্প (উষ্ণশ্বাস) বাহির হইলেই সমস্ত জ্বালাময় হইয়া যায়, যাহা হইতে পাবকাদি বস্তুসমূহ উৎপন্ন হয়, আর ক্রোধে ভ্রূকুটী করিলেই (ভ্রূর প্রান্ত এক জায়গায় মিলিত হইলেই) রুদ্রসমূহের (একাদশ রুদ্রের) অবতার হয়। সৌম্য ভাব হইতে যুগল অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়, হে পাণ্ডব, কর্ণ হইতে অনেক বায়ুর উৎপত্তি হয়;

এইভাবে এক একটি লীলায় দেব ও সিদ্ধগণের জন্ম হয়— এইরূপ অপার (অসংখ্য) ও বিশাল রূপ দেখ। যাহার বর্ণনা করিতে বেদের বাণী কুণ্ঠিত হয়, দর্শন করিতে কালেরও আয়ু ফুরায়, যাহার অন্ত স্বয়ং ব্রহ্মাও পান না, দেবত্রয়ও যাহার নাম শুনেন নাই, সেইসব অনেক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য ও কৌতুককর মহাসিদ্ধি উপভোগ কর।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭॥

হে কিরিটি, দেখ এই মূর্তির রোমকূপে সৃষ্টি ভরা রহিয়াছে—পর্বতে বৃক্ষের তলায় তৃণাঙ্কুর যেমন থাকে। আর বাতায়নের অন্তরালে যেমন পরমাণু উড়িতে দেখা যায়, তেমনি এই মূর্তির (প্রত্যেক) অবয়ব-সন্ধিতে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে; ইহার একটি অঙ্গপ্রদেশে বিশ্বের বিস্তার দেখ, আর যদি বিশ্বের অপর পারে কোনও বস্তু দেখিবার ইচ্ছা মনে উদয় হয় (১৫০)—তবে সে-বিষয়েও কোন সঙ্কট (বাধা) নাই—তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার দেহে সুখে দেখিতে পাইবে।

এইভাবে বিশ্বমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ করুণাভরে কহিলেন, তখনও অর্জুন দেখিতেছেন কিনা, তাহা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অর্জুন কেন স্তব্ধ হইয়া আছেন, জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাকাইয়া দেখিলেন, অর্জুন পূর্বের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ (মনে মনে) বলিলেন—ইহার উৎকণ্ঠা কমে নাই, এখন পর্যন্ত (আত্ম) সুখের স্বরূপ প্রাপ্তি হয় নাই—আমি যে (বিশ্বরূপ) দেখাইলাম, তাহা যথার্থভাবে বুঝিতে পারে নাই। এইভাবে বলিয়া ভগবান সহাস্যে সম্মুখস্থ অর্জুনকে বলিলেন, 'আমি যে বিশ্বরূপ দেখাইলাম, তুমি তাহা দেখিলে না?' ইহা শুনিয়া বিচক্ষণ অর্জুন বলিলেন, 'প্রভু, ইহা কাহার দোষ? আপনি বককে চন্দ্রামৃত পান করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। অহো, আপনি দর্পণ মার্জন করিয়া অন্ধকে দেখাইতে বসিয়াছেন, হে হৃষীকেশ, আপনি বধিরকে সঙ্গীত শুনাইতেছেন। হে শার্ঙ্গধর, আপনি ভেকের সম্মুখে মকরন্দরেণুর খাদ্য পরিবেশন করিয়া বৃথাই কষ্ট করিয়াছেন, এখন কাহার উপর ক্রোধ করিতেছেন? যাহা অতীন্দ্রিয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, যাহা কেবল জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারাই অনুভব করা যায়, তাহা আপনি চর্মচক্ষুর সম্মুখে রাখিলে আমি কি করিয়া দেখি? পরন্তু আপনার ত্রুটি না ধরিয়া চুপচাপ সহ্য করাই ভাল।'

ইহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন: বৎস, তোমার কথাই মানিয়া লইলাম। ইহা ঠিকই যে বিশ্বরূপ দেখাইতে হইলে প্রথমে তোমাকে দেখিবার সামর্থ্য দিতে হইবে (১৬০)— পরন্তু তোমাকে বলিতে গিয়া প্রেমভাবে আমি ভুলিয়া গিয়াছি, তুমি চাষ না করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলে যেমন সময় নষ্ট হয় তেমনি হইয়াছে—এখন তোমাকে এমন দৃষ্টি দান করিব, যাহা দ্বারা তুমি আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে। হে পাণ্ডব, এই দৃষ্টি দ্বারা আমার সমস্ত ঐশ্বর্য-যোগ দেখিয়া

আত্মানুভবের মধ্যে প্রবেশ করিবে। এইভাবে বেদান্তবেদ্য, সকল লোকের আদিকারণ জগতের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন। সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥

ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া সঞ্জয় কহিলেন: হে কৌরবকুল-চক্রবর্তি, আমার বারংবার ইহাই বিস্ময় বোধ হইয়াছে যে, ত্রিজগতে লক্ষ্মী হইতে অধিকতর ভাগ্য আর কাহার আছে? অথবা জগতে তত্ত্বকথা-বর্ণনায় শ্রুতি (বেদ) হইতে কি কেহ বেশী শক্তি দেখাইয়াছে? কিংবা সেবাশক্তির কথা ধরিলে তাহা এক শেষনাগের অঙ্গেই আছে; অহো, ভগবৎ-সেবার উৎকট ইচ্ছায—যোগীর ন্যায় অষ্টপ্রহর একাগ্রমনে সেবা করিতে গরুড়ের সমান কি কেহ আছে?

পরন্তু ইহাদের সকলকেই একধারে সরাইয়া পঞ্চপাণ্ডব যেদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই সম্প্রতি কৃষ্ণসুখ একস্থানেই আছে; এই পাঁচ জনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আবার অর্জুনের অধীন হইয়াছেন, পুরুষ যেমন মনোরমা নারীর অধীন হইয়া যায়; পড়ানো পাখীও এরূপ বলে না, ক্রীড়ামৃগও এরূপ ছন্দে চলে না (আজ্ঞামত ক্রীড়া করে না),—জানি না কি করিয়া অর্জুনের ভাগ্য এমন অনুকূল হইল! (১৭০)

এই ভাগ্যবানের নয়ন শ্যামল পরব্রহ্মের (শ্রীকৃষ্ণের) দর্শন-সুখ ভোগ করিবার ভাগ্য লাভ করিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ কেমন ইঁহার প্রত্যেকটি বাক্য প্রেমসহকারে পালন করিতেছেন; ইনি কোপ করিলে চুপ করিয়া সহ্য করেন, রুষ্ট হইলে (অভিমান করিলে) বুঝাইতে যান;—কি আশ্চর্য, শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছি পার্থের জন্য পাগল হইয়াছেন; (মাতৃগর্ভে) বিষয়-বাসনা জয় করিয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শুকদেবের ন্যায় সমর্থ মহাত্মাগণ যাঁহার বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া ভাটের ন্যায় স্তুতি করিয়াছেন, সেই যোগিগণের সমাধিধন ভগবান এখন পার্থের অধীন হইয়াছেন—হে রাজন্, ইহাতে আমার মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়াছে।

ইহা বলিয়া সঞ্জয় পুনরায় বলিলেন: হে কৌরবপতি, ইহাতে বিস্ময়েরই বা কি আছে? শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে স্বীকার করিয়া লন, তাহার আপনা হইতেই এরূপ ভাগ্যোদয় হয়।

তখন শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলিলেন, তোমাকে এখন দিব্য দৃষ্টি দিতেছি—যাহা দ্বারা তুমি সমগ্র বিশ্বরূপ দেখিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই (অক্ষর) বাক্য সম্পূর্ণভাবে বাহির হইতে না হইতেই (অর্জুনের) অবিদ্যার অন্ধকার দূর হইল।

তাঁহার দিব্য চক্ষু প্রকট হইল, তাহা দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টি ফুটিল,—এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ আপনার ঐশ্বর্য দেখাইলেন; অবতারসমূহ যে সমুদ্রের তরঙ্গ, এই বিশ্ব-রূপ মৃগজল যাঁহার কিরণে ভাসমান হয়, যাঁহার (সঙ্কল্পরূপ) অনাদি ভূমির চিত্রপটে চরাচর এই বিশ্বের চিত্র অঙ্কিত হয়, শ্রীবৈকুণ্ঠাধিপতি আপনার সেই স্বরূপ অর্জুনকে দেখাইলেন। (১৮০)

পূর্বে যখন বাল্যকালে শ্রীপতি একবার মাটি খাইয়াছিলেন, মাতা যশোদা ক্রোধে তাঁহার হাত ধরিয়াছিলেন, ভীত হইয়া মুখ দেখাইবার ছলে যশোদাকে সেই সময়ে মুখের ভিতরে চতুর্দশ ভুবন দেখাইয়াছিলেন, অথবা মধুবনে ধ্রুবের কপোলে শঙ্খ স্পর্শ করিয়া ভগবান্ এমন করিলেন যে, সে যে-সব (তত্ত্ব) কথা বলিতে লাগিল, সেখানে বেদেরও বুদ্ধি প্রবেশ

করে না; হে রাজন্, ধনঞ্জয়ের প্রতি শ্রীহরি তেমনি অনুগ্রহ করিলেন, যাহাতে 'মায়া' কোথায় গেল তিনি জানিতেই পারিলেন না।

একসঙ্গে ভগবানের সমগ্র ঐশ্বর্য দেখিতে পাইয়া অর্জুনের চিত্ত বিস্ময়-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। মহাপ্রলয়ের জলে (ব্রহ্মলোক পর্যন্ত) সব ডুবিয়া গেলেও যেমন মার্কণ্ড ঋষি একাকী ভাসিয়া ছিলেন, পার্থও তেমনি বিশ্বরূপের মহোৎসবে ভাসমান হইয়া বলিতে লাগিলেন: এখানে যে এত বড় গগন ছিল, তাহা কে দূরে লইয়া গেল? চরাচর মহাভূতের কি হইল? দিক্‌সমূহের চিহ্নও লুপ্ত হইয়াছে, আকাশ-পাতালের কি হইল কে জানে? জাগৃতির পর স্বপ্ন-লয়ের ন্যায় সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়াছে; অথবা সূর্যের তেজে যেমন চন্দ্রতারাগণ লুপ্ত হয়, তেমনি বিশ্বরূপ সারা প্রপঞ্চকে গ্রাস করিয়াছে; তখন অর্জুনের মনে মনোধর্মের স্ফুরণ বন্ধ হইল, বুদ্ধি আর আপনাকে বরণ করিতে পারিল না, ইন্দ্রিয়ের রশ্মি (বৃত্তি)-গুলি ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল (১৯০), তখন (তটস্থ লক্ষণ) স্তব্ধ হইল, একাগ্রতাও একাগ্র হইল— যেন সকল বিচার-বুদ্ধির উপর কেহ মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। বিস্মিত আগ্রহে অর্জুন দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে যে চতুর্ভুজ মূর্তি ছিল, তাহা নানা রূপ গ্রহণ করিয়া চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিতেছে। বর্ষাকালে যেমন মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলে, কিংবা মহাপ্রলয়ের তেজ যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনি ঐ মূর্তি ভিন্ন কোথাও আর অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকিল না। (ক্রমশঃ)

অল্প ও ভূমা

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

'নাল্পে সুখমস্তি'

অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার নাহিক' সন্তোষ,
প্রাপ্তির আহুতি পড়ে লোভাগ্নি শিখায়,
জ্বালা বাড়ে, শান্তি নাই, নাহি পরিতোষ,
বুভুক্ষা-বিক্ষুব্ধ প্রাণ সুষমা হারায়।

চাওয়ার বিরাম কই? নিত্য বাড়িতেছে,
যত পায়, তত চায়, অতৃপ্তি অশেষ,
সঞ্চিত বস্তুর পিণ্ড—বোঝা জমিতেছে,
সুখের বোঝার ভারে, বাড়ে ব্যথা-ক্লেশ।

আরাম আয়াসলাভে সতত প্রয়াস,
আত্মসুখপরায়ণ যাহা কিছু পায়,
প্রাসাদ প্রমোদ-সুখ উদ্‌ভ্রান্ত বিলাস,
অল্প সব, তুচ্ছ সব, কামনা না যায়।

বৃহতের সাধনায় ক্ষুদ্র ভুলে যাও,
অমৃতের পুত্ররূপে পরিচয় দাও।

'ভূমৈব সুখম্'

অনন্তের আস্বাদনে অমৃতের স্বাদ,
পড়ে না ঘটের জলে পূর্ণ প্রতিরূপ,
সীমার গণ্ডীর মাঝে নিয়ত বিবাদ,
ক্ষুদ্রতায় অপ্রকাশ বিরাট-স্বরূপ।

বিশ্বরূপে অখণ্ডতা উপলব্ধি এলে
লভে জ্ঞান নিত্যশুদ্ধ, সত্য অনুভূতি,
সবারে বাসিয়া ভালো সদা শান্তি মেলে,
লাভের বিচারে লভে আনন্দ-বিভূতি।

ভূমার সাধনা যাঁর ভূমিতে বসিয়া,
তুচ্ছ লোভ, ক্ষুদ্র লাভে উপেক্ষিয়া চলে,
অসীম সন্ধানে যায় সীমারে লঙ্ঘিয়া,
পূর্ণ প্রেমে লভে শান্তি, আনন্দ অতলে।

খণ্ড স্থূল জীর্ণ ক্ষুদ্র, ভূমাতেই সুখ,
আরামপ্রয়াসী সদা আনন্দ-বিমুখ।

মাতৃতীর্থ জয়রামবাটী

শ্রীপুষ্পকুমার পাল

অনেকের মতো আমারও মনে হয়, শ্রীশ্রীমা সারদামণি এখনও যেন জয়রামবাটীতে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা নিজের জন্মস্থান জয়রামবাটীকে বলিতেন, 'শিবপুরী'। প্রতি বৎসর মনে হয়, মাকে তাঁহার বাটীতে দেখিয়া আসি। শহরবাসী কোন কর্মী ছেলে অবকাশ-কালে কাছাকাছি নির্জন গ্রামে তাহার মাকে দেখিতে যাওয়ার সময় যেরূপ আনন্দ অনুভব করে, জয়রামবাটীর পথে যাইতে যাইতে মনে সেইরূপ আনন্দ হয়।

এবারেও বাবা তারকনাথকে দর্শন করিয়া মোটরে যখন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জন্ম-গৌরবে মহিমান্বিত বাঙলার অতি প্রিয় তীর্থ কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর পথে অগ্রসর হইলাম, মনে সেইরূপ আনন্দ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। অবিরাম গতিস্রোতে ব্যাপ্ত কোলাহলমুখর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া এই উদার আকাশতলে পরিচ্ছন্ন শ্যামলিমার মধ্যে প্রকৃতির অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া মন স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল।

মনে হইল, এই পথ পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিতে করিতে হাঁটিয়া যাই। এই পথেই শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকবার, মাতাঠাকুরানীও কয়েকবার হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। এ পথ এখন অনেক সুগম। নদী ও নালা-গুলির উপর সেতু হইয়াছে, তরণী সাহায্যে গাড়ীসহ নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কয়েক স্থানে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বিপৎসঙ্কুল সেতুসমূহ পার হওয়া আবশ্যক হয়, তৎসত্ত্বেও মাকে দেখিতে যাওয়ার আগ্রহে এ সব বাধা-বিপত্তির কথা আর মনে হয় না।

চাঁপাডাঙ্গা, পুরসুরা, হরিণখোলা, শ্যামপুর, আরামবাগ—নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আবার পশ্চাতে দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গেল। দুইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পূর্বে কয়েকবার যাওয়া পথের দুধারে আবার নূতন করিয়া যেন সব কিছু দেখিতেছি।

এই পথে কোন্‌খানে সেই চটির অর্ধভগ্ন মৃন্ময় গৃহ ছিল?—পিতার সহিত প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পথে সারদা-দেবী জ্বরে আক্রান্ত হইয়া যে গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কোথায় সেই গৃহ, যেখানে সেই অপরূপ শ্যামবর্ণা তরুণী গভীর রাত্রে মায়ের উত্তপ্ত মাথায় তাঁহার স্নিগ্ধ শীতল হস্ত বুলাইয়া দিয়াছিলেন? পরদিন শ্রীশ্রীমায়ের জ্বর ছাড়িয়া গেল এবং পিতার উদ্বেগ নিরসন করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরের পথে পুনরায় অগ্রসর হইলেন।

তেলো-ভেলোর মাঠের কোন্ স্থানে মাতাঠাকুরানীর সেই ডাকাতবাবার সহিত দেখা হইয়াছিল, কোন্ কুটিরে সে পত্নীসহ নিজ কন্যার ন্যায় সারদাকে সারারাত্র পাহারা দিয়া জাগিয়াছিল? কোথায় সেই ক্ষেত্র এবং কে সেই ভাগ্যবান্ কৃষক, যাহার ক্ষেত্র হইতে ডাকাতপত্নী মুঠি করিয়া মটরশুঁটি তুলিয়া বিদায়কালে নবলব্ধ কন্যাকে খাইতে দিয়াছিল?

কত পুণ্যবান্ কত ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী এই পথে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মভূমি দেখিতে গিয়াছেন। কত বিপৎসঙ্কুল

ও দুর্গম পথে তাঁহারা কত কষ্টই না করিয়াছেন। মনে মনে তাঁহাদের প্রণাম জানাইলাম।

কামারপুকুর আসিয়া গেল। এক উচ্ছ্বসিত আনন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজহস্তে রোপিত আম্রবৃক্ষ ও তাঁহাদের বাড়ীর খড়ের চাল দেখিতে পাইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির, রঘুবীরের মন্দির ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য লীলাস্থল দেখিয়া ও প্রণাম জানাইয়া শ্রীশ্রীমায়ের দেশ জয়রামবাটী যাত্রা করিলাম।

জয়রামবাটী যতই নিকটস্থ হইতেছে, মনের আবেগ ততই যেন বর্ধিত হইতেছে। ইহাই কি মায়ের টান? ভক্ত হৃদয়ের ব্যাকুল মনের সত্য অভিব্যক্তি 'বাপের চেয়ে মা দয়াল'। শ্রীশ্রীমায়ের অগণিত ভক্ত, যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছিলেন ও তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন—তাঁহারা অনেকে বলিয়াছেন যে, মায়ের কাছে একবার আসিলেই হইল; হউক সে পরিচিত অথবা অপরিচিত। শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ সকলের উপর সমানভাবে বর্ষিত হইত। যে ভাবের যে স্তরের লোক হউক, সকলের প্রতি সমভাব, সকলের তৃপ্তির জন্য অকুণ্ঠ মনোযোগ। তাঁহার সেই অতুলনীয় মাতৃভাব, অপরিমেয় স্নেহ, ও সকলকে তাঁহাদের নিজ গর্ভধারিণী মাতা হইতে অধিক অভিভূত করিয়া ফেলিত। বিদায়কালে স্নেহময়ী মায়ের সেই করুণায় ভরা আঁখি যে একবার দেখিয়াছে, শ্রীশ্রীমাকে সে আর ভুলিতে পারে নাই।

এইবার মায়ের গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ধূলিচ্ছন্ন তথাপি পরিচ্ছন্ন মেঠো পথ। প্রায় সমস্ত মাটির ঘর—উপরে খড়ের চাল। প্রায় সমস্ত গৃহেই গোলাভরা ধান। শুনিলাম এবার পর্যাপ্ত ফসল ফলিয়াছে। নদীর অবিরাম জলধারার জন্য এখানকার কৃষিক্ষেত্র স্বভাবতই উর্বর। মায়ের গ্রামের পুরুষ ও নারী কেমন যেন আপনার জন বলিয়া বোধ হয়। তাহারা জানে, যে কেহ এখানে আসে, সেই মায়ের সন্তান। শ্রীশ্রীমা বলিতেন, 'আমার দেশের লোকেরা বাপু, বড় ভাল। অন্ধ যুবতীর দিকেও কেউ ফিরে তাকায় না।' মায়ের গ্রামবাসীরা যেন মায়ের অন্ততঃ একটি ভাব লইয়া আছে, সেটি তাহাদের আন্তরিকতা। গ্রামের লোক সাধারণতঃ বড় আপনার হয়। তাহাদের অতিথি-বাৎসল্যের কথাও নূতন নয়। কিন্তু এখানে যেন আন্তরিকতা বড় অন্তরের বলিয়া মনে হয়। এ বস্তু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু অনুধাবন করিতে আনন্দ হয়। একান্ত আপনার জন হইয়া কাছে বসা, পাখা লইয়া পরিশ্রান্তকে শান্ত করিবার প্রচেষ্টা, রৌদ্রতাপ হইতে আসিবার পর অনতিবিলম্বে জলপান করার জন্য সস্নেহে অনুরোধ করা, সামান্য বিষয় হইলেও আত্মার সংযোগ দৃঢ় করে। এই যে কোনরূপ প্রতিদান বা নিজের কোনরূপ স্বার্থ না রাখিয়া একান্ত আপনার জন হইয়া সব রকমে সুখ ও সুবিধা দেওয়ার প্রয়াস, এই ধারা যেন মায়ের সময় হইতে একরূপে চলিয়া আসিতেছে। মাতৃমন্দিরে সাধুরা অবশ্যই শ্রীশ্রীমায়ের এই ভাব অনুসরণ করেন, মায়ের গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীর মনেও এই ভাবধারা প্রবহমান।

প্রথমে সিংহবাহিনী দর্শন করিলাম। একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্মিত সাধারণ গৃহ। উপরে টিনের চাল। পূর্বের স্থান হইতে বিগ্রহ কিঞ্চিৎ দূরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মায়ের ধাতুনির্মিত কলস-মূর্তি। দুই পার্শ্বে মহামায়া ও চণ্ডী। ঘরের একপার্শ্বে মা-মনসার মূর্তিও আছে। আজ শনিবার, মায়ের বিশেষ পূজা।

কোনরূপ জাঁকজমক-বর্জিত মন্দিরগৃহ; কিন্তু নিকটস্থ অথবা দূরস্থ বহু গ্রামবাসী মা সিংহবাহিনীকে আজও জাগ্রত দেবী বলিয়া পূজা দিয়া থাকেন। কাহারও গৃহে নূতন কিছু উৎপন্ন হইলে মাকে নিবেদন করিতে বহু দূর হইতে গ্রামবাসীরা এখানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমাই সিংহবাহিনীকে জাগ্রত দেবী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মৃত্তিকা-গৃহ এবং যে গৃহে তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, তাহাও দেখিলাম। দাওয়া ও তৎসংলগ্ন একটি বাঁশের খুঁটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। ছবিতে দেখিয়াছি মা দাওয়ায় ঐ স্থানে বসিয়া আছেন। হাতদুটি ক্রোড়ে নিবদ্ধ, পদদ্বয় ভূমিতে সংলগ্ন; মুখমণ্ডলে স্নেহ, করুণা ও অনির্বচনীয় মৃদু হাস্যের বরাভয়-অভিব্যক্তি। অতিশয় উদ্দীপনা হইল। এই স্থানে মস্তক অবনত করা মাত্র চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। মনে হইল, মা যেন বলিতেছেন, এস বাবা, বস।

এক বৃদ্ধা আমাদের দেখিতেছিলেন। তিনি আসিয়া বসিলেন। তিনি মায়ের পিত্রালয়ের এক আত্মীয়া। মায়ের কথা বলিতে বলিতে তিনি যেন মায়ের একান্ত সান্নিধ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। একান্ত আপনার জনের ন্যায় তিনি বলিতে লাগিলেন: সে একদিনের কথা আর পাঁচজনের নিকট শুনিয়া শুনিয়া 'শ্রীশ্রীমা কে?' তাহা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। মা আমল না দিয়া অন্য কথা বলিতে লাগিলেন। আমরা কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নই, মাকে বলিলাম, যদি না বলেন আপনি সত্য সত্য কে, তবে আমরা অন্নগ্রহণ করিব না। কেহ না খাইলে অথবা কাহাকেও আহার করাইতে না পারিলে মায়ের কষ্ট হইত। মা ছিলেন অন্নপূর্ণা, সকলকে আহার করানোর মধ্যে ছিল তাঁহার সবার চেয়ে বেশী তৃপ্তি। বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন, এই কথায় মায়ের মুখ যেন চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'তোরা শুনিসনি আমি যখন হলুম, তার আগে আমার মা দেখেছিলেন, এক লাল কাপড়-পরা সুন্দর একটি মেয়ে আমার মায়ের গলা জড়িয়ে বলছে, আমি এলুম। আমার মা বলতেন, সে জগদ্ধাত্রী।'

বৃদ্ধা বলিয়া চলিলেন, 'সেই থেকে বাপু আমার বাবা বলায় রোজ একটি ক'রে ফুল সব কাজের আগে তাঁর পায়ে টপ ক'রে ফেলে পালিয়ে যেতুম। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ছবি মা পূজা করতেন। আমার একদিন মনে হ'ল ঠাকুর যদি ভগবান, আমাদের মাও ভগবতী। আমি মায়ের একটি ছবি নিয়ে তাড়াতাড়ি একদিন ঠাকুরের ছবির পাশে জুড়ে দিলুম। পরে অন্য মেয়েরা এই দেখে হাসাহাসি করতে লাগলো। তারা ব'লল, তুই কি বোকা! মা তো ঠাকুরের স্ত্রী, তাঁকে ডান পাশে বসাতে আছে? মা সব দেখে বললেন, ও ঠিকই করেছে। ঠাকুর আমায় 'মা' ব'লে পূজা করেছিলেন। ও আমার ছবি ডান পাশে রেখেছে তো কি হয়েছে?' বৃদ্ধার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি যেন অনুভব করিতে লাগিলেন, মা কাছেই রহিয়াছেন, এবং এইমাত্র যেন তাঁহাকে তিনি ঐ কথা বলিলেন।

আবার মায়ের সম্বন্ধে জানা অজানা কত কথা তিনি বলিতে লাগিলেন। আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে করিতে মায়ের ঐ সমস্ত জানা কথাগুলি পুনরায় শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গেলাম।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের লজ্জাশীলতার কত কথা বলিতে লাগিলেন: গৌরীমা খুব রাশভারী ছিলেন। তিনি জমিদারবাবুকে নিয়ে মায়ের বাড়ী এলেন। জমিদারবাবু মাকে প্রণাম জানালেন। মায়ের তো এক-গলা ঘোমটা। গৌরীমা বললেন, 'আজ তুমি ধন্য হ'লে। তুমি সত্যই ভাগ্যবান্ যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী মা তোমার প্রজা। কিছু প্রসাদ পাও।' মা এদিকে গৌরীমাকে ক্রমাগত ইসারা-ইঙ্গিতে থামাতে চাইছেন চাপা গলায়। তিনি বললেন, 'ও গৌরীদাসী এ রাজা যে।' গৌরীমা বললেন, 'ওসব রাজা খাজা বুঝি না, যা সত্যি তাই বললুম।' মা লজ্জায় আবো জড়োসড়ো হ'য়ে বসে রইলেন।

কয়েকবার দেখা জয়রামবাটী আবার নূতন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। সমস্ত গ্রামই শ্রীশ্রীমার পাদস্পর্শে ধন্য। মায়ের বাড়ী, মায়ের মন্দির, মায়ের পুকুর, মায়ের দীঘি, মায়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখিয়া বেড়াইলাম। মাতৃমন্দিরে মায়ের সর্বত্যাগী সন্তানগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া পরম আনন্দিত হইলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা, তাঁহার জীবনচরিত্র, তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী অসামান্য ও অপূর্ব বোধ হয়। জীবশিক্ষার জন্য আমাদের জগদ্ধাত্রী মা সংসারের যাবতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সংসারী ব্যক্তি বহু সমস্যার মধ্যে থাকিয়াও অপূর্ব আনন্দ ও অনির্বচনীয় সুখে বসবাস করিতে পারে। সে পথ সকলকে ভালবাসা, কোন কিছুতে বিরক্ত না হওয়া। কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে এই কথাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল। শ্রীশ্রীমা কত অসুবিধার মধ্যে নিজ কর্তব্যে অবিচল থাকিতেন। নিজ আত্মীয় পরিজনের কত সমস্যা, হাজার হাজার সন্তানের কত অসহনীয় অনুযোগ ও বিরক্তিকর ব্যবহার কোন কিছুই মায়ের চরিত্রের এই অপূর্ব মাধুর্যকে ম্লান করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার সর্বশেষ উপদেশ—'দোষ দেখবে নিজের; জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখ।'

জয়রামবাটীর মাতৃমন্দির ও মায়ের বাড়ী হইতে যখন প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিলাম, তখন কেবলই মনে হইতে লাগিল যদি আরও কিছুক্ষণ থাকিতে পারিতাম। ফিরিবার পথে মনে হইতে লাগিল, মা সেইরূপ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন এবং বলিতেছেন 'আবার এস'। যাইতে যাইতে এই অনুভূতি বশতঃ ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিলাম। শ্রীশ্রীমাকে ঐরূপ দেখিবার আমার সুকৃতি কোথায়? কিন্তু তবু আর সকলের মতো মনে হয়, শ্রীশ্রীমা যেন সেখানে সেই অপরিসীম স্নেহ, সেই করুণা ও সন্তানের প্রতি একান্ত ভালবাসা লইয়া সর্ব সময় বিরাজমানা। মনে হইল, যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন মায়ের কাছে বার বার আসার আশায় দিন গণিতে থাকিব।

ত্যাগমূর্তি মা

মাহ্‌মুদা খাতুন সিদ্দিকা

'আরো দাও, আরো দাও, আরো দাও' বলি
নিত্য কাঁদে যে ধরণী,
তাহারি কোলেতে জন্ম নিলে তুমি
কিছু না চাহিলে জুড়ি পাণি।
মাথা করি নীচু তোমার যা ছিল কিছু
ক'রে গেলে দান।
ক্ষণেকের তরে নাহি মনে পড়ে
ঐশ্বর্যের মান।
তোমার তৃষ্ণার কূলে, এ সংসার হয়ে গেল মিছে,
শুধু তার লাগি প্রতীক্ষা-আসন, হৃদয়ে যতনে পাতা আছে,
তারি সৃষ্ট এ ধরণী তারি সৃষ্ট মানব-হৃদয়
সে-হৃদয় প্রেমের আধার।
যাহার করিয়া সেবা প্রেম প্রীতি হয় লাভ
আকাঙ্ক্ষা করেছ তুমি সেই অধরার।
ত্যাগের তটিনী-কূলে ক্ষণতরে কভু ভুলে
পড়েনিকো মনে
বসুধার শত সুখ, শুধু তার দাহ-দুখ
পড়েছে নয়নে।
ধরারে অনিত্য জানি তার যত সুখের সম্ভার
অক্লেশে করিয়া বিসর্জন,
যে জন সবার উর্ধ্বে যে জন প্রেমের মূর্তি
তাঁহারেই করেছ বরণ।
ধনী-দরিদ্রের ভেদ নাই, ছোট বড় সমান সবাই ;
সবারে ডেকেছ অনুরাগে,
মাতৃমন্ত্র জপি চুপে তুমিই জননী-রূপে
সর্বদা রয়েছ পুরোভাগে॥

---

* নারায়ণগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৩তম জন্মোৎসব উপলক্ষে মহিলা-সভায় পঠিত।

আমি

শ্রীমতী নলিনী ঘোষ

এই জগতে 'আমি ও আমার'—এই বোধই যত অনর্থের মূল কারণ। যতদিন 'আমি' আছে, ততদিন দুঃখ অশান্তির অন্ত নেই। 'আমি' কে? কত মহাপুরুষ, কত জ্ঞানী গুণী কত ভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। একে চেনা-জানা বড় কঠিন ব্যাপার। 'আমি'কে জানাই সাধনার প্রধান কথা—'আত্মানং বিদ্ধি' নিজেকে জানো। কিন্তু সহজে কি একে চেনা যায়? জানার আর শেষ হয় না, কবি তাই বলেছেন: 'আপনাকে এই জানা আমার

ফুরাবে না।'

আবার জেনেও শেষ করা যায় না, কারণ কে এর ইতি করবে? শেষ যে নেই—'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: দুটি 'আমি' আছে—একটি 'কাঁচা আমি', আর একটি 'পাকা আমি'। 'কাঁচা আমি'কে সরিয়ে 'পাকা আমি'কে জানতে হবে। তারপর সেই 'পাকা আমি'কেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু মজা এমনি যে 'কাঁচা আমি' আমাদের মনের মধ্যে এমন একটি নিরাপদ দুর্গ রচনা ক'রে বসে থাকে যে, সহজে তাকে পরাস্ত করা যায় না। কখনো মনে হয়—শত্রু বুঝি পালিয়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায়, কোন্ সময় সুযোগ বুঝে আবার এসে বেশ কায়েমী হয়েই বসে আছে। কেবলই সে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়। কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে রাজী হয় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ 'আমি'-শত্রুকে জব্দ করার উপায় বলেছেন, 'থাক শালা, দাস আমি হয়ে।' এই 'দাস আমি' আর নিজেকে জাহির করতে চায় না। সে তখন বলে: 'তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি।' এখানে নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব শ্রীভগবানের শ্রীচরণে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। জীবনে নিজের ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। যা কিছু ঘটছে, সবই শ্রীভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় সম্পাদিত হচ্ছে। ভক্ত তখন বলেন:

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

তাঁর ইচ্ছায় অসাধ্য সাধনও সম্ভব। মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। সবই আশ্চর্য! 'পাকা আমি' যখন আত্মস্বরূপে মিলিত হয়, তখন সবই হয়ে পড়ে রহস্যময়। কে এই রহস্যভেদ করবে?

ভক্ত বলেন, রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন কি? যাঁর ইচ্ছায় ত্রিভুবন পরিচালিত হচ্ছে, তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন যখন মানুষের একটি অঙ্গুলি উত্তোলনেরও ক্ষমতা নেই, তখন সেই ইচ্ছা-স্রোতেই নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াই সহজ পথ। একান্তভাবে ভগবানের শরণাগত হ'তে পারলে জীবনে কোন লোকসানই আসবে না। সকল কলঙ্কও তখন অলঙ্কার হয়ে উঠবে।

যে 'আমি'কে নিয়ে মানুষের এত অহঙ্কার, তার কোন ক্ষমতাই নেই। 'পাকা আমি'র সন্ধান পেলে, যা সত্য সনাতন শাশ্বত ধ্রুব, তারই সঙ্গে আমরা যুক্ত হ'তে পারি। অনন্ত শক্তির সঙ্গে তখন আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির মিলন ঘটে। আমাদের শক্তি যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তার মধ্যে তখন ঐশী শক্তি বিরাজিত। মন বিশুদ্ধ, নির্মল হ'লে তবে সত্যের আবির্ভাব হয়। অন্তরে সত্যের আবির্ভাব ঘটলে মানুষের অনায়ত্ত, অসাধ্য কিছুই থাকে না।

এই অবস্থায় জীব ক্ষুদ্র নয়, শিবত্বলাভ ক'রে সে অমৃতের অধিকারী হয়। যে 'আমি' জীবনের চরম দুঃখের কারণ হয়, সেই 'আমি'রই রূপান্তর ঘটলে ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদন হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল'।

সিঁথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

[প্রথম বারের বিবরণ)]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য পাদস্পর্শে যে সকল স্থান ধন্য হয়েছে, সিঁথি তাদের অন্যতম। সিঁথি কলকাতার তিনি মাইল উত্তরে, পাইকপাড়ার নিকট। এই পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম অনুরাগী ভক্ত শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের অতি মনোরম উদ্যান-বাটী ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ (বুড়ো গোপাল), ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র পাল (কবিরাজ) প্রভৃতিও এই পল্লীতে বাস করতেন। এঁদের কল্যাণে সিঁথি পল্লী বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত পদরেণু লাভে ধন্য হয়েছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, 'লীলা-প্রসঙ্গ', 'পুঁথি' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে সিঁথিতে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার কয়েকটি অতি মনোরম চিত্র পাওয়া যায়।

ভক্তবর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত ছিলেন। তাঁর উদ্যানবাটীতে বৎসরে দুইবার—একবার শরৎকালে ও একবার বসন্ত-কালে--ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হ'ত। ঐ উপলক্ষে তিনি তথায় বিশেষ সমারোহে মহোৎসব করতেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ব্রাহ্মভক্তগণকে বড়ই ভালবাসতেন। তাঁরা তাঁদের সমাজের উৎসব-অধিবেশনাদিতে তাঁকে অত্যন্ত ভক্তিভরে নিমন্ত্রণ করতেন। তিনিও ঐ সকল উপলক্ষে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরম আহ্লাদিত হতেন।

বেণীপালের উদ্যানবাটীটি অতি নিভৃত এবং ঈশ্বর আরাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। সেখানে একটি সুন্দর উপাসনাগৃহও ছিল। গৃহটি অতিশয় জীর্ণদীর্ণ অবস্থায় এখনও বর্তমান, অবলুপ্তির করালগ্রাসে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। যা হোক, পাল মহাশয় উৎসবাদি উপলক্ষে অতীব ভক্তিসহকারে শ্রীরামকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ ক'রে তথায় আনয়ন করতেন। 'কথামৃতে' তথাকার ঐরূপ মাত্র তিনটি উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য লীলা-বিবরণী প্রকাশিত দেখা যায়। আমরা এখন প্রথম বিবরণীটি সংক্ষেপে অনুধ্যান ক'রব। এই প্রসঙ্গটি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তেও সুললিত ছন্দে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

'বেণী পাল ভাগ্যবান্ জনগণে খ্যাত নাম
পল্লীগ্রাম সিঁতিতে বসতি।
সুন্দর আবাস-গৃহ ব্রাহ্মদল-ভুক্ত তেঁহ
প্রভুপদে বড়ই পিরীতি॥
বর্ষে বর্ষে দুইবার ব্রাহ্মোৎসব ঘরে তাঁর
বহু ভক্ত করে নিমন্ত্রণ।
আজি উৎসবের দিনে সমাগত বহু জনে
পরিপূর্ণ উদ্যান-ভবন॥'—(পুঁথি)

২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ শনিবার। বেণী পালের উদ্যানবাটীতে আজ ব্রাহ্মসমাজের যাণ্মাসিক মহোৎসব। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তগণ উপস্থিত। ভক্ত-সমাগমে উদ্যান-বাটী পরিপূর্ণ। মহোৎসবের আনন্দে চারিদিক মুখরিত।

শ্রীম-লিখিত বর্ণনা: শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানের

লতা-গুল্ম মধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে। আকাশ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা যেন একতানে গান করিতেছে। 'আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে—ভগবৎ মঙ্গল কিরণে।'

অপরাহ্ণ প্রায় তিন চারিটা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তসহ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হ'তে শুভাগমন করলেন। সকলেই সসম্ভ্রমে ও পরম ভক্তিভরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ঘোড়াগাড়ি হ'তে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বহু ভক্ত তাঁকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করলেন। মহাপুরুষের দিব্য সান্নিধ্য লাভের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব, তাঁর কথামৃত শ্রবণের জন্য প্রত্যেকেই উৎকর্ণ।

'শকট হইতে নামি দেখা দিলা গুণমণি
বিশ্বস্বামী প্রভু গুণধাম।
নয়ন-আনন্দকর কি মুরতি মনোহর
হেরিলে হরয়ে মন-প্রাণ॥'—(পুঁথি)

ফুল ও ফলের গাছে ঢাকা রাঙা পথ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণসহ ধীরে ধীরে প্রার্থনা-গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হলেন। সমাজ-গৃহের দালানে তাঁর জন্য বিশেষ আসন পাতা হয়েছে। তথায় উপনীত হয়ে তিনি সহাস্যবদনে ঐ আসন অলঙ্কৃত করলেন।

সকলেই নির্নিমেষ নয়নে সদানন্দময় মহাপুরুষকে দর্শন করছেন। অদ্ভুত প্রিয়দর্শন প্রেমঘন মূর্তি। পুনঃ পুনঃ ঐ শ্রীমূর্তি দর্শন করেও তাঁদের নয়নের তৃষ্ণা যেন মিটছে না। সকলেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ। তিনিও সুমধুর হাস্যমুখে চারিদিকে ভক্তগণের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন।

'প্রভুর মহিমাভরে আনন্দে উথলি পড়ে
আনন্দ-আধার তনুখানি।
মৃদুহাস্য-সহকারে আসন গ্রহণ পরে
করিলেন অখিলের স্বামী॥
রূপের ঠাকুরে দেখি যেখানে যতেক আঁখি
একবারে হয় বিমোহন।
নিরখে শ্রীপ্রভুরায় বিভোর চকোর-ন্যায়
নিশিনাথে করি দরশন॥'—(পুঁথি)

শ্রীযুক্ত শিবনাথকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত; তাঁকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন, 'দেখ তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব—আর একজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারি খুশী হয়। হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে।'

তাঁর সরস উপমা শ্রবণে উপস্থিত সকলেই মৃদু হাস্য করছেন। তিনি ভক্তগণকে লক্ষ্য ক'রে প্রসঙ্গতঃ কত তত্ত্বকথাই না বলছেন। ভক্তির সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের অবস্থা তিনি চমৎকার উপমাসহায়ে বিশ্লেষণ করছেন। ভক্তির তমঃ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সে-রূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো'—এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।"

তিনি এ-প্রসঙ্গে ভাবাবিষ্ট হয়ে সুমধুর কণ্ঠে গাইছেন—

'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী ব'লে আমার অজপা যদি ফুরায়॥'

ভাবোন্মত্ত হয়ে আবার গাইছেন—

'আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী॥'

প্রসঙ্গতঃ তিনি বলছেন, 'তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর; তিনি তো পর নন, তিনি আপনার লোক।'

জনৈক ব্রাহ্মভক্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঈশ্বর নিরাকার না সাকার?'

তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তদের জন্য সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার।'

এ-প্রসঙ্গে তিনি অতি সহজ-সরল অনেক দৃষ্টান্ত দিলেন। অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মভক্ত তাঁকে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন: ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়। তা তোমরা বুঝবে কেমন ক'রে?'

'কি উপায়ে ঈশ্বরের দর্শন লাভ হ'তে পাবে?' —এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে পার? লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য এক ঘটী কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে?'

আবার প্রশ্ন—'ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে নানা মত কেন?' —এর উত্তরে তিনি বললেন, 'যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন-রকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তা হ'লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না—সব খবর পাবে কেমন ক'রে?'

এ-প্রসঙ্গে তিনি 'বহুরূপী'র গল্পটি অবতারণা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে, সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ।'

ভক্তদের উদ্দেশ ক'রে তিনি বললেন, 'ভক্তি-পথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষ-জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।'

শিবনাথ প্রভৃতিকে লক্ষ্য ক'রে শেষে তিনি বললেন, 'তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন?···ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি! অনন্ত ঐশ্বর্য! অত খবরে আমাদের কাজ কি!'

ভাবোন্মত্ত হয়ে আবার গান ধরলেন:

'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥"

গান-শেষে উপমাসহ আবার কত প্রসঙ্গ করলেন। তারপর শিবনাথকে বললেন, 'তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাকব? শুদ্ধাত্মাদের পূর্বজন্মের বন্ধু ব'লে বোধ হয়।'

জনৈক ব্রাহ্মভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করলেন—'আপনি জন্মান্তর মানেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝবো? অনেকে ব'লে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না।'

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হ'ল। আজ আশ্বিনের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি। তাই সন্ধ্যার চার পাঁচ দণ্ড পরেই রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হ'ল। শরতের চন্দ্রের অমল ধবল কিরণমালায় চারিদিক সমুজ্জল হয়ে উঠল। শুভ্র চন্দ্রালোকে উদ্যানের সরোবর, বৃক্ষ-গুল্ম, লতা-পুষ্প প্রভৃতি প্রতিভাসিত হ'ল।

'ঊর্ধ্বগতি দেখি রাতি প্রহরেক প্রায়।
আজিকার কথা সাঙ্গ কৈলা প্রভুরায়॥
সমাজভবনে হৈল ভজনার কাল।
বাজিয়া উঠিল বাদ্য খোল-করতাল॥'(পুঁথি)

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। ব্রাহ্মভক্তগণ যথারীতি সান্ধ্য উপাসনা সমাপন করলেন।

সমাজগৃহে মধুর সংকীর্তন আরম্ভ হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরপ্রেমে সদাই মাতোয়ারা। তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে মধুর নৃত্য করছেন। ব্রাহ্মভক্তগণ খোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্যসহ তাঁকে ঘিরে ঘিরে নৃত্য করছেন। ভাবে সবাই বিভোর। হরি-সংকীর্তনের রোল ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চারিদিক হরিনামে মুখরিত। মধুর হরিনাম শ্রবণে সন্নিকটস্থ অধিবাসীরাও মহানন্দে ছুটে এলেন, তাঁরাও অদ্ভুত প্রেমময় মহাপুরুষকে দর্শন ক'রে ধন্য হলেন।

'লইয়া শ্রীপ্রভুদেবে বেড়িয়া আদরে।
আনন্দে হইয়া মত্ত সংকীর্তন করে ॥
হরিবোল উঠে রোল ভেদিয়া ভবন।
বড় খুশী প্রতিবাসী গ্রামবাসী জন ॥' (পুঁথি)

সংকীর্তন শেষ হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করছেন আর বলছেন, 'ভাগবত ভক্ত ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম; আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম!'

ভক্ত বেণীমাধব নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যের আযোজন করেছেন। তিনি পরিতোষসহকারে সমাগত সকলকে ভোজন করালেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তগণসহ মহানন্দে প্রসাদ ধারণের পর ঘোড়াগাড়ি ক'রে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যাত্রা করলেন।

স্মৃতি-কুসুমাঞ্জলি

ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়*

১৯০৯-১০ খৃঃ কথা। উদ্বোধনে স্বামী সারদানন্দ তখন প্রায়ই সন্ধ্যারতির পর তানপুরা লইয়া ভজন গান করিতেন। আমিও তানপুরা লইয়া দু-একটি শ্যামাসঙ্গীত গাহিতাম। একদিন শ্রীশ্রীমা বলিয়া পাঠাইলেন, "বলো, উহার গান আমার ভাল লাগিতেছে, আরও কয়েকখানি গাহিয়া শুনাক।" যে কয়দিন শ্রীশ্রীমা ওখানে থাকিতেন, বাটীটি এক অপূর্ব এবং দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। সে বিমল আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সকল সম্প্রদায়ভুক্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মেয়ে-পুরুষ নিত্য আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন এবং প্রণাম করিয়া যাইত, সে এক অপূর্ব দৃশ্য আমরা দেখিয়াছি, যাহা বর্ণনাতীত।

মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইবার পর তিনমাসকাল কলেজের ছুটি থাকিত, সেই সময়ে আমি নিজ বাটীতে দ্বিপ্রহরের আহারাদি সম্পন্ন করিয়া প্রায় সমস্ত দিন মায়ের বাটীতেই থাকিতাম। জনৈক সাধু এবং আমি এক বয়সের ছিলাম, তিনিও পূর্বাশ্রমে শান্তিপুর-নিবাসী ছিলেন। আমার সহিত তাঁহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। 'উদ্বোধনে'র অনেক কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিতাম। সন্ধ্যার সময় দু-জনে গঙ্গার ধারে যাইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নানা ধর্মপ্রসঙ্গে কাল কাটাইতাম। একদিন তিনি বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় কাম-ক্রোধ যদি বা যায় শেষ পর্যন্ত, 'আমি সাধু' এই অভিমানটা মন থেকে যেতে চায় না।" এত সহজভাবে এ

* পরলোকগত ভক্ত

কথাটি বলিয়াছিলেন যে, এখনও সে কথাগুলি আমার মনে রহিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের চরণাশ্রিত সাধুরা গৃহী অপেক্ষা যে কত বড়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

সেই সময়ে শ্রীযুত কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) একদিন আমায় বলিলেন, "শ্যামাপদ, আগামী কাল অক্ষয়তৃতীয়া, খিদিরপুর থেকে একটি ছেলে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা নিতে আসবে, তুমিও অতি অবশ্য দীক্ষাটি নিয়ে নাও, আমি সকল কথা শ্রীশ্রীমাকে জানিয়ে রাখব। এখানকার দীক্ষায় কোন হাঙ্গামা নেই। গঙ্গাস্নান ক'রে চলে এস।"

তদনুযায়ী আমি পরদিন গঙ্গাস্নান করিয়া মায়ের বাটীতে যাইয়া অপেক্ষা করিতে-লাগিলাম। শ্রীশ্রীমা পূজা সারিয়া, সেই ছেলেটিকে দীক্ষা দিয়া আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সিংহাসনের সম্মুখে শ্রীশ্রীমা বসিয়াছিলেন এবং আসনের কাছেই একখানি আসনে আমাকে বসিতে আদেশ করিলেন। শ্রীশ্রীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা শাক্ত, না বৈষ্ণব?" জিজ্ঞাসা করিয়াই আমাকে দীক্ষামন্ত্র দিলেন। তখন আমি যেন নিজের সম্বিত হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী' হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম অভিমুখে সরু গলিটি ধরিয়া রেলের লাইনগুলি পার হইয়া ঠিক সম্মুখেই গঙ্গার পূর্ব পাড়ে একটি জলনিকাশের পাইপের উপর সিমেণ্টে বাঁধানো চতুষ্কোণ একটি চাতালের উপরে গিয়া বসিলাম। একটি বকুল গাছ সেই চাতালটিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল, তাই ঐ জায়গাটিতে মোটে রৌদ্র আসিতেছিল না। সেইখানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া গায়ত্রী মন্ত্রটি উচ্চারণ করিবামাত্র অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া আমার সমস্ত শরীরটাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে। আমি তখন আনন্দে ও প্রীতিতে এতটা ভরপুর হইয়াছিলাম যে, আমি শ্রীশ্রীমায়ের বাটী হইতে কাহাকেও না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি, এ কথা মোটেই স্মরণ হইতেছিল না। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ থাকিবার পর আমার সম্বিত ফিরিয়া আসিল, এবং আমাকে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে সকলে খুঁজিতেছেন—এরূপ মনে হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে ফিরিয়া আসিবামাত্র শ্রীযুত শরৎ মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?' শ্রীশ্রীমা আমায় প্রসাদ দিবেন বলিয়া আমার খোঁজ লইতেছেন। আমি শরৎ মহারাজকে সকল কথা জানাইলাম এবং তিনি তাহাতে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

একবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসবে মঠে যাইয়া খুব আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, এবং গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া সাধু হইবার প্রবল ইচ্ছা লইয়া শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীযুত শরৎ মহারাজকে আমার ঐ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীযুত মহারাজ বলিলেন, "শ্যামাপদ, তোমার যে ভাব, তাহাতে তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর সম্পূর্ণ গা ঢালিয়া দিয়া থাকো, শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলিতেন, ঝড়ের আগে উচ্ছিষ্ট পাতার মতো সংসারে থাকিবে, ঝড় যেদিকে লইয়া যায় সেইদিকে পাতা উড়িয়া যায়।" তাঁহার ঐ কথাগুলি শুনিয়া পরম শান্তি লাভ করিলাম এবং সাধু হইবার প্রবল ইচ্ছা প্রশমিত হইয়া গেল।

১৯১০ হইতে ১৯১১ খৃঃ মধ্যে শ্রীযুত শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) মাদ্রাজ

হইতে বিশেষ অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিলেন, এবং শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে দ্বিতলে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ডানদিকের ঘরটিতে তাঁহাকে রাখা হইল। বিশ্বরঞ্জন মহারাজ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। Anatomy-র dissection প্রথম বৎসর আমার তখন হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য পিঠের উপরকার মাংসপেশীগুলির কথা আমার জানা ছিল। সেইগুলি মনে করিয়া সেই মাংসপেশীগুলির উপরে vibratory massage করিয়া (টিপিয়া) দিতাম। উহাতে তিনি বিশেষ আরাম পাইতেন, এবং বিশ্বরঞ্জন মহারাজকে বলিতেন যে, শ্যামাপদ ডিসেক্‌শন করেছে, সেইজন্য ও মাংসপেশীগুলি টিপে দিলে বড আবাম পাই। অতএব ওকেই করতে দাও। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এই মহাপুরুষের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া ও সেবার সুখ্যাতি শুনিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতাম।

তিনি অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু যখন হাসিতেন তখন মনে হইত ঠিক যেন সাত-আট বৎসরের বালক। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের কৃপা ব্যতীত ঐ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ আমার ঘটিত না। বাঙ্গালোর হইতে একটি ভক্ত তাঁহার জন্য একটি পেঁপে পাঠাইয়াছিলেন, সেই পেঁপে কাটিয়া লম্বালম্বি চারভাগের একভাগ আমাকে খাইতে দিয়াছিলেন। আমি উহার পূর্বে ও-রকম সুস্বাদু পেঁপে কখনও খাই নাই, সেই কথা বলিলে তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটির বৈঠকখানাতে একদিন দেখি, শ্রীযুত বড় মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বসিয়া আছেন এবং তাঁহার গুরুভ্রাতা—ঠাকুরের অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গেরা সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেছেন; শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ), শরৎ মহারাজ, এমন কি বয়োজ্যেষ্ঠ মহাপুরুষ মহারাজও (স্বামী শিবানন্দ) ঐরূপভাবে প্রণাম করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, ইহা ভক্তির আতিশয্য। তখনকার দিনে ঐরূপ অনেক ভুল ধারণা আমার মনে ছিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীযুত শরৎ মহারাজের সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, শ্রীযুত গিরীশবাবু শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে প্রবেশ-দ্বারের ডাহিনে অর্থাৎ বৈঠকখানা-ঘরের সংশ্লিষ্ট রোয়াকটির উপর উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, এবং তাঁহার মন যেন অন্য এক রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। শ্রীযুত শরৎ মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। শ্রীযুত শরৎ মহারাজ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে একজন; কায়স্থ সন্তান এবং গৃহী গিরীশবাবুকে তিনি ঐরূপভাবে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলাম, ইহাও যে ভক্তির আতিশয্য ছাড়া আর কিছু, তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

সপ্তসতী : ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত, প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭ ; পৃষ্ঠা ১৮৪ (ডিমাই) ; মূল্য চার টাকা।

ভারতের প্রাচীন ঐতিহের দিকে ক্রমেই আমাদের দৃষ্টি ফিরিতেছে। আমরা আমাদের দেশকে চিনিতে তথা আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছি—ইহা সত্যই সুলক্ষণ। ভারতের প্রাচীন কথা ও গাথার মধ্যে বহু রত্ন আজও সঞ্চিত রহিয়াছে—যাহাদের প্রকাশ ও ব্যবহার আমাদের দেশকে সত্যসত্যই উন্নতি ও শান্তির পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। আলোচ্য পুস্তকটি এই আদর্শের পতাকাবাহী।

পুস্তকটিতে সতী (পার্বতী), সাবিত্রী, অরুন্ধতী, অনসূয়া, সীতা, দময়ন্তী ও বেহুলা—এই সাতজন বহুজন-স্বীকৃত সতীর জীবনী-সংগ্রহ। লেখক সকল চরিতকথাগুলি একই রচনা-শৈলীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন নাই। প্রথম ও দ্বিতীয়টি পদ্যে, চতুর্থটি নাটিকারূপে এবং অবশিষ্টগুলি গদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত গাথাগুলিই অধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কোন কোন স্থানে উপমার ও ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ আমাদের ভাল লাগিয়াছে যেমন :

যেন নব সূর্যমুখী
বনের গহন কোণে থাকি
আভাসে পেয়েছে রবিকরের সন্ধান। (পৃঃ ৬)
প্রাণের বিনাশ নাই, আছে শুধু উদয়াস্ত তার।
স্রষ্টার লীলার তরে কালবক্ষে বহে অহুক্ষণ
অনন্ত মৃত্যুর কোলে অনন্ত জীবন। (পৃঃ ১৭)

ধীরে ধীরে মূলাধার হ'তে কুণ্ডলিনী
ষট্‌চক্র ভেদ করি উঠি সহস্রারে
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা সনে
চিরতরে হইল বিলীন ;
বিন্দু গেল সিন্ধুতে মিশিয়া, (পৃঃ ৩৬)

গম্ভীর চিন্তায় যেন শীর্ণ বর্তমান
হারায়ে গিয়াছে ভবিষ্যতে। (পৃঃ ৩৮)

পার্বতী বুঝিলেন যে শুধু রূপে ও পরিচর্যায় দয়িতের প্রেম আকর্ষণ করা যায় না। সংযম চাই, ধ্যান চাই, আত্মত্যাগ চাই,—অর্থাৎ আপনাকে ভুলে গিয়ে পতির সঙ্গে এক সুরে একাত্মজ্ঞানে মিশে যাওয়া চাই। (পৃঃ ৪৫)

কমল জানে কেবল রবিকর। (৫১)
শব্দহারা আসল ভালবাসা,
ভাল কভু বাসে নাই সে
যে দেয় তারে ভাষা। (পৃঃ ৬৪)

পুস্তকটির কোন কোন স্থানে পদ্যাংশ অস্বাভাবিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—যেমন দক্ষের মস্তক ঘুরে যেত। (পৃঃ ১)

ইহা ব্যতীত কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদও চোখে পড়িল। যাহা হউক সব মিলাইয়া পুস্তকটি আমাদের ভালই লাগিয়াছে। আশা করি বাংলার মায়েরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া গৃহে সুখ ও শান্তি আনয়ন করিতে পারিবেন এবং নিজ নিজ কন্যাদিগকেও পাশ্চাত্য আদর্শের মোহ হইতে উদ্ধার করিয়া ভারতের পবিত্র প্রেমের নিরিখ দেখাইতে পারিবেন। এই প্রকার পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

—মহানন্দ

শুকদেবী ঃ ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, প্রকাশক ঃ শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী, ৬১, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৫। পৃঃ ৩৬; দাম—৩৭ নঃ পঃ।

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সাধিকা শুকদেবীর পুণ্যজীবনচিত্রটি সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত ক'রে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমায় আছে, গভীর বনে ফুল ফুটলে মৌমাছি তার সন্ধান পায়। শুকদেবীর জীবনকাহিনী লোক-লোচনের অন্তরালে ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাব-সাধনার নীরব রূপায়ণ।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহের বালবিধবা সহজাত অধ্যাত্মসংস্কারের বশে কেমন ক'রে অন্তরে-বাহিরে ভগবৎপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই পরমা শান্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রেখে সংসারের সকল কর্ম ও সম্বন্ধকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে তুলেছিলেন—তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে। ছোট্ট বইটি পড়ে তৃপ্তি হয় না—এই সাধিকার পূর্ণাঙ্গ জীবনীর জন্য পাঠকচিত্ত উৎসুক হয়ে ওঠে।

সাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে শুকদেবীর অন্তরানুভব ঃ "এখন আর আমার কোন শোক নাই, অনুতাপ নাই, জীবন সার্থক বলিয়া মনে হয়। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। সকলের হৃদয়ে সেই এক অন্তর্যামী ঈশ্বর দ্রষ্টৃরূপে, পরিচালকরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমার যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে।"

কলরবমুখর বর্তমান শতাব্দীর নেপথ্যে ভারতবর্ষের অন্তর-তপোবনে এমন কত ভাবকুসুম নিঃশব্দে পরম সত্যের উদ্দেশে জীবনাঞ্জলি দিয়ে চলেছে। 'শুকদেবী'র জীবনকাহিনী সেই কথাই আর একবার মনে করিয়ে দিল। —প্রণবরঞ্জন ঘোষ

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান ঃ রায়চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১৯, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ১১২ ; মূল্য দেড় টাকা।

গীতা শাস্ত্র—কি ত্যাগী, কি গৃহী সকলেরই পথপ্রদর্শক। গীতার মূল কথা ত্যাগ, সংসারে যাহারা অসহায় এবং অশেষ কামনা-বাসনা দ্বারা পরিচালিত, তাহাদেরও জীবনে কিরূপে এই ত্যাগের ভাব আসিতে পারে, আলোচ্য গ্রন্থে তাহা দেখাইবার প্রচেষ্টা আছে। সংসারের রূপ, কর্মযোগ ও চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞান বড় না কর্ম বড়, বিহিত কর্ম, জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদ, বিশ্বরূপ, শ্রীভগবানের সর্বময় ভাব, উপনিষদের লক্ষ্য প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

গীতা-মূর্তি যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—এই ভাবটি পরিস্ফুট থাকিলে পুস্তকের নামকরণ সার্থক হইত। স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে এবং একটি সূচীপত্রের অভাবও রহিয়াছে।

ভারতী (১৯৬০-৬১) ১ম সংখ্যা—রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠ, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মস্থানে পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সারা বছরের লেখাগুলি হইতে কবিতা, প্রবন্ধ এবং গল্প নির্বাচন করিয়া এই ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। অধিকাংশই উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রের লেখা, অন্যান্য শ্রেণীর রচনাও স্থান পাইলে ভাল হইত। প্রথম পত্রিকা হিসাবে পত্রিকাটি ছাত্রদিগের আনন্দ বর্ধন করিবে সন্দেহ নাই, আগামী বৎসর যাহাতে 'ভারতী' সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে তাহাদিগকে অবহিত থাকিতে হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী আগমানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১৭ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪-১০ মিঃ স্বামী আগমানন্দ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া কালাডি হইতে তিন মাইল দূরে রায়নপুরম্ নার্সিং-হোমে ৬৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ ত্রিবান্দ্রম বেতারকেন্দ্র হইতে প্রচারিত হয়। দুই সহস্র লোকের একটি শোভাযাত্রা শবানুগমন করে।

স্বামী আগমানন্দ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ছাত্রাবস্থা হইতেই সংস্কৃত ভাষা, হিন্দুধর্ম ও কৃষ্টির প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া ১৯২৬ খৃঃ তিনি তিরুভল্লা আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ খৃঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনা গত ৪০ বৎসরে কেরালায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৩৩ খৃঃ আচার্য শঙ্করের জন্মস্থান পুণ্যভূমি কালাডিতে তিনি শ্রীশঙ্কর মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। আশ্রম কর্তৃক ব্রহ্মানন্দোদয় উচ্চবিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস সহ অনেকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। সুবক্তা স্বামী আগমানন্দ সংস্কৃত ভাষাতেও বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তিনি 'প্রবুদ্ধ কেরলম্' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং মালয়ালম্ ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক অনুবাদ করেন।

এই বহু গুণালঙ্কৃত সন্ন্যাসীর দেহনির্মুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ।। শান্তিঃ।।।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা

জলপাইগুড়িঃ গত ১৫ই বৈশাখ প্রভাতে জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ।

এতদুপলক্ষে পূর্বদিন প্রত্যূষে আধমাইল ব্যাপী একটি শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বৃহৎ প্রতিকৃতি সহ শহর পরিক্রমা করে, সন্ধ্যায় মন্দিরে মূর্তির শুভ অধিবাস সম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠা-দিবসের প্রভাতে শুভক্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ বহু সাধু ও ভক্তের শোভাযাত্রা নবনির্মিত মন্দির প্রদক্ষিণ করে, অতঃপর বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ সহ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী ঐ প্রতিকৃতিগুলি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর শুরু হয় মন্দিরে বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ এবং যজ্ঞমণ্ডপে বাস্তুযাগ।

সন্ধ্যা ৬টায় ধর্মসভায় স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশ দেখিয়া, তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন —শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য আসিয়াছেন। দীর্ঘকাল তাঁহার দক্ষিণ ভারতে কাটিয়াছে, সম্প্রতি বাংলাদেশে ঠাকুরের মহিমা দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন।

প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বলেন: ধর্ম অনুভূতির বিষয়; দুধ কেউ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে।...সাধারণ মানুষ দেহাভিমানী, কিন্তু আত্মাই যে দেহ ধারণ করেছে, এইটি বুঝতে হবে। বিভিন্ন যোগ তার উপায়; মত পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা অনুযায়ী স্বামীজী প্রচার করেন, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'—শিবজ্ঞানে জীবসেবা। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় মন্দির-নির্মাণে সকলের সহযোগিতার কথা বলিয়া প্রার্থনা করেন : এই মন্দির আমাদের দ্বেষ, দ্বন্দ্ব দূরীভূত করিয়া সেবায় ও প্রেমে অনুপ্রাণিত করুক।

অতঃপর স্বামী নিরাময়ানন্দ ও অপূর্বানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণের 'ষোড়শী পূজা' সম্বন্ধে কথকতা করেন। রাত্রে মন্দিরে ৺কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন (১৬ই) মঙ্গলারতি ও বিশেষ পূজার পর সপ্তশতীহোম বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। বৈকালে কথকতার পর সভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয় আলোচনা করেন স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, ধ্যানাত্মানন্দ ও অপূর্বানন্দ। সভান্তে রামায়ণ কীর্তন ভক্তবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

রবিবার সারাদিনব্যাপী আনন্দ-উৎসব। এই দিন যজ্ঞমণ্ডপে রুদ্রযাগের পর মধ্যাহ্ন হইতে প্রসাদ-বিতরণ শুরু হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ২০,০০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ ধারণ করেন। আশ্রম-সংলগ্ন মাঠে একটি মেলা বসে। 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী' বিষয়ক একটি পুস্তিকা প্রচারিত হয়। সান্ধ্যসভায় আশ্রম-সম্পাদক সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী পাঠ করেন। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ স্বামীজী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিলে পর সভাপতি স্বামী পরশিবানন্দ স্বামীজীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে সকলকে আহ্বান জানান।

এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জলপাইগুড়ি শহর এক নূতন ভাবের প্রেরণা লাভ করিয়াছে। কয়দিনে আশ্রমে প্রায় দেড় লক্ষাধিক লোক সমাগম হইয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

আসানসোল : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৩১শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের সূচনা হইলে উষাকীর্তন, শোভাযাত্রা, চণ্ডীপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

অপরাহ্ণে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীব্রজকান্ত গুহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং অধ্যাপক শ্রীহরলাল মাহতো শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে ভাষণ দেন।

পরদিন অপরাহ্ণে জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা আলোচিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং ভাষণ দেন স্বামী গম্ভীরানন্দ ও নিরাময়ানন্দ।

শেষ দিবস প্রাতে লীলাকীর্তন গীত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে স্বামী গম্ভীরানন্দের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে এবং অধ্যাপক হরলাল মাহতো স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) : গত ২৫শে মার্চ অন্নপূর্ণা-পূজা-দিবসে সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের দুর্ভিক্ষে সেবাব্রত আরম্ভের স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষপূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ এবং ভজনাদি সহ সারাদিন আনন্দোৎসব হইয়াছিল। পূর্বাহ্ণে কথামৃত পাঠ করেন অধ্যাপক

শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত এবং পূজনীয় অখণ্ডানন্দ মহারাজের জীবনী পাঠ করেন স্বামী জীবানন্দ। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত এবং স্বামী জীবানন্দ পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দ মহারাজের সেবাধর্ম বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। প্রায় ২,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বহরমপুর: গত ২৫শে এবং ২৬শে মার্চ বহরমপুর শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মমহোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৫শে মার্চ অধ্যাপক রেজাউল করিম সাহেবের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে যুগোপযোগী আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত এবং স্বামী জীবানন্দ। ২৬শে মার্চ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম ও ভজনাদিতে সারাদিন উৎসব-প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর হইয়াছিল। পূর্বাহ্ণে স্বামী জীবানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বামীজী-সম্বন্ধে এবং শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি স্বামী জীবানন্দ স্বামীজী-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া জনসাধারণের অন্তরে উৎসাহের সঞ্চার করেন। প্রায় ২,০০০ নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। উভয় দিনই ধর্মসভার পরে কীর্তনের ব্যবস্থা ছিল।

বাগের হাট: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৭ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ হইয়াছিল। ৪,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্ণে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীভুবনমোহন দেব (সভাপতি), শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সাহা ও শ্রীবিনোদবিহারী সেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ ও উপদেশ আলোচনা করেন।

রাত্রে বহুলোকের সমাবেশে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলোচিত হয়।

কাঁথি: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ৩১শে মার্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত তিনদিবসব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার-বিতরণ, হরিসমাজ দল কর্তৃক হরিনাম-সংকীর্তন, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীসুবোধরঞ্জন ভৌমিক, শ্রীঅমরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীসুধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিশোকাত্মানন্দ, হুগলি মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও স্বামী মহানন্দ বক্তৃতা করেন। তিন দিনে প্রায় সাত হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ধর্মসভায় ও কলিকাতার বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গীতের আসরে বহুজনসমাগম হইয়াছিল।

তমলুক: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৪ই হইতে ১৯শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। ১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে মহকুমা-শাসক শ্রীসুনীলকুমার সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত ও স্বামী জীবানন্দ। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। উৎসবের দুই দিন কলিকাতার বিশিষ্ট সঙ্গীত-

শিল্পিগণের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত এবং তিন দিন শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালের কথকতা শ্রোতৃবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দান করে।

কার্যবিবরণী

টাকী: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এতদঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের অনগ্রসর অধিবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি ১৯৩৮ খৃঃ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আশ্রম-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির আলোচ্য বর্ষে শিক্ষার্থী-সংখ্যা: (১) উচ্চ বিদ্যালয়—৩১৩, (২) বালকদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়—১২৬, (৩) বালিকাদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়—৫০। ছাত্রাবাসে ৪৫ জন ছাত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে ১০ জন বিনাব্যয়ে থাকিয়া বিদ্যার্জনের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথাবিধানে উদ্‌যাপিত হয়।

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে মোট ১১,২১৮ রোগীকে চিকিৎসা করা হয়।

বিবেকানন্দ সমাজসেবা-কেন্দ্র: (১৭, নন্দলাল মল্লিক লেন এবং ৯১, রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা ৬) স্বামীজীর শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থী দ্বারা রামবাগান বস্তিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সেবাকল্পে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ খৃঃ। বর্তমানে ইহা নরেন্দ্রপুর (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা-রূপে পরিচালিত হইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত ইহার কর্মধারা:

(১) বিবেকানন্দ নার্সারি স্কুল (৩ হইতে ৬ বৎসরের শিশুদিগেরজন্য): ছাত্রসংখ্যা ৪২।

(২) বিবেকানন্দ বেসিক স্কুল: ছাত্রসংখ্যা ১৫০।

(৩) ছাত্রাবাস: ১৫ জন অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্র এখানে সম্পূর্ণ বিনা খরচায় থাকিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে।

(৪) বয়স্কদের জন্য দুইটি নৈশ বিদ্যালয়।

(৫) সমাজশিক্ষার ক্লাস: চলচ্চিত্র, কথকতা, বক্তৃতা, থিয়েটার, প্রদর্শনী ও দেওয়াল-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার করা হয়।

(৬) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার: গ্রন্থাগারে ১,০০০ বই আছে। পাঠাগারের দৈনিক পাঠকসংখ্যা ১৫।

(৭) দাতব্য চিকিৎসালয়: ১২,৭০১ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, প্রতিদিন ২২৫ শিশুকে দুধ দেওয়া হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি): নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং প্রতি বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়:

ডিসেম্বর '৬০: প্রথমে প্রত্যক্ষ দেবতার উপাসনা কর; অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অজ্ঞাত ধাপসমূহ; আধ্যাত্মিক অনুভূতি-বিজ্ঞান; স্বামী শিবানন্দকে যেরূপ জানিয়াছি; ঈশ্বর কখন মানুষ হন এবং মানুষ কখন ঈশ্বর হয়? আত্মজ্ঞানের বিজ্ঞান, যীশুখৃষ্টের প্রধান উপদেশাবলী।

জানুআরি '৬১: মৃত্যুরহস্য ও জন্মান্তর; শান্তি, না যুদ্ধের আস্ফালন? আধ্যাত্মিক জীবনে ভাবালুতা; স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই জগতের একমাত্র আশা-ভরসা; বর্তমান

ভারতের মহান্ সন্ন্যাসী স্বামী ব্রহ্মানন্দ; আমি জন্মগ্রহণ করি নাই, মরিবও না; ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং মানুষ; অনাসক্তি কিরূপে অভ্যাস করিতে হয়।

ফেব্রুআরি: ইহা কি প্রমাণ করা যায় যে, মানুষের আত্মা আছে? আমরা কি আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি? আধ্যাত্মিকতায় ভাবালুতার স্থান; যে দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সর্বদর্শন অন্তর্ভুক্ত, যে ধর্মের মধ্যে সমস্ত ধর্ম নিহিত; কিরূপে ভয় জয় করা যায়? শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তিনি যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা তাঁহার শিষ্যদের দিয়াছিলেন; দৈনন্দিন জীবনে অতীন্দ্রিয়তা; 'আমাকে অনুসরণ কর, মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক'।

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

পুরাতন মন্দিরে: প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আলোচনা করেন। রবিবার ব্যতীত অন্যদিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেলা ১১টা হইতে ১২টা শিশুদের সময়।

স্বামী মাধবানন্দ

হিতৈষী বন্ধুগণের পরামর্শে গত ৭ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানকার চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া মস্তিষ্কে একটি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। গত ২৬শে এপ্রিল 'নিউ ইয়র্ক হস্‌পিটালে' সেই অস্ত্রোপচার নির্বিঘ্নে সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। স্বামী মাধবানন্দ ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬২; মূল্য এক টাকা।

অনেকেই বিধিমত শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করিতে চান, কিন্তু সাধারণতঃ উপযুক্ত পূজাপদ্ধতির অভাব থাকায় এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সাধারণ পূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা-পদ্ধতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হোমপ্রণালী, শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচার দানমন্ত্র, শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি স্তোত্র এবং শ্রীশ্রীসারদা-স্তোত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রে শিবরাত্রি ও মহাবীরের পূজা হইয়া থাকে, সেজন্য সংক্ষেপে মহাবীরের পূজা ও শিবরাত্রিতে শিবপূজাবিধিও ইহাতে সংযোজিত। পরিশিষ্টে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের অনুষ্ঠিত পূজাপ্রণালী এবং 'ভাবের পূজা'র কথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর): গত ২৫শে ও ২৬শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আযোজিত জনসভায় স্বামী অচিন্ত্যানন্দ এবং স্বামী পরশিবানন্দ বক্তৃতা দেন। সভায় সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও দ্বিতীয় দিন স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে বক্তৃতা হয়। ইহার পূর্বে ১৭ই ফেব্রুআরি আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা উপলক্ষে বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি ও হোম হয়।

পূর্ণিয়া: রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৭শে ফেব্রুআরি বহুলোকের সমাবেশে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ 'স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার উপদেশ' সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

২২শে হইতে ২৫শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গে বাসন্তী দুর্গাপূজা এবং রামনবমীর দিন নর-নারায়ণ-সেবা হইয়াছিল। ২৩শে মার্চ প্রবীণ উকিল শ্রীহরলাল মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্ম-সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয়।

অশোকনগর (২৪ পরগনা): শ্রীসারদা সঙ্ঘ-প্রাঙ্গণে গত ১৮ই ও ১৯শে মার্চ পূজা, হোম, ভজন-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মপ্রসঙ্গ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

১৯শে মার্চ অপরাহ্ণে স্বামী ঈশানানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী জীবানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন ও বাণী' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

আলিপুরদুয়ার জংশন: গত ৩১ মার্চ, ১লা ও ২রা এপ্রিল স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী, গীতা ও 'কথামৃত' পাঠ হয়। তিন দিনই অপরাহ্ণে আযোজিত সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং সভান্তে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আলোকচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা করেন।

রাঁচি: শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব উপলক্ষে গত ১২ই মার্চ হইতে ৫ দিন রাঁচি শহরের দুর্গাবাড়ীতে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে, হীনু ক্লাবে, মোরাবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ও আনন্দময়ী আশ্রমে কলিকাতার শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী সঙ্গীত-সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কথকতা করিয়াছেন।

নাটশাল (মেদিনীপুর): গত ২৩শে এপ্রিল স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। বৈকাল স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ এক ধর্ম-সভায় ভাষণ দেন। পরে ছায়াচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন দেখানো হয়। সর্বশেষে নরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা কথকতা করেন।

নূতন পুকুর (২৪ পরগনা): শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২রা এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব গ্রাম্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও ভজন দ্বারা উৎসব আরম্ভ হইলে একে একে বিশেষ পূজা, ভোগ, হোম, ধর্মপ্রসঙ্গ, প্রসাদ-গ্রহণ ও কালী-কীর্তনাদিতে উৎসব-প্রাঙ্গণ আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠে। বৈকালে চারিগ্রাম আশ্রম-পরিচালিত শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উৎসবে দেড় হাজার গ্রাম্য নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে স্বামী জীবানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশামৃত সহজ গল্পচ্ছলে বর্ণনা করেন। সভান্তে স্থানীয় কীর্তন-সম্প্রদায় কর্তৃক লীলাকীর্তন গীত হয়।

ভাঙ্গামোড়া (হুগলি): গত ২৬শে মার্চ স্থানীয় সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, ছাত্রদের ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী অজজানন্দ 'সেবাধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যারতির পর হরিনাম-সংকীর্তন হয়।

মাকুম জংশন (আপার আসাম): স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবা-সংঘের উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী বিবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ৬ই এপ্রিল বিকালে মাকুম রেলওয়ে স্কুল-হলে এক জনসভায় স্বামী শিবরামানন্দ এবং পুরুষোত্তমানন্দ প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে স্বরচিত এক ভাবগর্ভ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়। পরে কলিকাতা হইতে আগত বেতার-কথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'সারদা-রামকৃষ্ণ-মিলন' বিষয়ে কথকতা করেন। সভান্তে প্রসাদ বিতরিত হয়। প্রায় পাঁচশত নরনারী সভায় উপস্থিত ছিলেন। ৮ই এপ্রিল বিশেষ পূজা ও নাম-সংকীর্তন হয়।

সিঁথি (কলিকাতা): রামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক গত ২৯শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত ছয়-দিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব ডি. গুপ্ত লেনে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী মহানন্দ, স্বামী জীবানন্দ এবং শ্রীশিবপদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা, রামায়ণ-গান, কীর্তন-ভজন, 'শ্রীশ্রীমা'-লীলাভিনয়, দেবী-মাহাত্ম্য-কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সংশুদ্ধানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন এবং পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। উৎসবের একদিন প্রায় ৫,০০০ ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। একদিন নগর-পরিক্রমা করা হয়, তাহাতে প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত অনুগমন করেন।' প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ৮।৯ হাজার শ্রোতার সমাবেশ হইত।

রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা

বারাসত: গত ২০শে এপ্রিল প্রাতে বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মস্থান বারাসতে রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরের উৎসর্গ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ; যথারীতি মাঙ্গলিক কার্য ও স্তবপাঠের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের প্রতিকৃতি চারখানি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই উপলক্ষে ২৩শে এপ্রিল

পর্যন্ত ষোড়শোপচারে পূজা, সপ্তশতী হোম, বাস্তুযাগ, উপনিষদ্-গীতা-ভাগবত-শিবমহিম্নঃ-স্তোত্র-পাঠ, ভজন, রামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন, রামনাম-কীর্তন, কথকতা, কালীপূজা, যাত্রাভিনয়, শোভাযাত্রা, জনসভায় বক্তৃতা, সাধুসেবা ও প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসব চলিতে থাকে।

উৎসবের প্রথম দিন বারাসত সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত স্বামী শিবানন্দ মহারাজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাত্রগণের নিকট ছাত্রজীবনের আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অপরাহ্নে স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর পৌরোহিত্যে এক মহতী জনসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

উৎসবের শেষ দিন কয়েক শত ভক্ত নরনারীর একটি শোভাযাত্রা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের চারিখানি প্রতিকৃতি সহ ভজন ও কীর্তন গাহিতে গাহিতে বারাসত শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে। প্রায় ১০,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে স্বামী কৈলাসানন্দজীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় আশ্রম-সম্পাদক শ্রীআশু দে আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং ডক্টর রমা চৌধুরী, স্বামী পুণ্যানন্দ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ভারতের জাতীয় আয়

১৯৪৮ ৪৯ খৃষ্টাব্দের দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে :

বৎসর	জাতীয় আয় (কোটি টাকা)	ব্যক্তিগত আয়
১৯৫৯-৬০	১১,৭৬০	২৯১'৬ টাকা
১৯৫৮-৫৯	১১,৬৫০	২৯২'৬ „
১৯৫৫-৫৬	১০,৪৮০	২৭৩'৬ „

[কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান-সংস্থা হইতে প্রকাশিত তথ্য অবলম্বনে] P.T.I.

একজন যাত্রীর এরোপ্লেন

লণ্ডনে বিমান-বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়রিং ছাত্রগণ একটি ছোট বিমান নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে মাত্র ৯০০ টাকা খরচ পড়িয়াছে। যুদ্ধকালীন প্যাইলট মিঃ রবার্টসন ইহার পরিকল্পনা করেন। গত ২৪শে এপ্রিল ইংলণ্ডে রেডহিল বিমান-ঘাঁটিতে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। এই ছোট বিমান (Skimmer) একজন যাত্রীর জন্যই নির্মিত, তবে ৫ জনকে উঠাইবার শক্তি ইহার আছে। বিমানটির দৈর্ঘ্য ১২ ফুট, ওজন ১৫০ পাউণ্ড এবং অশ্বশক্তি ৪০ ; মিঃ রবার্টসন মনে করেন, এই জাতীয় ছোট বিমান ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় পূর্ণ, বিশেষত অনুন্নত দেশসমূহে।

[রয়টার হইতে সংকলিত]

ভ্রম-সংশোধন

১৪৪ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ ৯ পঙ্‌ক্তি— 'গ্রহণীয়' স্থলে পড়িবেন 'গ্রহণীয় নয়'
„ „ „ „ ১২ „ — 'সন্ন্যাস' „ „ 'সন্ন্যাসী'
১৪৫ „ ১ম „ ৩০ „ — 'হুঁ যাব' এর পরে পড়িবেন :

প্রশ্ন—আপনার পাণ্ডা কে? উত্তর—রাজনারায়ণ বসু।

গুরু, শিষ্য ও জ্ঞান

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥

[মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।১২, ১৩]

যেমন প্রজ্বলিত দীপশিখা হইতে একই প্রকার আলোকপ্রদানে সক্ষম শত শত দীপ জ্বালা যায়, সেইরূপ জ্ঞানের আলোকে যাঁহার জীবন উদ্ভাসিত, তাঁহার নিকট হইতেই জ্ঞানলাভ করা যায়। জিজ্ঞাসু শিষ্য কিভাবে ও কখন সদ্গুরুসমীপে উপনীত হন, এই গুরুই বা কিরূপ শিষ্যের হৃদয় আলোকিত করেন সে সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলিতেছেন:

অনিত্য ক্ষয়শীল কর্ম দ্বারা অক্ষয় নিত্যবস্তু মোক্ষ বা জ্ঞানলাভ করা যায় না—এইরূপে বিচার করিয়া কর্মনিষ্পন্ন ফলসমূহকে অনিত্যরূপে নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানলাভে আগ্রহশীল জিজ্ঞাসু ব্রহ্মচারী বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। নিত্যবস্তুকে জানিবার জন্য সেই নির্বেদপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী সমিৎপাণি হইয়া (যজ্ঞকাষ্ঠ প্রভৃতি উপহার দ্রব্য হস্তে লইয়া) বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মৈকপরায়ণ গুরুর সকাশেই গমন করিবেন।

ব্রহ্মজ্ঞ গুরুও যথাবিধি সমীপাগত, প্রশান্তমনা ও সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে যথাযথরূপে সেই ব্রহ্মবিদ্যাটি অবশ্যই উপদেশ করিবেন, যে বিদ্যাসহায়ে পরমার্থ নিত্যবস্তু—ক্ষয়হীন অক্ষর পুরুষকে—সেই সর্বব্যাপী সকলের অন্তর্যামীকে অন্তরের অন্তরে নিজের আত্মারূপে আবার পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করা যায়।

কথাপ্রসঙ্গে

বেদান্তের শিক্ষা

'বেদান্ত' সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন, অথবা বেদান্তের প্রসঙ্গ যাঁহারা শুনিয়া থাকেন, যদি তাহাদের মতামত গ্রহণ করা যায় তো দেখা যাইবে, কাহারও মতে বেদান্ত অতি সহজ এবং সরল একটি দার্শনিক মত—যাহা 'তত্ত্বমসি' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি মহাবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

আবার যাঁহারা বেদান্তের ভাষ্যটীকার অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন : না হে, অত সহজ নয়। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রের ভাষ্যটীকা পড়িয়া দেখিও, বুঝিবে 'অথ', 'অতো' তারপর 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'; ব্রহ্মজ্ঞান তো বহুদূর! 'তত্ত্বমসি' বলিলেই তাহার উপলব্ধি হয় না; তৎ-পদার্থ ত্বং-পদার্থ জানিয়া তারপর 'অসি'র অর্থ বুঝিতে হয়। সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্যক্তি ত্বং-পদার্থ শোধন করিয়া বোধে বোধ করেন—'আমি স্বরূপত ব্রহ্ম'।

যে বুঝিয়াছে সে তো ভালই আছে, যে না বুঝিয়াছে সেও বেশ আছে, মাঝখান হইতে আধবুঝুনির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন; তাহারা জানিতে ও বুঝিতে চায়, তাহাদেরই জন্য নানাভাবে আলোচনার প্রয়োজন।

বর্তমানে অনেকেই বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন, পুস্তকও রচনা করেন, কিছু অবশ্য শাস্ত্রানুমোদিত, আবার অনেকগুলি স্বকপোল-কল্পিত। বিশেষত দুর্নীতির সমর্থনে দুর্বৃত্ত যখন বলে—'জগৎই যদি মিথ্যা, তবে তদন্তর্গত দুর্নীতিটাই কি সত্য?', তখন চিন্তার কারণ ঘটে। আজকাল আবার রাজনীতিক হত্যাকাণ্ডের পর বেদান্ত প্রয়োগ করিয়া কেহ কেহ সান্ত্বনা দেন: জন্মমৃত্যু দুইই মিথ্যা—অতএব গীতার কথা স্মরণ করিয়া শোক করিও না। কিছুদিন পরে হয়তো দেখা যাইবে, বিভিন্ন দেশে সামরিক শিক্ষায় গীতা ও বেদান্ত আবশ্যিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তৎপূর্বে আমাদের জানা উচিত বেদান্ত কি, ও কি নয়!

বেদের শেষভাগকেই 'বেদান্ত' বলা হয়। বেদের প্রথমাংশে—স্তব-স্তুতি যাগ-যজ্ঞে দেবতা-তত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, স্বর্গতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনার পর বাহিরের সন্ধান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, মানুষের মন অন্তর্মুখী হইয়া পরমতত্ত্বকে গভীর ধ্যান চিন্তা ও বিচারসহায়ে প্রথমে নিজেরই মধ্যে অনুসন্ধান করিল, পরে সেই তত্ত্বকে সর্বত্র ওতপ্রোত অনুভব করিয়া যে গভীর বাণী ঘোষণা করিল, তাহাই উপনিষদ বা বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ। উপনিষদে প্রকাশিত বেদান্ত-তত্ত্বকে 'শ্রুতি'ও বলা হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-মুখে গীতায় বিঘোষিত বেদান্তসত্য 'স্মৃতি' নামে প্রসিদ্ধ। ব্যাসকৃত 'ব্রহ্মসূত্র' বেদান্তের 'যুক্তি-প্রস্থান' বলিয়া অভিহিত।

অনেকে 'বেদান্ত' বলিতেই অদ্বৈত বেদান্ত বুঝিয়া থাকেন। বিভিন্ন আচার্যের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত। আচার্য শংকরাদি প্রস্থানত্রয়ে অদ্বৈততত্ত্বই উপলব্ধি করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজাদি বিশিষ্টাদ্বৈতভাব পোষণ করেন, আবার মধ্বাদি আচার্যগণ পূর্বোক্ত মতসকল খণ্ডন করিয়া দ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণ আবার সূক্ষ্ম বিচারসহায়ে দ্বৈতাদি মত খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া 'অদ্বৈত সিদ্ধান্ত' সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাই ভারতের দার্শনিক জগতের সহস্র বৎসরের ইতিহাস।

যুগ যুগ ধরিয়া বেদান্ত ভারতের ধর্ম কর্ম সমাজ রাষ্ট্র সাহিত্য—সর্বত্র স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; বর্তমান যুগে ভারতের বাহিরেও বেদান্ত প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করিয়াছে।

অধুনা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে দৃশ্যমান শক্তিই অদৃশ্য দেবতাশক্তির স্থান অধিকার করিতেছে। যখন পুরাতন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক সকল ধর্মের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে, তখন কিভাবে বেদান্ত ধর্মের এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জড়বিজ্ঞানজাত নাস্তিক্যবাদের সম্মুখীন হইতেছে, তাহা বিশেষভাবে আলোচনীয়।

বেদান্তের ভাবধারা ভারতে চিরপ্রবাহিত, কখন প্রবল প্রবাহে, কখন স্তিমিত ধারায়, কখনও বা ফল্গুর মতো অন্তঃসলিলা। বর্তমান যুগে বেদান্ত-ভাবধারার নব ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অনুশীলন করিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে।

অদ্বৈত বেদান্তের কথা তারস্বরে ঘোষণা করিলেও, উহাকে মানব-মনের উচ্চতম সীমা বলিয়া স্বীকার করিয়াও অপর দুই মতকে তিনি ভ্রান্ত বা বর্জনীয় বলেন নাই। সাধকের মনের অবস্থা-বিশেষে সকল মতই সত্য। নিরপেক্ষ সত্য এক কিন্তু আপেক্ষিক সত্য বহু। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত সোপানবৎ সত্য! প্রথম অবস্থায় অবশ্যই মনে হয়, জীব জগৎ হইতে ঈশ্বর পৃথক্ (extra-cosmic God); মধ্যাবস্থায় উপলব্ধি হয়—জীব জগৎ ঈশ্বরের অংশ ; শেষের অনুভূতি—'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' —জীব জগৎ সকলই ব্রহ্ম : ইহার অর্থ—ব্রহ্মই সত্য, জীব জগৎ তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান্ —তাহাদের পৃথক্ কোন সত্তা নাই।

কেহ বলিবেন, এ অতি দুঃসাহসিক উক্তি ; আমরা বলিব, ইহাই নির্ভীক সত্যানুভূতি। ইহারই সুদৃঢ় এবং বিশাল ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিতে পারে আগামী যুগের বৈজ্ঞানিক ধর্ম।

স্বামীজী বলিতেছেন : Real religion, the highest, rises above mythology, it cannot rest upon that. Modern science has really made the foundation of religion strong.···What the metaphysicians call 'being', the physicists call 'matter'. Though an atom is invisible, unthinkable, yet in it are the whole power and potency of the universe. That is exactly what the Vedantist says of Atman. (*Inspired Talks.*)

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত : জড় জগতের সমস্ত শক্তি অদৃশ্য অচিন্তনীয় পরমাণুতে কেন্দ্রীভূত ; বেদান্ত সিদ্ধান্ত : সমস্ত শক্তি আত্মায় নিহিত।

আত্মবিশ্বাসই সকল বিশ্বাসের মূল, এবং বিশ্বাসের বলেই মানুষ শক্তি অর্জন করিতে পারে। যদি কেহ অসংখ্য দেবতায় বিশ্বাসী হয়, এবং যদি তাহার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে মুহূর্তে তাহার সকল বিশ্বাস টলিয়া যায়, সে প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক। আর একজন হয়তো কোন দেবতার উপর নির্ভর করে না, কিন্তু আত্মশক্তির উপর একান্ত বিশ্বাসী ; বেদান্ত তাহাকে নাস্তিক বলে না।

যে নিজের উপর বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই নিজেকে শ্রদ্ধা করে, এবং নিজের চেষ্টায় সে উন্নতির পথ করিয়া লয়। বেদান্তের অনুশীলন করিলে আত্মবিশ্বাস সহায়ে একজন শিক্ষক ভাল শিক্ষক হইবে, ছাত্র ভাল ছাত্র হইবে, উকীল ভাল উকীল হইবে, মুচি ভাল মুচি হইবে , চাষী ভাল চাষী হইবে।

যিনি বিশ্বাস করেন, আমার অন্তরে অনন্ত শক্তিমান্ আত্মা রহিয়াছেন, তিনি অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন, অপরের ভিতরেও সেই আত্মা

রহিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সকলের ভিতর আত্মাকে অনুভব করেন, কাহাকেও ঘৃণা বা হিংসা করিতে পারেন না, পরন্তু তিনি নিজের ও অপরের দুঃখ দূর করার জন্য, উন্নতির জন্য সমান চেষ্টাশীল, 'সর্বভূতে আত্মবৎ' এই দৃষ্টিই বৈদান্তিক সমাজ-নীতির ভিত্তি।

অনেকে মনে করেন, বেদান্তার্থ বুঝিতে গেলে 'বিবেক-বৈরাগ্যের' যে সাধনা করিতে হয়, তাহাতে 'জগৎ মিথ্যা, জীবন অনিত্য' এই প্রকার আত্মঘাতী চিন্তা করিতে হয়, —ইহা দ্বারা জগতের বা জীবনের কোন প্রকার কল্যাণ সম্ভব নয়। তাহার উত্তরে স্বামীজী কি অপূর্ব ভাষায় বেদান্তোক্ত বৈরাগ্যের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন :

Vedanta does not in reality denounce the world. The ideal of renunciation nowhere attains such a height as in the teachings of the Vedanta. But at the same time, dry suicidal advice is not intended, it really means deification of the world—giving up the world as we think of it, as we know of it, as it appears to us, and to know what it really is. (*Jnana Yoga*)

বৈরাগ্যের অর্থ জগৎকে অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দেওয়া নয়। জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন, প্রকৃতরূপে দর্শন। প্রাচীনতম উপনিষদেই পাওয়া যায় : ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্— সংসারে সমাজে সর্বত্র ঈশ্বরশক্তি অনুস্যূত রহিয়াছে ; ইহা অনুভব করিতে হইবে। ঈশ্বরই নানারূপে নানাভাবে খেলা করিতেছেন। জগৎকে জড়রূপে না দেখিয়া চৈতন্যরূপে দেখিতে হইবে ; জীবকে জীবরূপে না দেখিয়া শিবরূপে দেখিতে হইবে এবং তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে হইবে। বেদান্তের এই মহত্তম শিক্ষাই এ যুগে বিবেকানন্দ-কণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে।

মানবজাতির—তথা মানবসমাজের ক্রম-বিকাশের ফলে নূতন নূতন অনেক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, যেগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী বিশ্বভাবের। সমস্যাগুলির মধ্যে (১) প্রথম ও প্রধান পুরাতন ধর্মগুলিতে ক্রমক্ষীয়মাণ বিশ্বাস, (২) ধর্মমাত্রকেই অস্বীকার করিবার মনোবৃত্তি, (৩) বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও ভাবাদর্শের মধ্যে পরস্পর বিরোধ। আমরা এই সমস্যাগুলির সমাধান পাই এক বেদান্তের মধ্যেই।

বেদান্ত শুধু ভারতের ষড্‌দর্শনের একটি দর্শনমাত্র নয়। বেদান্ত সকল মতের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, সকল ধর্মেরও আধ্যাত্মিক ভিত্তি। ধর্মগুলির গায়ে জড়ানো নামাবলী খুলিয়া ফেলিলে দেখা যায়, সকল ধর্ম—সকল মত এক অনন্ত সত্যকে লাভ করিবার এক একটি পথ। বেদান্তের বিচ্ছুরিত আলোকেই অবিরোধের ও সমন্বয়ের এই মহান্ সত্য আমাদের চক্ষে উদ্‌ভাসিত হয়। বেদান্তসহায়েই একজন হিন্দু ভাল হিন্দু, খৃষ্টান ভাল খৃষ্টান, মুসলমান ভাল মুসলমান হইতে পারে। যে বেদান্ত নিজেকে ও নিজের মতকে শ্রদ্ধা করিতে শেখায়—সেই বেদান্ত অবশ্যই অপরকে ও অপরের মতকে শ্রদ্ধা করিতে বলে। বেদান্ত কাহাকেও নিজের ধর্ম ত্যাগ করিতে বলে না, অপর ধর্মকে ভ্রান্ত বলিয়া কাহাকেও ধর্মান্তরিত করে না, পরন্তু সকল ধর্মেই শক্তি সঞ্চার করে।

পারস্পরিক এই শ্রদ্ধার ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিতে পারে সমষ্টি-কল্যাণের সৌধ। যতই আমরা বেদান্তের এই শিক্ষা গ্রহণ করিব, ততই মতবিরোধ, মতবিভেদ প্রভৃতি অশুভ শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইবে। ব্যক্তিগত জাতিগতভাবে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ও মানুষ সুসংহত এক মানবজাতিতে পরিণত হইবে, যেখানে হিংসামূলক প্রতিযোগিতা থাকিবে না, থাকিবে প্রীতি-মূলক সেবা ও সহযোগিতা।

জাতীয় সংহতি

স্বাধীনতা-লাভের ১৪ বৎসর পরে আজ জাতীয় সংহতির (national integration) সমস্যা নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে। এ সম্বন্ধে নূতন করিয়া চিন্তা শুরু হইয়াছে। নানা অশুভ ঘটনার মধ্যে এই চিন্তা যে শুরু হইয়াছে—ইহাই শুভ লক্ষণ। চিন্তা যেন মধ্যপথে থামিয়া না যায়, চিন্তা যেন বিপথে চলিয়া না যায়। সরল যুক্তির প্রশস্ত রাজপথে চলিলে জাতীয় সংহতি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে, নতুবা রাজনীতিক স্বার্থের অলিগলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে 'এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে' কত জাতি যে মাথা তুলিয়া মহাজাতির গতিরোধ করিবে, তাহা বলা কঠিন। দেশের যাঁহারা কর্ণধার, তাঁহারা নিশ্চয় এই আসন্ন বিপদ লক্ষ্য করিয়াই জাতীয় সংহতির জন্য আজ সমধিক সচেষ্ট।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে—ভারতে কখনও জাতীয়তা বলিয়া কিছু ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের ফলেই এক প্রকার শাসন, এক প্রকার সরকারী ভাষা, এক প্রকার উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম প্রভৃতির ফলে উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে এই জাতীয়তার ভাব দানা বাঁধিতেছিল। ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে (১৯৩৫ খৃষ্টাব্দেই) ব্রিটিশ সযত্নে সেই জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছে—প্রথমত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, দ্বিতীয়ত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পত্তন করিয়া। ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাগের পর ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের ঢেউ আজ জাতীয় জীবনের উভয় কূল ভাঙিতেছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক অবশ্য বলেন, জাতীয়তাবোধের ধারণাটি উনবিংশ শতাব্দীতেই শুরু হইয়াছে ইওরোপে। সেখান হইতেই ভারতে আসিয়াছে, আফ্রিকাতেও যাইতেছে ইওরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে।

জাতীয়তাবোধের মূল যে কি, এ লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে গত শতাব্দীতে ইওরোপে প্রসূত এই জাতীয়তাবোধ প্রধানত ভাষাভিত্তিক! তথাপি সেখানে কোন কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেও একাধিক ভাষার প্রাধান্য স্বীকৃত: যথা সুইটজারলণ্ডে তিনটি, বেলজিয়মে দুইটি। 'মুসলিম জাহানে' বলা হইয়া থাকে ধর্মই জাতীয়তা—যাহাদের ধর্ম এক, তাহাদের জাতিও এক। এক ধর্ম, এক কৃষ্টি সত্ত্বেও ইওরোপ ভাষাভিত্তিতে বহু জাতিতে বিভক্ত। মরক্কো হইতে মালয় পর্যন্ত ইসলাম বিস্তৃত থাকিলেও ঐ সকল দেশের অধিবাসীরা নিজেদের একজাতি বলিয়া মনে করে না।

ভারতে বিভিন্ন ধর্মমত চিরদিন ধরিয়াই রহিয়াছে, ভাষারও অন্ত নাই। ধর্মমত ও ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতের একটি অতি সূক্ষ্ম জাতীয়তা আছে। অদৃশ্য সূত্র যেমন মণিগণের মধ্য দিয়া গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া রাখে, ভারতের জাতীয়তাবোধের সূত্রটি সেইরূপ অদৃশ্য, তাহারই উপর সযত্নে গাঁথা রহিয়াছে বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন ভাষার মণি-মালা। এইটুকু বুঝিতে পারিলে তবেই ভারতের জাতীয়তাবোধের রহস্য বোঝা যাইবে; নতুবা কখন ভৌগোলিক ঐক্য, কখন রাজনীতিক একতা, কখন আর্থনীতিক সমস্বার্থ—নানা দিকে মাথা ঠুকিয়া মরিব, কোথাও পাইব না—ভারতের সেই ঐক্যসূত্রের সন্ধান। অথচ সে রহিয়াছে অতি নিকটে—প্রতিটি মণির অভ্যন্তরে। ভারতের জাতীয় সংহতির সূত্র রহিয়াছে—তাহার ধর্মে দর্শনে সাধনায়, তাহার ভাষায় সাহিত্যে, কাব্যে সঙ্গীতে ভজনে, কৃষ্টিতে ঐতিহ্যে। অবিরত আপাত

বৈষম্যগুলির উপর জোর না দিয়া অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যগুলির তুলনামূলক অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে জাতীয় সংহতি সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইবে —পূর্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল অনেকেই মনে করেন, দলীয় রাজনীতিই দেশসেবার প্রশস্ত পথ। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্ব কোন একটি দল-বিশেষের নহে। যদি সত্যই আমরা বুঝিয়া থাকি, জাতীয়তাবোধে ভাঙন ধরিয়াছে, (ধর্ম ও ভাষা লইয়া যে এই ভাঙন ধরিয়াছে, ইহা আজ অস্বীকার করিয়া লাভ নাই)—তবে এ ভাঙন প্রতিরোধ করিতে হইবে দৃঢ় হস্তে। দলের রঙ্গমঞ্চের বাহিরে আসিয়া আজ দেশপ্রেমিক কল্যাণকর্মীকে অগ্রসর হইতে হইবে রাজনীতি-বর্জিত শুদ্ধ দেশসেবার বিরাট আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া।

জাতীয় সংহতি গড়িয়া তুলিতে হইবে উপর হইতে নয়—নীচে হইতে, শহর হইতে নয়—গ্রাম হইতে, কেন্দ্র হইতে নয়—পরিধি হইতে, ভারী শিল্প-মাধ্যমে নয়—কুটির শিল্পের মাধ্যমে, শুধুমাত্র ভোটাধিকার দ্বারা নয়—তৎসহ ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার দ্বারা; ধর্ম ও ভাষার সংখ্যালঘুকে সংবিধানসম্মত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নয়—সেগুলি যতশীঘ্র সম্ভব কার্যকর করিয়া।

সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয় জীবনের ক্ষয়-রোগের মতো জানিয়া কৃষ্টিরক্ষার অজুহাতে সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিলে কি করিয়া জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠিবে? জাতিভেদই আমাদের সর্বনাশের কারণ, বারংবার এ কথা বলিয়াও তপশীলী জাতি, উপজাতি প্রভৃতি বিভাগগুলি দীর্ঘস্থায়ী করিলে কখনই জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। জাতি-ধর্ম-ভাষা-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষকে সমানাধিকার দিলে তবেই সুস্থ জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিবে। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ অনুভব করিবে—আমি জাতির অঙ্গ, সারা ভারত আমার দেশ—ভারতের উন্নতি আমার উন্নতি। নতুবা লেখায় ও বক্তৃতায় উদার জাতীয়তার জয় গাহিয়া কার্যক্ষেত্রে যদি সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিই, তবে প্রাদেশিকতাই বাড়িবে; ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার (linguistic nationalism) গতিরোধ করিতে কেহই পারিবে না।

সেক্ষেত্রে এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে নিজেকে বিদেশী বোধ করিবে, সমগ্র ভারতকে কেহই নিজের দেশ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। যদি প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীরা মনে করে, এই অঞ্চল আমাদেরই দেশ—অপরের নহে, বাংলা শুধু বাঙ্গালীর, বিহার বিহারীর, ওড়িষ্যা ওড়িয়ার, আসাম অসমীয়াভাষীর, তাহা হইলে ভারত কাহার দেশ?

গত বৎসর হইতে আসামে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে কল্পনার অতীত। প্রায় একই প্রকার অপরাধের জন্য সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার পূর্বে আমাদের কর্তব্য নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে যে অন্যায় অবিচার বারংবার হইতেছে, তাহার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা। তবেই ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে জাতীয় সংহতি। এজন্য বক্তৃতা, প্রস্তাব ও পরিকল্পনার পূর্বে আজ একান্ত প্রয়োজন শক্ত সবল সাহসী ও সহানুভূতিশীল নেতৃত্ব।

চলার পথে

'যাত্রী'

'না, হ'ল না'– এ কথা বলেই তোমার চেষ্টা ছাড়ছ কেন, পথিক ? তুমি কি ভুলে গেলে, তোমার ধৈর্য, তোমার স্থৈর্যের কথা—বাল্যকালেও যা তোমার হৃদায়ত্ত ছিল ! তখন তো তুমি কতবার পড়েছ—এ ধরার পিঠে, তবুও সোজা হয়ে দাঁড়াবার অদমনীয় ইচ্ছা তোমাকে সেই সব ক্ষুদ্র পরাভবকে স্বীকার করতে দেয়নি। আর দেয়নি বলেই আজ তুমি দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছ, ছুটতে শিখেছ। কিন্তু এখন তোমার এই যৌবনের শক্তিমত্তা, বিবেকবুদ্ধির পরিপকতা পেয়েও পরাজয় মানতে চাইছ? তা কি হয়; চেষ্টা কর; বিফলতায় দমে যেও না; মনে বল রাখো, দেখবে শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতেছ। উদ্যম না থাকলে, ক্ষুধিত সিংহের মুখেও অন্ন এসে জোটে না—এ কথা কি ভুলে গেলে ?

আর ভয় ? কিসের ভয় ? মৃত্যুর ? —সে তো আছেই, তাকে এড়াবে কি ক'রে ? মহাভারতের শান্তিপর্ব খোলো (২৮।৫০) দেখবে—মৃত্যুর পথ অতি বিরাট; জগতে আর কিছুরই কি হবে তা জানা নেই। কিন্তু মৃত্যু ধ্রুব, সুনিশ্চিত—এ পথে না চলেও মানুষের উপায় নেই—সকলকেই যে এ পথে চলতে হবে। এর হাত থেকে ছাড়া পাবার যখন সম্ভাবনা নেই, তখন সেই মৃত্যুর স্বপ্নে-দেখা হাতছানির পথ ধরে বৃথা আশার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ার কি আছে ! ঋগ্বেদের ঋষির উদাত্ত উপাসনার সুরের মাঝেও সেই একই বাণীস্পন্দন (১।১১৩।১১): পূর্বে যাঁরা উজ্জ্বল উষাকে দেখেছিলেন, তাঁরা আজ কোথায় চলে গেছেন; এখন আমরা যারা উষাকে দেখছি এবং আমাদের পরেও যাঁরা দেখবেন, তাঁদের সকলকেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। তাইতো বলছি, আমরা হচ্ছি এক যাত্রীর দল। সকলেই একই সঙ্গে চলেছি; চলেছি সেই মৃত্যুর অভিযানে। এতে কেউ আছে এগিয়ে, কেউ আছে পেছিয়ে, তাই আগে কেউ পৌঁছচ্ছে, কেউ বা পরে; এতে আর দুঃখের কি আছে ?

তাইতো বলি, ভয় পেও না। বরং আনন্দ কর এই ভেবে যে তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ। কারণ বহুবার বহুযোনিতে ভ্রমণ ক'রে জীব পুরুষার্থ-সাধক মনুষ্যজন্ম পায়। তাই এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের যে পর্যন্ত না অবসান ঘটে, সেই পর্যন্ত বিবেকী পুরুষ নিঃশ্রেয়স্ লাভের জন্য যত্ন করেন, কারণ বিষয়ভোগ তো নিকৃষ্ট প্রাণী শরীরেও সম্ভব, কিন্তু পরমার্থ লাভ করতে হ'লে নরদেহ পেতেই হবে।—এই কথা আমরা পাই ভাগবতে (১১।৯।২৯)।

সেই নরদেহ পেয়েও তুমি কেবল বন্ধ্যা প্রতীক্ষায় কাল কাটাবে পথিক ? তুমি তোমার এই জীবনের মূল্য, তার মান নির্ণয় না করেই পৃথিবী থেকে চলে যাবে ? সে কি হয় ? তোমার ঐ মান, ঐ মূল্য সম্বন্ধে যথার্থ 'হুঁশ' হলেই তো তুমি মান-হুঁশ অর্থাৎ মানুষ হবে। তাই তোমার সুমুখে অহরহ যে কল্যাণপ্রদ 'শ্রেয়স্' ও আপাতমধুর 'প্রেয়স্' রয়েছে, তার মধ্যে শ্রেয়স্কেই লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হও। কেননা 'প্রেয়স্'-কে তো নিকৃষ্ট প্রাণীরাও সঙ্গী ক'রে নিয়েছে, আর তুমি শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে যদি শ্রেয়স্কে না ধর, তাহলে ঐ অদৃষ্টকে বা মৃত্যুকে 'হাস্যমুখে পরিহাস' ক'রে যেতে পারবে কি ক'রে। তাছাড়া শ্রেয়স্কে ধরে তুমি কিছুতেই

তোমার জৈবসত্তা বা জড়ত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে না। তাইতো তোমাকে প্রেয়সের পিপাসাকে ছাড়তে বলি, কারণ 'অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ'—পিপাসার শেষ নাই।

জানতো, মানুষ অভ্যাসের অধীন। সে যে যে বিষয় ভাবে, তাতেই তার মন আসক্ত হয়। তাই বলি কল্যাণের বিষয়ে ভাবো, ক্রমে তাই তোমার ভাল লাগবে। জেনো, এই ভাল লাগার বীজ তোমার মধ্যেই রয়েছে—আবাদ করো, সোনা ফলবে। মোট কথা, এই শ্রেয়সের জন্য কিছু করতে হবে। চুপ ক'রে থাকলে হবে না। চলতে হবে; তবেই এগোতে পারবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে: 'চরন্ বৈ মধু বিন্দতি'—যিনি বিচরণ করেন তিনিই মধু আহরণ করতে পারেন। ঘরে ব'সে কেহ স্বাদু ফল সংগ্রহ করতে পারে না। সূর্যের যে গৌরব তা কেবল তিনি কখনও বিচরণ করতে করতে থামেন না ব'লে। সত্যের এই আলোক-দিশারীকে তুমি আদর্শ কর, পথিক।

বলবে—শ্রেয়সের পথে চলতে গিয়ে যদি এই জীবনে শ্রেয়স্ না পাই? তাতেই বা কি? তোমার মনকে যে তুমি শ্রেয়সের পথে বাঁধতে পেরেছ, এইটেই যথেষ্ট। কারণ, 'অল্পংহি সারভূয়িষ্ঠং যৎ কর্মোদারমেব তৎ' (মহাঃ শান্তিঃ—৭৫।২৯) অর্থাৎ অল্প হলেও সারবান্ কর্মই প্রশংসনীয়। তাছাড়া, মরণ কখন যে এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে, তার যখন কোন ঠিক ঠিকানা নেই, তখন কালকের কাজ আজই শেষ ক'রে ফেল; অপরাহ্ণের কাজ পূর্বাহ্ণেই শেষ ক'রে রাখো। যা শ্রেয়স্কর আজই তা ক'রে ফেল, কাল হয়তো আর সময় পাবে না। কারণ, আমরা সবাই মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত এবং জরাদ্বারা পরিবেষ্টিত—এক একটি দিন আসছে, আর আয়ু কমছে। এর মাঝেই আমাদের শ্রেয়সের জন্য চেষ্টা ক'রে যেতে হবে কারণ, যা দুস্তর দুর্গম দুষ্কর—তা চেষ্টা করতে করতেই অধিগত হয়; চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই।

জীবন শেষ হবার আগেই জীবনকে চিনতে চেষ্টা কর। কেন এলে এই পৃথিবীতে, কেনই বা চলে যেতে হচ্ছে, তার একবার হিসাবনিকেশ করবে না? সামান্য অর্থেরও একটা জমা-খরচ রাখো, আর এই মহামূল্য জীবনের দেনাপাওনা বুঝে নেবে না? এই বুঝে নিতে গেলেই দেখবে, তোমার অতল অবচেতনার ভাষায় ফুটে উঠেছে সেই চিরন্তন বাণী—যা উদার, যার দ্বারা আত্মপ্রসার হয়, তাই ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে বৃহৎকে অবলম্বন করায়, আর ক্ষুদ্রতার ক্লিষ্ট নির্মোকটিকে খসিয়ে ফেলায়। এই আদর্শ পালন কর। দেখবে—তোমার হৃদয়ের কুয়াশা সরে গিয়ে এক উদারতার মহান্ আলোয় তোমার চিত্তের হাসি ফুটেছে, সেই সাথে অনুভূতির অন্তরতম প্রদেশেও অপ্রত্যাশিত মোক্ষলাভও প্রায় করায়ত্ত। কারণ 'ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে। মোক্ষ হি চেতসো ধর্মঃ চেতস্যেব স তিষ্ঠতি' (যোগবাশিষ্ঠ ৫।৭৩।৭৫)—অর্থাৎ মোক্ষের আবাস স্বর্গে, পাতালে বা ভূতলে নয়, মোক্ষ আমাদের চিত্তেরই একটা অবস্থাবিশেষ এবং তা চিত্তেই বাস করে। এ হচ্ছে আমাদের সোনার কণ্ঠহার, যা হারিয়ে গেছে মনে ক'রে আমরা অযথা ছুটোছুটি করছি। এ কেউ আমাদের এনে দেবে না, কেবল 'তা যে হারায় নি, আমাদের কাছেই আছে' এই জ্ঞানটুকু পেলেই যথেষ্ট।

তাই বলি, চল পথিক, তোমার সেই জ্ঞান আহরণের পথে, সেই শুদ্ধ-সত্ত্ব-বিভার অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ লাভের পথে, সেই 'একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা'য় যেখানে 'নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং' প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। চল চল আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

ধর্মজীবনে সুস্থ মনোভাব*

স্বামী পবিত্রানন্দ

বলা হয় যে, ধর্মজগতে সহজ বুদ্ধির মতো দুর্লভ আর কিছুই নেই। বাস্তবিকই এটা আশ্চর্যের বিষয়। বিভিন্ন ধর্ম অতি-প্রাকৃত অবস্থা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগায়, কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে, বহু ক্ষেত্রেই লোকে ধর্মজীবন যাপন করতে গিয়ে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষে যখন কতগুলি লোক হঠাৎ ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন দেখা যায়, তারা সকাল দুপুর ও সন্ধ্যায়—দিনে তিনবার ক'রে স্নান আরম্ভ করেছে,—অবশ্য ভারতবর্ষ গরম দেশ! তাদের আহারের অনেক নিয়মকানুন; নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করবে, তার মধ্যেও অনেক বিধিনিষেধ। মাসে কয়েকদিন উপবাস করা চাই। তারা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে তারা অপরের বহু অসুবিধা ঘটায় এবং নিজেদেরও বিপন্ন ক'রে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে তারা মন-মরা হয়ে পড়ে এবং নিজেদের স্বাস্থ্যও নষ্ট ক'রে ফেলে। স্বীকার করি, তারা অকপটে চেষ্টা করছে, কিন্তু এটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। নির্বুদ্ধিতা-বশতঃ বা সহজ বুদ্ধির অভাবের জন্য যদি তারা স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তবে এই দুর্বল ভিত্তির ওপর তারা কিরূপে আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তুলবে? অপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই এই অবস্থা! নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী নির্ধারিত খাদ্যগ্রহণ—কি কি খেতে হবে, কতবার স্নান করলে পবিত্র হওয়া যাবে—এই হয়ে পড়ে ধার্মিকতার মানদণ্ড।

যীশুখৃষ্টের কি বিচক্ষণ উক্তি: 'তুমি কি খাচ্ছ, বাইরে থেকে কি আসছে, তাতে কিছু এসে যায় না, ভিতর থেকে বাইরে কি যাচ্ছে (কি বলছ) সেইটি বিচার্য।' পবিত্রতা বাইরে থেকে হয় না, ভিতর থেকেই হয়। ভারতের এক শ্রেণীর লোকের কাছে—কিভাবে এবং কি কি খেতে হবে, এই বিচারের সঙ্গে ধর্ম এক হয়ে গেছে। আমিষ ভোজন করেও যে ধর্মজীবন যাপন করা যায়—এ কথা অনেকে বিশ্বাসই করবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছেন: তোমাদের ধর্ম ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে; হাজার বছর ধরে তোমরা এই বিচারই করেছ, কি খাবে আর কি খাবে না।

এই হচ্ছে জীবনের একটি দিক। সব ধর্মেই অপ্রয়োজনীয় জিনিস প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে মিশে গেছে; অনেকেই এই ফাঁদে পড়েছেন। ভারতে বৈদিক যুগের উষাকাল থেকে ধর্মের আচার-আচরণ অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য রয়েছে, এবং এক সময় আচার-অনুষ্ঠান এত বেড়ে যায় যে, লোকে ধর্মের উদ্দেশ্যই ভুলে গেল; তখন হয় তীক্ষ্ণধী মহাপ্রাণ বুদ্ধের আবির্ভাব। বুদ্ধের ধর্ম সূক্ষ্মবুদ্ধির ধর্ম, তার মানে এ নয় যে, আমরা বুদ্ধির দ্বারাই সত্য লাভ ক'রব; কিন্তু আমরা যুক্তিবিচার দ্বারা বুঝি যে, কোন্‌টি প্রয়োজনীয় এবং কোন্‌টি তত

* নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে ৭.৪.৫৭ তারিখে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতা 'Healthy-mindedness in Religion' হইতে স্বামী জীবানন্দ কর্তৃক অনূদিত।

প্রয়োজনীয় নয়। বুদ্ধ যেন পরিত্রাতা-রূপেই এসেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবে হিন্দুধর্মে সংশোধনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বৌদ্ধ-ধর্মেরও খুব উন্নতি হ'ল। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসই ধ্বংসশীল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম ক্ষয় পেতে লাগলো। বৌদ্ধেরা ভয়ঙ্কর আচার-অনুষ্ঠান শুরু ক'রল। এই সময়ই ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে চরম অবনতির সময়। তখন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। বুদ্ধের প্রধান উপদেশগুলি সকলে ভুলে গেল। এই সময়ে এলেন শঙ্করাচার্য; তিনি ভারতের ধর্মকে অবনতি থেকে রক্ষা করলেন।

আমরা ভুলে গেছি যে, প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে নয়। যদি আমরা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করি, তবে আমরা অস্বাভাবিকই হয়ে প'ড়ব। আমাদের মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে।

মনের স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায়? যখন আমরা স্বাভাবিক ভাবে কাজ করি না, কাণ্ডজ্ঞানরহিত হয়ে কাজ করি, তখনই আসে মানসিক অসুস্থতা। প্রত্যেক প্রাণীর দেহে তাপ আছে, যখন সেই তাপ খুব বেশী বা কম হয়, তখনই বুঝতে হবে রোগ হয়েছে। একে সুস্থ অবস্থা বলা যায় না। এইভাবে আমাদের জীবনে যখন আমরা অতি-মাত্রায় অপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করি, যখন আমরা দুঃখকষ্টগুলিকেই বড় ক'রে দেখি, তখনও আমাদের সুস্থ অবস্থা নয়। জীবনে বাধাবিপত্তি আসবেই, কিন্তু যদি কেউ সেই পরিপ্রেক্ষিতেই জীবনকে দেখে, আগামী কাল বা পরশু বা তারপরে কি বিপদ আসবে, যদি কেউ কেবল তাই বলতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই এটা সুস্থ অবস্থার লক্ষণ নয়। এ হ'ল দুঃখবাদী মনের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, তখন হতাশার ভাবে জীবনকে চিন্তা করা হয়।

সুখবাদ জীবনের উজ্জ্বল দিকটাই দেখে, অবশ্য এও অসুস্থ অবস্থা হ'তে পারে। যখন আমরা মনে করি, সবই ঠিক আছে, যখন অন্তরের প্রকৃত শক্তি লাভ না করেই আমরা ভাবি, আমরা সেই শক্তি লাভ করেছি, তখন আমাদের মধ্যে দেখা দেয় গর্ব ও আত্মম্ভরিতা। এও এক অসুস্থ অবস্থা। দেহের তাপ বেশিও ভাল নয়, কমও ভাল নয়। দেহের সাধারণ তাপই স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

ছোট নদী বয়ে আসতে আসতে মাঝে হয়তো বালুকাস্তরের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে যায়, আর যেতে পারে না, তখন সে বালুকার নীচে দিয়ে বইতে থাকে। এই রকম মানুষের জীবন-গতিও কখন কখন রুদ্ধ হয়ে যায়, অগ্রসর হ'তে না পেরে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়, আর তখন তার থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে। এ একটা অসুস্থ অবস্থা।

জীবনের সব ক্ষেত্রেই এটি সত্য, বিশেষ ক'রে ধর্মজীবনে; অতএব আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। ধর্মজীবনে এটি অধিকতর সত্য, কারণ এখানেই আমরা পূর্ণতালাভের চেষ্টা করি, পূর্ণ হবার আকাঙ্ক্ষা করি। যখন আমরা পূর্ণতালাভের ইচ্ছা করি, তখন স্বভাবতই আমাদের অপূর্ণতাগুলি বেশী ক'রে চোখে পড়ে। যে কোন আদর্শ অনুসরণ করে না, সে বিচার করতে পারে না—কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ। একদিক থেকে তাকে ভাগ্যবান্ বলা যেতে পারে। একজন খৃষ্টান—বোধ হয় 'Pilgrim's Progress' গ্রন্থের রচয়িতা জন বানিয়ন জীবনের এক সময়ে এমন দুঃখবাদী হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি

ভাবতেন—জন্তুজানোয়ার, গাছপালা, পাখী সবাই তাঁর চেয়ে ভাল, কারণ তিনি মহাপাপী, আর তাঁর জীবনে নানা অপূর্ণতা রয়েছে। তিনি ভাবতেন, তিনি যে মানুষ হয়ে জন্মেছেন, এর থেকে দুঃখের আর কি আছে? অন্য প্রাণীরা তাঁর থেকে অনেক সুখী! আর একজনের কথা জানি, তিনিও পাপের সম্বন্ধে এত বেশী ভাবতেন যে, ঘরের বাইরে বেরুতেই ভয় পেতেন। তিনি অনুভব করতেন, গাছপালাও যেন তাঁর জীবনের অন্ধকার দিকটি জেনে ফেলেছে। এখানে 'তাপ' খুব নীচুর দিকে; একে স্বাভাবিক 'তাপ' বলতে পারা যায় না।

আমরা যে পূর্ণতালাভের চেষ্টা করি, তার মধ্যে রয়েছে পুরুষকার। কিন্তু কথা হ'চ্ছে, কেন আমরা অপূর্ণতার কথা এত ক'রে ভাববো? বার বার বললে যে কোন বিষয়ই অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠে। যদি কারও উপর আমাদের বিরক্তির ভাব থাকে এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বলতে থাকি, তবে অসন্তোষ ক্রমশঃ বেড়েই চলবে; অবস্থা এমন হয়ে উঠবে যে, আমরা টুকরো টুকরো হয়ে যাব! এইভাবে আমরা নিজেদের দুর্বলতা ও অপূর্ণতার বিষয় অনবরত চিন্তা করতে আরম্ভ করি, এও এক রকম রোগ! এইরূপ বিবেকের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতনতাও রোগবিশেষ। অনেকে অপরের কাছে নিজেদের দুর্বলতা উদ্‌ঘাটন করতে ভালবাসে। এ যেন এক রকমের বাহাদুরি দেখানো। এই ধরনের লোক এত সরল যে, নিজেদের দুর্বলতা দোষক্রটি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে। এর দ্বারা তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে! যদি আমাদের দুর্বলতা থাকে, আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ক'রব, তা জয় করবার জন্য। কতগুলি ধর্মে পাপের দিকটাই বেশী চিন্তা করা হয়। কিন্তু কেন আমরা জীবনের অন্ধকার দিকটি নিয়েই চিন্তা ক'রব? শেষ পর্যন্ত, কে বেশী শক্তিমান্—ঈশ্বর, না শয়তান?

জীবনে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কি? গতি হচ্ছে জীবনে স্বাভাবিক জিনিস। রাস্তার উপর থেমে যাওয়া অস্বাভাবিকতা, এ তো বিচ্যুতি। পূর্ণতালাভের প্রচেষ্টা, তার দিকে অগ্রসর হওয়াই স্বাভাবিকতা। অপূর্ণতার দিকে যাওয়া হচ্ছে বিপথে গমন, ভুল। প্রতিযোগিতায় কেউ কেউ পড়ে যাবে; কিন্তু পড়ে গিয়ে যদি আমরা কাঁদতে থাকি এবং পতনের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করি, তাহলে আর অগ্রসর হ'তে পারব না। আমরা মানুষ, মানুষের দুর্বলতা আছে। কিন্তু কেন দুর্বলতার দিক থেকেই জীবনকে চিন্তা ক'রব? দুর্বলতার ভাব ঝেড়ে ফেলে জীবনের পথে অগ্রসর হও। এ খুবই স্বাভাবিক যে, জীবনে চলার পথে কখন কখন আমরা পড়ে যাব, আমাদের হয়তো শত শত বার পড়তে হবে। কিন্তু সেই পতনের দ্বারাই নির্মিত হ'তে পারে উন্নতির স্তম্ভ—অন্ততঃ ধর্মজীবনে। বাস্তবিক ধর্ম-জীবনের অর্থ বিফলতার সঙ্গে যুদ্ধ; সর্বপ্রকার বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে যেতে হবে। ধর্মজীবনে আমরা পূর্ণতালাভের চেষ্টা করি ব'লে আমাদের ক্রটিবিচ্যুতিগুলি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে এবং সেগুলি অপরেরও দৃষ্টিগোচর হয়। সাদা কাপড়েই কালো দাগ চোখে পড়ে! এ হ'ল স্বাভাবিক অবস্থা; কিন্তু এ অবস্থা অস্বাভাবিক ও অসুস্থ হয়ে পড়ে, যখন আমরা কালো দাগগুলির দিক থেকেই কাপড়টিকে চিন্তা করি।

পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়াতেই পূর্ণতা-লাভের সম্ভাবনা। দোষক্রটিগুলিকে বেশী

ক'রে দেখলে বা লুকিয়ে রাখলেই সেগুলি চলে যায় না ; তাতে শুধু তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সমস্ত শক্তি ক্ষয় করাই হয়, শক্তিলাভ হয় না। প্রকৃত শক্তিলাভের জন্য ইতিবাচক (positive) কিছু অবলম্বনীয় ; সমস্ত শক্তির উৎসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নইলে আমাদের সকল শক্তি বৃথা ব্যয়িত হবে, বিশেষ কিছু ফল হবে না। কতকগুলি খৃষ্টান সাধুর জীবনে দেখা যায়, তাঁরা জীবনের অন্ধকার দিকটির উপর বড় বেশী জোর দেন। অবশ্য সব ধর্মেই এই ধরনের মানুষ আছে। তারা প্রকৃত পথ খুঁজে পায় না, তাদের দৃষ্টিও ঠিক নয়, আর এই জন্যই তাদের অধিকাংশ শক্তি ঐদিকে বৃথা ব্যয়িত হয় এবং জীবন বিফল হয়।

ধর্মজীবনে সত্যি খুবই সংগ্রাম আছে ; কিন্তু ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ঐ সাধুদের জীবনে এত দুঃখকষ্ট ভোগের পর এসেছিল সিদ্ধি ও সফলতা। এইটিই হ'ল সব চেয়ে বড় জিনিস। আমরা তাঁদের সমগ্র জীবন-ইতিহাস জানতে পারি না, তাঁদের আত্মজীবনী থেকে কয়েকটি ঘটনা মাত্র জেনে থাকি। আমাদের সৌভাগ্য যে—আমরা এ রকম আত্মজীবনী পেয়েছি, যার সাহায্যে সামান্যভাবে বুঝতে পারি, তাদের সংগ্রাম ও সাধনা ; এ তাঁদের সমগ্র জীবনের চিত্র নয়, এ শুধু একটি দিকের কথা।

কি সেই শক্তি, যা তাঁদের ঠিকভাবে ধরে রেখেছিল এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও? সেইটি খুঁজে বার করতে হবে। সংগ্রাম যতই কঠোর হোক, অন্ততঃ কয়েকজন তো জয়ী হয়েছেন।

সাধকের ব্যক্তিগত অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সংগ্রামের তারতম্য হয়। বেদান্তে বলা হয়, আমরা আমাদের অতীত কর্ম আমাদের সঙ্গে বহন ক'রে নিয়ে চলি, যদি কেউ পূর্বজীবনে অনেক অসৎ কর্ম ক'রে থাকে, তবে এই জীবনে তাকে তার মূল্য দিতেই হবে এবং সংগ্রামও হবে তীব্রতর। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জীবন ব্যর্থ বা বিফল। যতই আমরা অপবিত্র হই না কেন, ঠিকভাবে চেষ্টা করলে আমরা নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ ক'রব—লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকব। আমাদের যতই দোষত্রুটি থাক, সেগুলি দূর করতে সমর্থ হব। মহাপুরুষগণের সংগ্রামমুখর জীবন থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায়। কখন কখন তাঁরা এমন কঠোর সংগ্রাম করেছেন, যার কোন অর্থ বোধগম্য হয় না।

কতকগুলি সত্যি নিরর্থক। দারুণ শীতে যখন বরফ পড়ছে, তখন অনেক খৃষ্টীয় সাধু ঘরের বাইরে এসে প্রার্থনা করেছেন, উদ্দেশ্য খালি গায়ে ভীষণ শীত সহ্য করা। কখন কখন তাঁরা মনকে সংযত করার জন্যই এরূপ করেন ; শরীরের প্রভাব কিছু পরিমাণে মনের উপর থাকলেও শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করলেই মন সংযত হয় না—এ কথা তাঁরা ভুলে যান। শরীর যখন খুব দুর্বল অসুস্থ, মন তখন চিন্তা করতে পারে না। তার মানে এই নয় যে, মন সংযত হয়ে গেছে, সেই অবস্থায় মন চিন্তা করতে পারছে না মাত্র। কেউ কেউ মনকে বশে আনবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন, এবং তাঁদের স্বাস্থ্য ও মন দুইই ভেঙে পড়ে। তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যেন শিখতে পারি, সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনা বলতে শুধু শরীরকে সংযত করাই বোঝায় না।

ভারতেও এইরূপ একশ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাঁরা সাধনার কঠোরতার উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেকে বিভিন্ন ভঙ্গীর কঠিন কঠিন আসন অভ্যাস করেন, কেউ কেউ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে থাকেন। এ কিন্তু প্রকৃত ধর্মজীবন নয় ; বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এগুলি গ্রাহ্যই করেন না।

এখানে আসার আগে ভারতে আমি এক ধর্মমেলায় গিয়েছিলাম। শুনলাম, সেখানে একজন ১৪ বছর একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বহু লোক তাকে দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু ১৪ বছর একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? ধর্মজীবনের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কি? এগুলি দ্বারা সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করা যায়, ভারতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এগুলি চেয়েও দেখেন না, হেসে উড়িয়ে দেন। যা হোক পাশ্চাত্যে কিন্তু এগুলি সংবাদপত্রে রোমাঞ্চকর ঘটনার খোরাক জোগায়। আগেই বলেছি, সব ধর্মেই এ ধরনের জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।

ধর্মের ব্যাপার মনের সঙ্গে, দেহের সঙ্গে নয়। অবশ্য শরীরের কিছুটা যত্ন নিতে হবে বইকি, কিন্তু শরীরকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা বস্তু ভাবলে চলবে না। সব কিছুই নির্ভর করছে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। ধর্মের লক্ষ্য কি? ঈশ্বর,—না শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ? ঈশ্বরের স্বরূপ কি? এটি নির্ভর করছে—কিভাবে ঈশ্বরকে তুমি দেখছ তার উপর। ঈশ্বর তো ক্রোধের ঈশ্বর নন। এক সময়ে লোকে ভাবত— তিনি ক্রোধের ঈশ্বর, শাস্তিদাতা ঈশ্বর, ফৌজদারী আদালতের বিচারক ঈশ্বর - প্রত্যেকের পাপগুলিই দেখছেন! কিন্তু ঈশ্বর যদি প্রেমের ঈশ্বর হন, তাহলে আমরা কেন এত ভয় পাব? সিদ্ধির জন্যই বা জীবনে বীভৎস সংগ্রাম কেন? তাঁর উপর নির্ভর করতে পার, তাঁর প্রেমের উপর,—তাঁর দয়া, তাঁর সহানুভূতির উপর।

বেদান্তে ঈশ্বরকে একটি ভাবরূপ বলা হয়ে থাকে। বেদান্তে চরম তত্ত্ব—সৎস্বরূপ চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ। উপনিষদে* চরম সত্যের সর্বোচ্চ আদর্শ ঈশ্বরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি, চরম সত্তা-রূপেই তা বলা হয়েছে। একহার্টও একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরত্ব শাশ্বত সত্তা। যখন সৃষ্টি ছিল না, তখন এক সত্তা বর্তমান ছিল। একহার্ট বলেন, সেই সত্তাই ঈশ্বরভাব। যখন সৃষ্টির প্রকাশ হ'ল, সে সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরত্ব থেকেই শক্তির আবির্ভাব, যখন বিশ্বজগৎ প্রকাশিত হ'ল, তখন বলা হয়—ঈশ্বরই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। উপনিষদেও এই একই ভাব বিবৃত। একহার্ট খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের মানুষ, আর উপনিষদের জ্ঞানরাশি উদ্ভাসিত হয় খৃষ্ট-আবির্ভাবের প্রায় ২,০০০ বছর আগে। কিন্তু ভাবের কী মিল!

শাশ্বত সত্তার লক্ষণ কি? উপনিষদ্ বলেন, আনন্দ। একটি উপনিষদে জিজ্ঞাসিত হয়েছে: শাশ্বত সত্তার স্বরূপ কি? উত্তর: যাঁর থেকে বিশ্বজগৎ জাত, যাঁতে অবস্থিত এবং পরিশেষে যাঁতে বিলীন হয়। শিষ্য প্রশ্ন করলেন, ব্রহ্ম কি? কি তাঁর প্রকৃতি? গুরু বললেন, 'যাও, তপস্যা কর, তাহলেই জানবে'। শিষ্য তপস্যা ক'রে ফিরে এলেন, কিন্তু ঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। প্রথমে তিনি বললেন, 'অন্নই ব্রহ্ম', তারপর বললেন, 'মন ব্রহ্ম', তারপরে 'প্রাণ ব্রহ্ম' ইত্যাদি। প্রতিবারই গুরু তাঁকে কঠোরতর তপস্যায় পাঠিয়ে দেন। বারংবার বিফলতা সত্ত্বেও তিনি তপস্যা ক'রে চললেন, অবশেষে গুরুর কাছে এসে বললেন, 'আনন্দই ব্রহ্ম; কারণ আনন্দ থেকেই জগৎ উৎপন্ন হয়, আনন্দের দ্বারাই বর্ধিত হয় এবং শেষে আনন্দের অবস্থাতেই ফিরে যায়'।

উপনিষদ্ বলেন, যদি আমাদের মূল সত্তা আনন্দ না হ'ত, তবে কিভাবে জীবন থাকত? অন্তরে যদি আনন্দ না থাকত, তবে বিশ্বের অবস্থান অসম্ভব হ'ত? এ সাধারণ সুখ নয়, শাশ্বত আনন্দ—যা মন বুদ্ধির অতীত। যদিও উপনিষদ্ বলছেন—জগৎ মিথ্যা, আবার একথাও বলছেন, জগতের উৎস হচ্ছে আনন্দ,

এবং সেই আনন্দই একমাত্র কাম্য। চরম সত্তা আনন্দময়তা,—জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

এখন যদি আদর্শ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকে, তাহলে সাধনা সহজ হয়। যখন আমরা আনন্দলাভের চেষ্টা করি বা আনন্দময় অবস্থায় পৌঁছাতে চাই, তখন প্রকৃতির অশুভ শক্তিগুলির কথা ভুলে যাই, মনের হতাশা সংশয়ের মৃদু স্পন্দনগুলির কথা ভুলে যাই। যখন আমরা কোন কিছু পাবার জন্য চেষ্টা করি, তখন যদি জানি যে সেটি কাছেই আছে, নাগালের বাইরে নয়, তাহলে আর কোন প্রকার দুঃখকষ্টই বেশী ব'লে মনে হয় না, তখন আমরা কাঁদি না বা বিলাপ করি না। আমরা জানি, জীবনপথে দুঃখকষ্ট আসবেই। আমাদের সমস্ত চিন্তা আদর্শ উপলব্ধির জন্যই নিয়োজিত হয়। সমগ্র মন যখন সেই উপলব্ধির জন্য উন্মুখ হয়, তখন কোন প্রকার দুঃখকষ্ট, কঠিন সংগ্রাম আমাদের ভয় দেখাতে পারে না; অন্ততঃ সাধনা অব্যাহত থাকে। এই হ'ল স্বাভাবিক অবস্থা। ধর্মজীবনে এই হচ্ছে স্বাভাবিক মনোভাব।

হ্যাঁ, জীবনে প্রতিক্ষেত্রেই স্বাভাবিক ভাব এরূপই হওয়া উচিত। সাংসারিক জীবনে যাঁরা কৃতকার্য হয়েছেন, তাঁদেরও দেখা যায়—এই প্রকার মনোভাব; প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনেও এইরূপ। জীবনের অস্তিবাচক দিকটিই তাঁরা দেখেন। জীবনে আদর্শকে উপলব্ধি করার দিক থেকে তাঁরা চিন্তা করেন ব'লে তাঁদের সংগ্রাম ও তপস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে না। এ হ'ল একটা গতিশীলতা, সাধক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন! কখন কখন সংগ্রামের জন্যই জীবন বেশ উপভোগ্য হয়। হৃদয়ে যদি দৃঢ় সংকল্প থাকে, জীবন সম্বন্ধে যদি সুস্থ মনোভাব থাকে—আর যদি জানি লক্ষ্য কি, সেই লক্ষ্য আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে, তবে আমরা বাধাবিঘ্নের সঙ্গে লড়াই ক'রে যেতে পারি। স্বভাবতই আমাদের দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, লক্ষ্য আমাদের নাগালের মধ্যে—এ বিশ্বাস যদি না থাকে। কিন্তু লক্ষ্য তো নাগালের মধ্যে, সেখানে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব। আদর্শের আকর্ষণ, লক্ষ্যের মহিমা আমাদের ধরে রেখেছে। লক্ষ্যের মহিমা সর্বদা আমাদের দৃষ্টির মধ্যে, তাই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কঠোর সংগ্রামকে আর সংগ্রাম ব'লে মনে হয় না, সেগুলি আর তত ভয়ঙ্কর বা দুঃখদায়ক ব'লে মনে হয় না।

কিন্তু যখন আদর্শ সম্বন্ধেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা থাকে না, যখন জানি না কিসের জন্য আমাদের এত সাধনা, তখন জীবনের মরুপথে থেমে যাই এবং জীবন হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। ধর্মজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাদের ধারণা অস্পষ্ট, ঈশ্বর বা চরম সত্তা সম্বন্ধেও যাদের সঠিক ধারণা নেই, তারা কঠোর তপস্যার জীবন যাপন করলেও, তাদের সাধনা ভুল পথে চলেছে। সেইজন্য একটা অনিশ্চয় হতাশার পরিবেশে তাদের জীবন কাটতে থাকে।

আগেই বলেছি, পূর্বজন্মের অসৎ কর্মের ফল যাঁদের এই জীবনে ভোগ করতে হয়, তাঁদের ধর্মজীবন গঠনের জন্য কঠিনতর সাধনার প্রয়োজন। 'অসৎ কর্ম' বলা উচিত নয়; বলা উচিত, পূর্বজন্মে অজ্ঞানের আধিক্য বশতঃ আধ্যাত্মিক জাগরণ তাদের একেবারেই হয়নি। যাঁরা পূর্বজন্মে সাধনা করেছেন, তাঁদের সংগ্রাম ক্রমশঃ কমে যায়। অজ্ঞানের আবরণ যদি খুব ঘন হয়, পূর্বজন্মে কিছুমাত্র সাধনাও যদি না করা থাকে, তাতেও কিছুই এসে যায় না; যদি আমরা সরল ও ব্যাকুল হই,

তবে এই জন্মেই শত জন্মের সাধনা ক'রে ফেলতে পারি। ধর্মজীবনে সাধনার ফল পরিমাণ দ্বারা নির্ণীত হয় না, হয় গুণের দ্বারা। গত জন্মের যদি কিছুও না জমা থাকে, তবু একাগ্রতা দ্বারা আমরা অনেকখানি অর্জন করতে পারি। ঐকান্তিকতা ও আগ্রহের উপর এটি নির্ভর করে।

এখন আর একটি বিষয়ও বলা দরকার। যদি ভাগ্যবলে কোন সাধক জ্ঞানী পুরুষের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পায়, তবে তার সাধনা সহজ হয়ে যায়। বহু লোকের ধর্ম-জীবনে খুব পরিশ্রম করতে হয়, অথচ তাদের প্রচেষ্টা ঠিক দিকে পরিচালিত না হওয়ায় সার্থক হয়ে ওঠে না, কারণ তারা কোন মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেনি। যদি তারা মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পায়, তবে ধর্মজীবনে কি করতে হবে এবং কিভাবে চলতে হবে, তার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়।

গীতায় একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা হয়েছে: 'স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ কিভাবে কাজ করেন, কিভাবে চলেন, কিরূপ কথা বলেন?' যাঁরা সত্য উপলব্ধি করেছেন, সাধনায় অনেক এগিয়ে গেছেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা অন্ততঃ এই শিক্ষা পেতে পারি, কিভাবে শক্তির অপচয় বন্ধ করা যায়, শক্তি অযথা ক্ষয় না ক'রে কিভাবে তাকে শুভকর্মের দিকে পরিচালিত করা যায়। বহু সাধুসন্তের জীবনে দেখা যায় সাধনার অতিশয় তীব্রতা! এর একটি কারণ এই যে, তাঁরা এমন কোন মানুষের সংস্পর্শে আসেননি, যিনি সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিতে পারেন। তাই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস মাত্র সম্বল করেই তাঁদের একাকী সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু যখন সাধক ঠিক পথের সন্ধান পান, তাঁর তপস্যা সহজ হয়ে যায় এবং বিপথে আবর্তিত হয় না।

তাই ভারতে গুরুর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তিনিই প্রকৃত গুরু, যিনি সত্য জেনেছেন। যাঁর এইরূপ গুরু লাভ হয়, তিনি বাস্তবিকই ভাগ্যবান্। উপনিষদের যুগ থেকেই গুরুর উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। আলো থেকেই আলো জ্বলে, আধ্যাত্মিক জীবনেও একথা সমভাবে সত্য। এ কথা ঠিক যে প্রকৃত গুরু সচরাচর মেলে না। একজন সদ্গুরুর আশে পাশে বহু ভণ্ড গুরুর আবির্ভাব হয়। তাই প্রকৃত গুরুর সন্ধানের ওপর এত জোর দেওয়া হয়েছে।

যে সব সাধন-পদ্ধতিতে সাধককে একা একা সংগ্রাম করতে হয়, সেখানে সাধনার তীব্রতা যখন বাড়ে, তখন একটা কিছু ভাবের ওপর সাধককে নির্ভর করতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বৌদ্ধধর্মে—যেখানে ঈশ্বরের কথা বিশেষ নেই, যেখানে সাধকের পুরুষকারের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে, সেখানে সাধক বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা ক'রে থাকেন। অদ্বৈত বেদান্তে ভাবস্বরূপ চরম সত্যে উপনীত হবার জন্য সাধককে বুদ্ধি এবং দর্শনের ভাষায় চিন্তা করতে হয়। ভাবমূলক সাধনাই তীব্রতর হয়। এইরূপে যাঁরা পুরুষকারের উপর নির্ভর ক'রে চলেন, তাঁদের সাধনজীবন সত্যই কঠোর। যাঁরা এইভাবে সাধনা করেন, তাঁরা কিভাবে তাঁদের মন উচ্চে তুলে রাখেন? তাদের দেবতা শিবকে তাঁরা ঈশ্বররূপে চিন্তা করেন, তাঁরই কাছে তাঁরা প্রার্থনা করেন। সাধনার এ এক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে।

এই প্রকার সদ্গুরু লাভ না হ'লে সাধক কি করবে? পূর্বেই বলেছি যে, বাস্তবিক ক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তির সাক্ষাৎ দুর্লভ, যিনি তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে লক্ষ্য ও পথ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন। এর অভাবে পরবর্তী প্রকৃষ্ট উপায়—শাস্ত্র থেকে সাধন-নির্দেশ নেওয়া; ঐকান্তিকতা ও সাধনায় নিষ্ঠা থাকলে শাস্ত্র থেকে ঠিক ঠিক নির্দেশ পাওয়া যায়। ধর্মজীবন-গঠনে ঐকান্তিকতা ও অকপটতা থাকলেই শাস্ত্রের মর্মার্থ ভালভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং সাধনার প্রকৃত পথ পাওয়া যায়। অন্যথা শাস্ত্রচর্চা শুধু দার্শনিক বিচার ও বুদ্ধির দুর্বোধ্য কচকচিতে পরিণত হয়। কিন্তু ধর্মজীবন কয়েকটি সরল নিয়ম মেনে চলার উপরেই নির্ভর করে। সেইজন্য বলা হয়, বিশ্বাসের বলেই আমরা বেঁচে আছি। বেদান্তে এবং ভারতের অন্যান্য লোকপ্রিয় ধর্মেও বিশ্বাসের ওপরই জোর দেওয়া হয়। আমার

মনে হয়, সকল ধর্মই বিশ্বাসের ওপর খুব জোর দেয়। বিশ্বাস কিরূপে আমাদের ধরে থাকে? যখন আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তখন শাস্ত্রপাঠের বা মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী আলোচনার সময় আমরা উদ্দীপনা লাভ করি।

কখন কখন সরল বিশ্বাসের উপরই সমগ্র ধর্মজীবনটিই নির্ভর করে, বিশেষতঃ যখন আমরা অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাই এবং সাধনা কঠিনতর হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ কি? সঙ্গে সঙ্গে সবাই ব'লে উঠবে, 'ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান্।'—ঈশ্বর সর্বদা সর্বত্র রয়েছেন, তিনি সব কিছু জানেন, এবং সমস্ত শক্তির আধার তিনি। ঈশ্বর যদি সর্বত্র আছেন এবং সব কিছু জানেন, তবে নিশ্চয়ই আমাদের সংগ্রামের কথাও জানতে পারছেন; আর ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান্ হন, তবে তিনি নিশ্চয়ই শয়তানের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। তবে আমরা ভয় পাব কেন? আমরা বার বার উচ্চারণ করি, 'ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, সর্বব্যাপী'। ছোট ছেলেরাও ঈশ্বর সম্বন্ধে রচনায় এগুলি লিখে থাকে। কথাগুলি খাঁটি সত্য—সাধুসন্তের অনুভূতি। আর এ যদি সত্যই হয়, তবে জীবনে এর অর্থ কি? কেন আমরা জীবন-সংগ্রামে ভীত হব? জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত কেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে? জীবন হবে সুস্থ, আনন্দময়।

সাধুসন্তদের জীবন থেকে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? খৃষ্ট বলেন, 'আমার বোঝা হাল্কা, এ বোঝা বহন করা সহজ।' এর মানে কি? এর মানে—যদি আমাদের ব্যাকুলতা ও সরলতা থাকে, তবে সাধন সহজ হয় এবং তাতে আনন্দই পাওয়া যায়; ভার হাল্কা হয় এবং বহন করা সহজ। একহার্ট বলেছেন, 'ঈশ্বরের কাছে যেতে তোমার যা আগ্রহ, তার থেকে সহস্রগুণ বেশী আগ্রহ তাঁর তোমাকে ধরা দিতে। তুমিই তাঁর থেকে দূরে চ'লে যাচ্ছ।' বিভিন্ন যুগের মহাপুরুষ-বাণী উদ্ধৃত ক'রে দেখালাম, একই সারবস্তু সর্বত্র। সাধনা যদি ঠিক পথে স্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হয়, তবে আধ্যাত্মিক জীবন তত কঠিন নয়।

গীতায়ও একই ধরনের চিন্তাধারা দেখা যায়। হতাশ অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করতেই গীতার আরম্ভ। আমরা প্রত্যেকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে ধর্মজীবনে এই রকম হতাশ হয়ে পড়ি। মনে করি, এ জীবন কঠিন সংগ্রাম অথবা সুদীর্ঘ পথে যাত্রা! কাজ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ফল চাই, পাই না; আমরাও এক একজন অর্জুন, অন্ততঃ হতাশার দিক দিয়ে। গীতার প্রথম শিক্ষা: ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!—যুধ্যস্ব, যুদ্ধ কর। উপসংহারে গীতার শিক্ষা: প্রত্যেক কর্মের ভাল মন্দ দুটি দিক আছে। যা কিছু সব আমাকে সমর্পণ কর। আমার ওপর নির্ভর কর, আমি তোমার সকল ভার বহন ক'রব। গীতার মধ্যভাগে একটি শ্লোকে পাই। যদি অনন্যা ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, তাহলে তাঁকে পাওয়া সহজ হবে।

কেউ হয়তো বলতে পারে, 'আমার এত দোষত্রুটি, আমি কিরূপে আশা করতে পারি যে, আমি একদিন সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিতে পারব?' সাধনাকালে দোষত্রুটি অপূর্ণতাগুলি চোখের সামনে ফুটে উঠবে, এ তো স্বাভাবিক। গীতায় এর উত্তর পাই: অত্যন্ত দুরাচারী মহাপাপীও যদি ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে চিন্তা করে, তবে তার সমস্ত অন্ধকার মুহূর্তে দূর হবে। বলা হয়ে থাকে, যদি হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালো তো সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরটি আলোকিত হয়ে উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ঈশ্বর আমার কাছে আনন্দময়ী মা। দেখ, আমরা সর্বদা ভাবি, মায়ের ভালবাসার ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি। শান্তিময়ী মা আনন্দস্বরূপিণী। হতাশার ভাব নিয়ে যখন কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসত, তিনি বলতেন: তিনি তোমার আপন মা। শিশুর যেমন সব অবস্থাতেই মায়ের ভালবাসার উপর দাবি আছে, আমাদেরও তেমনি আনন্দময়ী জগজ্জননীর ভালবাসার উপর দাবি আছে, তবে কেন উদ্বিগ্নবোধ করবে?—এই (নিরুদ্বেগ ভাব) হচ্ছে ধর্ম-জীবনের ঠিক ঠিক ভাব, স্বাভাবিক ভাব। একেই বলা হয়—ধর্মজীবনে সুস্থ মনোভাব।

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ : বিশ্বরূপ-দর্শন]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥

তখন অর্জুন সেখানে অনেক (সুন্দর) মুখ দেখিলেন—যাহা রমণীয় রাজভবনের ন্যায় (উজ্জ্বল) অথবা যেন লাবণ্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে, কিংবা যেন আনন্দের বন শোভা পাইতেছে—যেন সৌন্দর্যের সাম্রাজ্যলাভ হইয়াছে, এমনি শ্রীহরির অসংখ্য মনোহর বদন দেখিলেন ; তাহারই মধ্যে কোন কোন মুখ এমন স্বাভাবিক ভাবে ভয়ঙ্কর, মনে হয় যেন কালরাত্রির সৈন্য চড়াও করিয়াছে, কিংবা যেন মরণের মুখ উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা ভয়ের দুর্গ প্রস্তুত হইয়াছে, বা প্রলয়ানলের মহাকুণ্ড উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বীর অর্জুন অদ্ভুত ভয়ঙ্কর বদনসমূহ দেখিলেন, সেখানে অন্য সাধারণ আকারের মুখও ছিল, অনেক সৌম্য বদনও দেখিলেন। তিনি জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা দেখিতেছিলেন, তথাপি মুখের অন্ত পাওয়া গেল না, তখন কৌতুকে নেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; নানা বর্ণের কমলবন যেন বিকশিত হইয়া আছে, অর্জুন এইরূপ সূর্যের পঙ্‌ক্তির ন্যায় অসংখ্য নেত্র দেখিলেন। ২০০

কল্পান্তের সময় কৃষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ চমকায়, তেমনি ভ্রূর নীচে অগ্নির ন্যায় পিঙ্গল নেত্র দেখা যাইতে লাগিল। একই রূপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্রকারের আশ্চর্য বস্তু দেখিয়া দর্শনের অনেকতা সম্বন্ধে অর্জুনের মনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইয়াছিল। তখন তিনি (মনে মনে) বলিতে লাগিলেন, ইঁহার চরণ কোথায় ? মুকুট কোন্ দিকে, বাহুই বা কোথায় ? এইভাবে দেখিবার ইচ্ছা অধীরভাবে বাড়িতে লাগিল ; ভাগ্যবান্ পার্থ, তাঁহার মনোরথ কি বিফল হইবে ? পিনাকপাণি শঙ্করের তূণে কি নিষ্ফল বাণ থাকিতে পারে ? অথবা চতুর্মুখ ব্রহ্মার বাক্যে কি মিথ্যা অক্ষর থাকে ? সুতরাং এই অপার স্বরূপের আদ্যন্ত অর্জুন দেখিলেন ; বেদ যাঁহার অন্ত পায় না, তাঁহার সম্পূর্ণ রূপ (অবয়ব) অর্জুনের দুটি নয়ন একসঙ্গে উপভোগ করিতে লাগিল ; চরণ হইতে মুকুট পর্যন্ত তিনি নানা রত্ন অলঙ্কারে সুশোভিত এই বিশ্বরূপের ঐশ্বর্য দেখিতে লাগিলেন ; আপনার অঙ্গে ধারণ করিবার জন্য পরব্রহ্ম স্বয়ং যে অনেক অলঙ্কার হইয়া আছেন, তাহাকে আমি কিসের সমান বলিয়া বর্ণনা করিব ? যাঁহার প্রভার ঔজ্জ্বল্য চন্দ্রাদিত্যমণ্ডলকে প্রভাসংযুক্ত করে, যে মহাতেজ বিশ্ব প্রকট করে, সেই মহাতেজের যাহা জীবন—সেই দিব্যতেজরূপ শোভা কাহার বুদ্ধিগোচর হয় ? দেবতা নিজেই আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া আছেন,—বীর অর্জুন তাহাই দেখিলেন। ২১০

পুনরায় যখন জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা সবল করপল্লবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাহাদের এমন শস্ত্রে সজ্জিত দেখিলেন, যাহা কল্পান্তের জ্বালা (অগ্নি) নিবাইতে পারে ; যাহার কিরণের তীব্রতায় নক্ষত্রগুলি ভাজা ছোলার ন্যায় ফুটিতে থাকে, যাহার তেজে অভিভূত হইয়া অগ্নি সমুদ্রে প্রবেশ করে, যেন কালকূটের তরঙ্গে লিপ্ত অথবা যাহাতে মহা বিদ্যুতের অরণ্যের উদ্ভব হইয়াছে—এইরূপ যুদ্ধে উদ্যত, শস্ত্রে সজ্জিত অসংখ্য হস্ত দেখিতে পাইলেন।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

যেন ভীত হইয়া সেখান হইতে দৃষ্টি সরাইয়া কিরীটী কণ্ঠ ও মুকুট দেখিতে লাগিলেন, যেখান হইতে (মনে হয়) কল্পতরুর সৃষ্টি হইয়াছে ; যে মহাসিদ্ধির মূলপীঠে কমলা শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে যান, তেমনি অত্যন্ত নির্মল ও সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ (কণ্ঠ ও মস্তকে) ধারণ করিয়া আছেন,—দেখিলেন মুকুটের উপর পুষ্পস্তবক, স্থানে স্থানে অনেক পূজোপচার বাঁধা, কণ্ঠে সুন্দর দিব্য পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে, যেন সূর্যতেজ স্বর্গকে আচ্ছাদন করিয়াছে ; যেন মেরুপর্বতকে স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করা হইয়াছে, পরিহিত পীতাম্বর তেমনি ঝল্‌কাইতেছে ; যেন কর্পূর দ্বারা (গৌরবর্ণ) শ্রীমহাদেবের গাত্র মার্জনা করা হইয়াছে, কিংবা কৈলাসকে (ধবলগিরিকে) পারদ দ্বারা লেপন করা হইয়াছে, অথবা ক্ষীরসমুদ্রকে দুগ্ধ-শুভ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করা হইয়াছে ; কিংবা যেন চন্দ্রমার ভাঁজ খুলিয়া গগনের উপর ওড়্‌না পরানো হইয়াছে—তাঁহার সর্বাঙ্গ তেমনিভাবে চন্দনচর্চিত দেখিলেন ; যাহা (যাহার সুগন্ধ) প্রকাশের কান্তি বৃদ্ধি করে, ব্রহ্মানন্দের তেজ শান্ত করে—যাহার সুরভিতে পৃথ্বী জীবন প্রাপ্ত হয়। ২২০

যাহার লেপনে নির্মলতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সাক্ষাৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম যাহা সর্বাঙ্গে ধারণ করেন—তাহার (সেই চন্দনের) সুগন্ধের মহিমা কে বর্ণনা করিবে ? এইভাবে এক একটি শোভা দেখিতে দেখিতে অর্জুন এমন হতবুদ্ধি হইলেন যে, ভগবান বসিয়া আছেন, কি দাঁড়াইয়া আছেন, কি শয়ন করিয়া আছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্তই মূর্তিময় দেখিতে পান, আর না দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিলেও অন্তরে তাহাই দেখেন ; সম্মুখে বিশাল রূপ দেখিয়া, ভীত হইয়া পশ্চাতে ফিরিলে সেখানেও শ্রীমুখ কর ও চরণ তেমনিভাবে দেখিতে পান ; অহো, চক্ষু মেলিয়া দেখিলে সব কিছুই দেখা যায়। ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে ? পরন্তু না দেখিলেও দেখা যায়, ইহা শুনিতেও আশ্চর্য ! চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া ভগবান কেমন অনুগ্রহ করিলেন,—পার্থের দেখা না দেখার মধ্যে স্বয়ং নারায়ণ একেবারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিলেন ; অর্জুন সর্বসময়েই নারায়ণকে দেখিতে লাগিলেন। সুতরাং এক আশ্চর্যের বন্যায় পড়িয়া, সঙ্গে সঙ্গে তীরে আসিতেই অন্য এক চমৎকারের মহার্ণবে গিয়া পড়িলেন। এইভাবে অনন্তরূপ শ্রীকৃষ্ণ আপনার অসাধারণ দর্শন-কৌশলে অর্জুনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাপিয়া ফেলিলেন। তিনি তো স্বভাবতই বিশ্বতোমুখ। আর ইহা দেখাইবার জন্যই অর্জুন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এখন তিনি প্রত্যক্ষতঃ বিশ্বময় হইয়া গেলেন। আর শ্রীবৈকুণ্ঠাধিপতি অর্জুনকে যে (দিব্য) দৃষ্টি দিয়াছিলেন, তাহা এমন নহে যে দীপ বা সূর্যের প্রকাশ থাকিলে দেখিবে, না থাকিলে দেখা বন্ধ হইবে। ২৩০

অতএব কিরীটী উভয় অবস্থাতেই (চক্ষু খুলিয়া বা মুদ্রিত করিয়া) দেখিতে পাইয়াছিলেন, জানিবেন।—ইহাই হস্তিনাপুরে সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, আরও বলিলেন, 'অধিক কি বলিব? শুনুন, কি ভাবে পার্থ নানা আভরণে সজ্জিত বিশ্বতোমুখ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন।'

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

ঐ অঙ্গপ্রভার অসাধারণ তেজ কাহার সমান বলিয়া বর্ণনা করা যায়? কল্পান্তে দ্বাদশ সূর্য যেমন একত্রে মিলিয়া যায়, সেইরূপ সহস্র সূর্য যদি এক সময়ে আকাশে উদিত হয়, তাহার তেজ এই (অঙ্গপ্রভার) তেজের মহিমার সহিত উপমার যোগ্য। সমস্ত বিদ্যুৎ যদি একত্র করা যায়, আর প্রলয়াগ্নির সমস্ত উপাদান যদি একত্র মিলিত করা হয়, এবং তাহার মহাতেজের দশগুণ মিশ্রিত করা হয়, তথাপি ঐ অঙ্গপ্রভার সহিত তুলনায় সেই তেজও স্বল্পই হইবে, আর অন্য কোন তেজই উহার ন্যায় নির্মল হইবে না। এমনই শ্রীহরির স্বাভাবিক মাহাত্ম্য, তাঁহার সর্বাঙ্গের তেজ যাহা সর্বত্র বিকশিত হইয়াছিল, তাহা (ব্যাস) মুনির কৃপায় আমার দৃষ্টিগোচর হইল।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

আর এই বিশ্বরূপের একদিকে সারা জগতের বিস্তার—সমুদ্রের মধ্যে বুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল; কিংবা আকাশে গন্ধর্বনগরের ন্যায়, অথবা ভূতলে পিপীলিকার নির্মিত ঘরের ন্যায়, অথবা মেরুপর্বতের উপর পতিত সূক্ষ্ম ধূলিকণার ন্যায়; সেইরূপ দেবচক্রবর্তীর শরীরে অর্জুন সেই সময় সারা জগৎ দেখিতে পাইলেন। ২৪০

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

তখন বিশ্ব এক আর আমি এক—এই যে সামান্য দ্বৈতভাব ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া গেল, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ সহসা দ্রবীভূত হইল, অন্তরে মহানন্দ জাগ্রত হইল, বাহিরে শরীরের বল চলিয়া গেল, আপাদমস্তক পুলকে রোমাঞ্চিত হইল। বর্ষাকালের প্রারম্ভে জলধারায় পর্বতের সর্বাঙ্গে যেমন কোমল অঙ্কুর বাহির হয়, তেমনি তাঁহার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হইল। চন্দ্রকিরণের স্পর্শে যেমন সোমকান্ত মণি দ্রবীভূত হয়, তেমনি তাঁহার শরীরে স্বেদবিন্দু নির্গত হইল; কমলকলিকার মধ্যে ভ্রমরকুল আবদ্ধ হইলে যেমন তাহা জলের উপর আন্দোলিত হয়, তেমনি তিনি শ্বাসোর্মির বেগে কাঁপিতে লাগিলেন। কর্পূরকদলীর বহিরাবরণ ফাটিয়া গেলে যেমন ভিতরে ভরা কর্পূরের কণা বাহির হইয়া পড়িতে থাকে, তেমনি তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। এইভাবে, অষ্টসাত্ত্বিক ভাব পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিলে তাঁহার অন্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দের রাজ্য লাভ হইল। চন্দ্রের উদয়ে ভরা সমুদ্রও যেমন ভরিয়া উঠে, তেমনি তিনি (আনন্দের) তরঙ্গে বারংবার উদ্বেলিত হইতে

লাগিলেন। ঐরূপ সুখানুভবের পরেও অর্জুনের দৃষ্টিতে দ্বৈতভাবের অস্তিত্ব থাকিল এবং নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন; তদনন্তর যেদিকে ভগবান বসিয়াছিলেন, সেইদিকে মস্তক নত করিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন। (২৫০) অর্জুন উবাচ:

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫॥

অর্জুন তখন বলিলেন: হে স্বামিন্, আপনার জয়-জয়কার করিতেছি, আপনি আশ্চর্য কৃপা করিয়াছেন, যাহাতে আমি প্রাকৃত (সামান্য) মানুষ বিশ্বরূপ দেখিলাম; পরন্তু হে প্রভু, আপনি সত্যই ভাল করিয়াছেন, আমার অত্যন্ত সন্তোষ হইয়াছে, আপনিই যে এই সৃষ্টির আশ্রয় তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম। হে দেব, মন্দর-পর্বতের অঙ্গে স্থানে স্থানে যেমন শ্বাপদসমূহ থাকে, তেমনি আপনার দেহে অনেক ভুবন (ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মাদি লোক) দেখিতেছি। অহো, আকাশের খোলে যেমন গ্রহগণের সমষ্টি দেখা যায়, অথবা মহাবৃক্ষের উপরে যেমন অগণিত পক্ষীর বাসা থাকে, তেমনি হে শ্রীহরি, আপনার এই বিশ্বাত্মক শরীরে সুরগণপূর্ণ স্বর্গলোক দেখা যাইতেছে; হে প্রভু, এখানে আমি পঞ্চমহাভূতের এবং ভূতগ্রামের জন্ম দেখিতেছি। হে প্রভো, আপনার মধ্যে সত্যলোক আছে,—দেখিলে কি চতুরানন সেখানে নাই? আর একবার দৃষ্টিপাত করিলে কৈলাসও এখানে আছে; আপনার এক অংশে ভবানীসহ শ্রীমহাদেবকে দেখা যাইতেছে, আর হে হৃষীকেশ, আপনার (বিশ্বরূপের) মধ্যে আপনাকেই দেখিতেছি। কশ্যপাদি ঋষিকুল, এবং নাগকুলসহ পাতালও আপনার স্বরূপে দেখা যাইতেছে। অধিক আর কি বলিব? হে কৈবল্যপতি, আপনার এক এক অবয়বের ভিত্তিতে চতুর্দশ ভুবন সমাবিষ্ট হইয়া আছে, দেখিতেছি। (২৬০) আর ঐ ভুবনের যে যে লোক আছে, তাহাদেরও অনেক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে—এইভাবে আপনার অলৌকিক গাম্ভীর্য দেখা যাইতেছে।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬॥

এই দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি, আকাশে যেন অনেক বাহুদণ্ড অঙ্কুরের ন্যায় নির্গত হইয়াছে। আপনার প্রত্যেকটি বাহু নিরন্তর একই সময়ে সমস্ত ব্যাপার করিয়া যাইতেছে। মহাশূন্যের বিস্তারে যেন অনেক ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডার রচনা করা হইয়াছে, আপনার অপার উদর তেমনি দেখাইতেছে; সহস্রশীর্ষের ফণা যেন একই সময়ে কোটীসংখ্যক দেখাইতেছে; কিংবা যেন পরব্রহ্মরূপ বৃক্ষ বিবিধ বদনরূপ অসংখ্য ফলভারে ভাঙিয়া পড়িতেছে; হে বিশ্বমূর্তি, যেখানে সেখানে আপনার মুখ দেখিতে পাইতেছি। তদনুযায়ী অনেক নেত্রপঙ্‌ক্তিও দেখা যাইতেছে। আর অধিক কি বলা যায়? স্বর্গ, পাতাল, ভূমি, দিক্‌সকল, আকাশ প্রভৃতি ভেদ ঘুচিয়া গিয়া সকলই মূর্তিময় দেখাইতেছে। কোন দিকে কৌতুকে দেখিতে গেলে, আপনাকে ছাড়িয়া পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম অবকাশও দেখা যাইতেছে না, আপনি এমনি সর্বব্যাপক হইয়া আছেন। নানাবিধ ও অগণিত মিলিত মহাভূতের সমষ্টি হে অনন্ত, সে সমস্ত বিস্তারের মধ্যে আপনিই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন,

দেখিতেছি। আপনি কোথা হইতে আসিলেন, আপনি এখানে উপবিষ্ট কি দণ্ডায়মান, আর কাহার গর্ভে আপনি জন্মিয়াছেন, আপনার আকৃতি কত বড় ? ২৭০

আপনার রূপ, অবয়ব কি প্রকার, আপনার ওপারে আর কি আছে, আপনি কিসের উপর অবস্থিত, আপনার আধার কি ?—এই সব কথা বিচার করিয়া দেখিলাম, হে দেব, আপনিই এই সারা বিশ্বময় হইয়া আছেন, আপনি কোথা হইতেও উৎপন্ন হন নাই, আপনি অনাদিসিদ্ধ ; আপনি দণ্ডায়মানও নহেন, উপবিষ্টও নহেন, দীর্ঘও নহেন, হ্রস্বও নহেন। হে বৈকুণ্ঠ, উপরে নীচে—শুধু আপনিই আছেন। হে দেব, আপনি রূপে আপনারই ন্যায়, আপনিই আপনার পরিমাণ, হে পরেশ, আপনার সম্মুখে পশ্চাতে শুধু আপনিই। কিং বহুনা, হে অনন্ত, আপনিই আপনার সব কিছু—ইহা আমি বারংবার দেখিয়াছি ; পরন্তু হে প্রভু, আপনার রূপের মধ্যে যে একটি ন্যূনতা দেখিলাম ; তাহা এই যে, ইহাতে আদি, মধ্য ও অন্ত—এ তিনটিই নাই। সর্বত্র খুঁজিয়া কোথাও এগুলির সন্ধান পাওয়া যায় না, সুতরাং নিশ্চয়ই এই তিনটি আপনাতে নাই। এই ভাবে হে আদিমধ্যান্তরহিত, হে অনন্ত (অপরিমিত) বিশ্বেশ্বর, আমি তত্ত্বতঃ আপনার বিশ্বরূপ দেখিলাম ; আপনার মহামূর্তির অঙ্গ হইতে অনেক পৃথক মূর্তি প্রকট হইয়াছে ; মনে হইতেছে যেন আপনি অঙ্গে নানাবর্ণের অলঙ্কার পরিধান করিয়া আছেন। হে দেব, মনে হয় যেন আপনি একটি মহাসমুদ্র, যাহার উপর মূর্তিরূপ তরঙ্গ আন্দোলিত হইতেছে, কিংবা আপনি একটি সুন্দর বৃক্ষ যাহাতে নানা মূর্তিরূপ ফল ফলিয়াছে। ২৮০

হে প্রভো, পৃথ্বীতল যেন ভূতগণে ভরিয়া আছে, গগন যেমন নক্ষত্রে ছাইয়া আছে, তেমনি আপনার রূপ মূর্তিময় দেখহিতেছে। অহো, এক একটি মূর্তির অঙ্গপ্রান্তে ত্রিভুবন উৎপন্ন হইতেছে ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে—এইরূপে বৃহৎ মূর্তিসকল আপনার অঙ্গের রোমকূপে প্রকট হইতেছে ; এইরূপ বিশ্বের চিন্তার রচনাকারী আপনি কে এবং কোথাকার—ইহা জানিতে চাহিলে দেখিতেছি, আপনি আমারই সারথি ; হে মুকুন্দ, আমি বিচার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি সর্বব্যাপক হইয়াও ভক্তের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবার জন্যই এই প্রেমময় মূর্তি ধারণ করেন ; এই চতুর্ভুজ শ্যামল মূর্তি দেখিলে কেমন নয়ন মন আর্দ্র হয়, আলিঙ্গন করিতে গেলে দুই বাহুর মধ্যেই ধরা যায় ; হে প্রভু, আপনি বিশ্বরূপ হইয়াও কি এমন সুন্দর মূর্তি ধারণ করেন—কি আমাদের স্বল্প দৃষ্টিই আপনাকে ছোট করিয়া দেখে ? তবে এখন দৃষ্টির দোষ চলিয়া গিয়াছে, আপনি সহজে দিব্য জ্ঞানের প্রসাদ দান করিয়াছেন। এইজন্য আপনার রূপের মহিমা দেখিতে পাইলাম ; পরন্তু আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, (রথের) মকরাকার মুখের পশ্চাতে উপবিষ্ট আপনিই এই প্রকার বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

হে শ্রীহরি, আপনার মস্তকে যে মুকুট ধারণ করিয়া আছেন, তাহা কি সেই পূর্বের মুকুটই নহে ? পরন্তু ইহার তেজ ও বিশালতা অতিশয় আশ্চর্য মনে হইতেছে। হে বিশ্বমূর্তি, আপনার উপরের হস্তে যথারীতি ঘূর্ণায়মান চক্র সম্বরণ করিয়া আছেন,—ইহার চিহ্ন প্রকট। (২৯০) অন্য

দিকে কি উহা গদা নহে ? আর হে গোবিন্দ, নীচের দুই নিরস্ত্র বাহু অশ্ব-বল্‌গা একত্র করিয়া ধরিয়া প্রসারিত হইয়া আছে। হে বিশ্বেশ, আমার মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্যই আপনি সহসা একেবারে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন—ইহা আমি জানি ; পরন্তু আমার বিস্ময় উৎপাদন করাইবার কি অভিনব এই ব্যাপার ! আমার চিত্ত এই আশ্চর্যে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছে। ইহা এখানে আছে কি নাই, তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না ; অঙ্গপ্রভার এমন অভিনব শোভা যে, চতুর্দিক ভরিয়া গিয়াছে। ইহাতে অগ্নির দৃষ্টি ঝলসাইয়া গিয়াছে, অগণিত (কোটী কোটী) সূর্য নিষ্প্রভ হইয়াছে—এই তেজের এমন অদ্ভুত তীব্রতা ! অহো, যেন প্রকাশের মহার্ণবে সমস্ত সৃষ্টি ডুবিয়া গেল, কিংবা প্রলয়কালের বিদ্যুতের আবরণে যেন সারা গগন ঢাকিয়া গেল ; অথবা সংহার-তেজের জ্বালা (অগ্নি) ভাঙিয়া তাহা দ্বারা যেন আকাশে একটি মঞ্চ বাঁধা হইয়াছে, এখন দিব্য জ্ঞানের দৃষ্টি দ্বারাও দেখা যাইতেছে না। ইহার তীব্রপ্রভা অতিশয় বাড়িতেছে, ইহার দাহিকা শক্তি অত্যন্ত দহন করিতেছে, উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দিব্য চক্ষুরও ত্রাস হইতেছে ; অথবা এই মহাতেজের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, যাহা কালাগ্নি রুদ্রের তৃতীয় নেত্রে গুপ্ত থাকে, তাহা যেন ঐ নেত্রের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এই তেজের দাহিকা ও প্রকাশ শক্তি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ায় পঞ্চাগ্নির জ্বালা সারা ব্রহ্মাণ্ডকে অঙ্গারে পরিণত করিয়াছে ; (৩০০) এমন অদ্ভুত আশ্চর্য তেজোরাশি আমি এই প্রথম দেখিলাম। হে প্রভু, আপনার ব্যাপ্তি কিরূপে পার হওয়া যায়, জানি না।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

হে দেব, আপনি অক্ষর (অবিনাশী), আপনি (ওঁকারের) সার্ধ ত্রিমাত্রার অতীত, শ্রুতি যাহার স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, যাহা সর্ব আকারের মূলঘর, যাহা সারা বিশ্বকে একত্রে রাখিবার নিধান (মূলাধার), আপনি অব্যক্ত, গহন, অবিনাশী ; আপনি ধর্মের স্নেহাংশ (জীবন), অনাদিসিদ্ধ, নিত্য নব, (ছত্রিশতত্ত্বের বাহিরে) সপ্তত্রিংশতত্ত্ব, আপনি নিশ্চিত পুরাণ (সনাতন) পুরুষ,—ইহা আমি জানিয়াছি।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

আপনি আদিমধ্যান্ত-রহিত, স্বসামর্থ্যে আপনি অনন্ত, আপনি বিশ্ববাহু, বিশ্বচরণ, আপনি অপরিমেয় ; চন্দ্র ও সূর্য আপনার নেত্র, আপনি কোপ ও প্রসাদের লীলা প্রদর্শন করিতেছেন ; হে গোপাল, প্রথমটির দ্বারা আপনি শাসন করিতেছেন, অপরটির দ্বারা সর্বভূত পালন করিতেছেন। হে প্রভো, এইভাবে আমি আপনার যথার্থ রূপ দেখিতেছি, আপনার এই মুখ প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নির তেজের ন্যায়। পর্বতে দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে যেমন সমস্ত জ্বালাইয়া অগ্নির শিখা বাহির হয়, তেমনি আপনার লোল জিহ্বা আপনারই দংষ্ট্রাদন্ত চাটিতেছে ; এই বদনের প্রদাহে ও সর্বাঙ্গকান্তির প্রভায় সারা বিশ্ব উত্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, আকাশ, চারিদিক ও চারি কোণ—আগ্নেয়, নৈঋর্ত্য, বায়ব্য ও ঈশান—উপদিশা সহ সমস্ত দিক্‌চক্র (৩১০) এ সমস্ত এক আপনার মধ্যেই ভরিয়া আছে—আমি কৌতুকে দেখিতেছি, পরন্তু সমস্ত গগন যেন আপনার ভয়ানক স্বরূপে ডুবিয়া গিয়াছে। অথবা (আপনার) অদ্ভুত রসের তরঙ্গে যেন চতুর্দশ ভুবনই বেষ্টিত হইয়াছে, এমনই আশ্চর্য এই রূপ—ইহাকে আমি বুঝিব কিরূপে? অহো, এই অসাধারণ ব্যাপ্তির কোন সীমা নাই। এই তেজের উগ্রতা সহ্য করা যায় না; সুখ দূরে গেল, এখন জগৎ প্রাণ ধারণ করিবে কিরূপে?

অমী হি ত্বা সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্‌ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

হে দেব, জানি না কেমন ভাবে আপনার এই রূপ দেখিয়া ভয়ের বন্যা আসিয়াছে—এখন ত্রিভুবন দুঃখের তরঙ্গে দুলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শনে ভয় ও দুঃখের সংযোগ হইবে—ইহা হইতেই পারে না; যে জন্য হয় না, তাহা আমার জানা আছে। যতক্ষণ আপনার রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, ততক্ষণই জগতে সাংসারিক সুখদুঃখ, ভালমন্দ; এখন আপনার বিশ্বরূপ দর্শনে বিষয়বাসনা মিটিয়া গিয়া ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার এই রূপ দেখিয়াই কি সহসা আলিঙ্গন করা যায়? আর যদি আলিঙ্গন নাই করা যায়, তবে এই সঙ্কটে থাকিব কিরূপে? পশ্চাতে সরিলেই সংসারের জন্মমরণ অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়িবে, আর অগ্রসর হইলে আপনার অপার (দুঃসহ) স্বরূপ, যাহা সহ্য করা যায় না; এইভাবে, দুই সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া ত্রৈলোক্য অগ্নিদগ্ধ হইতেছে,—এই অগ্নির জ্বালা আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি; যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তাহার জ্বালা মিটাইবার জন্য কেহ সমুদ্রের দিকে যায়, আর উত্তাল তরঙ্গের লহরী দেখিয়া অধিকতর ভীত হয়। (৩২০)

এই জগতের দশাও তেমনি হইয়াছে, আপনার রূপ দেখিয়া টল্‌মল্ করিতেছে। ইহারই মধ্যে ওদিকে জ্ঞানিগণের সম্মেলন দেখিতেছি। আপনার অঙ্গের তেজে ইঁহারা সর্ব কর্মের বীজ জ্বালাইয়া, স্বতঃ সদ্‌ভাবপ্রণোদিত হইয়া আপনার মধ্যে মিলিত হইতেছেন। আর কেহ কেহ স্বভাবতঃ ভয়ভীত হইয়া, সর্বভাবে আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া করজোড়ে আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন, 'হে দেব, আমরা প্রচণ্ড মোহার্ণবে পড়িয়াছি, বিষয়-জালে আবদ্ধ হইয়াছি, স্বর্গ ও সংসার এই দুটির বন্ধনে জড়িত হইয়াছি। এই অবস্থায় আপনি ভিন্ন অন্য কে আমাদের উদ্ধার করিবে? হে দেব, আমরা সর্বপ্রাণে আপনারই শরণ লইলাম'—আর দেখিতেছি মহর্ষি, সিদ্ধগণ ও বিবিধ বিদ্যাধরসমূহ আপনার স্বস্তিবাদ করিয়া স্তুতি করিতেছেন।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ ॥

রুদ্রাদিত্যসমূহ, (অষ্ট) বসু, সাধ্যদেব (ধর্ম ও সাধ্যার পুত্রগণ) বিশ্বদেব (ধর্ম ঋষি ও বিশ্বার দশ পুত্র), অশ্বিনী কুমারদ্বয়, মরুৎ-আদি সমস্ত দেবগণ, অগ্নি ও গন্ধর্বগণ, ওদিকে সর্ব রাক্ষসগণ, মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবতাসমূহ ও সিদ্ধাদি—ইঁহারা সকলেই আপন আপন লোক হইতে আপনার সৌম্যাজ (প্রশান্ত) দৈব মহামূর্তি (বিশ্বরূপ) দেখিতেছেন। এইভাবে

আপনাকে দেখিতে দেখিতে প্রতিক্ষণে অন্তঃকরণে বিস্মিত হইয়া নিজ নিজ মুকুটমণ্ডিত মস্তক নত করিয়া, হে প্রভু, আপনারই আরতি করিতেছেন। (৩৩০) তাঁহারা কলরব করিয়া আপনার জয় ঘোষণা করিতেছেন, তাহাতে সমস্ত স্বর্গ নিনাদিত হইতেছে,—তাঁহারা করজোড় করিয়া ললাটে ঠেকাইতেছেন; বিনয়রূপ বৃক্ষের উপবনে সাত্ত্বিক ভাবের বসন্ত ঋতু সুশোভিত হইতেছে,—এইজন্য ইঁহাদের করসম্পুটরূপ পল্লবে আপনিই ফল হইয়া আছেন; হে প্রভু, আমার নয়নের ভাগ্যোদয় হইল, অন্তঃকরণে সুখের সুদিনের প্রভাত হইল,—কারণ আপনার এই অগাধ বিশ্বরূপ নয়নগোচর হইল। এই লোকব্যাপক রূপ দেখিয়া দেবগণও ভীত হইয়াছেন– যেদিক দিয়া দেখা যাউক না কেন, এই রূপের সম্মুখ ভাগই দেখা যাইতেছে।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্ ॥ ২৩ ॥

মূর্তি একটিই, পরন্তু ইহার বিচিত্র ও ভয়ানক বদনসমূহ। বহুলোচন ও সশস্ত্র অনন্ত বাহু, অসংখ্য চরণ, বহু উদর ও নানাবর্ণ; প্রত্যেক মুখে কেমন আবেশের মত্ততা দেখা যায়; অহো, যেন মহাকল্পের অন্তে যেখানে সেখানে মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। যেন অগ্নিকুণ্ডের উপরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আছে; অথবা যেন ত্রিপুরারি শঙ্করের সংহার করিবার শস্ত্রাস্ত্র, কিংবা প্রলয়-ভৈরবের ক্ষেত্র (স্থান), অথবা যুগান্তচক্রের পাত্র—যাহাতে পঞ্চভূতের খেচরান্ন পরিবেশন করা হয়; এইভাবে যেখানে সেখানে আপনার প্রচণ্ড মুখসমূহ দেখা যাইতেছে; গুহার মধ্য হইতে প্রচণ্ড সিংহ বাহির হইলে যেমন দেখায়, তেমনি আপনার উগ্রদশনরাজি (মুখবিবর হইতে বাহির হইয়া) ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে; কালরাত্রির আঁধারে—যেমন সংহারে উন্মত্ত পিশাচগণ অন্ধকার ভেদ করিয়া বাহির হয়, তেমনি আপনার মুখাভ্যন্তরে দন্তপঙ্ক্তি প্রলয়-রুধিরে রঞ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছে। ৩৪০

আর অধিক কি বলা যায়? কাল যেন যুদ্ধকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, কিংবা মরণ যেন সমস্ত সংহার করিতে মাতিয়া উঠিয়াছে, তেমনি আপনার বদনের অতি ভয়ঙ্কর ভাব; এই বেচারী ভূত-সৃষ্টিকেই বিপন্ন দেখাইতেছে, কারণ (আপনি) তাহার দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাকে দুঃখ-কালিন্দীর তটে (বিষদগ্ধ) বৃক্ষের ন্যায় দেখাইতেছে; আপনার এই মহামৃত্যুর সাগরে এখন এই ত্রিলোক শোকদুঃখের লহরীতে আন্দোলিত হইতেছে; হে বৈকুণ্ঠ, ইহাতে যদি আপনি ক্রোধ করিয়া কদাচিৎ বলেন, 'অন্য লোকের চিন্তায় তোমার কি প্রয়োজন? তুমি ধ্যান কর ও বিশ্বরূপদর্শন-সুখ ভোগ কর', তবে বৃথাই সাধারণ লোকের কথা-রূপ ঢাল দ্বারা আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, আমারই প্রাণ কাঁপিতেছে। আমাকে রুদ্রও ভয় করে, মৃত্যুও আমার ভয়ে পলায়; সেই আমি থরথর করিয়া কাঁপিতেছি, এরূপ কখনও হয় নাই। পরন্তু হে হরি, ইহা এক আশ্চর্য মহামায়ী স্বরূপ। এই বিশ্বরূপের নামে ইহা ভয়ঙ্করত্ব আনিয়াছে।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

মহাকালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, এমনি আপনার কোন ক্রুদ্ধ মুখ এত বিস্তৃত যে, স্বর্গও তাহার কাছে ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। আকাশের বিশাল বিস্তারও ইহাকে আবরণ করিতে পারে না, ত্রিভুবনের বায়ুও ইহাকে বেষ্টন করিতে পারে না, এই (মুখনিঃসৃত) বাষ্পের জ্বালা চরাচরকে জ্বালাইয়া দেয়। ইহার মধ্যে একটি অন্য একটির সমান নহে, ইহাদের বর্ণেও প্রভেদ আছে। অহো! প্রলয়কালের বহ্নি ইহাদেরই সাহায্য লয়। ৩৫০

ইহার অঙ্গের তেজ এত অধিক যে, ত্রৈলোক্য ভস্মীভূত করিতে পারে; ইহার অতি বিশাল মুখ এবং মুখের মধ্যে দন্ত ও দংষ্ট্রা; (মনে হইতেছে) যেন বায়ুর ঝড় বহিতেছে, সমুদ্রে মহাবন্যা আসিয়াছে, অথবা যেন বড়বানল বিষাগ্নি উদ্গার করিতে উদ্যত হইয়াছে। হলাহল বিষ যেন অগ্নি ভক্ষণ করিয়াছে, কিংবা মরণ যেন সংহারলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তেমনি এই বদনে সংহার-তেজ উৎপন্ন হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। পরন্তু, ইহা কত বিশাল! যেন অন্তরাল ভাঙিয়া পড়িয়া আকাশে একটি বৃহৎ গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছে। কিংবা বসুন্ধরাকে কুক্ষিগত করিয়া হিরণ্যাক্ষ যখন গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হটকেশ্বর শঙ্কর (পাতালের মহাদেব) যেমন পাতালের গুহা খুলিয়া প্রকট করিয়াছিলেন, তেমনি আপনার বক্ত্রের বিকাশ, মধ্যস্থলে জিহ্বার ক্ষোভ—সমগ্র বিশ্বও একগ্রাস হইবে না, ঐ মুখে কোন গ্রাস ভরিতেছেন না; আর যেমন পাতালের নাগের ফুৎকারে বিষের জ্বালা উঠিয়া আকাশ পর্যন্ত স্পর্শ করে, তেমনি এই মুখের গহ্বরের মধ্যে জিহ্বা বিস্তৃত হইয়া আছে, দেখা যাইতেছে প্রলয়কালের বিদ্যুৎসমূহ যেমন বাহির হইয়া গগনের (মেঘনির্মিত) দুর্গ-প্রাকার রঞ্জিত করে, তেমনি ওষ্ঠের বাহিরে বক্র দংষ্ট্রাগুলি (ভীষণ) দেখাইতেছে; ললাট-পটের নীচে নেত্রযুগল যেন ভয়কে ভয় দেখাইতেছে, অথবা মহামৃত্যুর অগ্নিশিখা যেন অন্ধকারের গহ্বরে বসিয়া আছে; এইরূপ মহাভীতিপ্রদ আপনার ঐশ্বর্য দেখাইয়া আপনি যে কি কার্য করিতেছেন জানি না, পরন্তু আমার প্রত্যক্ষ কল্যাণ হইল। ৩৬০

হে দেব, আমি যে বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে; হে প্রভু, আমার নয়ন সেই রূপ দেখিয়াছে, দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত (শান্ত) হইয়াছে। অহো, এই পার্থিব দেহ যদি চলিয়াও যায়, তাহাতে কিসের দুঃখ? পরন্তু, এখন আমার চেতনা যাইতে বসিয়াছে। সাধারণতঃ ভয়ে শরীর কাঁপিতে পারে, কিছু কালের জন্য মনও অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতে পারে, অথবা বুদ্ধিও বিচলিত হয়, অভিমানেরও বিস্মরণ হইতে পারে। পরন্তু ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যাহা কেবল আনন্দস্বরূপ, সেই নিশ্চল অন্তরাত্মাও শিহরিয়া উঠিয়াছে। হে তাত, সাক্ষাৎ দর্শনের কি প্রভাব! জ্ঞান দেশছাড়া হইয়াছে, গুরুশিষ্য-সম্বন্ধও টিকিবে কিনা সন্দেহ; হে দেব, আপনার এই রূপ দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে সম্বরণ করিবার জন্য আমি নিজেকে ধৈর্যের আচ্ছাদনে ঢাকিতেছি। তাহাতে আমার ধৈর্যই লয়প্রাপ্ত হইতেছে, যেন তাহারও বিশ্বরূপ দর্শন হইয়াছে! আর অধিক কি বলিব? পরন্তু আমার খুব ভাল শিক্ষা হইল। বেচারী জীব বিশ্রাম লাভ করিবার আশায় যেখানে সেখানে ছুটাছুটি করিতেছে, পরন্তু কোন দিকেই আশ্রয় মিলিতেছে না; বিশ্বরূপ এই চরাচর জগতের ত্রাস উৎপন্ন করিয়াছেন, হে মহাবিষ্ণু, ইহা না বলিয়াই বা কি করি? [ক্রমশঃ]

মনের রহস্য

স্বামী সুন্দরানন্দ

মানুষের মনই আসল মানুষ; স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর তাহার বাহ্য ও আভ্যন্তর আবরণমাত্র। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় 'রাজযোগে' বলিয়াছেন, "মনোনামধেয় আন্তরিক সূক্ষ্ম শক্তি বাহির হইতে স্থূল ভূত লইয়া শরীররূপ বাহ্য আবরণ প্রস্তুত করে।" মন ভিন্ন স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর কিছুই করিতে পারে না। চেতনা-অচেতনা, জ্ঞান-অজ্ঞান, স্মৃতি-বিস্মৃতি, চিন্তা-অচিন্তা, ভক্তি-অভক্তি, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, প্রেম-অপ্রেম, শান্তি-অশান্তি, সুখ-দুঃখ, বন্ধুতা-বৈরিতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিসমূহ যে মনেরই এক একটি রূপ, ইহা অনুভবসিদ্ধ। এইরূপ অসংখ্য ভাবের একসঙ্গে সমাবেশ মনের বৈশিষ্ট্য এবং কল্পনাতীত শক্তির পরিচায়ক। মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রায় সকল ক্রিয়াই মনদ্বারা সম্পন্ন হয়। মন সংযুক্ত না হইলে কোন মানুষেরই দেহ-সম্পর্কিত অধিকাংশ ক্রিয়াই সম্ভব হয় না। এইজন্য *'সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসার-সংগ্রহে'র সঙ্গে* কণ্ঠ মিলাইয়া নিঃসন্দেহে বলা যায়: "অন্তর্বহিশ্চার্থমনেন বেত্তি। শৃণোতি জিঘ্রত্যমুনৈব চেক্ষতে বক্তি স্পৃশত্যত্তি করোতি সর্বম্॥" মনদ্বারাই মানুষ আন্তর ও বাহ্য বস্তু অবগত হয়, সকল শব্দ শ্রবণ করে, গন্ধ গ্রহণ করে, দর্শন করে, বাক্য প্রয়োগ করে, স্পর্শ করে, আহার করে এবং সকল কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই কারণে 'যোগ-বাশিষ্ঠ' প্রচার করেন: "মনোমাত্রমতো বিশ্বম্"—এ জগৎ মনোমাত্র এবং ইহা সমর্থন করিয়া 'বিবেকচূড়ামণি' বলেন, "ভোক্তাদি-বিশ্বং মন এব সর্বম্"—ভোক্তা ভোগ্য সবই মন। এই ভাবসমূহ পরিস্ফুট করিয়া 'পঞ্চদশী' ঘোষণা করেন, "যচ্চিত্তস্তন্ময়ো মর্ত্যঃ"—মন যেরূপ প্রাণী সেইরূপ। সুতরাং "মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ"—এই পুরুষ (জীব) মনোময় বা মনপ্রধান, এই শ্রুতিবাক্য সর্বাংশে সত্য। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনের অত্যন্ত প্রাধান্যের জন্য গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি"—ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমি মন। এই কারণে মানুষের সূক্ষ্ম শরীর অপঞ্চীকৃত ভূতজাত অতিসূক্ষ্ম পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয়—এই সপ্তদশ অবয়বে গঠিত হইলেও 'কারিকোপেত-মাণ্ডূক্যোপনিষৎ' অতি উচ্চকণ্ঠে উহাকে মন মাত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আচার্য শংকর উহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "লিঙ্গং মনঃ"—মন অর্থ লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম দেহ। ইহা আত্মারই উপাধি বলিয়া ইহাকেও আত্মা বলা হয়। *এই সূক্ষ্ম দেহ তথা মনে মানুষের* জন্মজন্মান্তরের সকল জ্ঞান ও কর্মের ফল সমবেত এবং পূর্ব পূর্ব ও ইহজন্মের সর্ববিধ মানসিক ক্রিয়ার ফল পুঞ্জীভূত সংস্কার-আকারে লুক্কায়িত। এই কারণে "বন্ধশ্চ মোক্ষো মনসৈব পুংসাং"—মনের দ্বারাই মানুষের বন্ধন ও মুক্তি হয়। বিশুদ্ধ (রজ-স্তমোগুণবিহীন) সত্ত্বগুণপ্রধান মনদ্বারা মোক্ষ এবং অশুদ্ধ মলিন (রজঃ ও তমোগুণযুক্ত) মনদ্বারা বন্ধন সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্য জগতে মনের তুল্য অমিত শক্তিশালী রাহস্যিক সত্তা আর কিছু দেখা যায় না। মনের প্রাক্তন

সংস্কারই মানুষের ইহ ও পরজন্মের একমাত্র কারণ। মন শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সূক্ষ্ম শরীর সঞ্চিত সংস্কার অনুযায়ী বারংবার স্থূল শরীর ধারণ করে। মন শুদ্ধ হইলে উহার সংকল্প একেবারে চলিয়া যায়; তখন আর মন থাকে না, ইহা শুদ্ধ চৈতন্যে পরিণত হইয়া মুক্ত হয়। এই ভাবটি পরিস্ফুট করিতে যাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সোজা ভাষায় বলিয়াছেন: "তিনি (ঈশ্বর) শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।"

মনসম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রসমূহের এই অভিমতের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতবাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল্ লিখিয়াছেন, "মন জীবনের সার। ইহা শরীরের সকল অংশেই দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহার কেন্দ্র হৃদয়।"[১] পণ্ডিত সক্রেটিস বলিয়াছেন, "আত্মাই মন বা মনের উৎস।"[২] দর্শনবিদ্ লিবনিজ্ ঘোষণা করিয়াছেন, "জড়পদার্থরূপে যাহা দৃষ্ট হয়, উহা প্রকৃত পক্ষে মন।"[৩] দার্শনিক মূরের মতে "মন শরীরের উপর আত্মার শক্তি।"[৪] সুপণ্ডিত লক প্রচার করিয়াছেন, "আমরা যাহাকে মন বলি, উহা এরূপ একখণ্ড কাগজ-সদৃশ, যাহার উপর আবেগসমূহ উহাদের ইচ্ছামত অঙ্কন করিতে পারে।"[৫] দর্শনবিদ্ হিউম্ লিখিয়াছেন, "মন আবেগের সমষ্টি।"[৬] পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন, "মন এরূপ রাহস্যিক কিছু, যাহা অনুভব ও চিন্তা করে।"[৭]

এক শ্রেণীর আধুনিক বিজ্ঞানীদের লেখায়ও মন সম্বন্ধে উল্লিখিত অভিমত-সমূহের সমর্থন দেখা যায়:

একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান-গ্রন্থে 'জীবন—অমীমাংসিত সমস্যা' প্রবন্ধে জনৈক বিজ্ঞানী লিখিয়াছেন, "মানুষের সমগ্র জীবনের অভ্যন্তর দিয়া তাহার জীবন ও মন এক বলিয়া অভিব্যক্ত।"[৮] ঐ পুস্তকের 'গ্ল্যাণ্ড—আভ্যন্তর রাসায়নিক কারখানা' নিবন্ধে আছে: "মন ও জীবন যে এক, ইহা সত্য এবং এই ভাবে উভয়ের এক সঙ্গে আবির্ভাব হইয়াছে। * * চরম বিশ্লেষণে জীবন ও মন অধ্যয়ন একই।"[৯]

এই প্রসঙ্গে ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, অধিকাংশ আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতে—মন জীবন চেতনা চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারমাত্রই জড়েরই এক এক প্রকার ক্রিয়া। কিন্তু এই অভিমত পৃথিবীর কোন দেশে যুক্তি-বিচারের দিক দিয়াও অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং জনসাধারণকর্তৃক এ পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই।

---

১ Mind is essence of life. It is found in every part of the body, but its centre is heart. —*Aristotle*

২ Soul is mind, or source of mind. —Socrates

৩ All that appears as matter is really mind. —Liebnitz

৪ Mind is a power of soul over body. —Moore

৫ All that we call the mind amounts to a piece of paper upon which sensations inscribe what they will. —*Locke*

৬ Mind is a bundle of sensations —Hume

৭ *Mind is a mysterious something* which feels and thinks. —Mill

৮ Life and mind are one throughout the whole scale of being. 'Life—Unsolved Problem of the Universe'—Book of Popular Science.

৯ The truth that mind and life are one and have thus evolved together. * * The study of life is, in the final analysis, the study of mind.—'Glands—Internal Laboratories'—*Book of Popular Science.*

অন্তর্মুখে

শ্রীবিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়

তেষাং সুখং শাশ্বতং

কী ভুল করেছি, প্রভু, এতকাল ধ'রে
ধ্রুবেরে খুঁজিতে গিয়ে ছায়ার ভিতরে !
কামনা এনেছে মৃত্যু। এই মৃত্যু হ'তে
ভাসাও আমারে তব মাধুর্যের স্রোতে—
যার আস্বাদনে ধন-জীবন-যৌবন,
একচ্ছত্র সম্রাটের স্বর্ণ-সিংহাসন
তুচ্ছ বলে মনে হয়, সর্ব দুঃখ যায়।
'মিশ্রী পেলে এ সংসারে গুড় কেবা চায় !'

জায়া পুত্র রূপ আর খ্যাতির গুমোর—
রাতের স্বপন যেন। কোথায় সে জোর
কাহারেও ধ'রে রাখি ? তুমি নিত্য ধন।
তোমার চরণে মোর শান্তি চিরন্তন।
বেসুরো বাঁশরি—পঙ্কে প'ড়ে আছি হায় !
অসীম, তোমার সুরে বাজাও আমায়।

মূকং করোতি বাচালং

রাজাধিরাজের পুত্র ভয় কি আমার ?
তুমি আছ পিতা মোর। জগৎ সংসার
সকলই তোমার সৃষ্টি সর্বশক্তিমান্।
কেন ভুলে যাই,—আমি তোমারই সন্তান ;
তব আজ্ঞা নতশিরে করিয়া ধারণ
জলধারা ঢালে মেঘ ; বহে সমীরণ ;
আলো দেয় চন্দ্রসূর্য। কেন ভয় পাই ?
যতক্ষণ একা আমি, ততক্ষণ নাই
কণামাত্র শক্তি মোর। তুমি বল দিলে
সর্বজয়ী আমি, পিতঃ, অনন্ত নিখিলে।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা ভুলেছিনু, হায়,
মূকও বাচাল হয় তোমার কৃপায় ;
চলচ্ছক্তিহীন করে গিরি অতিক্রম।
দয়া করো, গেছে, প্রভু, দৃষ্টির বিভ্রম।

মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা অনেকেই সংস্কৃতকে কঠিন মনে করিয়া ভয় পাই অথবা 'মৃত ভাষা' ভাবিয়া উপেক্ষা করি। কিন্তু আমরা নিয়তই অজ্ঞাতসারে সাধুবাংলার মধ্যে বহু সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিতেছি। শত শত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত অবস্থায় আমাদের মাতৃভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অর্থের বা রূপের কোন পরিবর্তন না ঘটাইয়া বাংলা হইয়া গিয়াছে। আমরা যদি এই-জাতীয় শব্দসমষ্টির সহিত পরিচিত হইবার কৌশল আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে বহু সংস্কৃত পদ আপনা হইতে মাতৃভাষার ন্যায় সহজ সরল হইয়া যাইবে এবং তাহার সাহায্যে কিছু কিছু সংস্কৃত কথা লিখিতে ও বলিতে পারিব। মাতৃভাষায় সংস্কৃত কথাগুলিকে জানিয়া পরে সংস্কৃত শিক্ষা করিলে তাহা সহজ ও সরল মনে হইবে।

'হে মাতঃ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' এই বাক্যটির 'বিবিধ রতন' শব্দ-দুটি বাদ দিলে দেখা যায়, অবশিষ্ট অংশটি সংস্কৃত ভাষা। এখানে 'বিবিধ রতন' স্থলে 'বহুরত্নমালা' বসাইলেই সম্পূর্ণ বাক্যটি সংস্কৃত হইয়া যাইবে; কিন্তু উহা বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাংলা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আমাদের সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতের বহু অংশ সংস্কৃতে লেখা, কিন্তু আমরা বাংলা বলিয়াই জানি। প্রথম চরণে 'হে জনগণমনোঽধিনায়ক' সম্বোধন পদ, 'ভারতভাগ্যবিধাতা' ত্বং এই উহ্য কর্তার বিশেষণ এবং 'জয়'—জি ধাতুর লোট্ মধ্যম পুরুষের একবচন। আমরা বাংলায় 'বালক বিদ্যালয়ে চল' বলিয়া থাকি, উহা শুদ্ধ সংস্কৃত। বালক-শব্দে সম্বোধনের একবচনে 'বালক'। বিদ্যালয়-শব্দের সপ্তমীর একবচনে 'বিদ্যালয়ে' চল্-ধাতু লোট্ মধ্যম পুরুষের একবচনে 'চল' হইয়াছে।

এইভাবে আমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বহু সংস্কৃত কথাকে বাংলা ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। বিশুদ্ধ বাংলার মধ্যে এই-জাতীয় উভয় ভাষায় প্রচলিত শব্দসংখ্যা নগণ্য বা উপেক্ষণীয় নহে। ইহাদের প্রভাবও বাংলার উপর অত্যধিক। এমন কি যাহাদিগকে বাংলা ভাষার উপাদান বলা হইয়া থাকে, (অর্থাৎ তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী প্রভৃতি) তাহাদিগের সাহায্য না লইয়াও এই শ্রেণীর বিভক্তিযুক্ত শব্দসমূহ দ্বারা বাংলা ও সংস্কৃত দুইই যুগপৎ লিখিতে ও বলিতে পারা যায়।

একাধিক ভাষায় প্রচলিত শব্দ বা বাক্য-সমূহকে অলঙ্কার-শাস্ত্রে 'ভাষাসম' নামে অভিহিত করা হয়। আমিও এই-জাতীয় বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় প্রচলিত পদগুলিকে 'ভাষাসম' নামে চিহ্নিত করিব। তাহাতে বাংলার মধ্য হইতে উহাদিগকে পৃথকৃভাবে জানিবার সুবিধা হইবে এবং আমরা বুঝিতে পারিব ভাষাজননীর (সংস্কৃত ভাষার) অপূর্ব রূপমাধুর্য আজিও অবিকৃত অবস্থায় তাহার সন্তানের দেহে রূপায়িত হইয়া বাংলার সৌন্দর্য সমৃদ্ধি ও গৌরব বর্ধিত করিতেছে।

বাংলার মাধ্যমে সংস্কৃত শিখিতে হইলে শব্দ ও পদের ন্যায় তৎসম ও ভাষাসম সংস্কৃতের

পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 'রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী'—এই বাক্যটিতে রাবণ, শ্বশুর ও মেঘনাদ তৎসম শব্দ, কিন্তু মম ও স্বামী ভাষাসম সংস্কৃত। কারণ ঐ বাক্যটিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করিলে 'রাবণঃ শ্বশুরঃ মম মেঘনাদঃ স্বামী' হইবে। এখানে লক্ষ্য করুন—পাঁচটি শব্দের মধ্যে তিনটি বিভক্তিযুক্ত হইয়াছে, অপর দুইটি অর্থাৎ মম ও স্বামী পূর্ব অবস্থাতেই রহিয়াছে। উহারা সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত অবস্থাতেই সগৌরবে বাংলার মধ্যে স্থান পাইয়াছিল বলিয়া অনুবাদের সময় আর বিভক্তির প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত যে সকল পদ সংস্কৃত ও বাংলায় একার্থবোধক তাহারাই ভাষা-সম, অন্যগুলি নহে। তৎসম ও ভাষাসম সংস্কৃতের এই পার্থক্যটুকু জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

অনুস্বার-বিসর্গ-বিহীন এই জাতীয় ভাষাসম সংস্কৃত আমাদের অনেকের নিকট বাংলা বলিয়া মনে হইলেও মূলে যে তাহারা সংস্কৃত, এই কথাটি বুঝিতে পারিলেই সংস্কৃত-ভীতি চলিয়া যাইবে এবং উহাকে মৃত ভাষা ভাবিতেও কুণ্ঠা দেখা দিবে।

"যাচে তব কৃপাকণা ভবদুঃখভাগী
ধর্মক্ষেত্রে সংসারেতে ধর্মকর্মত্যাগী।"

—এই বাক্যটির কর্তা অহং বা আমি উহ্য আছে। অন্যপদগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত। 'কৃপাকণা'য় সংস্কৃত বিভক্তিটি নাই, 'সংসারেতে' বাংলা বিভক্তি।

নিম্নলিখিত বাক্যটিকে বাংলা বা সংস্কৃত যা ইচ্ছা বলিতে পারেন। "গৃহে গৃহে তব পূজা তব আরাধনা"—এই বাক্যে 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদটি উহ্য রহিয়াছে। বাক্যটি সংস্কৃতে ও বাংলায় একই অর্থে প্রচলিত, সুতরাং ভাষাসম সংস্কৃত।

বাংলাভাষার তৎসম শব্দগুলি কিরূপ অবস্থায় ভাষাসম সংস্কৃতে পরিণত হয়, তাহার একটি সাঙ্কেতিক তালিকা প্রস্তুতের চেষ্টা করা যাইতেছে :

(১) যাবতীয় অকারান্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ সপ্তমী 'এ' বিভক্তিতে ও সম্বোধনের এক বচনে ভাষাসম সংস্কৃত, অর্থাৎ সংস্কৃত-বাংলা এক।

বাংলায় অকারান্ত তৎসম শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই একটিমাত্র সাঙ্কেতিক সূত্রের সাহায্যেই আমরা শত শত ভাষাসম সংস্কৃত পদের সহিত পরিচিত হইতে পারি। যে কোন অকারান্ত শব্দের শেষে একটি 'এ' বসাইলে (৭মী) অথবা (কিছু না বসাইলে) সম্বোধন বুঝাইলেই তাহা সংস্কৃত হইয়া যাইবে।

সংস্কৃতপদের উদাহরণ যথা : গৃহে, বিদ্যালয়ে, হে ছাত্র, হে মহাশয় ইত্যাদি।

সংস্কৃত বাক্যের উদাহরণ যথা :

অনলে অনিলে সাগরে পর্বতে উত্তমে অধমে
স্থাবরে জঙ্গমে
সর্বত্র অনন্তকরুণা তব হে জগদীশ
হে করুণাসাগর।

(২) আকারান্ত ও ঈকারান্ত সমুদয় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রথমার একবচন ও সম্বোধনের একবচন ভাষাসম। (আকারান্ত শব্দ সম্বোধনে সর্বস্থানে ভাষাসম হয় না)। উদাহরণ যথা : দয়া, মায়া, কামিনী, রজনী; হে বালিকে, হে জননি ইত্যাদি। বাক্য যথা : নিরাশ্রয়া কন্যা তব হে জননি, ক্রোড়ে তব আশ্রয়প্রার্থিনী।

(৩) সখি শব্দ প্রথমা ও সম্বোধনের একবচন ভাষাসম, যথা : সখা, সখে; বাক্য যথা : সখে, সখা তব অভিমানী অতি।

(৪) উকারান্ত শব্দ সম্বোধনে বহুক্ষেত্রে সংস্কৃত বাংলা এক, অর্থাৎ ভাষাসম। যথা: হে গুরো, হে প্রভো ইত্যাদি।

বাক্য: হে গুরো চরণে তব অপরাধী দাস।

(৫) ঋকারান্ত পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রথমার একবচন ও সম্বোধনের একবচন ভাষাসম। পদ যথা: দাতা, বিধাতা, হে ভ্রাতঃ, হে মাতঃ প্রভৃতি। বাক্য যথা:

মাতা মম জগন্মাতা পিতা বিশ্বপিতা
তথাপি কেন হে ভ্রাতঃ হৃদয়ে ভীরুতা।

সংস্কৃত 'কিম্' শব্দ হেতু-অর্থে তৃতীয়ার একবচনে 'কেন' বাংলায় বিকৃত উচ্চারণে 'ক্যানো' হইয়াছে।

(৬) ইকারান্ত ও উকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচন ভাষাসম। পদ যথা: দধি, মধু ইত্যাদি। বাক্য যথা:

শরীরপোষণে তথা জীবনরক্ষণে
স্বাদু শুচি দধি মধু আহর সর্বদা।

(৭) সংস্কৃত 'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্' শব্দের ষষ্ঠীর 'তব' ও 'মম' বাংলা পদ্যে বহু প্রচলিত, সুতরাং উহাকে ভাষাসম বলিতে পারা যায়।

বাক্য যথা: মধুময়ী তব কথা মম মনোহরা।

(৮) অন্‌ভাগান্ত সংখ্যাবাচক শব্দ প্রথমার বহুবচন ভাষাসম, অর্থাৎ সংস্কৃত বাংলা এক। যথা:-দশ, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ইত্যাদি।

(৯) বণিজ্, ঋত্বিজ্, ভিষজ্ সম্রাজ্ প্রভৃতি জকারান্ত শব্দ প্রথমার একবচন ও সম্বোধনের একবচন ভাষাসম। পদ যথা: বণিক্, সম্রাট্ ইত্যাদি। বাক্য যথা:

ভিষক্ বণিক্, নহে ব্যাধিহারী সদা।

(১০) তকারান্ত দকারান্ত শব্দ প্রথমার একবচন ভাষাসম। সম্পৎ, সুহৃৎ ইত্যাদি। বাক্য যথা: সম্রাট্ বার্ধক্যে তব সর্বতাপহৃৎ
উপনিষৎ সর্বথা সম্পদ্ সুহৃৎ।

(১১) মৎ বৎ প্রত্যয়ান্ত এবং অন্, ইন্ ভাগান্ত যাবতীয় পুংলিঙ্গ শব্দ প্রথমা ও সম্বোধনের একবচন ভাষাসম।

পদ যথা: বুদ্ধিমান্, শ্রীমান্, ভগবান্, মন্ত্রী, হস্তী প্রভৃতি। বাক্য যথা:

ধনী মানী গুণী জ্ঞানী মহাত্মা মহান্
কর্মযোগী পিতা মম যশস্বী ধীমান্
সত্যবাদী সেবাব্রতী দীনে দয়াবান্
তেজস্বী মনস্বী তথা বিশ্বে মহীয়ান্॥

(১২) চকারান্ত শকারান্ত শব্দ প্রথমার একবচন ভাষাসম। যথা: বাক্, ত্বক্, দিক্, প্রভৃতি।

(১৩) মন্ ভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচন ভাষাসম। পদ যথা: জন্ম, কর্ম, চর্ম ইত্যাদি। বাক্য যথা:

উচ্চবংশে জন্ম তব ধাম বারাণসী
সর্ব জীবে প্রেম তব নাম মুক্তকেশী।

(১৪) বহু সংস্কৃত অব্যয় ভাষাসম। ইহাদিগকে সূত্রাকারে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সুতরাং যথাসম্ভব তালিকা দেওয়া হইল। যথা:

অথবা, অতীব, অধুনা, অন্যত্র, অয়ি, অরে, অহো, আঃ, ইদানীং, ঈষৎ, উপরি, একত্র, একদা, কদাচিৎ, ক্রমশঃ, কদাপি, কিংবা, বা, কিন্তু, তথাপি, দিবা, ধিক্, নচেৎ, নানা, নাম, পরশ্বঃ, পশ্চাৎ, পুনঃপুনঃ, পৃথক্, মিথ্যা, যথা, তথা, যদি, যদ্যপি, যাবৎ, সহসা, সাক্ষাৎ, হে, হা, স্বয়ং, বিনা, যুগপৎ, ভূমিসাৎ, আত্মসাৎ, বৃথা, সম্প্রতি, সর্বত্র, সর্বদা, সদা, সুতরাং, পিতৃবৎ, মাতৃবৎ ইত্যাদি অব্যয়গুলি সংস্কৃত বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রচলিত আছে। অতএব ভাষাসম। বাক্য যথা:

ধিক্ মূর্খ! বৃথা তব বীরত্ব-কল্পনা।

(১৫) কোন কোন ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ধাতুর মধ্যম পুরুষের একবচন ভাষাসম। যথা :

ধর, চল, থর, সংহর, উদ্ধর, ইত্যাদি।

বাক্য : ধর ধর গলে মালা,
সংহর সকল জ্বালা।

(১৬) কোন কোন আত্মনেপদী ধাতুর উত্তমপুরুষের একবচন কবিতায় ভাষাসম রূপে ব্যবহৃত হয় যথা : যাচে, সহে প্রভৃতি। বাক্য যথা :

সহে না সহে না সদা দারুণ যন্ত্রণা, দয়াময়ি !

(১৭) সমাসবদ্ধ বহু সংস্কৃত কথা বাংলা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রয়োজনক্ষেত্রে অনেকগুলি পদ একত্র সমাসবদ্ধ করিয়া ভাষাসম পর্যায়ে আনা যাইতে পারে। যেমন, 'গুরুজন-চরণকমলে অশেষপ্রণতি-পূর্ব্বক প্রার্থনা' ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ বাংলার জ্ঞান থাকিলেই উপরিউক্ত সামান্য কয়েকটি নিয়মের সাহায্যে মাতৃভাষার অস্থিমজ্জায় জড়িত বাংলার একটি বিরাট অংশকে ভাষাসম সংস্কৃত-রূপে চিনিতে পারি এবং সংস্কৃত না শিখিয়াই আমরা অনেকখানি সংস্কৃতজ্ঞ হইতে পারি। ইহা সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে সামান্য কথা নহে। মাতৃভাষার সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষার এই প্রচেষ্টা যদি কাহারও সামান্য উপকার-সাধনে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বারান্তরে ভাষাসম পদের সাহায্যে সংস্কৃত বাক্য-গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এইবার ভাষাসম পদের সাহায্যে একটি অনুবাদের নমুনা এবং একটি সংস্কৃত মাতৃবন্দনা দিয়া বক্তব্য শেষ করিতে চাই।

চলিত বাংলা : এখন বাবা অফিসে, মা মন্দিরে পূজা করছেন, দিদি মামার বাড়ীতে, একা স্ত্রী রোগগ্রস্ত অবস্থায় বিছানায় শুয়ে; সুতরাং ভিক্ষুক তোমার কোন আশা নাই।

সংস্কৃতে অনুবাদ যথা : অধুনা পিতা কর্মস্থলে, মাতা মন্দিরে পূজারতা, অগ্রজা মাতুলালয়ে, গৃহিণী একাকিনী রুগ্না শয্যা-শায়িনী, সুতরাং হে ভিক্ষুক, তব আশা বৃথা।

মাতৃবন্দনা

স্নেহময়ী শান্তিময়ী সন্তাপহারিণী
সেবাপরায়ণা সদা কল্যাণ-কারিণী।
স্বধর্মচারিণী তথা পরোপকারিণী
পূজনীয়া মাতা মম দেবীস্বরূপিণী॥

দয়াময়ী হাস্যময়ী মধুর-ভাষিণী
দানধর্মরতা সদা দেশ-হিতৈষিণী
পুণ্যবতী ভক্তিমতী স্বসুখ-ত্যাগিনী
পূজনীয়া মাতা মম দেবীস্বরূপিণী॥

আন্দামানে কয়েকদিন

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র

কিছু দিন আগেও আন্দামান বলিলে যাবজ্জীবন দণ্ডিত অপরাধীর কথাই লোকের মনে হইত; তাহাদিগকেই আন্দামানে প্রেরণ করা হইত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ঐরূপ অপরাধী প্রেরণ করা বন্ধ হইয়া যায়। যুদ্ধ চলিবার সময়ে ১৯৪২ খৃঃ হইতে তিন বৎসর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের অধিকারে আসে। হিরোশিমাতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের পরেও আন্দামানস্থ জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষেরা আত্মসমর্পণ না করিয়া যুদ্ধ চালাইতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, টোকিও হইতে প্রেরিত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা যাইয়া তাঁহাদের বুঝান যে, জাপানীরা সমগ্রভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে জাপানের নিস্তার নাই, আণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে সমগ্র জাপানই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন তাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন এবং সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ ভারত ও বর্মাস্থিত তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের অধীনে আসে।

পূর্বে যখন একই ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ ও বর্মার উপর প্রভুত্ব করিতেন, তখন সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ একই ইংরেজ সরকারের অধীনে ছিল। পরে ১৯৩৫ খৃঃ যখন ভারতবর্ষ ও বর্মা পৃথক্ করা হয় তখন বর্মা সরকার উত্তর দিকের তিনটি দ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করেন, এবং অবশিষ্ট দ্বীপপুঞ্জ ভারত সরকারের অধীনে থাকে। জাপানী আমলে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের অধিকারে থাকে, জাপানীরা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং বর্মা হইতে চলিয়া গেলে, ঐ সকল দেশ ইংরেজদের অধিকারে ফিরিয়া আসে। ইংরেজরা ভারতবর্ষ ও বর্মাকে স্বাধীনতা দিবার সময়ে বর্মা সমগ্র দ্বীপপুঞ্জই দাবি করে, কিন্তু পূর্বে যে তিনটি দ্বীপ বর্মাস্থিত ইংরেজ সরকারের অধীনে ছিল, তাহাই বর্মাকে দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট দ্বীপপুঞ্জ ভারতকে দেওয়া হয়।

জাপানীরা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কোন সুনাম রাখিয়া যায় নাই, বরং জাপানীদের নৃশংসতার কথাই আন্দামানে গেলে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমে জাপানীরা যাইয়া জেলখানা হইতে সমস্ত কয়েদীদের মুক্তি দেয়। কয়েদীরা সকলেই রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দণ্ডিত ছিল না; বেশীর ভাগই জঘন্য অপরাধের জন্য দণ্ডিত, তাহারা ছাড়া পাইয়া পুনরায় অসদাচরণ করায় তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। জাপানীরা যখন বিস্তৃত রণাঙ্গনের বিভিন্ন জায়গায় যতই হারিতে থাকে, তাহাদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা ততই বাড়িতে থাকে। মিত্রপক্ষের বিমান দেখিতে পাইলেই জাপানীরা মনে করিত, নিশ্চয় ভারতীয়েরা ইংরেজদিগকে গোপনে সংবাদ দেয় এবং রাত্রিবেলায় আলোর সঙ্কেত দেখায়। প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া জাপানীরা যাহাকে সন্দেহ করিত, তাহার উপর নানা অমানুষিক অত্যাচার করিত; অনেক লোককে বন্দী করিয়া, ষ্টীমারে মধ্য সমুদ্রে লইয়া গিয়া হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইত। যুদ্ধের শেষের দিকে খাদ্য-সরবরাহও কমিয়া গিয়াছিল, তখন গরু মহিষ যাহা পাওয়া যাইত, তাহাই মারিয়া খাওয়া হইত, রেফ্রিজিরেটার না থাকায় মাংস যাহাতে

না পচিয়া যায়, সে জন্য পশুটিকে একবারে হত্যা করা হইত না, আজ হয় তো একটি পা কাটিয়া লওয়া হইল, পরের দিন অন্য একটি পা, এইরূপে চলিত।

যুদ্ধ চলিবার কালে নেতাজী চার পাঁচ দিনের জন্য পোর্ট ব্লেয়ারে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে সব দেখিতে দেওয়া হয় নাই, অনেকটা নিয়ন্ত্রিত সফর (conducted tour) হইয়াছিল, তবুও তিনি অনেক কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেগুলি জাপানে উচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করায় নৃশংসতা ও বর্বরতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস পায়।

আন্দামানে এখন আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয় না। ভারতীয় দণ্ডবিধিরও সংশোধন করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের পরিবর্তে বিশ বৎসর কারাবাস করা হইয়াছে।

দ্বীপপুঞ্জের শাসন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, কেবল বিচারবিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বে,—কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনে। রেভিনিউ এসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার সব-জজের কাজ করেন। চীফ কমিশনার ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের এবং ডেপুটী চীফ কমিশনার অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজের কাজ করেন, এবং তাঁহাদের বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যায়। হাইকোর্ট বৎসরে একবার দুইজন বিচারপতিকে দিয়া সার্কিট কোর্ট (Circuit Court) গঠন করিয়া পোর্টব্লেয়ারে পাঠান। এই বৎসর এই কোর্টের সহিত আন্দামান যাইবার সুযোগ লাভ করি।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়, কিন্তু তথায় যাতায়াত করা সহজসাধ্য নহে। দুইটি জাহাজ এম. ভি. আন্দামান (M. V. Andaman) এবং এম. ভি. নিকোবর কলিকাতা, পোর্ট ব্লেয়ার, কার-নিকোবর এবং মাদ্রাজ যথাক্রমে যাতায়াত করে। 'আন্দামান' জাহাজটি বিশাখাপত্তমে ভারতীয়দের দ্বারা প্রস্তুত। দুইটি জাহাজই পেট্রোলে চলে এবং সে জন্য 'মোটর ভেস্‌ল্' (Motor Vessel) বলা হয়। জাহাজে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইলে চীফ কমিশনারের সেক্রেটারিকে লিখিতে হয়। ২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যা ছয়টায় খিদিরপুর ডক হইতে 'এম. ভি. আন্দামানে' আমরা যাত্রা করিলাম।

গঙ্গার উভয় পার্শ্বের দৃশ্য খুব সুন্দর, তবে বড় জাহাজকে গঙ্গার উপর দিয়া যাইবার সময় জোয়ারের উপর নির্ভর করিতে হয়। পলিমাটি পড়িয়া এইরূপ হইয়াছে যে, ভাটার সময়ে নোঙর ফেলিয়া পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয়। বঙ্গোপসাগরের পূর্বেই সাগরদ্বীপ পড়ে, সেখানে পৌষসংক্রান্তির সময় পুণ্যার্থীরা স্নান করিতে যান। সাগরদ্বীপের কিছু দক্ষিণে 'স্যাণ্ডহেড' (Sand Head) বলিয়া একটি জায়গায় পাইলট ভেস্‌ল্ (Pilot Vessel) অপেক্ষমাণ। খিদিরপুর হইতে স্যাণ্ডহেড পর্যন্ত প্রায় একশত মাইল জাহাজ পাইলট লইয়া যাইয়া মোটর লঞ্চে পাইলট ফিরিয়া যান, এবং স্যাণ্ডহেড হইতে পোর্ট ব্লেয়ারে জাহাজ ক্যাপ্টেন লইয়া যান।

'আন্দামান' জাহাজ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় খিদিরপুর ডক ছাড়িয়া গার্ডেন রীচে পৌঁছিয়া রাত্রি আট ঘটিকা অবধি রহিল, পরে আবার চলিতে আরম্ভ করে। ২৮শে এপ্রিল ভোর বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি জাহাজ নোঙর ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছোট ছোট

নৌকা করিয়া ডাব বিক্রি করিতে আসিয়াছে, প্রতিটির দাম পঁচিশ নয়া পয়সা। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, জাহাজটি উলুবেড়িয়া পর্যন্ত আসিয়াছে। সমস্ত রাত্রিতে এই সামান্য পথ আসায় মনে নৈরাশ্য আসিলেও মা ভাগীরথীর মৃদুমন্দ পবনে শরীর স্নিগ্ধ হইয়াছিল। সকালে আট ঘটিকার সময়ে চলিতে আরম্ভ করিয়া দুপুর প্রায় ১টার সময় পুনরায় জাহাজ নোঙর ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে আমাদের পাশ দিয়া এম. ভি. নিকোবর কলিকাতা অভিমুখে চলিয়া গেল। রাত্রি প্রায় আটটার সময়ে জাহাজ পুনরায় চলিতে আরম্ভ করে। রাত্রি প্রায় দুইটার সময়ে জাহাজের দোলানিতে ঘুম ভাঙিয়া যায়। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, জাহাজ স্যাণ্ডহেড-এ পৌঁছিয়া গিয়াছে, পাইলট নামিয়া গিয়াছেন এবং ক্যাপটেন জাহাজের ভার লইয়াছেন। তিন চারিটি জাহাজ দেখিলাম দাঁড়াইয়া আছে, পাইলট তাহাদিগকে কলিকাতা অভিমুখে লইয়া যাইবেন।

২৯শে এপ্রিল সকাল বেলায় অনেককে বমির জন্য কাতর দেখিলাম। জাহাজের ডাক্তার—ডাঃ ভাদুড়ী বমির প্রতিষেধক হিসাবে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে একটি করিয়া ট্যাবলেট (Avomine Tablet) দিতেছেন এবং সকলকে আশ্বাস দিতেছেন যে, বমির ভাব শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। দুপুর বেলা অবধি খুব দোলানি ছিল, পরে কমিয়া যায় এবং সকলেই ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠেন। ৩০শে এপ্রিল সমুদ্র একেবারে শান্ত, মনে হয় যেন পুকুর—পুকুরের মধ্য দিয়া জাহাজ চলিতেছে।

১লা মে সকাল বেলা হইতে ছোট বড় দ্বীপ দেখা গেল। তাহাদের পাশ দিয়া জাহাজ চলিতেছে। নারিকেল ও সুপারি গাছ দেখা যাইতেছে, কিন্তু কোন জনপ্রাণী দেখা যাইতেছে না।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে, উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ আন্দামান। পোর্ট ব্লেয়ার দক্ষিণ আন্দামানে। আন্দামানে পৌঁছিয়া শুনিলাম যে, উত্তর আন্দামানে 'ঝারোয়া' বলিয়া এক হিংস্র জাতি বাস করে। তাহারা গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকে এবং লোক দেখিলেই তীক্ষ্ণ লোহার শর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলে। তাহাদের লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ। কেহ কেহ সাহস করিয়া দূর হইতে ফল বা খাদ্যদ্রব্য দেখাইয়া আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা কাছে আসে নাই, বরং তীরের নাগালের মধ্যে পাইলে মারিয়া ফেলিয়াছে। নৃতত্ত্ববিদেরা (Anthropologists) ইহাদের সম্বন্ধে বোধ হয় কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ঝারোয়াদের লোকগণনার (Census) আওতায় আনা যায় নাই বলিয়া শুনিলাম।

আমাদের সঙ্গে কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবার যাত্রা করেন। খিদিরপুর ডকেই প্রতি পরিবারকে বড় পিতলের কলসী, বালতি, কোদাল, লাঙল প্রভৃতি দেওয়া হয়, নগদ টাকাও দেওয়া হয়। ১লা মে দশ ঘটিকার সময়ে মধ্য আন্দামানে পোর্ট এলফিনস্টোন-এ তাহাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইল। এখান হইতে তাহাদিগকে মায়া বন্দরে লইয়া যাইবার জন্য একটি ছোট জাহাজ আসিয়াছিল। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবার-গুলিকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস না ফেলিয়া কেহ থাকিতে পারিল না। দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার জন্য কি মূল্যই না এই মানুষগুলিকে দিতে হইল? আরও

মূল্য দিতে হইবে কিনা ভগবান জানেন। উদ্বাস্তু পরিবারের একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম যে, মায়া বন্দরে প্রতি পরিবার ত্রিশ বিঘা জমি, বাড়ী করিবার জন্য তিন শত টাকা এবং ছয় মাসের ভাতা সরকার হইতে পাইবে এবং কৃষিকর্মের জন্য বীজাদিও পাইবে। সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবারের ছোট জাহাজে উঠিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগিল।

পরে প্রায় তিন ঘটিকার সময় আমাদের যাত্রার পঞ্চম দিনে জাহাজ পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছিয়া চেথাম জেটীতে নোঙর ফেলিল। তথা হইতে মোটরযোগে বিচারপতিদ্বয় সহ আমরা সরকারী গেস্ট হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বিচারপতিদ্বয় সহ আমরা যতদিন ছিলাম, গেস্ট হাউসে আর কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হয় নাই। আমরা রবিবার ৭ই মে পুনরায় 'আন্দামান' জাহাজে উঠি কলিকাতা ফিরিবার জন্য।

পোর্ট ব্লেয়ার শহরটি খুব সুন্দর। পাহাড়ের মধ্য দিয়া উঁচু নীচু রাস্তা, অনেকটা দার্জিলিং শহরের মতো। চারিপাশে গাছপালা; তাহারই ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্র দেখা যাইতেছে। বাড়ীগুলি কাষ্ঠনির্মিত। পুরাতন ইষ্টকনির্মিত 'সেলুলার জেল'—যেখানে বীর সাভারকার, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমিককে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। ভগ্নপ্রায় সেলুলার জেলের সাতটি বাড়ীর মধ্যে তিনটিকে জাপানীরা বোমা ফেলিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল, সেই স্থানে যক্ষ্মারোগীদের জন্য একটি হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। বাকী চারিটি বাড়ীও শীঘ্রই ভাঙিয়া ফেলা হইবে শুনিলাম। বীর সাভারকার যে ঘরে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা দেখিলাম, সেখানে তাঁহার একটি ছবি আছে। তথায় এক রক্ষীর সহিত আলাপ হইল, তিনি জাপানীদের অধিকার-কালেও তথায় কাজ করিতেন এবং তাঁহারই কাছে জাপানীদের অত্যাচারের কথা শুনি এবং তিনিও জাপানীদের সন্দেহভাজন হইয়া তাহাদের হস্তে নিগৃহীত হন।

পোর্ট ব্লেয়ারে প্রথম দুইটি বৃষ্টিহীন দিন পাইয়াছিলাম। শেষের তিন দিন প্রবল বৃষ্টি হইয়াছিল, সাইক্লোনের কবলে ছিলাম, এই সাইক্লোনই পরে পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়াছে। সেজন্য বেশী বেড়ানো সম্ভব হয় নাই। শহরের মধ্যে একটি শিশু গাছপালার নার্সারির মতো আছে। নারিকেল গাছের চারা পাওয়া যায়। শহরে অনেক আমগাছ আছে; আম বেশ মিষ্ট। পেঁপে খুব বড় পাওয়া যায়, খাইতেও খুব মিষ্ট। সুমিষ্ট আনারসও পাইয়াছিলাম। সরকার নারিকেল কণ্ট্রোল করিয়াছেন।

পোর্ট ব্লেয়ারের সন্নিকটে রস দ্বীপ (Ross Island) উর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্র ছিল। জাপানীরা উহার উপরে বোমা ফেলে। দ্বীপটি এখন ক্রমশঃ সমুদ্রগর্ভে নামিয়া যাইতেছে এবং সেজন্য কেহ ওখানে থাকে না।

পোর্ট ব্লেয়ারে চেথাম জেটীর পাশেই Chatham Saw Mill, ইহা সরকার-পরিচালিত কাঠ কাটিবার একটি বিরাট কারখানা। শুনিলাম সমগ্র এশিয়াতে ইহা বৃহত্তম কারখানা। বিদ্যুতের সাহায্যে বিরাট বিরাট যন্ত্র চলিতেছে। শহর হইতে প্রায় ১৭ মাইল দূরে খুব বড় এক জঙ্গলে গিয়াছিলাম, সেখানে অনেক বড় বড় গাছ আছে। তাহাদের মধ্যে বৃহৎ গর্জন বৃক্ষও দেখিলাম। এই গাছে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া দিলে

তেল বাহির হইয়া থাকে, ইহাকে গর্জন তেল বলা হয়। বাল্যকালে শ্রীশ্রীদুর্গা-প্রতিমায় রং দেওয়া হইলে প্রতিমার উপর গর্জন-তেল লাগাইতে দেখিতাম, তাহাতে প্রতিমা যেন সজীব হইয়া উঠিতেন। জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় গাছের গোড়া কাটা হইয়া গেলে হাতীর সাহায্যে তাহা সংগ্রহ-স্থলে লইয়া যাইতে দেখিলাম। সেই স্থান হইতে মোটর গাড়ী করিয়া উহা করাত-কারখানায় নীত হয় এবং বিভিন্ন করাত-বসানো যন্ত্রের সাহায্যে বড় কাঠগুলি প্রথমে অর্ধেক এবং পরে যথাক্রমে পরিমাপ-মত টুকরা করা হয়। যন্ত্রের করাতগুলি এত ধারাল এবং জোরাল যে, মাখনের মধ্যে ছুরিকার মতো অতি সহজেই চলিয়া যায়। কাটা হইয়া গেলে কাঠ যন্ত্রের সাহায্যে গুদামে নীত হয়।

পোর্ট ব্লেয়ারের চতুর্দিকেই সমুদ্র। Corbyn's Cove নামে সমুদ্রতীরে স্নানের একটি জায়গা আছে। শহরের মধ্যে খোলা মাঠে এরোপ্লেন ওঠানামা করে। বর্তমানে বর্ষাকাল ব্যতীত সকালে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌স্ কর্পোরেশনের এরোপ্লেন কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন হইয়া পোর্ট ব্লেয়ারে যায় এবং শনিবার পোর্ট ব্লেয়ার হইতে রেঙ্গুন হইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসে। আমরা আন্দামানে থাকিতে এই যে আন্দামানের চীফ কমিশনার আন্দামানে আসিবার জন্য কলিকাতা হইতে প্লেনে রওনা হইয়াছিলেন, কিন্তু প্লেন রেঙ্গুন হইতে আন্দামান আসিতে পারে নাই সাইক্লোনের জন্য, পরে কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। বর্ষার প্রাবল্যে এরোপ্লেন চলাচল কিরূপ ব্যাহত হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। কার নিকোবরে (Car Nicobar-এ) ভাল বিমান-ঘাঁটি আছে।

কাঠের তৈরী জিনিস—যেমন থালা, লাঠি, টেবল-ল্যাম্প—করাত-কারখানা দ্বারা পরিচালিত কুটিরশিল্পের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। জিনিসগুলি সুন্দর এবং সস্তা।

মাউণ্ট হ্যারিয়েট (Mount Harriet) একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এককালে উচ্চ রাজকর্মচারীরা এখানে থাকিতেন। তথায় এক কয়েদী ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মেয়ো (Lord Mayo)-কে হত্যা করে। তাই ভূতের ভয়ে সেখানে এখন আর কেহ থাকে না শুনিলাম।

যাহা হউক আন্দামানে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ (Anthropologist) গবেষণা করিবার অনেক জিনিস পাইবেন। মাত্র পাঁচ দিন থাকিয়া আন্দামানে যাহা শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি, তাহা পাঠকসমাজে উপস্থিত করিলাম। আন্দামানে যাতায়াতের নিয়মিত ব্যবস্থা থাকিলে অনেক টুরিস্ট সেখানে যাইতে পারেন।

কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

বঙ্গোপসাগরে ৫০০ মাইল জুড়িয়া ২২৩টি দ্বীপের সমবেত নাম 'আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ'। ইহাদের প্রধান শহর ও বন্দর পোর্টব্লেয়ার কলিকাতা হইতে ৭৮০ মাইল, মাদ্রাজ হইতে ৭৪০ মা., রেঙ্গুন হইতে ৪৫০ মা. দূরে অবস্থিত।

	দ্বীপসংখ্যা	আয়তন	লোকসংখ্যা (১৯৫১ খৃঃ গণনা)
আন্দামান	২০৪	২,৫৮০ বর্গ মা.	৩৮,০০০ (তন্মধ্যে ৩০০০ উদ্বাস্তু পরিবার)
নিকোবর	১৯	৬৩৫ "	১২,০০০ (আদিম অধিবাসী)

স্মৃতি-কুসুমাঞ্জলি

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়

যখন মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ রক্তআমাশয়ে বহুদিন যাবৎ কষ্ট পাইতেছিলেন, সে সময় তিনি বলরাম-মন্দিরে থাকিতেন। আমি বৈকালে কলেজ হইতে বাড়ি ফিরিয়া নিত্য তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। প্রত্যহ দেখিতাম, তিনি সকলের সহিত বেশ হাসিমুখে আলাপ করিতেছেন; তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যহই আমার মনে হইত, আজ বোধহয় মহারাজ ভাল আছেন। সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতাম, "মহারাজ, আজ কেমন আছেন?" তিনি বলিতেন, "ভাল নাই, তুমি তো ডাক্তারি পড়িতেছ; রক্তআমাশয় রোগে কত যন্ত্রণা হয়, তাহা তো তুমি জান।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিতাম, "মহারাজ, আজ কতবার পায়খানা যাইতে হইয়াছে?" তিনি সেই হাসিমুখেই এবং অবিকৃত মুখমণ্ডলে উত্তর দিতেন, "সকাল হইতে তিরিশ চল্লিশ বার।" সে কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম; এই কঠিন রক্তআমাশয় পীড়ায় এতদিন ধরিয়া কষ্ট পাইলেও তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না যে, তিনি এত কষ্ট পাইতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণায় পূর্ববঙ্গে যাইয়া অবিশ্রান্তভাবে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিশ্রাম না লইয়া প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন, সেখান হইতে দারুণ অসুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া ঐ বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। তাঁহাকে কালাজ্বর আক্রমণ করিয়াছিল।

একদিন স্বপ্ন দেখিলাম, বাবুরাম মহারাজ তন্ময় হইয়া উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা তথায় দাঁড়াইয়া আছেন, এবং শ্রীশ্রীঠাকুর বাবুরাম মহারাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "গৌরাঙ্গের ভাব, গৌরাঙ্গের ভাব"।

অসুখের সময় বাবুরাম মহারাজের সেই অপূর্ব গৌরবর্ণ ম্লান হইয়া গিয়া একেবারে কালো হইয়া গিয়াছিল। একদিন তাঁহার নিকট যাইয়া দেখি যে, খলে মাড়িয়া একটি কবিরাজী ঔষধ সেবন করিতেছেন এবং কিছুমাত্র মুখ বিকৃত না করিয়া হাসিমুখে আমায় বলিতেছেন, "ঔষধটি ঠিক যেন বিষ্ঠার গন্ধ; কি করিব, কবিরাজ বলিয়াছেন, অতএব সেবন করিতেই হইবে।" দুর্গন্ধযুক্ত ঔষধ ঐরূপ অবিকৃত হাসিমুখে সেবন করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম, এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের মতো এইরূপ ভাব আর কোথাও দেখি নাই। এই অবিশ্বাসের যুগে যে-সব কীর্তি ও লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন, সে সবই অপূর্ব; যত দিন যাইবে ততই আমরা অবাক্ এবং আশ্চর্যান্বিত হইব।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে দ্বিতলের ঠাকুর-ঘরের পূর্বে অবস্থিত পূঃ শরৎ মহারাজের ঘরে পূঃ হরি মহারাজকে (স্বামী তুরীয়ানন্দ) খুব অসুস্থ অবস্থায় কিছুদিন যাবৎ রাখা

হইয়াছিল। বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া শরীরের যেখানে সেখানে বিশেষ করিয়া সংযোগস্থলগুলি পাকিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম এরূপ ঘটে যখন তিনি পুরীধামে। সেখানে তখন কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক (Dr. S. B. Mitra) পুরীতে গিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনের পাস করা ডাক্তার ছিলেন, এবং এখন যেখানে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটী, সেইখানে তাঁহার দ্বিতল বাটী ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া M.B. পরীক্ষায় Zoology-র পরীক্ষক হইয়াছিলেন। এবং সে সময় তাঁহার হাতে ছয়-সাতটি ছাত্রের বেশী কখনও উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সেই কঠোরহৃদয় ব্যক্তি হরি মহারাজের প্রথম অস্ত্রোপচার (operation) করিয়াছিলেন। পূঃ মহারাজ ক্লোরোফর্ম (chloroform) না লইয়া, বিন্দুমাত্র অস্থির না হইয়া, অবিকৃত মুখে অপারেশান করাইয়াছিলেন দেখিয়া ডাক্তার মিত্র অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতে তাঁহার ভাবের আমূল পরিবর্তন হইয়াছিল, এবং তাহার পর হইতে হরি মহারাজের নিকট হইতে ফী বাবদ আর কিছু লন নাই। হরি মহারাজ কলিকাতায় আসিলে তিনি ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে ট্যাক্সি করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে মহারাজকে দেখিতে আসিলেন, ভাড়া দিতে গেলে বলিয়াছিলেন, "আমাকে ট্যাক্সিভাড়া দিলে আমার এখানে আসা বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ আমার এত বয়স হইয়াছে, এ রকম মানুষ এই প্রথম দেখিলাম, কাজেই তাঁহার কিঞ্চিৎ সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করি।"

একখানি উঁচু খাটের উপর তিনি সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়া শুইয়া থাকিতেন। সমস্ত জয়েন্ট-গুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মুখের উপর একটি মাছি বসিলে হাত নাড়িয়া সেটিকে তাড়াইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সেই অবস্থায় আমি তাঁহাকে যখনই দেখিয়াছি, তখনই তাঁহার মুখ-মণ্ডল দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে, তিনি ভাল আছেন। জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন, অসহ্য যন্ত্রণা রহিয়াছে।

বলরাম-মন্দিরে নীচের ঘরে (বাটীতে প্রবেশ করিয়াই রাস্তার ধারের ডানদিকের ঘরটিতে) থাকা কালে তাঁহার পায়ের একটি জয়েণ্ট পাকিয়া পুঁজ হইলে পর ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য (তখনকার দিনের প্রখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক) মহাশয় আমার উপস্থিতিতে তাঁহার অপারেশান করিয়াছিলেন। একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া ক্লোরোফর্ম না করিয়া অস্ত্রোপচার করাইলেন। ডাক্তার ভট্টাচার্য ছুরি দিয়া ফালা করিয়া আঙুল দিয়া ভিতরটা ঘাঁটিয়া পুঁজরক্ত বাহির করিয়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। হরি মহারাজ বিন্দুমাত্র মুখ বিকৃত করেন নাই, কিংবা কোন কষ্টসূচক শব্দ করেন নাই। ডাক্তার সুরেশবাবু তাঁহার এই বিস্ময়কর অপার সহ্যগুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এমন কি কাশী সেবাশ্রমের নিকট একখানি বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি প্রায়ই হরি মহারাজকে দেখিতে যাইতে পারেন এবং যথাসম্ভব তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পান। সেই কাশীতেই একটি পিঠজোড়া প্রকাণ্ড দুষ্টব্রণ (Carbuncle) সজ্ঞানে তিনি বসিয়া কাটাইয়াছিলেন, আমি শুনিয়াছিলাম।

প্রথম প্রথম মঠে (বেলুড়) খুব ঘন ঘন যাইতাম। পূঃ মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ এবং বাবুরাম মহারাজের প্রতি আমার বেশি আকর্ষণ থাকায় সর্বাগ্রে তাঁহাদিগকেই প্রণাম করিতে যাইতাম (অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম

করিবার পর)। প্রত্যেকেই আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন যে, রাজা-মহারাজকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম কি না। আমি 'না' বলিলে প্রত্যেকেই আমাকে আগে পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম করিয়া আসিতে বলিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতি আমার আকর্ষণ কম ছিল, তাঁহারা সকলেই বুঝিতে পারিতেন। এখন মনে হয়—সেইজন্যই আমার এই অপূর্ণতা দূর করিয়া আমার কল্যাণার্থে তাঁহারা ঐরূপ আদেশ করিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজের একটি পিতলের গড়গড়া ছিল। সেবকরা সেটিকে নিত্য ধুইয়া মাজিয়া রাখিতেন, এবং দেখিলে মনে হইত যে, সোনার গড়গড়া। তাঁহার নিকট যাইয়া দেখিতাম, সেই গড়গড়াতে তিনি তামাক সেবন করিতেছেন কিংবা কাহারও সহিত ফষ্টি-নাষ্টি করিতেছেন। কেহবা তাঁহার গা-হাত-পা টিপিয়া দিতেছেন। এই সব দেখিয়া প্রথম-প্রথম ভয়ভক্তিবশতঃ কোন প্রকারে তাঁহাকে একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতাম।

একবার পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ অসুস্থ হইয়া সারগাছি হইতে আসিয়া চিকিৎসার জন্য বলরাম মন্দিরে রহিয়াছেন। অসুস্থ শরীরে দিনে পাছে না ঘুমাইয়া পড়েন, তাই তাঁহাকে লইয়া তাসখেলা হইত। পূজ্যপাদ মহারাজেরই বেশি উৎসাহ। খেলায় গোল-মাল হইত। মহারাজ তাস বলিয়া দিতেন, হারিয়া গেলে ঠাট্টা করিতেন। আমার এসব ভাল লাগিত না।

একে তো পূর্ব হইতে আকর্ষণ ছিল না, তাহার উপর প্রত্যহ ওরূপ ছেলেমানুষের মতো খেলা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকর্ষণ আরও কমিয়া গিয়াছিল।

একদিন যখন মনে এরূপ ভাব উঠিয়াছে যে, আর এরূপ খেলিতে আসিব না, তখন মহামহিমান্বিত অপার দয়ার সিন্ধু অন্তর্যামী মহারাজ আমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তৎক্ষণাৎ আমার দিকে ফিরিয়া, আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ শ্যামাপদ, এক ব্রহ্ম সত্য, এবং এ জগৎ মিথ্যা'। এ সকল কথা সদ্‌গ্রন্থে অনেকবার পাঠ করিয়াছি এবং বহুবার লোকমুখেও শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ঐ সকল বাণী যেন মনে অমৃত ঢালিয়া দিতে লাগিল। সাপুড়ে যেমন মন্ত্রের দ্বারা সাপকে অভিভূত করিয়া নিশ্চল করিয়া দেয়, মহারাজ আমার মনোভাব সেইরূপ একেবারে বদলাইয়া দিয়া আমাকে একেবারে বিশ্বাসী এবং ভক্তিমান্ করিয়া দিলেন; সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ জন্মিল। সেইদিন হইতে মহারাজকে দিনান্তে একবারও না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না, এবং অপর সকল (ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ) সাধুবৃন্দের প্রতি যতটা আকর্ষণ ছিল, সবগুলি একত্র করিয়া তাঁহার প্রতি আকর্ষণটি অনেক প্রবল বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম, এবং সেইদিন হইতে মনে হইত, মহারাজ যেন তাঁহার বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সংঘ ও সাঙ্গোপাঙ্গদের তাঁহার সেই পক্ষদ্বয়ের নীচে আশ্রয় দিয়া সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাহার পর হইতে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই মহারাজকে ক্রমশঃ আরও বড় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

স্বামীজীর 'ভাববার কথা'

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনাবলীর সময়সীমা স্বল্পপরিসর। প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে 'উদ্বোধন'-পত্রিকা প্রকাশ-উপলক্ষেই তাঁর বাংলা লেখার সূত্রপাত। তার আগে তিনি যে-সব চিঠি লিখেছেন, সেগুলির সাহিত্যমূল্য অনেক ক্ষেত্রেই অসাধারণ; তবু ওরা ঠিক সচেতন সাহিত্যসৃষ্টি নয়। উদ্বোধনে প্রকাশিত 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'ভাববার কথা'র প্রবন্ধাবলী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বামীজীর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের রূপায়ণ।

'ভাববার কথা'-র প্রবন্ধসমষ্টি বাংলাপ্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'শিবের ভূত' এবং 'ঈশা-অনুসরণ' নামে অসমাপ্ত রচনা-দুটি এবং 'পারি-প্রদর্শনী'র বিবরণী বাদ দিলে অবশিষ্ট প্রত্যেকটি প্রবন্ধ গভীর চিন্তাশক্তি, মৌলিক দৃষ্টি, এবং নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর গুণে যথার্থ সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে।

ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধ

'বাংলা ভাষা' নামে স্বামীজীর যে বহুখ্যাত রচনাটি বাংলা গদ্য সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার নির্দেশকরূপে স্বীকৃত, সেটি মূলতঃ উদ্বোধন-সম্পাদককে লেখা চিঠি। সাহিত্যে জ্ঞানের বিষয় বা ভাবের বিষয়—দুয়েরই প্রকাশক ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান রচনা ক'রে কৃত্রিম হয়ে পড়ে। স্বামীজীর মতে—"আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক—কল্পিতমাত্র, তাতে ছাড়া কি পাণ্ডিত্য হয় না?"

উপরের এই উদ্ধৃতিটিতে বাংলা গদ্যে সংস্কৃতরীতির গুরুভার আমদানির বিপক্ষেই রায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলা গদ্যের সমুন্নতি যে সংস্কৃতশব্দৈশ্বর্যের দ্বারাই সম্ভব, তার প্রমাণ 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বা 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধ-দুটিতে মেলে। স্বামীজী নিজেও সব সময় চলতি ভাষায় লেখেননি। 'বর্তমান ভারত' পুস্তিকাটি আদ্যন্ত সংস্কৃতপ্রধান সাধু গদ্যে রচিত। সুতরাং বিষয়বস্তুর গভীরতার সঙ্গে ভাষার গাম্ভীর্য আপনিই দেখা দেয়—এমন সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তও সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ" অবধি জগতের মহত্তম চিন্তানায়কদের যে উদাহরণ স্বামীজী দিয়েছেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের মুখের কথার মধ্য দিয়েই উচ্চতম চিন্তা ও ভাবনার প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজী তো স্পষ্টই লিখেছেন—"আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।···যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির ক্ষয় হয়,

ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।"

সত্যের প্রকাশ যেমন সরলতায়, সাহিত্যের বিকাশও তেমনি প্রাঞ্জলতায়। "ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"—বাংলা গদ্যের আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে ঐ উদ্ধৃতির মধ্যেই স্বামীজী নবযুগের বাংলা ভাষার আদর্শ স্থাপন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের গদ্য-রীতির সাধু ও চলতি—দুই রূপেই তাঁর ব্যক্তিত্বের ওজস্বিতা দীপ্যমান। চলতি ভাষায় তিনি প্রাণময় বৈদ্যুতিকগতিসম্পন্ন; সাধু ভাষায় সংহত শাঙ্কর ভাষ্যের গভীর গম্ভীরতায় সমাসীন। বিবেকানন্দের গদ্যরীতির দ্বৈতরূপে তাঁর ব্যক্তিসত্তারই দ্বৈতপ্রকাশ। ওয়াল্টার পেটারের 'Style is the man' কথাটি এক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য।

তবু বলতে হয়, স্বামীজীর নিজস্ব পক্ষপাত ছিল চলতি ভাষার প্রতি। তাঁর সমকালীন সাহিত্য থেকেই বোধ করি আসন্ন পরিবর্তনের আভাস তিনি পেয়েছিলেন। তাই লিখেছেন— "এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন —সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনাআপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।"

ক্রান্তদর্শী সাহিত্যমনীষার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আধুনিক বাংলা গদ্যরীতিতে। এই পত্রাংশটি উদ্বোধনে ছাপা হবার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলা গদ্যে সাধুভাষার স্থান নিয়েছে চলতি ভাষা। কিন্তু স্বামীজীর গদ্যে যে প্রাণস্পন্দন মেলে, আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনায় তার একান্ত অভাব। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক চলতি গদ্য অনাধুনিক সাধু গদ্যের চেয়ে কৃত্রিম শোনায়। স্বামীজী বলেছিলেন— "ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে।" সাহিত্যে ভাবের ক্ষেত্রে দৈন্য দেখা দিলে কেবল ভাষার আধুনিকতায় তাকে সজীব ক'রে তোলা যায় না।

ব্যঙ্গাত্মক রচনা : লোকাচার-বিষয়ক

'ভাববার কথা' নাম দিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট উদাহরণের মালায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার আকাশোপম বিস্তার এবং তারই তলায় লোকাচারের যুক্তিহীন শৃঙ্খলপাশের দৈন্য—এই পরস্পরবিরোধী মনোভাবের দরুন সমাজে ও ব্যক্তিচরিত্রে কতদূর অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, তার কয়েকটি উদাহরণ গল্পের মতো ক'রে উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে সুচতুর হাস্যপরিহাস-নিপুণ বিবেকানন্দের সার্থক পরিচায়ক এই গল্পসমষ্টি :

"বলি রামচরণ। তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমাদ্বারা সম্ভব নহে, তার ওপর নেশা-ভাঙ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়তে পার না, কি ক'রে জীবিকা কর বল দেখি ?" রামচরণ— "সে সোজা কথা, মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।" কী শান্ত সংযত অথচ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ।

লক্ষ্ণৌ শহরে নবাগত দু-জন রাজপুত মহরমের জাঁকজমক দেখে মসজিদে ঢুকতে চাইলে দেউড়ির সিপাই তাদের নিষেধ করলে। "কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই

যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মারো, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এলো—ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাঁসেন হোঁসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ-মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কি কর্মের বিচিত্র গতি! উল্টো সমঝলি রাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ-মূর্তির পদতলে কুমড়ো-গড়াগড়ি আর গদ্‌গদস্বরে স্তুতি—'ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভল্ বাবা অজিদ্‌, দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্ মারো শারোকো কি অভিতক রোবত।'—(ধন্য বাবা ইয়েজিদ, এমনি মেরেচো শালাদের কি আজও কাঁদছে !!)"

এই গল্পটির পরেই স্বামীজী প্রচলিত হিন্দুয়ানির ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন যে, আমাদের বেশীর ভাগ ধর্মভাবই লোকাচারের দ্বারদেবতা অবধি এসেই ঠেকে যায়, অন্তর্যামী ভগবান অবধি পৌঁছয় না।

'ভাববার কথা' গল্পসমষ্টিতে 'কড়ামাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে' ভগবানের মন ভিজানোর চেষ্টারত ভক্তটি, 'বেজায় বেদান্তী' ভোলাপুরী, অথবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-পারঙ্গম গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর ধর্মধ্বজীদের স্বরূপ-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার আদর্শটি ফুটিয়ে তোলাই স্বামীজীর লক্ষ্য। তাই তাঁর হাস্যরসে বিদ্রূপ থাকলেও বিদ্বেষ নেই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের সমাজ-সমালোচনার সঙ্গে এইখানে স্বামীজীর মিল লক্ষণীয়। স্বামীজীর চিন্তাধারায় বেদান্ত ও মানবপ্রেমের অনায়াস-মিলনের মতো তাঁর রচনায়ও গুরুগম্ভীর বক্তব্যের সঙ্গে সহজ রসবোধের মিলন ঘটেছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : সংঘাত ও সামঞ্জস্য

হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বর্তমান সমস্যা, জ্ঞানার্জন, রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি—প্রবন্ধ-চতুষ্টয় সাধুভাষায় লেখা। 'বর্তমান সমস্যা' উদ্বোধন-পত্রিকার প্রস্তাবনা; প্রবন্ধটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সংঘাত উনিশ শতকের চিন্তাজগতে দেখা দিয়েছিল স্বামীজী তার সামঞ্জস্যের উপায় চিন্তা করেছেন। তথা-কথিত 'ইতিহাস' হয়তো ভারতবাসীর ছিল না। কিন্তু সে ইতিহাস তো "রাজা-রাজড়ার কথা।" ভারতবাসীর অন্তরের চিন্তা ও চেষ্টার কথা সাধারণ ইতিহাসের চেয়ে অনেক ভাল-ভাবে লেখা রয়েছে—"ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী"তে। তাই—"প্রকৃতির সহিত যুগ-যুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।"

একদিকে এই ভারতীয় সভ্যতা—আর অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা, যার জন্মভূমি গ্রীস। "মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে।"

এমন কি এ যুগের উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বা ভারতবাসী সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। "প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আমরা আধুনিক বাঙালী—আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ

যবন গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।"

এই গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার একবার মিলন হয়—আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের কালে। স্বামীজীর মতে—"...আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

আধুনিক ইউরোপবাসী প্রাচীন গ্রীসের যোগ্য উত্তরাধিকারী—আধুনিক ভারতবাসীর মধ্যে প্রাচীন ভারতের মহিমার অতি সামান্যই অবশিষ্ট। তাই ভারতবাসীকে ইউরোপীয় সভ্যতার কয়েকটি উপাদান অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে—"চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

অবশ্য ভারতবাসীর আদর্শ—পারমার্থিক মুক্তি। কিন্তু ক-জন এ সংসারে যথার্থ মুক্তির অভিলাষী? "সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। —আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নর-নারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে? এ পেষণেরই বা কি ফল? দেখিতেছ না যে সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল।" বিবেকানন্দের দৃষ্টি যে কী পরিমাণে অন্তর্ভেদী ছিল, ভারতীয় মানসের এই বিশ্লেষণই তার প্রমাণ।

ভারতবাসীর পক্ষে তাই স্বামীজীর নির্দেশ—"রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?" সেই সঙ্গে প্রতীচ্য সভ্যতার উদ্দেশে তাঁর বাণী—"ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ।"

রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অবধি উনিশ শতকের মননভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার যে দ্বন্দ্ব চলেছিল, স্বামীজীর চিন্তাধারার আলোকে এইভাবে তাদের সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে।

'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধটি আকৃতিতে ছোট হলেও ছোট্ট মুক্তার মতোই মননের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। প্রত্যক্ষবাদী আধুনিক ও অপ্রত্যক্ষে বিশ্বাসী প্রাচীন চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা স্বামীজী জ্ঞানার্জনের পন্থা নির্দেশ করেছেন; বেদান্তের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান থেকে পারমার্থিক জ্ঞান অবধি সব স্তরের জ্ঞানই মূলতঃ এক—"...কেবল উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ...।" প্রাচীনপন্থীরা অনেক সময় এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে, সব জ্ঞানই তাঁদের পূর্বপুরুষদের আয়ত্ত ছিল। কিন্তু "পরবর্তীদের নিকট এই লুপ্ত জ্ঞান থাকা না থাকা সমান; নূতন উদ্যোগ করিয়া পুনর্বার পরিশ্রম করিয়া তাহা আবার শিখিতে হইবে।" সুতরাং জ্ঞানার্জনের জন্য বিশেষ সাধনা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বিদ্যা বিশেষ এক শ্রেণীর আয়ত্তাধীন ছিল—তাই সর্বসাধারণ সেই বিদ্যা থেকে বঞ্চিত থেকেছে। এই শ্রেণীগত সুবিধাবাদের দিন গতপ্রায়। সর্বশ্রেণীর

লোকই এখন বিদ্যাচর্চার অধিকারী হয়ে উচ্চবর্ণের সমান কৃতিত্বের অধিকারী। সুতরাং জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে "পিতৃপিতামহাগত গুণের পক্ষপাতিতা" আজকাল অচল। জ্ঞানার্জনের দুটি পথ—এক পূর্বপুরুষ বা গুরুপরম্পরা ধরে জ্ঞানের প্রসার আর এক পূর্বনির্দিষ্ট কোন পন্থার উপর নির্ভর না ক'রে নব নব পথে অভিযান। প্রথম উপায়ে জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি হলেও নিজস্ব বুদ্ধি বা চিন্তার স্বাধীনতা কমে যায়। তার ফলে—"···প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া ভক্তেরা মহাজনদিগের অভিপ্রায় তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান করেন এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ পূর্বপুরুষদিগের ঐশ্বর্যস্মরণেই কালাতিপাত করে···।" অন্য দিকে আধুনিক বিদ্যাও গুরু-নির্দেশ ছাড়া চলতে পারে না। তা যদি হ'ত, তবে প্রাচীন সভ্যতা কেবল জুলু, কাফ্রী প্রভৃতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

আসল কথা এই যে, সব রকম জ্ঞানের জন্যই সাধনা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য দরকার চিত্তশুদ্ধির কঠোর তপস্যা, জাগতিক জ্ঞানের জন্য নিয়ত চর্চা, নূতন অনুসন্ধান। বাইরে থেকে যা অলৌকিক ব'লে মনে হয়, তার পিছনে ওই নিরন্তর কঠিন সাধনার ইতিহাস। তাই স্বামীজীর মন্তব্য—"অলৌকিকত্ব-রূপ যে অদ্ভুত বিকাশ, চিরোপার্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাহার কারণ; লৌকিক ও অলৌকিক কেবল প্রকাশের তারতম্য।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবন্ধ

'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি'—প্রবন্ধ-দুটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের তাৎপর্য ও বর্তমান যুগের চিন্তাধারায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দান সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র ধর্মচেতনাকে উনিশ শতকের প্রথম যুগে বিদেশীরা অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, স্বদেশী পণ্ডিতেরা লোকাচার ও সংস্কারের বেড়ি পরিয়ে তৃপ্ত ছিলেন। হিন্দুধর্মের এই বহুশাখায়িত রূপ দেখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের শাখাটিকেই বড় ক'রে তোলার চেষ্টায় ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক প্রচার-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে হিন্দু-সাধনার মূল সত্য বেদান্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মদের সাধনায় পাশ্চাত্য খ্রীষ্টধর্মীয় রীতি-নীতি এত বেশী পরিমাণে দেখা দিতে শুরু করেছিল, যার ফলে মনে হয় পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে আমাদের ধর্মসাধনাকে শ্রদ্ধেয় ক'রে তোলার চেষ্টাই তাদের মধ্যে বেশী ছিল। পাশ্চাত্য-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মকে বুঝবার চেষ্টা রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'[১] বক্তৃতাটিতে কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু এ বক্তৃতাটি অনেকটা পাশ্চাত্যধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত। শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বক্তৃতা নয়, জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যেই ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার অনুভূতিলব্ধ সত্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার কলরোল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্পর্শমাত্র করেনি।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের কারণ—"·· আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সততবিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগযুগান্তর-

১ লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য: 'উদ্বোধন' ৬৩তম বর্ষ চৈত্রসংখ্যা, পৃষ্ঠা, ১৪১।

ব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।”

ভারতের অধ্যাত্ম ঐতিহ্যে আস্থাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই উপলব্ধি করবেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের নব-জাগরণের নিশ্চিত সূচনা।

উনিশ শতকের বেদচর্চার কেন্দ্র ভারতবর্ষ নয়—ইংলণ্ড ও জার্মানি। ম্যাক্সমূলার এই বেদোদ্ধার-আন্দোলনের প্রথম নায়ক। ম্যাক্সমূলার জানতেন, “অদ্বৈতবাদ ধর্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া”। ভারতবর্ষের ধর্ম বলতে সেকালের (এবং অনেকাংশে একালেরও) ইউরোপীয় সমাজ মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক যাদুবিদ্যাই মনে করতেন। এই মনোভাবের প্রতিবাদে ভারতবর্ষের যথার্থ ধর্ম ও আদর্শ ধার্মিকদের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে ম্যাক্সমূলার ‘প্রকৃত মহাত্মা’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে এই প্রবন্ধটিই বর্ধিতাকারে ‘The Life and sayings of Ramakrishna’ (রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী) নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের The Face of Silence এবং রোমাঁ রোলাঁর ‘শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী’ প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপ-আমেরিকার চিন্তাজগতে রামকৃষ্ণ-দেবের ভাবধারা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর মধ্যে এমন একটি বিশ্বমানবিক আবেদন রয়েছে, যার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় চিন্তাজগতেই তিনি সমাদৃত ও স্বীকৃত। ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধটি নিয়ে তদানীন্তন ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মিশনরীরা তীব্র বাদানুবাদ আরম্ভ করেন। স্বামীজী জানতেন: সত্যমেব জয়তে। কিন্তু যাঁরা রামকৃষ্ণ-আদর্শে বিশ্বাসী তাঁদের সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী: “মুখে—বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি, বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে? সকল হৃদ্গত ভাবই ফলানুমেয়; কার্যে পরিণত কর—জগৎ দেখুক।”

অনির্বাণ

শ্রীমতী বিভা সরকার

হে মরমী! তুমি জ্বেলে দিলে শিখা
চিত্তে মোর সদা জ্যোতিষ্মান্
সে অগ্নিশিখায় দহি, ক্ষয়হীন
লয়হীন আমি অনির্বাণ!

অনাহুত পথপাশে কি জানি কিসের আশে—
ছিল জাগি ভীরু দীপখানি;
তুমি আপনার ক’রে নিলে তুলে স্নেহ ভরে
হে সুন্দর! তাই ধন্য মানি।

অক্ষয় করিলে মোরে মঙ্গল পরশে
পূর্ণকাম উতরিনু অমৃতের পার;
আমার জীবন-নায় সাজিলে কাণ্ডারী,
নির্ভয়, আসিলে যদি ভয় কি আবার!

তুচ্ছ সে মহৎ হ’ল, হ’ল মহীয়ান্;
বিন্দু সে মিলায়ে গেল অসীম সিন্ধুতে।
অতলান্ত সে আমার শুনি জয়ধ্বনি,
অনন্ত উঠিল জাগি একটি বিন্দুতে!

রবীন্দ্রজীবনে পদ্মা

শ্রীমতী নলিনী ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির সবুজ শ্যামল মাঠ, নদীর কুলুকুলু ধ্বনি তাঁকে যেন অহরহ ডাক দিত। কর্মময় জীবনের অবসরের ফাঁকে ফাঁকে যখনই তিনি সুযোগ পেয়েছেন, তখনই প্রকৃতির স্নেহশীতল কোলে ধরা দিয়েছেন। শিশুকাল থেকেই জলের সঙ্গে কবির যেন একটা আন্তরিক টান ছিল। ভৃত্যরাজতন্ত্রে তাঁর জীবন যখন বন্দী-দশায় কেটেছে, তখন দেখা যায় জোড়া-সাঁকোর ঘরে জানলার ধারে তিনি পুকুরের দিকে মুখ ক'রে বসে আছেন। অবশ্য শুধু পুকুরের জলই তাঁর লক্ষণীয় বিষয় ছিল না; সেই ঘাট, পুকুর, লোকজন, গাছপালা সবই বালক কবিকে কোন্ এক অজানা রাজ্যে নিয়ে যেত। নদীর সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ সখ্য ছিল। একবার এক চিঠিতে কবি লিখেছেন: "অনেকদিন পরে জলের ধারা ও সবুজ মাঠের সংস্রব পেয়ে আমি যেন নিজের সত্যকে ফিরে পেয়েছি।"

কবির জীবনে ও কাব্যে নদীর প্রতি প্রীতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে তিনি পদ্মাকে দেখেছিলেন অত্যন্ত নিবিড় গভীর অন্তরঙ্গরূপে।

সাধারণের কাছে পদ্মা ভয়ঙ্করী, ভীষণা রাক্ষসী, তার মতিগতির স্থিরতা নেই, ধ্বংস-লীলার প্রলয়-নাচনেই তার গভীর আনন্দ। দয়া নেই, মায়া নেই, কোন বিচার নেই; যাকে সে আশে-পাশে পায়, তাকেই সমূলে বিনাশ ক'রে সে আনন্দ পায়। কোথাও এতটুকু বাধা নেই, সঙ্কোচ নেই, এক ফোঁটা ভয় নেই। প্রলয়-নাচন নাচতে নাচতে সে সদর্পে এগিয়ে চলে। কেউ কাছে যেতে ভরসা পায় না। নাম শুনলে প্রাণে চমক লাগে। কি বেশে যে সে মানুষকে অভ্যর্থনা করবে, তা কেউ জানে না। যারা কাছাকাছি থাকে, তারা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। যাকে কাছাকাছি আসতে হয়, সেও ভয়ে ভয়ে আসে।

কিন্তু কবি সৌন্দর্যের পূজারী। তাঁর দৃষ্টি সূক্ষ্ম। সাধারণ মানুষ যেখানে ভীষণ, ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে, কবি তার মধ্যেও সুন্দরের সন্ধান পান। রুদ্ররূপের মধ্যেও অভিনব সৌন্দর্যের সন্ধান তিনি আবিষ্কার করেন। তাই পদ্মার সেই ভয়ঙ্করী মূর্তির মধ্যেই কবি দেখতে পেলেন প্রেমের স্পর্শ, সৌন্দর্যের সুষমা। শিলাইদহে যখনই তিনি কাজের ডাকে গেছেন, তখনই তিনি ঠাঁই নিয়েছেন ভীষণার বুকে। এই পদ্মার তীরেই তাঁর 'সুদীর্ঘকাল পড়ে থাকার ইচ্ছা' প্রবল ছিল; কিন্তু বাইরের জগতের হিসাব-নিকাশও মেটাতে হবে, তাই তাঁকে কেবলই বঞ্চিত হ'তে হয়েছে পদ্মার সান্নিধ্য থেকে।

কবি-জীবনের 'সোনার তরী'-পর্বে পদ্মার প্রভাব সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। 'চৈতালী' কাব্যেও পদ্মার প্রভাব পড়েছে। শুধু মাত্র পদ্মা নয়, বাংলা দেশের নদ-নদী তাঁর কাব্য-জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। বাংলাদেশের অপরাপর নদীর চেয়ে পদ্মা একটু পৃথক্ ধরনের, সে একটু খাপছাড়া। অত্যন্ত খামখেয়ালী তার মেজাজ, নিজের

খুশীমত সে ছুটে চলে। এই ছুটে চলা, এই গতিবেগ রবীন্দ্রকাব্যের মূল লক্ষণ। পদ্মার কাছ থেকেই যেন কবি অন্তরে এই গতিবেগ লাভ করেছিলেন।

'সোনার তরী' রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ পরিণতরূপ, এই কাব্যের বেশীর ভাগ কবিতা রচিত হয়েছিল কবির পদ্মাবাস-কালে। কাব্য-জীবনের চরম পরিণতি লাভই কবির পদ্মা-বাসের একমাত্র লাভ নয়; পদ্মার ভেতর দিয়েই কবি দেখতে পেয়েছেন, অন্তরে উপলব্ধি করেছেন বাংলার প্রকৃত সৌন্দর্য।

'ছিন্ন পত্রের' পত্রগুলির মধ্যেও অনেক জায়গায় কবি পদ্মার নানা রূপ, নানা ভাব প্রকাশ করেছেন।

কবি ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভেসে চলেছেন, আর এই চলার গতিবেগ অন্তরে অনুভব ক'রে কাব্যে তাকে প্রকাশ করেছেন। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে কবি এই গতিধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন: "আমি জীবনের কতকাল যে এই নদীর বাণী থেকে বাণী পেয়েছি, মনে হয়, সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না।" শুধুমাত্র তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বা কাব্যেই গতিবেগকে অনুভব বা স্বীকার করেননি। তিনি সর্বত্রই গতির ধর্মকে লক্ষ্য করেছিলেন। কবি তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমের বালক পড়ুয়ার মধ্যে গতিধারাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর একটি পত্রে পাওয়া যায়: "তুমি মনে কোরো না, এখানে কোন স্রোত নেই, এখানে অনেকগুলি জীবনের ধারা মিলে একটি সৃষ্টির স্রোত চলছে, তার ঢেউ প্রতি মুহূর্তে উঠছে, তার বাণীর অন্ত নেই। এই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হচ্ছে, আপনার পথ সে কাটছে, দুই তটকে গড়ে তুলছে। সে কোন্ এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে চলেছে, দূর থেকে আমরা তার আভাস পাই মাত্র।"

পদ্মা যে কেবল কবির জীবনে একটি গতিবেগের সঞ্চার করেছে, তা নয়। পদ্মা কবির একান্ত আপনার। তার সঙ্গে তাঁর জীবনের একটি নিবিড়, গভীর প্রীতির সম্বন্ধ। কত সময় চলেছে দুজনের মধ্যে কত মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের কান্না-হাসি। কর্মের তাড়নায় যখন তিনি পদ্মাকে ছেড়ে চলে গেছেন, মনে হয়েছে পদ্মা যেন অভিমান ক'রে তার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। প্রীতির গভীরতা না থাকলে এমনটি হয় না। কবি আবার ফিরে এসেছেন—পদ্মা যেন ইচ্ছে ক'রে তাঁকে চিনতে পারছে না। কবি দূর থেকে পদ্মাকে দেখে বলেন: "সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপসা বাষ্প-লেখাটির মতো দেখতে পাচ্ছি, জানি এ আমার সেই পদ্মা।"

রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীর উপর একটি বিশেষ টান ছিল, পৃথিবীকে পরিত্যাগ ক'রে তিনি স্বর্গ কামনা করেননি; এই 'সুন্দর ভুবনে' তিনি চিরদিন থাকতে চেয়েছেন। বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের সরল অনাড়ম্বর, সহজভাব তাঁকে গভীর ডাকে আকৃষ্ট করেছে। বাংলার প্রকৃতির মধ্যে তিনি বিশেষ ধরনের বৈরাগ্যের সুর শুনতে পেয়েছেন। এই ভাবগুলিই তাঁর সমস্ত কাব্যের মূল উপাদান বলা যেতে পারে। এইগুলি কবি লাভ করেছিলেন পদ্মার কাছ থেকেই।

পদ্মাকে কবি প্রেমের চোখে দেখেছেন। কত কথা দুজনে যে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আবার এ সম্বন্ধ যেন শুধু এ জন্মেরই নয়, বহু যুগ ধরে যেন তিনি তাঁর সঙ্গে যুক্ত—

"হে পদ্মা, তোমায় আমায় দেখা শত শত বার............"। পদ্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ তিনি কল্পনা করতে ব্যথা পান, কিন্তু কালের কঠোর শাসনে হয়তো একদিন দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন, কিন্তু তিনি কামনা করেন আবার যেন জন্মান্তরে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হন। যদি পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তাহলে যেন পদ্মাতীরেই আবার তাঁদের দেখা হয়।

পরমহংস

মোঃ ইকবাল হোসেন

মহৎ যাঁহারা, যাঁহারা সাধক, তাঁরা সবে এক জাতি,
নাই তাঁহাদের কোন ভেদ নাই, জাতির নাহিক' পাঁতি।
বিপুল এ ধরায় অযুত সমাজে যেখানেই তাঁরা যান,
সকল কলুষ তাঁদের পরশে হয় জানি অবসান।

শস্ত্রের মতো শাস্ত্র আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মন
ধর্মদ্বন্দ্বে শতধা ভিন্ন মোদের প্রাণ যখন,
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তখন শান্ত স্বরে
বাঁচালেন আসি, বাঁধিলেন সবে নূতন প্রীতির ডোরে।

শুনালো সে মুনি—অনুষ্ঠানের আলোড়ন মাঝে কভু
প্রাণের ঠাকুর সাড়া দেয় নাকো, জাগে না জীবন-প্রভু।
বিভেদ-বিচারে মানুষের মনে আঘাত হানিল যারা,
দেবতা তো নয়, দানব তাহারা—শান্তি-শত্রু তারা।

মানব-প্রেমের হে মহাপূজারী, বিপুল জ্যোতির অংশ,
সালাম তোমারে হে সাধু তাপস, সাধক পরমহংস।

---

* নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় পঠিত।

সমালোচনা

What Vedanta means to me : A symposium. Edited by John Yale. Copyright : The Vedanta Society of Southern California (U. S. A.).

Published in America by Doubleday & Company Inc. Garden City, New York, (1960). Pp. 215. Price $ 3·95.

Published in England by Rider & Company, 178-202 Great Portland Street. London W-I. (1961) Pp. 176. Price 21s.

পাশ্চাত্য পাঠকের জন্য পাশ্চাত্য প্রথায় পরিবেশিত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সারমর্ম— 'What Vedanta means to me' (বেদান্ত বলিতে কি বুঝি)। 'বেদান্ত' বলিতে একদিকে যেমন বুঝায় হিন্দুধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব, তেমনি ইহা আবার সকল ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, সেদিক দিয়া বেদান্ত বিশ্বজনীন। বর্তমান সংকলনে সেই দিকটির উপর জোর দিয়া দেখানো হইয়াছে। সাধারণভাবে যাঁহারা প্রচলিত ধর্মগুলির উপর আস্থা হারাইয়াছেন, বেদান্ত কিভাবে তাঁহাদিগের অশান্ত উদ্‌বাস্তু মনকে একটা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে পুনর্বাসিত করিয়াছে, তাহারাই কয়েকটি অকপট বিবরণ এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। মনে হয়, এই দিক দিয়াই বর্তমান জগতে বেদান্তের সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকারিতা।

গ্রন্থখানিতে বেদান্তের সূত্র-অনুযায়ী ধর্ম বা দর্শনের বিবিধ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, মনে করিলে পাঠক হতাশ হইবেন; বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন মানসিক স্তরের মানুষের মনে বেদান্ত-চিন্তা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, পরিশেষে কিভাবে একটা শান্ত সমাধানের পথের ইঙ্গিত দেয়, তাহারই সুন্দর সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বিবরণী এখানে পাওয়া যাইবে।

এলডুস হাক্সলি, ক্রিষ্টোফার ঈশারউড, জিরাল্ড হার্ড প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকের মনে বেদান্ত কিভাবে প্রতিভাত হইয়াছে; স্বামী অতুলানন্দ, জন ইয়েল, প্রব্রাজিকা সারদাপ্রাণা প্রভৃতি পাশ্চাত্য নরনারীকে বেদান্ত কিভাবে ত্যাগের ও সাধনার জীবনে আকর্ষণ করিয়াছে —তাহা তাঁহাদের নিজের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। জন্মগত ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়াও বেদান্তের শক্তিতে কিভাবে মানুষ স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহার চিত্রগুলি মনোমুগ্ধকর।

লেখকেরা সকলেই পাশ্চাত্যে বেদান্ত-আন্দোলনের সহিত জড়িত, এবং প্রবন্ধগুলি ১৯৫১ খৃঃ পর হইতে বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি-পরিচালিত 'Vedanta and the West' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকশেষে লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তাঁহাদের বক্তব্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

এই জাতীয় আরও দুইখানি গ্রন্থ দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দের উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছে: Vedanta and the Western World (1945), Vedanta for Modern Man (1951). পুস্তক-গুলির মাধ্যমে আমরা বুঝিতে পারি—বেদান্ত কিভাবে পাশ্চাত্য মনীষার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

ভগবান রমন মহর্ষি—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক : শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১০৬ ; মূল্য টাকা ৩.২৫।

অরুণাচলের রমন মহর্ষির নাম আজ কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে সাধক-সমাজে সুবিদিত। বাল্যেই সহসা দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার উপলব্ধির আভাস পাইয়া, কৈশোরে গৃহত্যাগ করিয়া পুরুষকার-সহায়ে কঠোর সাধনা দ্বারা তিনি আধ্যাত্মিকতার উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। সাধনার ও সিদ্ধাবস্থার যে আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বহু সাধকের জীবন-পথ আলোকিত করিতেছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এই মহাপুরুষের জন্ম, সাধনা, সিদ্ধি, মহাসমাধি—সকল কথা সহজ ভাষায় সুন্দরভাবে বর্ণিত। একটি পরিচ্ছেদে মহর্ষির প্রধান উপদেশগুলি সঙ্কলিত। মহর্ষির দুইখানি ছবি এবং অরুণাচল মন্দির ও রমনাশ্রমের ছবি পুস্তকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। পাতায় পাতায় বানান ভুল বড় চোখে লাগে। যাই হোক—আজিকার অবিশ্বাসের যুগে এরূপ মহাপুরুষের জীবনকাহিনীর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কল্যাণ (সংক্ষিপ্ত যোগবাশিষ্ঠ অঙ্ক)—হিন্দী পত্রিকা, ৩৫তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা সম্পাদক—শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী শাস্ত্রী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০০ ; মূল্য টাকা ৭.৫০।

কল্যাণ-পত্রিকার এই 'সংক্ষিপ্ত যোগবাশিষ্ঠ অঙ্ক' প্রসিদ্ধ যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের সংক্ষিপ্তসার। সচ্চিদানন্দ-ঘন ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিপাদক অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ এই যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে একই তত্ত্বকে নানা সুন্দর কাহিনী ও অনুকূল যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম, নির্বাণ—এই প্রকরণগুলিতে যোগ, যোগসাধন, সদাচার, শাস্ত্রবিধিপালন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর উন্নত বিচার-প্রণালী প্রদত্ত হইয়াছে। পুরুষকার ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস চরম কল্যাণের পথে লইয়া যায়—ইহাই যোগবাশিষ্ঠ বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়।

আলোচ্য বিশেষাঙ্কে ৭০০ পৃষ্ঠায় যোগবাশিষ্ঠের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সবই পাওয়া যাইবে। বহুরঙের ১৬টি এবং রেখা-চিত্র ১৩৬টি এবং অন্যান্য চিত্র দ্বারা ইহাকে আকর্ষণীয় করা হইয়াছে। হিন্দী ভাষার বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা রচনাগুলি সুলিখিত। ছাপা উত্তম।

যুগশঙ্খ : মালদহ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পত্রিকা, ১৩৬৬—ছাত্রসম্পাদক : শ্রীখগেন্দ্রনাথ দে। বিদ্যামন্দির পত্রিকা পরিচালন-সমিতির পক্ষে শ্রীরাখালরাজ তরফদার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৩।

ছাত্রদের এই বার্ষিকীতে ৫টি প্রবন্ধ, ১৫টি কবিতা, ৫টি গল্প এবং ৩টি ভ্রমণকাহিনী স্থান পাইয়াছে। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে এই লেখাগুলিতে তরুণ মনের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'ভগিনী নিবেদিতা প্রসঙ্গে' শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে নিবেদিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ভারতপ্রীতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। 'ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের দান' ও 'উপহার' লেখা-দুইটির রচনাশৈলী ভাল। 'বিদ্যামন্দির-সংবাদ-পরিক্রমা' প্রবন্ধে জানিতে পারা গেল যে, ছাত্রেরা শ্রেণীহিসাবে সারা বছরে 'চিহ্ন', 'কুঁড়ি' 'শিক্ষা', 'স্বাক্ষর', 'অনামিকা', 'আবোল-তাবোল' প্রভৃতি অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছে—ইহা তাহাদের সাহিত্য-প্রীতির পরিচায়ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজ : (১) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের ১৯৬০-৬১ খৃ: বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৫ খৃ:। ৭ জন বিদ্যার্থী লইয়া স্টুডেন্টস্ হোমের কাজ আরম্ভ হয়, বর্তমানে ৩০০ জন বিদ্যার্থী বিনা খরচে থাকা-খাওয়া ও পড়াশুনার সর্ববিধ সুযোগ পাইতেছে।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তিনটি বিভাগ: উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ বিভাগ, শিল্প-বিদ্যালয়। উচ্চ বিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় সম্পূর্ণ আবাসিক। কলেজ-ছাত্রাবাসে বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র থাকে। এতদ্ব্যতীত স্টুডেন্টস্ হোম কর্তৃক দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়, তন্মধ্যে একটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য। হরিজন বালকগণের জন্য একটি ফ্রি ছাত্রাবাসও পরিচালিত হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে উল্লেখযোগ্য কার্য: টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুটের L.M.E. কোর্সের জন্য নূতন ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে, ল্যাবরেটরিও নির্মিত হইয়াছে। মাদ্রাজের গভর্নর শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী ১০. ৩. ৬০ তারিখে এই ভবনের উদ্বোধন করেন।

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের বার্ষিক কার্যবিবরণী (জানুআরি, '৬০—মার্চ, '৬১) পাইয়া আমরা আনন্দিত। ১৯২৫ খৃ: চিকিৎসালয়টির প্রতিষ্ঠা-বর্ষে ৯৭০ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৯৮,৬১৩ ('৫৯ খৃ: ১,৫৪,১৭৫); এক্স-রে বিভাগে পাঁচ শতাধিক, চক্ষুবিভাগে ১৯ হাজারের অধিক, E.N.T. বিভাগে ১৬ হাজারের অধিক এবং দন্তবিভাগে ১১ হাজারের অধিক রোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসাদি করা হয়। রুগ্ণ ও অপুষ্ট শিশুদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে ১০,০৯৭ শিশু চিকিৎসিত হয়। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ১,৯৮৮। ১,৩৫,৮৫০ জনকে দুধ দেওয়া হয়।

জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের ক্রমোন্নতির মুখ্য কারণ।

মাঙ্গালোর : কেন্দ্রের ১৯৬০-৬১ খৃ: বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মাঙ্গালোরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ১৯৪৭ খৃ: এবং মিশনের শাখা ১৯৫১ খৃ: প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে এখানে একটি ছাত্রাবাস ও একটি দাতব্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে ছাত্রাবাসে স্কুলের ৩২ এবং কলেজের ১০ জন বিদ্যার্থী ছিল; মোট ৩৫ জন ছাত্র ফ্রি থাকার সুযোগ লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসালয়ে মোট ৪৫,৯৮৭ রোগী (নূতন ৮,২৫৪) চিকিৎসিত হয়।

আশ্রমে দৈনিক পূজা ভজন, সাময়িক উৎসব এবং সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা হইয়া থাকে।

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার) : প্রতি শনিবার নিম্নোক্ত সূচী অনুযায়ী পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল :

বিষয়	বক্তা
জানুআরি :	
যিশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ	,, নিরাময়ানন্দ
,, ব্রহ্মানন্দ	,, জীবানন্দ
,, ত্রিগুণাতীতানন্দ	,, দেবানন্দ
ফেব্রুআরি : মহাভারত	শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ	,, তেজসানন্দ
মার্চ : স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা	,, জীবানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা	শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
আমার 'আমি'	স্বামী অজজানন্দ
মহাভারত	শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
এপ্রিল : গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা	,, জীবানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	,, সুশান্তানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শক্তিপূজা	,, জ্ঞানাত্মানন্দ
জগতের রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ	,, সম্বুদ্ধানন্দ
মে : শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত
শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
গীতা	স্বামী সাধনানন্দ

আমেরিকায় বেদান্ত

হলিউড বেদান্ত সোসাইটি : কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ ও স্বামী ঋতজানন্দ। রবিবাসরীয় বক্তৃতা :

জানুআরি, '৬১ : দৈনন্দিন জীবনে বেদান্ত; স্বামী বিবেকানন্দ; সাধুত্ব; শ্রীশ্রীমহারাজ; মনের শক্তি।

ফেব্রুআরি : নৈর্ব্যক্তিক জীবন; আত্মজ্ঞান; ভক্তি; ঈশ্বর এবং ঈশ্বরসদৃশ মানুষ।

মার্চ : শ্রীরামকৃষ্ণ; বেদান্তের দৃষ্টিতে জগৎ; ভাল-মন্দের সমস্যা; নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবারে ভাগবত এবং প্রতি বৃহস্পতিবারে কঠোপনিষদের ক্লাস হয়।

সান্টা বারবারা শাখাকেন্দ্রে :

জানুআরি : বিশ্বাস; আধুনিক মানুষের জন্য যোগ; স্বামী বিবেকানন্দ; সর্বভূতে ঈশ্বর-দর্শন; স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

ফেব্রুআরি : মনের পবিত্রতা; নৈর্ব্যক্তিক জীবন; বহুত্বে একত্ব; ভক্তি।

মার্চ : প্রার্থনা ও ধ্যান; শ্রীরামকৃষ্ণ; ভক্তের জীবন; ভাল-মন্দের সমস্যা।

রবিবারে বক্তৃতা ও মঙ্গলবারে গীতা ক্লাস হয়।

বক্তৃতা-সফর

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত জানুআরি হইতে মার্চ পর্যন্ত শিলং, গৌহাটী, পাণ্ডু, আমিনগাঁও, কুচবিহার, মেখলীগঞ্জ, রানীর হাট, মাথাভাঙ্গা, আলিপুরদুয়ার জংশন, দমনপুর, নরেন্দ্রপুর, জগদ্দল, হরিনাভি, জয়নগর, বাটানগর, বাণীপুর ট্রেনিং কলেজ ও কলিকাতা লেক রোড ইত্যাদি স্থানে 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবদান', 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ' এবং 'ভারতীয় নারী সম্বন্ধে জাতির আদর্শ ও মাতা সারদাদেবী' বিষয়ে মোট ৩৪টি বক্তৃতা দেন; তন্মধ্যে ৩০টি ছায়াচিত্র-যোগে প্রদত্ত।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

ডিগবয় (আসাম) ঃ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ৩০শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে দুইটি সাধারণ সভা, চারিটি কথকতা অধিবেশন, উপনিষদ্ ও কথামৃত পাঠ, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ ও সংকীর্তনাদির অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম সভায় (ইণ্ডিয়া ক্লাবে) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাংলায় এবং স্বামী ভব্যানন্দ ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদর্শ ও জীবনদর্শন সম্বন্ধে ভাষণ দেন। দ্বিতীয় সভায় (সেবাশ্রমস্থ সভাগৃহে) বক্তৃতা করেন স্বামী শিবরামানন্দ, স্বামী ভব্যানন্দ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও স্বামী পুরুষাত্মানন্দ।

এই উপলক্ষে স্থানীয় সারদাসঙ্ঘের উদ্যোগে ২রা এপ্রিল সূচী-শিল্প ও হাতের কাজের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ৫ই এপ্রিল সকালে উক্ত সঙ্ঘের এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনকথা আলোচিত হয়।

৬ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে সেবাশ্রম-পরিচালিত বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের এক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

৪ঠা, ৫ই ও ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় যথাক্রমে **মার্গারেটা, তিনসুকিয়া** ও **মাকুমে** বক্তৃতা করেন স্বামী শিবরামানন্দ এবং সঙ্গীতসহ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা কথকতা করিয়া শুনান শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

রগড়া (মেদিনীপুর) ঃ ৯ই এপ্রিল হইতে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত রগড়া পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, নামসংকীর্তন, শোভাযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বিশ্বদেবানন্দ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রতিদিন সন্ধ্যায় সঙ্গীতসহ কথকতা করেন। দুইটি অধিবেশনে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা এবং একটি অধিবেশনে চণ্ডী-মাহাত্ম্য কথকতা হয়।

কল্যাচক (মেদিনীপুর) ঃ গত ১৭ই মে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা, পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। সন্ধ্যায় এক জনসভায় স্বামী গোপেশ্বরানন্দ (সভাপতি), স্বামী বিশ্বদেবানন্দ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বেরা প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

১৮ই মে সকালে শিক্ষক-ছাত্র সম্মেলনে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে শিক্ষা'-বিষয়ে আলোচনা হয়।

চেতলা (কলিকাতা) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপে গত ৩১শে মার্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত চারদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, বক্তৃতা, প্রসাদ-বিতরণ, ভজন ও কীর্তনাদি হইয়াছিল। ১লা এপ্রিল সন্ধ্যায় স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী জীবানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২রা এপ্রিল স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট বক্তাগণ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

চাকদহ (নদীয়া) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৯ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রভাতফেরী, চণ্ডীপাঠ, পূজা ও হোম, কীর্তন-ভজন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত

হয়। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী জীবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

উত্তরবঙ্গে : গত ৫ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তপন থানায় শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের নবনির্মিত সর্বজনীন উপাসনা-গৃহের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও প্রায় তিন সহস্র নরনারীর মধ্যে অন্নপ্রসাদ বিতরিত হয়। ছায়াচিত্রযোগে সঙ্গীতসহ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা, অষ্টপ্রহরব্যাপী কীর্তন প্রভৃতিও উৎসবের অঙ্গ ছিল।

৭ই ও ৮ই বৈশাখ গঙ্গারামপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়। সন্ধ্যার পর সারদা-লীলা-গীতির অনুষ্ঠান করেন মালদহের সারদা-সঙ্ঘের শিল্পিবৃন্দ। পরদিন ছায়াচিত্রে সঙ্গীত সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সঙ্গীতসহ বক্তৃতা হয়।

৩১শে বৈশাখ হইতে ৫ দিনব্যাপী ইটাহার থানার মারনাই গ্রামে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং সন্ধ্যার পর ছায়াচিত্রযোগে সঙ্গীতসহ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ ও পরে একদিন ভক্ত প্রহ্লাদের জীবন-রচিত সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় যাত্রা এবং কীর্তনের ব্যবস্থাও ছিল। অনুষ্ঠানগুলিতে প্রত্যহই প্রায় দুই সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইত।

উপরে উক্ত তিন স্থানেই মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পরশিবানন্দ, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ উপস্থিত থাকিয়া গ্রামবাসীদিগকে উৎসাহিত করেন।

সানমুড়া (মেদিনীপুর) **: ২৬শে মে** স্থানীয় অধিবাসিগণের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা, বিশেষ-পূজা, হোম, চণ্ডী, গীতা ও কথামৃত পাঠ, ভক্তসেবা, ধর্মসভা প্রভৃতি কার্যসূচীর অন্তর্গত ছিল। সভায় স্বামী বিশ্বদেবানন্দ (সভাপতি), অধ্যাপক শক্তিপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বলেন। বিবেকানন্দ সঙ্ঘের সভ্যগণ 'বাংলার বিবেক' অভিনয় করেন। পরদিবস সন্ধ্যায় কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়।

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের সংবাদ পাইয়া আমরা আনন্দিত :

আগরতলা, চক-কাশীপুর (২৪ পরগনা), দোমড়া (বর্ধমান), খেপুত (মেদিনীপুর), শান্তিপুর, কুমিল্লা।

জনসংখ্যা : আয়ব্যয় : হ্রাসবৃদ্ধি

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৎসরে ৪.৫ হইতে ৫.৫ কোটি হারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং চলতি বৎসরের কোন সময়ে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ৩,০০ কোটি দাঁড়াইতে পারে।

U. N. Bureau of Social Affairs-এর ৩৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণীতে বলা হইয়াছে : কম্যুনিস্ট চীন, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো এবং ভেনেজুয়েলায় মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি লক্ষণীয়। কৃষির উপযুক্ত আবহাওয়ার অভাবে এবং রপ্তানী মূল্যের পরিবর্তন হওয়ায় অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় কমিয়া গিয়াছে।

১৯৫৪-৫৮ খৃঃ মধ্যে ফিনল্যাণ্ড, মিসর, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে

৫% হারে শ্রমিকের 'প্রকৃত বেতন' বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু পশ্চিম জার্মানি ও পোল্যাণ্ডে এই বৃদ্ধি যথাক্রমে ২০% ও ৪০% হইতেও বেশি। ১৯৫৯ খৃঃ পাশ্চাত্য শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে এই বৃদ্ধি ৩% বা ততোধিক এবং পূর্ব-ইওরোপে ৪% হইতে ৫%।

সাপ্তাহিক নির্ধারিত ৪৮ ঘণ্টা স্থলে পশ্চিম জার্মানি ও সোভিয়েট ইউনিয়নে কাজের সময় সাধারণতঃ ৪১ ঘণ্টা হইতে ৪৬ ঘণ্টার মধ্যে করা হইয়াছে এবং বৃটেন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে ইহা অপেক্ষাও কম।

ইওরোপীয় নারীগণের মধ্যে টিনে-ভরা, জমানো এবং তৈরী খাদ্যের ক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভ্রমণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, টেলিভিশন (T. V. Sets) এবং মোটরগাড়ীর ক্রেতার সংখ্যাও বাড়িয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দুর্ঘটনা-জনিত মৃত ও আহত ব্যক্তির সংখ্যা তিনগুণ হইয়াছে।

১৯৫৫-৫৯ খৃঃ মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে দুই বা অধিক মোটরগাড়ীর মালিকের সংখ্যা ১১% হইতে ১৫% তে উঠে। সোভিয়েট ইউনিয়নে টেলি-ভিশন সেট, রেফ্রিজারেটার, ধোলাই-যন্ত্র প্রভৃতির চাহিদা বাড়িয়াছে; উৎপাদনের তুলনায় পোশাক-পরিচ্ছদ ও রেডিওর চাহিদা কম, ঐগুলি দোকানে অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ঘানা, মরক্কো, নাইজিরিয়া, মিসর এবং লঙ্কাদ্বীপে ১৯৫৩-৫৮ খৃঃ রেডিও ব্যবহার দ্বিগুণ হইয়াছে। [সংকলিত]

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা

I. N. S. কর্তৃক প্রদত্ত এক খবরে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলির হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ১,২৫,০০০। ইহার মধ্যে ৬৭% ম্যাট্রিক, ২১% ইণ্টারমিডিয়েট এবং ১২% গ্র্যাজুয়েট। এই শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৩০ জনের কারিগরি ও বৃত্তিগত যোগ্যতা আছে এবং শতকরা ২০ জনের কোন চাকরির অভিজ্ঞতা নেই।

(সংকলিত)

দেহত্যাগ-সংবাদ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৬শে মে স্বামী কৃষ্ণপ্রেমানন্দ (অখিল্ মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৪ মাস যাবৎ তিনি পাকস্থলীর রোগে (chronic gastritis) শয্যাগত ছিলেন।

১৯১৮ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়া শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের নিকট হইতে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ।। শান্তিঃ।।।

সন্ধান ও প্রাপ্তি *

স্বামী বিবেকানন্দ

পাহাড়ে পর্বতে উপত্যকায়,
গির্জায় মন্দিরে মসজিদে —
বেদ বাইবেল আর কোরানে
তোমাকে খুঁজেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে।
মহারণ্যে পথভ্রান্ত বালকের মতো
কেঁদে কেঁদে ফিরেছি নিঃসঙ্গ;
তুমি কোথায়—কোথায়—আমার প্রাণ—
ওগো ভগবান?
নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই।

দিন রাত্রি মাস বর্ষ কেটে যায়,
আগুন জ্বলতে থাকে শিরে,
কিভাবে দিন রাত্রি হয় জানি না,
হৃদয় ভেঙে যায় দুভাগ হয়ে।
গঙ্গার তীরে লুটিয়ে পড়ি বেদনায়,
রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি,
ধূলিকে সিক্ত করে তপ্ত অশ্রু,
হাহাকার মিশে যায় জন-কলরবে;
সকল দেশের সকল মতের মহাজনদের
নাম নিয়ে ডেকে উঠি অধীর হয়ে,
বলি, আমায় পথ দেখাও, দয়া কর,
ওগো, তোমরা যারা পৌঁছেছ পথের প্রান্তে।

কত বর্ষ কেটে গেল করুণ আর্তনাদে,
মুহূর্ত—মনে হয় যুগ যেন,
তখন—একদিন আমার হাহাকারের মধ্যে
কে যেন ডাকল আমায় আমারি নাম ধরে।

মৃদু মধু আশ্বাসের মতো এক স্বর—
'পুত্র! আমার পুত্র! পুত্র মোর!'
সে কণ্ঠ বাজলো হৃদয়ে একটি সুরে—
আত্মার প্রতিটি তন্ত্রী উঠল ঝঙ্কার দিয়ে।

---

* ১৮৯৩, ৩০শে অগষ্ট—তারিখে বষ্টনের অধ্যাপক (J. H. Wright) রাইটকে লিখিত পত্রের শেষে সংযোজিত ইংরেজী কবিতার অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু।

উঠে দাঁড়াই। কোথায় সেই স্বর
যা ডাকছে আমায়—এমন ক'রে ?
খুঁজে ফিরি এখানে, ওখানে—সেখানে,
বারে বারে—পথে ও প্রান্তে।
ঐ ঐ আবার সেই দৈবী স্বর!
ঐ তো শুনছি আমি, আমারি আহ্বান!
আবেগে আনন্দে নিরুদ্ধ হৃদয়
ডুবে গেল পরমা শান্তিতে।

জ্বলে উঠল আত্মা পরম জ্যোতিতে
খুলে গেল হৃদয়ের দ্বার,
আনন্দ! আনন্দ! একি অপরূপ!
প্রিয় মোর, প্রাণ মোর, সর্বস্ব আমার,
তুমি এখানে, এত কাছে—আমারি হৃদয়ে ?
আমারি হৃদয়ে তুমি নিত্যকাল—
রাজার গৌরবে!

সেইদিন থেকে যখনি যেখানে যাই
বুঝেছি হৃদয়ে, তুমি আছ পাশে পাশে
পর্বতে—উপত্যকায়—শিখরে—সানুতে—
দূরে বহু দূরে, উর্ধ্বে আরো উর্ধ্বে।

চাঁদের কোমল আলো, তারকার দ্যুতি,
দিবসের মহান্ উল্লাস—
সবার অন্তর-জ্যোতি রূপে প্রকাশিত,
তাঁরি শক্তি সকল আলোর প্রাণ।
মহিমার উষা তিনি, সন্ধ্যা বিগলিত,
অনন্ত—অশান্ত তিনি সমুদ্র,
প্রকৃতির সুষমায়, পাখীর সঙ্গীতে
শুধু তিনি, একমাত্র তিনি।

ঘোর দুর্বিপাকে যখন জড়িয়ে পড়ি,
অবসন্ন প্রাণ—ক্লান্ত ও কাতর,
যখন প্রকৃতি আমাকে চূর্ণ করে
ক্ষমাহীন তার নিয়মে—
তখনি তোমারি স্বর শুনেছি তো প্রিয়!
বলেছ গোপন মৃদুভাবে—'আমি এসেছি':
জেগেছি সেই স্বরে; তোমার সঙ্গে
সহস্র মৃত্যুর মুখে আমি যে নির্ভয়।

তুমি আছ মায়ের গানে, যা শুনে
কোলের শিশু ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে,
তুমি আছ শিশুর হাসিতে ও খেলায়,
দাঁড়িয়ে থাকো তাদের মাঝে আলো ক'রে।

পবিত্রহৃদয় বন্ধুরা যখন মিলিত হয়
তাদেরও মাঝে দাঁড়িয়ে থাকো তুমি।
সুধা ঢেলে দাও তুমি মায়ের চুমোয়,
তুমি সুর দাও শিশুর মা-মা ডাকে।
প্রাচীন ঋষির তুমি ভগবান,
সকল মতের তুমি চিরন্তন উৎস,
বেদ বাইবেল আর কোরান গাইছে
তোমারি নাম উচ্চকণ্ঠে—সমস্বরে।

আছ, আছ, তুমি আছ:
ধাবমান জীবনে তুমি আত্মার আত্মা।
ওঁ তৎ সৎ ওঁ[১]—আমার ঈশ্বর তুমি,
প্রিয় আমার, আমি তোমার, আমি তোমারি।

---

১ 'তৎ সৎ': সেই সৎস্বরূপ।
[স্বামীজীর টীকা: 'Tat Sat' means That only Real Existence]

কথাপ্রসঙ্গে

ভাষাসমস্যা—সমাধানের পথে?

ঘনকালো মেঘের কিনারায় রূপালী আলোর রেখা প্রমাণ করে—মেঘের পিছনে সূর্য রহিয়াছে। ভাষা লইয়া দেশে যে তাণ্ডব শুরু হইয়াছে, যে অনাচার অত্যাচারের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহাতে মানুষেব মন স্বভাবতই হতাশ হইয়া পড়ে; কিন্তু ইহারই মধ্য হইতে আশার আলো ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যদি মনোযোগ সহকারে শান্তভাবে এবং মুক্ত মন লইয়া আমরা বিষযটি পর্যালোচনা করি, দেখিব—ভাবতের ভাষাসমস্যা এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার নহে। তবে কেন ইহা এত দুরূহ বলিয়া মনে হইতেছে? কেনই বা ভাষার জন্য এত দাঙ্গা মারামারি হইতেছে?

ভাষাসমস্যার দুইটি রূপ আছে, একটি প্রকৃত, অপরটি বিকৃত। প্রকৃত রূপ এই যে—প্রত্যেকে তাহার মাতৃভাষাকে ভালবাসে, অতএব সেই ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে, কর্মজীবনে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যবহার করিতে চায়, ইহা খুবই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত। এই চিন্তার সূত্র লইয়াই একদিন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী উঠিয়াছিল। প্রদেশ-গুলিতে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ঐ প্রদেশের সংখ্যাগুরু অধিবাসিগণ নিজ ভাষাকে প্রদেশের প্রধান ভাষা করিতে চাহিবে, ইহাও প্রথমত ন্যায়সঙ্গত বলিযাই মনে হয়; কিন্তু প্রদেশ হইতে যখন আমরা দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই দিশাহারা হইয়া যাই! ভারতবাসী—কোন্ ভাষায় কথা কহিবে, কোন্ ভাষায় পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করিয়া দেশের সমগ্রতা রক্ষা করিবে?

তখনই প্রশ্ন ওঠে—সারা ভারতের জন্য কোন একটি ভাষা চালু করা সম্ভব কিনা? যেহেতু ইংরেজ-শাসনের উত্তরাধিকার-রূপে আমরা ভারতের শাসনাধিকার পাইয়াছি, এবং যেহেতু ইংরেজ-শাসনাধীনে একটি ভাষা সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়াছে, সেহেতু আমরা মনে করিয়াছিলাম—ইংরেজ চলিয়া যাইবার পর সহজেই একটি ভারতীয় ভাষা তাহার স্থান অধিকার করিতে পারিবে। স্বাধীনতালাভের উদ্যোগপর্বে হিন্দীকেই ভারতের সাধারণ ভাষা করিবার চেষ্টা মাননীয় নেতৃবর্গ করিয়াছিলেন, মোটামুটি তখনকার সংগ্রামের দিনে সকলে উহা মানিয়া লইয়াছিল; এবং ভারতের ভাষাগত ঐক্য সাধনের জন্য অনেকে ঐ ভাষা শিক্ষা করিতে-ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর দুই দিক দিয়া ব্যাপারটি দাঁড়াইয়াছে অন্য রকম।

হিন্দীভাষা-ভাষীদের ধারণা—যেহেতু অন্যান্য ভাষার তুলনায় সংখ্যার দিক দিয়া হিন্দী একক গরিষ্ঠ (যদিও শতকরা চল্লিশেরও কম, তথাপি উহাই সর্বাধিক লোকের ভাষা), সেহেতু হিন্দীই ভারতের সাধারণ ভাষা—তথা সরকারী ভাষা হইবে। সংবিধানেও অতি সন্তর্পণে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে, যতদিন না সমগ্র দেশবাসী নিজে হইতে হিন্দীকে গ্রহণ করিতে পারে, ততদিন উহা কাহারও উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে না, ততদিন ইংরেজীও চালু থাকিবে; তবে ক্রমশঃ ইংরেজীর ব্যবহার কমাইয়া দিতে হইবে। এতদর্থে মাঝে মাঝে ভাষা কমিশন ও পার্লামেণ্টারি প্রতিনিধিগণ

ব্যাপারটি আলোচনা করিয়া রাষ্ট্রপতিকে জানাইবেন। কিন্তু হিন্দীভাষিগণ একটু অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাহারা যথাশীঘ্র সর্বব্যাপারে হিন্দী চালু করিতে চান। তাঁহাদের এই আবেগ সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়াইয়া পড়িতেছে। অন্যান্য ভাষাভাষীরাও তাঁহাদের ভাষার প্রাধান্যলাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

কিন্তু এই অশোভন আবেগ ভাষাপ্রেমের লক্ষণ নয়, তাহার বহু প্রমাণই জনজীবনে আজ প্রকট হইয়াছে। সরকারী ব্যাপারে, সর্বভারতীয় চাকুরীর পরীক্ষাব্যাপারে যাঁহারা হিন্দীকে প্রাধান্য দেন, তাঁহারাই আবার বেসরকারী ব্যাপারে, চিঠিপত্রে, ব্যবসাবাণিজ্যে, সভা-সমিতিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় না হইলেও ইংরেজী ব্যবহার করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা জানেন—ইহাই উচ্চশিক্ষিতস্তরে সর্বজনবোধ্য ভাষা। সর্বাধিক দুঃখের বিষয়, জাতির নেতাগণ দেশবাসীর উন্নতির জন্য হিন্দীমাধ্যম বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচার করেন, কিন্তু নিজ নিজ পুত্র-কন্যাগণকে ইংরেজীমাধ্যম মিশনরী স্কুলে প্রেরণ করেন। তাই বলিতে-ছিলাম—কি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, কি প্রদেশে, ভাষা আন্দোলনের মূল কারণ ভাষাপ্রেম নয়, রাজনীতিক অধিকার লাভ—অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা-ভাষীকে বঞ্চিত করিয়া, এবং অনেকক্ষেত্রে সংবিধানকে লঙ্ঘন করিয়া।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলি কিভাবে এ সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে? মধ্যযুগে ল্যাটিনের মাধ্যমে ইওরোপের ধর্মীয়-রাজনীতিক ঐক্য বজায় রাখা হইয়াছিল, রেনেসাঁর পর ভাষাভিত্তিক ছোট ছোট রাজ্যে ইওরোপ ভাঙিয়া যায় এবং ক্রমশঃ ফরাসীই সেখানে সাধারণ ভাষা রূপে চালু থাকে, এখন ইংরেজী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাষাসমস্যা প্রবল ভাবে দেখা দেয় নাই, তাহার কারণ ইংরেজ নারীই অধিক সংখ্যায় সে দেশে গিয়াছিল—তাহারাই জাতিকে ইংরেজী ভাষা দিয়াছে। কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসী দুইই চালু আছে। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় ল্যাটিনজাত ভাষাগুলি প্রবল।

এখন দেখা যাক, রাশিয়া কিভাবে তাহার বিরাট রাষ্ট্রের ভাষাসমস্যার সমাধান করিয়াছে। সেখানে ৫০টি জাতির ৭০টি ভাষা! 'ভাষার জন্য কেহ সুবিধা পাইবে না, ভাষার জন্য কেহ নির্যাতিত হইবে না',—ইহাই সেখানকার নীতি। বাধ্যতামূলক সরকারী ভাষার প্রয়োজনীয়তা সেখানে অনুভূত হয় নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাই অবশ্য মাধ্যম; উচ্চতর শিক্ষায় ক্রমশঃ সমৃদ্ধ রাশিয়ান ভাষা ব্যবহৃত হয়।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের ভাষা-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। এটি কোন ভাবাবেগের ব্যাপার নয়, কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ লইয়া খেলা করা চলে না। এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে ভারতের জন্য একটি ভারতীয় সাধারণ ভাষা প্রয়োজন, কিন্তু তাহা কি জোর করিয়া সম্ভব? না ধীরে ধীরে ক্রম-বিকাশের পথে উহা আসিবে? যতদিন তা না আসে ততদিন 'স্থিতাবস্থা' রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একই প্রকার পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করিয়া, এবং পারস্পরিক সাহিত্য অনুবাদ করিয়া জাতীয় ভাষাগুলিকে ক্রমশঃ নিকটবর্তী করিবার চেষ্টা করা উচিত।

আসামের ব্যাপার দেশের সকলকে চিন্তিত করিয়াছে; কিন্তু রাজনীতিকগণ যে ভাবে উহার সমাধান করিতে চাহিতেছেন, তাহা নিতান্ত

সাময়িক, স্থানীয় প্রলেপের মতো। সমস্যার গুরুতর দিকটি—তাঁহারা হয় দেখিতে পাইতেছেন না, নয় উপেক্ষা করিতেছেন।

আসামের প্রকৃত ব্যাপার ভারতের অন্যত্র অনেকেই ঠিক জানেন না। অধিকাংশ ব্যক্তিরই ধারণা বঙ্গভাষীরা সকলেই সেখানে প্রবাসী ও বহিরাগত। কিন্তু যাঁহারা গত ৫০।৬০ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—আসাম একটি বহুভাষী অঞ্চল, অন্যান্য প্রদেশের মতো ওখানে একটি ভাষাকে প্রধান করিয়া ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন করা ঠিক হয় না। একদিক দিয়া বলা যায়, বহুভাষী আসামের পরীক্ষা-পাত্রে (test-tube) সারা ভারতের ভাষাসমস্যা আজ সমাধানের উপায় খুঁজিতেছে।

অশীতিপর প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ (states-man) ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় ভারতের দুঃখ-দায়ক ভাষাসমস্যার সমাধানের যে সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্য জ্ঞাতব্য, এবং জাতির নেতৃবর্গের বিশেষভাবে বিবেচনীয়। যদি এই সূত্র যথোপযুক্ত আলোচনার পর বিধানে পরিণত হয়, তবে বহু অনাবশ্যক রক্তপাত বন্ধ হইবে; আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন নষ্ট না করিয়াও ভাষাজনিত প্রাদেশিক বিদ্বেষভাব দূরীভূত হইবে। মনোভাবের দিক দিয়া খণ্ডবিখণ্ড না হইয়া শান্তিপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ভারত দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। আমরা ডক্টর রায়ের প্রস্তাবের মূল সূত্রগুলি উল্লেখ করিতেছি :

(১) যতশীঘ্র সম্ভব ঘোষণা করা উচিত—ভারতের সকল অঙ্গরাজ্যই বহুভাষী। প্রয়োজন হইলে এই ঘোষণার পূর্বে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে ঐরূপ ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হইতে পারে। কোন রাজ্যের অবস্থা বুঝিয়া সেখানে একাধিক সরকারী ভাষা ব্যবহৃত হইবে।

(২) ভারত সরকারের ১৯৫৬ খৃঃ 'স্মারক-লিপি' পরিষ্কারভাবে বিধিবদ্ধ করিতে হইবে; এবং দেখিতে হইবে প্রতিটি রাষ্ট্রে ভাষাগত সংখ্যালঘুগণের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে কিনা।

(৩) ভাষাগত সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষার জন্য সংবিধানের ৩৪৭ ধারার ভাষা পরিবর্তন করিয়া এমন করিতে হইবে—যেন রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে সংবিধানের রচয়িতাগণের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য করিতে পারেন।

সমাধানের সূত্রগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। দলীয় রাজনীতির বহু উর্ধ্বে দূরদৃষ্টিপ্রসূত এই নীতিগুলিকে সমর্থন করিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ২৫শে জুন Amrita Bazar Patrikaয় যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিও আমরা দেশবাসীর ও নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহার মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষাই ভারতের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য রক্ষা করিতে পারে। সুদীর্ঘ প্রবন্ধের শেষে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরাও এ প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি :

'The two languages, English and Sanskrit, can be complimentary to each other, for maintaining the intellectual, administrative and political as well as the spiritual and cultural unity of India during these troubled times, these crucial decades, through which we shall have to act with justice, with caution, with tact, with a sense of the realities, and with imagination and circumspection.'

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী

ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক ভারতের ইতিহাসে এক অপূর্ব অধ্যায়ের সূচনা করে! সবে মাত্র সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ভারতের শাসনভার নিয়মতান্ত্রিক ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাতে গিয়াছে; ধর্ম-ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ঘোষিত হইয়াছে; পরাধীনতা সত্ত্বেও ভারতবাসীর মনে একটা নিরাপত্তার ভাব আসিয়াছে, যাহা ভারতে সহস্রাধিক বৎসর ছিল না। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে ভারতের সুপ্ত প্রতিভা দিকে দিকে বিকশিত হইতে লাগিল। এই দশকেই এমন সব মহা-মনীষী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা পৃথিবীর যে কোন দেশের গর্ব ও গৌরব। বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে স্বাধীন ভারতে জাতীয় মর্যাদা সহকারে তাঁহাদের জন্মশত-বার্ষিকী উদ্‌যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমরা নিজেদের ধন্য মনে করিতেছি।

১৮৬৩ হইতে ১৯০২; মাত্র ৩৯ বৎসর! ইহারই মধ্যে স্বামীজী তিনটি মহাদেশে যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহার জন্মের শতবর্ষ পরে—তাহা অবধারণ করিবার সময় আসিয়াছে। তাঁহার বহুমুখী ব্যক্তিত্ব এক এক জনের কাছে, এক এক দেশে এক এক ভাবে প্রতিভাত! আবার দেখা যাইতেছে কালভেদেও তাঁহার বাণীর নূতন নূতন অর্থ ফুটিয়া উঠিতেছে। সনাতন ভারত তাঁহার মধ্যে পাইয়াছে প্রাচীনতম ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। নূতন ভারত তাঁহার মধ্যে পাইয়াছে নবতম জীবনের উদ্‌গাতা—জাতীয় জাগরণের প্রথম হোতা! পাশ্চাত্য তাঁহার মধ্যে এক যোদ্ধার সহিত সম্মুখীন হইয়া পরে বরণ করিয়া লইয়াছে আগামীযুগের ধর্মগুরুকে—নবমানবতার মন্ত্রদাতাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠভাবগুলির সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ মানবের বিশ্বব্যাপী যে নূতন কৃষ্টি গড়িয়া উঠিবে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনায়—বাণী ও রচনায় তাহারই ইঙ্গিত!

মূর্খ তাহারা, যাহারা স্বামীজীর উদার বেদান্ত প্রচারের মধ্যে 'সেকেলে' সাম্প্রদায়িকতা দেখিয়া থাকে; বিকৃতমস্তিষ্ক তাহারা, যাহারা তাঁহার দেশপ্রেমে রাজনীতির গন্ধ পায়; কৃপার পাত্র তাহারা, যাহারা তাঁহার আধ্যাত্মিক শিক্ষার মধ্যে কেবল ইহবিমুখ মোক্ষমার্গই সন্ধান করে।

স্বামীজীর ব্যাখ্যাত ধর্ম অতি ব্যাপক, মানব-জীবনের ও সমাজের সকল দিকেই তাঁহার সমন্বয়ী দৃষ্টি, সকল সমস্যার একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানের ইঙ্গিত তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাই আমাদেরই নিজেদের জীবন-সমীক্ষা। তাঁহার শতবার্ষিকী কেন্দ্র করিয়া আজ আমাদের নূতন করিয়া তাঁহার চিন্তাসমুদ্রে অবগাহন করিতে হইবে অমৃতশক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য।

স্বামীজী কোন বিশেষ দেশের নয়, বিশেষ জাতিরও নয়। সকল দেশ সকল জাতি তাঁহার যুগোপযোগী শিক্ষা হইতে নিজ নিজ উন্নতির পথ খুঁজিয়া পাইতেছে ও পাইবে,—এই বিশ্বাসেই আমরা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতেছি তাঁহার জন্ম-শত-বার্ষিকীর উৎসবের আয়োজনে যোগ দিতে।*

* এ বিষয়ে বিস্তৃত সংবাদ দ্রষ্টব্য এই সংখ্যার ৩৮৫ পৃষ্ঠায়।

চলার পথে

'যাত্রী'

মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাসে বিষাক্ত এই যুগে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল 'সভ্যতা'। তাই সভ্যতার মানদণ্ডে আমরা সকল ব্যক্তি বা জাতকেই মেপে নিতে চাই। ঐ একটি জিনিষের অভাবেই কি মানুষ, কি জাত অনেক নীচে পড়ে যায়। তার কাছ থেকে তখন আমাদের আর কিছুই শিখবার নেই, বরং তাকে আবার 'সভ্য' ক'রে তোলবার চেষ্টা জাগে! কিন্তু এই সভ্যতা কি? প্রকৃত সভ্যই বা কারা?

ওদেশে বলে—সেই জাতই সভ্য যে জাত বেশী সাবান ও কাগজ ব্যবহার করে। কেবলমাত্র এই দিক দিয়ে বিচার করলে অনেকেই কিন্তু আপত্তি তুলবেন। কেউ বলেন—সভ্যতার মানদণ্ড হচ্ছে ভাল কাপড়চোপড়, মোটরগাড়ী, টাকা। কিন্তু যে-কোন বড়লোকের ছোট্ট ছেলেটির বা পাগল ছেলেটারও তো ঐ সব থাকতে পারে। তাই বলেই কি তারা সভ্য? কেউ বলবেন—সভ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে যন্ত্রপাতির আধিক্য—রেলগাড়ী, বেতারবার্তা, ছায়াচিত্র প্রভৃতি—কিন্তু এসবও যে-জাতের বেশী আছে তাকেও সব সময় 'সভ্য' ব'লে মেনে নিতে রাজী নই। আবার কারো কারো মতে তারাই সভ্য যাদের মধ্যে শেক্সপিয়রের নাটক, রাফাএলের ছবি এবং বিঠোফেনের গান বেশী চালু; তাহলেও দেখা যাবে—ঐ সব নিয়ে যারা ব্যস্ত, তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়; এবং সেই কারণে বাকী সকলকে অসভ্য বললে—সভ্য ব'লে আর কিছুই থাকে না। ভাল 'খানাপিনা'কেও সভ্যতার মাপকাঠি ধরা যায় না। এদের অনেককেই আমরা সভ্য বলতে রাজী নই, অথচ স্বল্পাহারী উলঙ্গ সাধুকেও সভ্য বলতে বাধে না। কেউ যদি বলেন, সভ্যতার মানদণ্ডে তারাই বড়, যারা নিছক দানবীয় শক্তিতে অপর জাতিকে অধীনস্থ ক'রে সাম্রাজ্য গড়েছে—এতেও আপত্তি তুলব। কেউ হয়তো বলবেন—যে জাত বেশী দিন বেঁচে আছে, তাদেরই সভ্য বলা চলে। এ বিচারে মানুষের চেয়ে জন্তু-জানোয়ারদেরই বেশী সভ্য বলতে হয়। তা ছাড়া মানুষের মধ্যে এমন অনেক প্রাচীন জাত ছিল বা আছে, যারা এই পৃথিবী থেকে প্রায় মুছে গিয়েও দু-চার-দশজনের মধ্যে বেঁচে রয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র ঐ পরমায়ু-বিচারে তাদের আজ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মুকুট পরিয়ে দিতেও অনেকের বাধবে। তবে যদি কেউ বলেন, সেই জাতই সভ্য যে জাত নূতন চিন্তা, নূতন আবিষ্কার এবং সুন্দর সামাজিক আইনকানুন প্রভৃতি নিয়ে চলেছে—তাহলে অবশ্য তাকে অস্বীকার করা শক্ত। তথাকথিত লেখাপড়ার অনুপাত একদেশে বেশী হলেই যে, সে দেশ সভ্যতায় আর সব দেশকে ছাড়িয়ে গেল, এ কথাও মানতে পারি না।

আমাদের দেশেও সভ্যতার একটা সংজ্ঞা আছে। 'সভ্যতা' কথাটি 'সভা' শব্দ থেকে এসেছে। ঋগ্বেদের যুগের শেষের দিকে আমরা 'সভা' বলতে বিচার-সভা বুঝতাম এবং তার বিচারকদের 'সভ্য' ব'লে জানতাম। অথর্ববেদে দেখি—যে ঘরে অগ্নিকে রক্ষা করা হয়েছে তাকে সভা বলা হ'ত, এবং ঐ অগ্নিকে 'সভ্য' বলা হ'ত। শুক্ল যজুর্বেদের পুরুষমেধ-অংশে 'সভা' বলতে বিচারসভাকে বুঝি। পরবর্তী যুগেও পারস্কর গৃহ্য-সূত্রে 'সভা' বলতেই যে বিচার-সভা, তার সম্যক বর্ণনা তাতেই রয়েছে। বৌদ্ধ জাতকেও 'সভা'র উল্লেখ রয়েছে—

এবং এই সভ্যেরা (এখানে সভ্য বলতে অগ্নি নয়, মানুষ) যদি যথার্থ ন্যায়নিষ্ঠ বা ধর্মানুগ না হতেন তা হ'লে তাঁদের সমাবেশকে সভা বলা হ'ত না। এই সভায় গুণবিচারে তাঁরাই সভ্য, যাঁরা নিঃস্বার্থ, নির্ভীক এবং সদ্‌বিচারশীল। নারদীয় গৃহ্য-সূত্রে দেখি সভার সভ্যরাই বিচারকদের নির্বাচন করছেন।

বেশ বুঝছি, আমাদের দেশের সভ্যতার সংজ্ঞায় একটা আন্তর দৃষ্টি আছে—ওদেশের মতো তার সবটাই বাইরের বিচার নয়। এই প্রভেদেরও কারণ আছে। ওদেশের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে 'করা' আর আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে 'হওয়া'। আমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব আন্তরিক কিছু হওয়ায়, বাইরের কিছু পাওয়ায় নয়। একজন লিখেছেন—'হনুমান রামচন্দ্রের জন্য এত করলেন অথচ তাঁকে কোন পদবী দিলেন না তিনি রাজা হয়েও।' নিজেকে হনুমানের মতো পরার্থে বিলিয়ে দিয়ে পরিবর্তে কিছুরই আকাঙ্ক্ষা না রাখার মনোবৃত্তিই আমাদের সভ্যতার মাপকাঠি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশী। গানে গানে গেয়ে বেড়াই প্রাণের কান্নাহাসি।" এই যজ্ঞের ভার গ্রহণ করি বলেই সভ্য।

আমাদের সভ্যতা জড়ত্বকে ধরে বসে নেই, চৈতন্যকে ধরে দাঁড়িয়েছে। ওদেশও আজকাল একথা বুঝছে, তাই Powel এক জায়গায় বলেছেন: Materialism like influenza is endemic amongst us—ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো জড়বাদ আমাদের মধ্যে সব সময়েই ছড়িয়ে রয়েছে। তার ফলে আজ আর প্রচার-ক্ষুধায় জর্জরিত বড়দের জন্য আমাদের আত্মাহুতি নেই, তাঁদের ফটো তুলবার জন্য হঠাৎ-জ্বলা বাতিগুলোই প্রাণ দেয় মাত্র। এই প্রচারমুখী সভ্যতার যুগে আদর্শ চরিত্র দেখে অনুকরণ করবার সুযোগও শিশুদের নেই। আমরা ভুলে গেছি এই সভ্যতা প্রসঙ্গে দীপশিখার উদাহরণ, অথচ এই দীপশিখা জ্বালিয়েই আমাদের সকল পূজা-পার্বণ চলে। এই দীপশিখাই আমাদের সভ্যতার, আমাদের আন্তর চরিত্রের প্রতীক। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"দীপশিখা নিজে যে পরিমাণ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে।" এই অন্যের দৃষ্টিকে তথা দৃষ্টিভঙ্গীকে সাহায্য করার জন্যই আমাদের চরিত্র, আমাদের সভ্যতা। দধীচি তাই আমাদের সভ্যতার আদর্শ। আজ সেই আদর্শচ্যুত হয়েছি বলেই—পাখীর মতো মানুষ আকাশে উড়তে শিখেছে; মাছের মতো জলের নীচে সাঁতরাতে শিখেছে, কিন্তু মানুষের মতো ডাঙায় বাস করতে শিখল না। এই শিখল না বলেই আজকে অনেক মানুষকে সভ্য বলতে বাধে।

সভ্য হ'তে গেলে বাইরের ঐ ভোগের পথে ছুটলে চলবে না, ত্যাগের প্রেরণায় এগোতে হবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে: যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥—মানুষের মধ্যে কাম ও বাসনা যখন সমূলে ধ্বংস হয়, তখনই মানুষ অমৃত হয় এবং তখন এই পার্থিব দেহেই ব্রহ্মলাভ করে।

সভ্যতার আদর্শ এই 'অমৃত' হওয়ায়। তাই চল পথিক ঐ অমৃতলাভের পথে—সেই বৈদিক প্রতীক অগ্নিশিখার 'সভ্য' দীপ্তিকে স্মরণ ক'রে সভ্যতার পথে। চল ত্যাগের পথে, চল নির্ভীকভাবে—চল সব বিলিয়ে, সভ্য হয়ে 'আপন'-ভাবে। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

শ্রীম-সমীপে

স্বামী ধর্মেশানন্দ

প্রথম দর্শন

১৯২০-২১ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহীভক্ত ভাই ভূপতি মহাশয়ের শিষ্য আমার বন্ধুপ্রতিম শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের সহিত আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থ স্কুল-বাড়ীর চার-তলার ছাদে অনেক ভক্ত মধ্যে সমাসীন প্রশান্ত গম্ভীর 'শ্রীম' অর্থাৎ মাস্টার মহাশয়কে আমি প্রথম দর্শন করি। তখন উত্তর কলিকাতায় দর্জিপাড়ায় থাকি ও সিটি কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমার বয়স তখন ২১।২২ হইবে। ছিদাম মুদীর লেনে সুরেনবাবুর সহিত শ্রীশ্রীভূপতিনাথের নিকট প্রায় যাইতাম। সুরেনবাবুর নিকট হইতে একখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত চতুর্থ ভাগ পাইয়া খুব তন্ময় হইয়া পড়িতে লাগিলাম। সুরেনবাবু বলিলেন, লেখক 'শ্রীম' অর্থাৎ পূজনীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। আপনার যখন 'কথামৃত' ভাল লাগিয়াছে, তখন তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত সরাসরি শুনিলে অপূর্ব ভাব-সম্পদ্ লাভ হইবে, তাহাতে মনের ক্ষুধা দূর হইবে, জীবন ধন্য হইবে।

এই কথার পর একদিন বৈকালে দুইজনে মিলিয়া শ্রীম-সমীপে উপস্থিত হইলাম। অল্পবয়স্ক হইলেও আমাদিগকে তিনি সমাদর করিয়া বসাইলেন। শ্রীম চেয়ারে আসীন, আমরা অনেকে বেঞ্চে বসিয়া আছি। বর্ষাকাল, আষাঢ় মাস, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উৎসবের কয়েকদিন পরে। শ্রীম আমাদের হাতে হাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ (শুষ্কপ্রসাদী তণ্ডুলকণা) দিলেন ও ✓মহাপ্রসাদের গুণকীর্তন করিয়া বলিলেন, 'এই মহাপ্রসাদ ধারণ করলে শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হয়।' আমি তখন ব্রাহ্মসমাজে যাই, তদুপরি ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস করাটা কুসংস্কার মনে করি, তবে মনের শক্তি মানি। কলিকাতায় দু-তিন বৎসর বাস করিয়া চটপট কথা বলিতে শিখিয়াছি, বলিয়া ফেলিলাম, 'হ্যাঁ, বিশ্বাস ক'রে খেলে ভক্তিলাভ হ'তে পারে।'

শ্রীম—না, বস্তুধর্ম আছে, যেমন ক'রে খাও, মন পবিত্র হবে, ভগবানে বিশ্বাস-ভক্তি লাভ হবে।

আমি—তা, কেমন ক'রে হবে, মনই তো সব, মনে অবিশ্বাস থাকলে কেমন ক'রে হবে?

শ্রীম—শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, যেমন ক'রে খাও ভক্তিলাভ হবে।

আমি—তা কি ক'রে মানি?

এই কথা শুনিয়া শ্রীম গম্ভীর হইয়া গেলেন, চেয়ারটি একটু ঘুরাইয়া অন্য দিকে ভক্তমণ্ডলীর দিকে মুখ করিয়া বাঁ হাতের তর্জনী আমার দিকে ঘুরাইয়া একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন: ঠাকুর বলেছেন, 'ভক্তি হবে', আর ইনি ঠাকুরের কথা নিচ্ছেন না। সকলে নিস্তব্ধ, সুরেনবাবু আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি হতবাক্ হইয়া অধোমুখ হইয়া রহিলাম। ভাবিতেছি, আমার এত স্পর্দ্ধা ভাল নহে। কাহার সঙ্গে

কথা কহিতেছি, ইনি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিহ্নিত লোক!

শ্রীম তখন সস্নেহে বলিলেন: শোন, একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বললেন, 'রথযাত্রা হয়ে গেল, এই সময় শ্রীক্ষেত্র থেকে রথযাত্রীরা ফিরছে, তুমি স্টেশনে গিযে যাত্রীদের কাছ থেকে আমার জন্য মহাপ্রসাদ ভিক্ষা ক'রে নিয়ে এসো, আমি ঐ প্রসাদ গ্রহণ ক'রব। প্রসাদ ধারণ করলে অন্তরে ভক্তিলাভ হয়।' আমি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে প্লাটফর্মে যাত্রীদের নামতে দেখে ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে বলতে লাগলাম, 'একটু মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দেবেন?' ভদ্র-বেশধারী আমাকে ঐরূপে ভিক্ষা করতে দেখে কেউ অবাক্ হযে চেয়ে রইল, কেউ বা দ্রুত-বেগে চলে গেল, কোন কোন মহাজন আমার অন্তরের ভাব বুঝে আটকে খুলে সযত্নে বা অযত্নে আমায় একটু প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ নিয়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর কত খুশী! তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। আমি কৃতার্থ হলাম। ঠাকুর এর দু-একটি দানা রোজ খেতেন, আমাকেও রোজ সকালে খেতে বলেছিলেন। তাঁর কথা বিশ্বাস কর। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—আর অন্য উপায় নেই।

আমি দু-এক কণা গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব ও অপরোক্ষ বিশ্বাসের এক প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পরে ১৯২৪ খৃঃ হইতে ক্রমাগত শ্রীম-সমীপে যাইতে যাইতে বিশ্বাস ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল।

উৎসাহদান

১৯২৪ খৃঃ কোন সময়ে বিবেকানন্দ সোসাইটির ব্রহ্মচারী তারকের সঙ্গে একদিন শ্রীম-র নিকট যাই। বোধ হয় এই দ্বিতীয় দর্শন। তখন আমি 5th year-এ পড়ি। বিবেকানন্দ সোসাইটিতে থাকিয়া পড়াশুনা করি। সোসাইটির কিছু কাজও করি। তন্মধ্যে ঠাকুরপূজা, লাইব্রেরী দেখা, এবং সাময়িক সভা-সমিতির ব্যবস্থা করা। তারক ইতিপূর্বে দু-একবার গেলেও বিশেষ পরিচয় ছিল না। আমরা একরূপ নবাগত। শ্রীম আমাদের সঙ্গে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। মনে আছে, চারতলার একটি বারান্দায়—ছাদের সম্মুখে।

শ্রীম—(তারককে) তুমি ওখানে কি কর?

তারক—আমি বিবেকানন্দ সোসাইটির চাঁদা সংগ্রহ করি এবং সোসাইটির সম্পাদক মহাশয়কে কার্যে সাহায্য করি। প্রতি মাসে কোন ভক্ত সদস্যের বাড়ীতে সোসাইটির তরফ থেকে একটি সভায় ধর্মবিষয়ে আলোচনা এবং ভজনাদির ব্যবস্থা করি। সোসাইটির গৃহে রামনাম-সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সপ্তাহে দুটি ক'রে ঠাকুর-স্বামীজীর বইয়ের ক্লাসও হয়।

শ্রীম—বাঃ চমৎকার, এই তো ঠিক কর্মযোগ—স্বামীজী যা ব'লে গেছেন। নিষ্কামভাবে করতে পারলে, এতেই জ্ঞানভক্তি লাভ হয়।

শ্রীম-র এই উৎসাহ পাইয়া তারক অতিশয় হৃষ্ট হইল। কারণ সংসারে তাহার নিকট আত্মীয় কেহ নাই। সে সোসাইটির কার্যে ধীরে ধীরে নিজেকে উৎসর্গ করিতেছিল। শ্রীম-র উৎসাহ পাইয়া সে রাত্রে সোসাইটিতেই থাকিতে আরম্ভ করিল। আমার দিকে তাকাইয়া শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কর?

আমি—ওখানে ঠাকুরঘরে নিত্যপূজা ও আরতি করি।

শ্রীম—উৎকৃষ্ট কাজ পেয়েছ। চমৎকার, এ কাজে তোমার ভক্তিলাভ হবে। দেখ, ফুলের কি পবিত্র মনোহর গন্ধ। তুমি সেই ফুল

নিয়ে পরম পবিত্র শ্রীভগবানকে নিবেদন ক'রছ। চন্দন ঘষার সময় ওর সুগন্ধ চিত্ত হরণ করে। আবার সেই চন্দন তুমি ভগবানকে অর্পণ ক'রছ। তাঁকেই হৃদয়ে ধ্যান ক'রছ। এ কাজটি তুমি ছেড় না। পূজার দ্বারা অতি শীঘ্রই ভগবানের কৃপা লাভ হয়। পবিত্রভাবে একাগ্র মনে পূজা ক'রে শেষে প্রার্থনাদির দ্বারা তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করবে। আর আরতির ভজন শুনলে মন আপনিই একাগ্র হয়, চেষ্টা ক'রে ধ্যান করতে হয় না। বেশ, বেশ!

অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দু-জনের পৃথক্ পৃথক্ কাজের গুণকীর্তন করিয়া শ্রীম যেন আমাদিগকে আপনার করিয়া লইলেন।

১৯২৪ খৃঃ আমার এক দাদা একবার কলিকাতা হইতে বায়ু-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কাশী গিয়া সেবাশ্রমে কিছুদিন থাকেন এবং সেখানে সাধুসঙ্গে প্রভূত আনন্দ লাভ করেন। কাশী যাইবার প্রাক্কালে আমার সহিত তিনি শ্রীম-কে দর্শন করিতে যান। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীম জানিতে পারেন যে, আমি সংসারী হইতে চাই না। দাদার ইচ্ছা ছিল, আমি সংসারী হই, চাকরি করি। আমার একটি চাকরিও জুটিয়াছিল, কিন্তু আমি গ্রহণ করি নাই। এ সকল কথা শুনিয়া শ্রীম দাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—যে বংশে ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে একজন সাধু হয়, সে বংশ ক্রমশঃ পবিত্র হয়ে যায়। মা, ভাই—সবাই সেই সাধুকে চিন্তা করে কিনা, তাই তারা অন্তরে সাধু হয়ে যায়। যে যার চিন্তা করে, সে তার সত্তা পায়। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।' দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি কর?'

দাদা—ব্যবসা করি।

শ্রীম—উত্তম, চাকরির অপেক্ষা ব্যবসা ভাল। স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনতা ধর্মলাভে সাহায্য করে।

আমরা উভয়ে শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

সাধু সাবধান

নবাগত ব্রহ্মচারীদিগকে শ্রীম কাম-কাঞ্চন হইতে সর্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ করিতেন। আমি তখন ব্রহ্মচারী. শ্রীম-র নিকট গিয়াছি; ঠাকুরবাড়ীতে, সকালের দিকে শ্রীম তখন একাকী ছিলেন। আমাকে বলিলেন, 'আজকাল দেখি, নবাগত ব্রহ্মচারীকে গৃহস্থের বাড়ীতে চাঁদা সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়। এতে বিপদের আশঙ্কা আছে।'

আর একদিন এক ভক্তের নিকট কাঞ্চনের আশায় উপস্থিত এক ব্রহ্মচারীকে সুকৌশলে শ্রীম শিক্ষা দিয়াছিলেন, যাহাতে সাধু ভক্তের মুখাপেক্ষী না হয়, বরং ভক্তই যেন সাধুর নিকট শ্রদ্ধাপূর্বক আসে। সাধু একমাত্র ঈশ্বরে নির্ভরশীল হইবে। ধনী ভক্তের অপেক্ষা রাখিবে না। এইভাবে শ্রীম শিক্ষা দিতেন। আর বলিতেন, 'আজকাল, দেখি নূতন ব্রহ্মচারীরা গুরুর নিকটে বাস, গুরুসেবা, ঠাকুর-সেবা, শাস্ত্রপাঠ ছেড়ে অর্থান্বেষণে বেরোয়, অল্প-বয়সী গৃহস্থদের সঙ্গে মেশে। আরও শুনছি বয়স্ক সাধুরাও ভক্তের খরচায় তীর্থে গিয়ে তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও পোঁটলা-পুঁটলি সামলায়।

জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে বলিলেন, 'পূর্বে গুরু মুখ হ'তে উপদেশ পেয়ে তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ ক'রত। আজকাল অনেকে শুধু lecture (বক্তৃতা) শুনতে চায়। গৃহস্থ বক্তার বক্তৃতার মূল্য আর কত? তারা তো সেইভাবে জীবনযাপন করে না, কেবল

বক্তৃতাই দেয়। ওর মূল্য চার আনা। ধর্ম-জীবন যাপন করা, ঈশ্বরলাভের জন্য চেষ্টা, সাধনাদি—এ সব individual problem (ব্যক্তিগত সাধনার বস্তু), গুরুমুখী বিদ্যা। গুরু শিষ্যের অন্তর জানেন, কখন কোন্ উপদেশটি দরকার—তিনি জানেন। একি আর সভা-সমিতিতে ধর্মোপদেশ শুনে হয়?' এইরূপে শ্রীম ব্যক্তিগতভাবেই নূতন সাধু-ব্রহ্মচারীদের সুপথে চালিত করিতেন।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি শ্রীম-র ভক্তি অনির্বচনীয়। মাকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণের লক্ষ্মীরূপে দেখিতেন। বাগবাজার মায়ের বাড়ীতে মাতৃদর্শনে যাইতেন, সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া ফিরিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্ধানের বহু পরে ১৯৩১ খৃঃ একবার শ্রীম-র সহিত মায়ের বাড়ী গিয়াছিলাম। শ্রীম বড় এক চ্যাঙারি সন্দেশ ঠাকুরের ভোগের জন্য লইলেন। আমরাও ৪।৫ জন তাঁহার সহিত সকাল ৯টা আন্দাজ শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে উপস্থিত হইলাম। যে ঘরে মা মহাসমাধি লাভ করিয়াছিলেন, সেখানে এখন ঠাকুরের পূজা হয়। মায়ের খাট পালঙ্ক শয্যা এখনও সেই ঘরে সেইভাবে আছে। শ্রীম মায়ের খাটের নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধ্যান করিলেন। তারপর তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইল। আমরা সকলে ফিরিলাম।

একবার একটি ভক্তকে তিনি মায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ভক্তটি ঠাকুরের সম্বন্ধে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মায়ের সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না। মা তখন উদ্বোধনে বাস করিতেছেন। শরীর খুব সুস্থ নয়। মা উপরের ঘরে কুলবধূর মতো সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, কেবল শ্রীচরণ দুইটি দেখা যাইতেছে। ভক্ত মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। মা কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং ভক্তটি অল্পবয়স্ক বলিয়া করুণা-পূর্বক কোন একটি কাজেও পাঠাইলেন। ভক্তটি এইরূপে সেবা করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইল, কিন্তু মনে বড় দুঃখ রহিল, কারণ তিনি মায়ের শ্রীমুখ দর্শন করিতে পান নাই। তখন মা অবগুণ্ঠিতা ছিলেন।

ভক্তটি শ্রীম-র নিকট ফিরিয়া গিয়া একটু বিমর্ষ হইয়া বলিল, 'মা আমায় দেখেছেন বটে, কিন্তু আমি মায়ের মুখ দেখতে পাইনি।' শ্রীম বলিলেন, 'তুমি তাঁর চরণ স্পর্শ করলে, তিনি তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করলেন—আর কি বাকি রইল? তুমি আজ থেকে অভয়ার আশ্রয় পেলে, নির্ভয় হ'লে। মা লক্ষ্মী তোমার ওপর মুখ তুলে চেয়েছেন।'

শ্রীম-র অন্তর্নিহিত ভক্তি ফল্গুধারার মতো শ্রীশ্রীমায়ের চরণাভিমুখে সতত প্রবাহিত হইত। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন প্রতি মাসে শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় টাকা পাঠাইতেন। জয়রামবাটী হইতে একজন সামান্য লোক আসিলেও শ্রীম-র নিকট সম্মান ও সমাদর লাভ করিত।

কুম্ভমেলা

১৯৩০ খৃঃ জানুআরি মাস, আমি তখন বেলুড় মঠে আছি। শ্রীম-র কাছে মাঝে মাঝে যাই। কুম্ভমেলার কথা শুনি। এই মাঘ মাসে প্রয়াগে পূর্ণ কুম্ভমেলা হইবে। বেলুড় মঠ হইতে অনেক সাধু একখানি Reserved গাড়ীতে প্রয়াগে যাইতেছেন শুনিয়া আমারও যাইবার ইচ্ছা হইতেছিল। কুম্ভমেলার সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ছিল না। একদিন শ্রীম বলিতে লাগিলেন, 'ধীরেন, তুমি কুম্ভমেলায় যাও। বেশ হবে, দেখিবে সাধুদের একটি সমাজ আছে। সংসারের প্রতি ঘনিষ্ঠতা

রুমে যাবে। ওখানে নানা সম্প্রদায়ের সাধুর সমাগম হয়। প্রতিদিন মাসাধিককাল তথায় ঐ সব সাধুর সমাজে ভগবদ্‌গুণগান, শাস্ত্রচর্চা, ভাণ্ডারা, শোভাযাত্রা দেখলে আনন্দ পাবে ও অনেক অভিজ্ঞতা হবে।'

শ্রীম-র কথায় কতকটা উৎসাহিত হইলাম বটে, তখনও মনে হইতেছিল—মঠে থাকিয়া মহাপুরুষ মহারাজের সেবা করি। মহাপুরুষ মহারাজের সেবকদের মধ্যে দু-এক জন কুম্ভমেলা দেখিতে যাইবেন, শুনিলাম। একজন সেবকও আমায় বলিলেন, 'এই সময় যদি তুমি মঠে থাক, তোমার সেবার সুযোগ মিলবে।' শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে একদিন বলিয়া ফেলিলাম, 'আপনার সেবা ক'রব।' তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তোর যে রোগা শরীর, তোর সেবা করে কে?'

যাহা হউক অনেক বাধা সত্ত্বেও কুম্ভমেলায় যাওয়া ঠিক হইল। যাইবার সময় শ্রীম বলিয়া দিয়াছিলেন, 'তুমি কুম্ভ-মেলার বর্ণনা করিয়া আমায় একটি চিঠি লিখো।' কুম্ভমেলায় গিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের কাছে ক্যাম্পে রহিলাম। সেই দু-তিন ক্রোশব্যাপী মেলায় বিভিন্ন মণ্ডলেশ্বরকে দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। একদিন মুঠিগঞ্জ আশ্রমে গিয়া তথা হইতে দু-এক জন সাধুর সহিত যমুনায় এক নৌকা করিয়া সঙ্গমের দিকে যাইতে যাইতে যমুনার উভয় তীরে শ্যামলক্ষেত্র ও যমুনার কালো জল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হইয়াছিল, সেই ভাবে ভরপুর হইয়া শ্রীম-কে এক পত্র লিখিলাম। উহার মধ্যে নাগা-সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া বিভিন্ন সাধুমণ্ডলীর যে পরিচয় পাইয়া-ছিলাম, তাহাও লিখিলাম। একসঙ্গে লক্ষাধিক সাধুর স্নান করিবার দৃশ্য ও সমাগত শ্রদ্ধাবান্ ভক্তদের সাধুগণ-সমীপে আগমন, মনে সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

এক বৎসর পরে যখন কলিকাতায় শ্রীম-র কাছে যাই, শ্রীম আমাকে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া বলিলেন, 'আহা তোমার কুম্ভমেলার কি বর্ণনা! আর সর্ব প্রথমেই তোমার চিঠি পাই। তোমায় ধন্যবাদ।'

ঐ বৎসর (১৯৩০) গ্রীষ্মকালে আলমোড়া আশ্রমের পশ্চিমে একটি পাহাড়ের পাদদেশে এক কুটিরে—নির্জনে যেভাবে কাটাইতে-ছিলাম, তাহাও তাঁহাকে পত্রে লিখিয়াছিলাম। শ্রীম তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন: এই নির্জন হিমালয়ে অনন্যশরণ হইয়া তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তায় কাল কাটাইতেছ। কি সুন্দর পরিবেশ, ইচ্ছা হয়, এই বৃদ্ধ বয়সে ঐ কুটিরে থাকিয়া তপস্যা করি। 'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম'। কিন্তু একাকী বাসকালে 'সাধু সাবধান!' শ্রীশ্রীঠাকুরের এই মহাবাক্য সর্বদা স্মরণ করিবে।

নির্জনে শ্রীম-সঙ্গে

১৯৩১ খৃঃ একদিন দুপুর ১॥-২টার সময় বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী হইতে আমহার্স্ট স্ট্রীটে স্কুলবাড়ীর চারতলার ছাদে গিয়া উপস্থিত। এরূপ অসময়ে প্রায় যাই না। মায়ের বাড়ী হইতে প্রায় রোজই সন্ধ্যার কিছু আগে ঐখানে শ্রীম-র কাছে যাই এবং তাঁহার মুখ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত শ্রবণে তৃপ্তি-লাভ করি। তিনি বহু ভক্ত পরিবৃত হইয়া সানন্দে ঠাকুরের কথা বলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই ঐ চারতলার ছাদের উপর যেখানে তিনি বেশ একটি সুন্দর তুলসী-কানন করিয়াছেন, তাহার ভিতরে গিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান করেন। আমরাও তাঁহার চারিপাশে বসিয়া শ্রীভগবানের ধ্যান

করিবার চেষ্টা করিতাম। আসন না থাকিলে শ্রীম নিজেই আসন দিতেন। ঐ জন্য আমি নিজে একখানা আসন লইয়া যাইতাম। আসনখানি একদিন ভুলক্রমে ফেলিয়া আসিয়াছি। তখন কপর্দকশূন্য অবস্থা, আসনখানি অপহৃত হইলে কাহার কাছে আবার আসন চাহিব, এই ভাবনায় ছাদের উপর হইতে এই অসময়ে আসনখানি আনিতে গিয়াছি। কিন্তু শ্রীম আমায় দেখিয়া ফেলিলেন।

শ্রীম তখন ছাদের উপর একটি ছোট্ট টিনের চালাঘরে একাকী দুপুরে বিশ্রাম লইতেন, তাহা আমি জানিতাম না। তিনি নির্জনতা ভালবাসেন; নির্জন না হইলে ঈশ্বরচিন্তা হয় না, অধিকন্তু ঝঞ্ঝাট বাড়ে, তাই এখানে একান্তে থাকেন। আর ছাদের উপর চারিধারে এত উঁচু আল্‌সে দেওয়া আছে যে, নীচের ঘর-বাড়ী জন-মানব দেখা যাইত না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অন্তরাত্মা। ভক্ত পাইলে ঠাকুরের কথা কহিতে খুব ভাল বাসিতেন। আমাকে দেখিয়া 'এই যে, এস এস' বলিয়া সাদরে কাছে ডাকিলেন। আমি তাঁহার সমীপে গেলে আমার হাত ধরিয়া তাঁহার পাশে খাটের উপর বসাইলেন এবং কুশল প্রশ্ন করিলেন। আমি বলিলাম, 'আমাকে এখনই ফিরতে হবে। মায়ের বাড়ীতে তিনটার সময় ছান্দোগ্য-উপনিষদের ক্লাস হবে, সেখানে আমায় উপস্থিত থাকতে হবে। আসনখানি ফেলে গিয়েছিলাম, তাই নিতে এসেছি।' এই কথার উত্তরে শ্রীম বলিলেন, 'আরে! বস, বস।' কিন্তু আমি উঠিয়া পড়িলাম এবং হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি, তখন বলিলেন, 'ধীরেন, বেদ-বেদান্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলেই পড়ে আছে। সেই চরণ ধ্যান করলে সমস্ত জ্ঞান লাভ হয়।'

আমি কিন্তু মূঢ়ের মতো তখন তাঁহার কথার গভীর মর্ম ধারণা করিতে না পারিয়া আসন লইয়া উদ্বোধনে ফিরিলাম। এখন মনে হয়, তাঁহার ঐরূপ আগ্রহ এবং নির্জনে তাঁহার সঙ্গ কত সুদুর্লভ! হয়তো সেদিন তিনি আমাকে তাঁহার অমৃতময় স্পর্শে আমার অন্তরে উচ্চ অধ্যাত্মভাব সঞ্চার করিয়া দিতেন। কারণ পরে আমার এক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, একদিন শ্রীম তাহাকে ঐরূপে নির্জনে ডাকিয়া লইয়া ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে চোখে চোখে চাহিয়া হৃদয়ে এরূপ উচ্চভাব উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, অনেকক্ষণ সে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিল। তখন কি ভক্তসঙ্গের এত মাহাত্ম্য বুঝিতাম। এখন হায় হায় করি এবং দুরদৃষ্টের কথা ভাবি।

শতবার্ষিকী-প্রসঙ্গে

১৯৩৬ হইতে ১৯৩৭ খৃঃ পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহার ৪।৫ বৎসর পূর্ব হইতে একটি শতবার্ষিকী গ্রন্থ প্রকাশ করিবার উদ্যোগ হইতেছে। উহাতে সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে অনুভূতি ও ধারণা লিপিবদ্ধ থাকিবে। শতবার্ষিকীর প্রধান উদ্যোক্তা স্বামী অবিনাশানন্দজী জনৈক সাধুর সহিত ঐ গ্রন্থে প্রবন্ধসকল কিভাবে সঙ্কলিত হইবে তদ্‌বিষয়ে পরামর্শ লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। শ্রীম বলিলেন, 'ধর্মের প্রাণ তপস্যা। ঠাকুর সেই তপোমূর্তি ছিলেন, যদি তোমরা ভারতবর্ষে নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রে ভগবানের জন্য সর্বত্যাগী তপস্বীদের অভিজ্ঞতার লিপি সংগ্রহ করতে পারো, তাহলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিগ্রন্থ হবে। স্বামীজী, রাজা মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্যগণের তপস্যার উপরই এই শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত।'

মাস্টার মহাশয়ের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

অমাবস্যা ৺কালীপূজা দিবস
1, Jhamapukur Lane,
6th Nov. 1904

শ্রী—,

আপনার পত্রপাঠে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ঠাকুর পাণ্ডবদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, স্মরণ করিবেন। ভক্ত হইলে যে সুখদুঃখ হইবে না, তাহা নহে। পাণ্ডবরাও সুখদুঃখের পার ছিলেন না—দেহধারণ করিলেই সব আছে। শ্রীশ্রীমার চরিতামৃতেও তাহা দেখা যায়।

আর ঠাকুর কি বলেন নাই, 'সবই রামের ইচ্ছা।' রামই আপনাকে হৃষীকেশ লইয়া গিয়াছিলেন, তিনিই মহাপুরুষের মুখ দিয়া আপনাকে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, আবার তিনিই বলছেন, 'হাঁ বটে, তবে তুমি তো তোমার মার কথা তখন বল নাই।' তিনি আপনাকে দেখাইয়া দিলেন যে, কর্ম বাকি থাকিলে সন্ন্যাস হয় না।

মনে করলে কি তিনি আপনাকে কর্মযোগ করাতে পারেন না? তিনি সর্বশক্তিমান্! কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসীর অভাব নাই। এই লীলাক্ষেত্রে তিনি সব রকম খেলা খেলিতে চান। তিনি আমড়া গাছে ন্যাংড়া ফলাতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে ন্যাংড়ার বাগানের অভাব নাই! 'Nevertheless not my will, but Thine be done.' ইতিমধ্যে আপনি তাঁর নিকট সর্বদা দরখাস্ত করুন; ঠাকুর বলেছেন, আকুল হয়ে বললে তিনি সুবিধা করিবেন। নিশ্চয়ই করিবেন!

আপনি সাধুসঙ্গ করেছেন, হৃষীকেশে নির্জনে ঠাকুরকে ডেকেছেন, এখন যদিও ক্ষণকাল যোগভ্রষ্ট হন, এ সাধন বিফল হইবার নহে। 'ন হি কল্যাণকৃৎ etc.'। ঠাকুর বলেছেন, আন্তরিক হ'লে সংসারেও যোগী হওয়া যায়। তবে বড় কঠিন।

অহল্যা বলেছিলেন (ঠাকুর সর্বদা বলতেন), হে রাম, যদি শূকর-যোনিতে জন্ম হয়, তাতেও আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার শ্রীপাদপদ্মে যেন শুদ্ধা অমলা অহেতুকী ভক্তি হয়। অতএব ঠাকুর সর্বদা বলছেন, তাঁকে ডাকো নিশিদিন, যেন তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়। তা যদি হয়, সব সহ্য হবে। এ সংসারে মানুষ আর কয়দিন?

অধরকে কি তিনি বলেন নাই, সম্মুখে কলি! যে যেমন অবস্থায় থাক না কেন, তাঁকে ভুলো না!!! তাঁকে কর্মত্যাগের কথা না ব'লে, ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে ভক্তি প্রার্থনা করতে বলতেন। আর তিনি যদি করান, করাবেন। আপনার মা আছেন, সংসার আছে, এখন বোধ হয় কিছু কর্মকাজ করিয়া শ্রীযুক্ত ··· বাবুর ন্যায় তাঁদের ভরণ-পোষণ করিতে করিতে ঈশ্বরকে ডাকাই তাঁর ইচ্ছা। তারপর তাঁর যা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।··· Yours sincerely M. N. Gupta

P. S. আহা তাঁর কি দয়া! গৃহস্থকেও অভয় দিয়েছেন! তবে পরিবারের সঙ্গে সর্বদা ঈশ্বরের কথা কহিতে বলিতেন—ও ঈশ্বরের পূজা ও সাধুভক্তের পূজা সর্বদা করিতে বলিতেন ও নির্জনে চিন্তা ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। 'কথামৃতে' দেখিবেন।

P. S. ······ঠাকুর খুব বিশ্বাস করতে বলতেন, তিনি পর নন, আপনার মা। আপনি মার ছেলে ভুলবেন না। হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করতে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam, E. I. R.
21st December, 1922

শ্রী—,

আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবেন। শীত পড়াতে শরীর একটু ভাল বোধ হইতেছে। এখানে আর কিছুদিন থাকিব, এরূপ ইচ্ছা আছে। আপনি যখন যখন মঠ বা ৺দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, অনুগ্রহ করিয়া বিবরণ সংক্ষেপে লিখিবেন ও তৎসঙ্গে আপনার কুশল সংবাদ দিবেন। মঠের বিবরণে সাধুদের কথাবার্তা ও তাঁরা কি করিতেছেন ইত্যাদি লিখিবেন—'কিমাসীত, ব্রজেত কিম্, কিং প্রভাষেত etc.' (গীতা)।

সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা, ঠাকুর বলিতেন, আমাদের একমাত্র উপায়। ভাইটিকেও এই কথা বলিবেন & give him my love.

Affectionately শ্রীম

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam, E. I. R.
1st March, 1923

শ্রী—,

তোমার স্নেহলিপি আজ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমরা মহোৎসবে গিয়াছিলে ও বোধ হয় ৺তিথিপূজার দিনও গিয়াছিলে। আর, অবসর হইলেই মঠে যাওয়া উচিত—সাধুসঙ্গ বিনা উপায় নাই, সর্বদা প্রয়োজন—ঠাকুর বলিতেন।

আর গুরুদত্ত ধন লইয়া (বীজ) ডুব মারা—যেমন শামুক স্বাতী নক্ষত্রের জল লইয়া মুক্তা প্রস্তুত করে।···

শ্রী—,

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভজন্ম anniversary উপলক্ষে আমাদের love & namaskar জানিবেন।

Affectionately শ্রীম

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

Mihijam,
5th July, 1923

Dear—,

Many thanks for your kind notes. Did you visit Bhubaneswar Math at the time of ৺ প্রতিষ্ঠা? If you have not done so, you should do it next time you get leave. For the spirit of শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ still possesses that Holy spot. Trust your health is now better, কারণ সাধুসঙ্গ।···শ্রীগুরুদেব কেবল সাধুসঙ্গ করিতে বলিতেন, তবেই শ্রীগুরুদত্ত মন্ত্রের মূল্য বুঝা যায় ও চৈতন্য হইবে। With best wishes···

Ever yours in the Lord. M.

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ : বিশ্বরূপদর্শন]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈ্ব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

মহাভয়ের ভাণ্ড ফুটিয়া যেন নিরন্তর চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে, তেমনি আপনার প্রচণ্ড বদনসমূহ চতুর্দিকে বিস্তৃত দেখিতেছি। শুধু তাহাই নহে, উহার অসংখ্য দন্ত ও দংষ্ট্রারাজি ওষ্ঠাধর ছাড়াইয়া বাহির হইয়াছে (দুই ওষ্ঠ কিছুই আচ্ছাদন করিতে পারিতেছে না)—চতুর্দিকে যেন প্রলযের অস্ত্রসমূহের বেষ্টনী লাগানো হইয়াছে। যেন নূতন বিষে ভরিয়াছে, কিংবা কালরাত্রি মুখব্যাদান করিয়াছে। কিংবা বজ্রাগ্নি (প্রলয়াগ্নি) যেন আগ্নেয়াস্ত্র চালনা করিতেছে; তেমনি আপনার প্রচণ্ড বক্ত্র হইতে ক্ষোভ উছলিয়া বাহির হইতেছে, যেন আমাদের উপর মরণরূপী জলের বন্যা আসিয়াছে; প্রলয়কালের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত আর কল্পান্তের প্রলয়ানল—যদি এ দুটি একসঙ্গে মিলিত হয়, তবে কি না জ্বালাইতে পারে, আপনার সংহারের মুখ দেখিয়া কি আমার ধৈর্য নষ্ট হইবে না? এখন ভ্রমে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছি, আর নিজেকেও চিনিতে পারিতেছি না। স্বল্প পরিমাণে বিশ্বরূপ নয়নগোচর হইল, আর সুখেরও অন্ত হইল, এখন আপনার অব্যবস্থিতভাবে বিস্তৃত এই অপার বিশ্বরূপ সংবরণ করুন, এই অবস্থায় আপনি এইরূপ করিবেন জানিলে কি বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিতাম? এখন এমন হইয়াছে যে একবার প্রাণ বাঁচিলে হয়!

হে অনন্ত, যদি আপনি সত্যই আমার প্রভু হন, তবে এই মহামারীর প্রসার সঙ্কোচ করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন। আপনি সকল দেবগণের পরম দেবতা, আপনার চৈতন্যেই এই বিশ্বের জীবন, ইহা ভুলিয়া আপনি উল্টা করিতেছেন, অতএব হে প্রভু, আপনি শীঘ্র প্রসন্ন হউন, আপনার মায়া সংবরণ করিয়া আমাকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন। (৩৮০)

এ পর্যন্ত বারংবার যে অত্যন্ত আকুল হইয়া আপনাকে মিনতি করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, আপনার বিশ্বমূর্তি দেখিয়া আমি ভীত হইয়াছি। ইন্দ্রের অমরাবতীর উপর যখন শত্রুর আক্রমণ হয়, তখন আমি একাই তাহাদের পরাভূত করিয়াছি,—কালের সম্মুখেও দাঁড়াইতে আমি ভয় পাই না, পরন্তু হে দেব, ইহা তেমন নহে; এখানে মৃত্যুকেও আক্রমণ করিয়া আপনি এখনই গ্রাস করিবেন, ইহারই সূচনা দেখা যাইতেছে; প্রলয়কাল উপস্থিত না হইতেই, তাহার পূর্বেই আপনি কালেরও কাল হইয়া আসিয়াছেন; বেচারী ত্রিভুবন অল্পায়ু হইল! অহো, বিপরীত ভাগ্য! শান্তি কামনা করিতে গিয়া বিঘ্ন দেখা দিল। হায়, হায়, এই বিশ্ব ডুবিল, আপনি ইহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমি কি বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, না আপনি চতুর্দিকে মুখব্যাদান করিয়া এই সমস্ত সৈন্যদল গ্রাস করিতেছেন?